প্রকাশ : শারদ ষষ্ঠী ১৩৬০
প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ৩১।১বি মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা ৯।
মুদ্রক : রতিকান্ত ঘোষ, দি সত্যনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২০৯এ বিধান সরণি, কলকাতা ৯।

সূচিপত্র

পান্নালাল দাশগুপ্ত

সুহৃদ্বরেষু

এমন অপরাজিত বীর্যের সম্পদ,
এমন নির্ভীক সহিষ্ণুতা,
এমন উপেক্ষা মরণেরে,...
সাথে সাথে, পথে পথে
এমন সেবার উৎস আগ্নেয় গহ্বর ভেদ করি
অফুরান প্রেমের পাথেয়।

সূচনা

"পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে"

এই গানে এবং আরো কয়েকটি গানে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে "পান্থজন", "পথিকজন", "পথিকপরাণ" বা শুধু "পথিক" বলেছেন। খুব নতুন কথা নয় এটা। সাধু-সন্তরা, আউল-বাউলরা, সুফী-দরবেশরা, মরমিয়া কবিরা নিজেদেরকে চরম প্রেমের করুণ-রঙিন অথচ প্রাণান্ত-কঠিন পথের পথিক ব'লে জেনেছেন বহুকাল যাবৎ। "পথের শেষ কোথায়, কী আছে শেষে" – ভেবে না-পেয়ে মাঝে-মাঝে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য আকুল হয়েছেন, এমন মর্মান্তিক সংশয়ও মনে জেগেছে যে তাঁর ঈশ্বর-তৃষ্ণা বুঝি মিটবে না কোনোদিন, মরুপারে দূর দিগন্তে যার আভাস দেখে তিনি পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন তা মরীচিকা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু এমন অন্তিম নৈরাশ্য ক্বচিৎই তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করেছে। 'গীতাঞ্জলি' পর্বে তিনি প্রশান্তই ছিলেন, পথশেষের কথা না-ভেবে পথকেই ভালোবেসেছেন, গান গেয়েছেন – "পথে চলা, সেই তো তোমায় পাওয়া।" এই গানের প্রথম দুটি পঙক্তিতে হাফিজের দুটি পঙক্তির অনুরণন শুনতে পাই আমি – "পথিকদের পথক্লান্তি নেই। / প্রেম পথও বটে, গন্তব্যও (মন্‌জিলও) বটে।"

আমাদের পরিচিত মরমিয়া সাধকরা কিন্তু প্রায় সবাই একই সাধনমার্গ ধ'রে ঈশ্বরের দিকে এগুতে প্রয়াসী হয়েছেন সমস্ত জীবনভরে। পক্ষান্তরে, রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরভাবনা ও তৎসংশ্লিষ্ট ধ্যানধারণা মার্গ থেকে মার্গান্তরে চ'লে গেছে একাধিকবার – এক ধর্মসমাজ থেকে আর-এক ধর্মসমাজে, তারপরে একলা পথে কখনো মগ্ন হ'তে চেয়েছেন ব্যক্তিস্বরূপ জীবনস্বামীতে, কখনো নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বজাগতিক সত্তা অর্থাৎ ভূমাতে, কখনো দীক্ষা নিতে চেয়েছেন নটরাজ শিবের কাছে, কখনো চিরমানবের বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য সাজিয়ে দিয়েছেন, কখনো অমৃত-ভরা মুহূর্তে ধরতে চেয়েছেন শাশ্বতকালের মহিমা। এমন বৈচিত্র্যময় অথচ প্রত্যেকটি সাধনায় নিবিষ্টপ্রাণ সাধকের দৃষ্টান্ত সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই তিনি যখন নিজেকে পান্থজন বলেন তখন পূর্ব-সাধকদের সঙ্গে তাঁর তুলনা

খানিকটা বিভ্রান্তিকর। কাব্যে গানে নাটকে ব্যক্ত বা আভাসিত আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান এই পথিকহৃদয়ের কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি বইয়ের নামপ্রবন্ধে এবং অন্যান্য প্রবন্ধেও।

স্বভাবতই কবি রবীন্দ্রনাথের যাত্রারম্ভ নারীপ্রেম থেকে। যতই তিনি এ-প্রেমকে সুন্দরতর পূর্ণতর করতে প্রয়াসী হলেন, ততই উপলব্ধি করলেন রোম্যান্টিক প্রেমের অন্তর্নিহিত অপূর্ণতা – প্রেমানুভূতির অপূর্ণতা এবং প্রেমাস্পদের অপূর্ণতা। 'গীতাঞ্জলি'তে কি তিনি পেলেন পূর্ণ প্রেমের পূর্ণ পাত্র ("perfect object of perfect love")? কিছুকাল (ন্যূনাধিক এক দশক কাল) তা-ই ভেবেছিলেন তিনি, কিন্তু বেশিদিন ধ'রে রাখতে পারেননি এই প্রশান্ত মধুর ভাবাবেশ। ভাবান্তর ঘটালো প্রথম মহাযুদ্ধ; "বন্দরের কাল হল শেষ"। নোঙর তুলতে হ'লো, পাড়ি জমাতে হ'লো অজানা সমুদ্রে, ঝড়-ঝঞ্ঝার মাঝখানে। পৌছলেন তিনি মানব-দেবতার মন্দিরে: "হে মানব, তোমার মন্দিরে দিনান্তে এসেছি আমি"; জানালেন এখানেই যাত্রাশেষ। কিন্তু শেষ কোথায়? 'পরিশেষ'-এর পরে আছে 'পুনশ্চ'। তার পরেও বিরাম নেই দুঃসাহসিক নাবিকের সামুদ্রিক অভিযানের। আরো কত নতুন দেশের, নতুন কালের সৈকতে লাগতো তাঁর তরী, কে বলতে পারে। মৃত্যু এসে যাত্রা থামিয়ে দিলো যেন মাঝপথেই। আকাশের দিকে চেয়ে বলতে ইচ্ছা হ'লো – অমৃতপাত্র কি এমনি ক'রে ভাঙতে হয়? "বিধাতা আপন ক্ষতি করে যদি ধার্য" – কিন্তু কেন? জড়প্রকৃতির নিয়মশৃঙ্খলা কি এতই ইস্পাতকঠিন যে বিধাতাও তা ভাঙতে পারেন না?

অথচ এই মৃত্যুগ্রাসিত অফুরন্ত-যৌবন কবির ষাট বছর ধ'রে কাটা ফসলের এক বিপুল অংশ তুলে নিয়ে সোনার তরী ব'য়ে চলেছে কালপ্রবাহে। তাই, কী পাইনি তার হিসাব না-মিলিয়ে, কী পেলাম তারই পুনঃপুনঃ বিচার করতে হবে আমাদের। কোনো-কোনো দিক থেকে রবীন্দ্রসাহিত্য পূর্বতন মূল্য হারিয়েছে; আবার অন্যদিক থেকে নবযুগোচিত মূল্য সঞ্চয় করেছে ততোধিক। এ অনিত্য জগৎ ও জীবনে কাব্যবিচারের মাপকাঠিও স্বভাবতই পরিবর্তনশীল। তবে জামাকাপড় গয়নাগাঁটি দাড়িগোঁফের ফ্যাশানের মতো বছরে-বছরে সাহিত্যের মূল্যায়ন বদলালে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে সর্বনাশ ঘটবে।

মহত্তম মূল্যের পুনর্বিচারে, revaluation-এ, আমাদের ধৈর্য রাখতে হবে, স্থবিরতা বর্জন করতে হবে ধাবমান সাহিত্যিক ফ্যাশানের পিছনে না-ছুটে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে সেই দুরূহ 'মঝ্‌ঝিম পন্থা' ধ'রে হাঁটতে চেষ্টা করেছি।

নিজেকে "পান্থজন" বলাতে নতুনত্ব না-থাকলেও পরমেশ্বরকে "পান্থ" বলাতে নূতনত্ব আছে কিছু। পরমেশ্বর পথের কষ্ট স্বীকার করেছেন কিসের জন্য, কিসের সন্ধানে? তাঁর তো কোনো অভাব বা অপূর্ণতা নেই, তিনি তো অনবদ্য, পরাকাষ্ঠা, perfect being। উপনিষদ যখন তাঁকে সত্যম্ বলেন তখন পূর্ণ ও পরোৎকৃষ্ট সত্তা অর্থেই বলেন, নইলে একটি তৃণখণ্ডও তো আপন অকিঞ্চিৎকরতা নিয়ে সত্য। তাই প্রশ্ন জাগে—শাস্ত্রমতে এবং প্রচলিত বিশ্বাসানুযায়ী যিনি সবদিক দিয়ে পরিপূর্ণ, তিনি আবার পান্থ কেন?

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝিয়েছিলেন: "ত্রিভুবনে আমার করণীয় কিছু নাই, প্রাপ্য বা অপ্রাপ্তব্য কিছু নাই, তথাপি আমি কর্মেই ব্যাপৃত আছি লোকসংগ্রহার্থে এবং মানবসকলের দৃষ্টান্তস্থল হইবার জন্য।" রবীন্দ্রনাথও কি সেইরকম কিছু বোঝাতে চেয়েছেন "পান্থ তুমি" ব'লে? রাধাকৃষ্ণন্ "লোকসংগ্রহ"-এর অনুবাদ করেছেন "maintenance of the world", জগদীশচন্দ্র ঘোষের অনুবাদ "লোকরক্ষা"। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনে যে-ছবিটি সর্বদা উজ্জ্বল ছিলো তা বিশ্বজগতের স্থিতিশীলতার নয়, গতিশীলতা ও বিবর্তনোন্মুখতার। তাই তাঁর ভাবপ্রকাশের জন্য ঈশ্বরের বিশেষণ হিসাবে 'কর্মব্যাপৃত' অপেক্ষা 'পান্থ' শব্দটা অধিকতর উপযুক্ত।

আর-একটি বৈশিষ্ট্য—রবীন্দ্রনাথের চোখে জগৎ এবং জগদীশ্বরের মধ্যে দূরত্ব বা পার্থক্য তেমন স্পষ্ট নয় যেমন ছিলো গীতাকারের চোখে। না-থাকারই কথা। কারণ রবীন্দ্রমানসে গীতার চেয়ে উপনিষদের স্থান অনেক বেশি প্রশস্ত। ঈশোপনিষদের প্রারম্ভেই বলা হয়েছে যে সমস্ত জগৎ-চরাচর ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত। ঈশ্বরের দ্বারা 'সৃষ্ট', 'শাসিত', বা 'নিয়ন্ত্রিত' না-ব'লে 'আচ্ছাদিত' (কিংবা 'আচ্ছাদনীয়'—'বাস্যম্') বলাতে অত্যন্ত নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতা বোঝায়। তবু 'আচ্ছাদন' ও 'আচ্ছাদিত'-এর মধ্যে যেটুকু দ্বিত্ব রয়েছে তার দিকে নিশ্চয় ঈশোপনিষদ ইঙ্গিত করছেন না; বক্তব্য এই নয় যে ঈশ্বর স'রে গেলেও জগৎ থাকবে, যেমন ঢাকা তুলে নিলেও ফলভরা থালা থাকে; অথবা জগৎ না-

থাকলেও ঈশ্বর থাকবেন। বাংলা অনুবাদে 'ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট' বললে. সম্ভবত আরো সঠিক অর্থ পাওয়া যাবে। কিংবা যদি বলি জগৎ-চরাচর ঈশ্বরময়, এবং সেই বিচারে ঐশ্বর্যবান (charged with value)।

পরম পান্থকে "পান্থজনের সখা" বলার অন্যতম ইঙ্গিত কি এই নয় যে রবীন্দ্রনাথের মতো যাঁরা মনে-প্রাণে পান্থজন তাঁদেরই সখা তিনি, যাঁরা চিরা-চরিত কোনো ধর্মানুষ্ঠানের পায়ে নিজের স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি প্রত্যর্পণ ক'রে প্রাচীনযুগের খুঁটিতে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে জড়ভরত হ'য়ে ব'সে আছেন, তিনি তাঁদের সখা নন ?

আমি অবশ্য বর্তমান গ্রন্থের নামকরণে ঐ বিশেষণ-পদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথকেই বোঝাতে চেয়েছি, নিজেকে অন্যতম পান্থজন জ্ঞান ক'রে। যে-ধর্মসমাজ ও ধর্মবিশ্বাসের আশ্রয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলাম তাতে একপ্রকার শান্তি, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ছিলো। সেই আরামের ভিটেবাড়ি ছেড়ে বনজঙ্গলের মাঝখান দিয়ে খানাখন্দ পার হ'য়ে পাহাড়-পর্বতের উপর দিয়ে, কখনো-বা উপত্যকার গুমোট অন্ধকারের ভিতর দিয়ে অজানা আকাটা পথে বেরিয়ে পড়ার ক্লেশ, ভয়, বিপদ, ক্ষীণায়মান আশা এবং ঘনায়মান নৈরাশ্যের কথা ভুক্তভোগীই জানেন। তবে রবীন্দ্রনাথের মতন অত নিবিড়ভাবে অমন সর্বান্তঃকরণ দিয়ে আর কেউ জেনেছেন ব'লে তো মনে হয় না। কীর্কেগার্ডের হৃদয়যন্ত্রণা অবশ্য আরো দুঃসহ ছিলো। কিন্তু সে তীব্র যন্ত্রণার কশাঘাতে তাঁর মানসিক স্বাস্থ্য ভেঙে গেলো। ধর্মভাবনায় বুদ্ধি ও যুক্তির সমূহ প্রত্যাখ্যান এবং উদ্ভটের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ তাঁর মনো-রোগেরই উপসর্গ। বর্তমানকালের অযৌক্তিকতাবাদের মন্ত্রদাতা তিনি। টি এস. এলিয়ট ভয়াবহ চিত্র আঁকলেন খরাগ্রস্ত আধুনিক জীবন ও জগতের। তার পরে নিজেই ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলেন এই "ওয়েস্ট্ ল্যাণ্ড্" থেকে, আশ্রয় খুঁজলেন মধ্যযুগের চার্চতন্ত্রে ও রাজতন্ত্রে। তাঁর ধর্মজিজ্ঞাসা ছিলো সাহিত্য-সৌখিন এবং আত্মনির্ভরতাশূন্য। রবীন্দ্রমানস থেকে এ দু-জন মনীষীর আধ্যাত্মিক দূরত্ব অনেকখানি—শুধু দেশগত নয়, কালগতও বটে। রবীন্দ্রনাথ এ-যুগেরই মানুষ, এই পৃথিবীরই কবি।

'গীতাঞ্জলি'র অনেক গানে আমরা শুনেছি তিনি আসছেন—"আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে"; "যুগে যুগে পলে পলে দিনরজনী / সে যে

আসে, আসে" ; ইত্যাদি। কিন্তু আলোচ্য গানে "পান্থ তুমি" এই অর্থে বলা হয়নি। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে ভক্ত যে-দিকে চলেছে ভগবানও সেই দিকে চলেছেন। এই গানে তিনি প্রেমিক নন, সহযাত্রী ; উদ্দেশ্য মিলন নয়, সাধন। কী তাঁর সাধনা ?

"সৃষ্টি যে অপূর্ণ"—রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ১৩১৪ সালে লেখা "দুঃখ" শীর্ষক প্রবন্ধে ; কিন্তু কী বিরাট ভয়ংকরভাবে অপূর্ণ তা উপলব্ধি করলেন আরো সাত বছর পরে, প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমিকায়। তার পর থেকে অংকুরিত হ'তে দেখা যায় আর-একটি উপলব্ধি—এই অপূর্ণ সৃষ্টিকে পূর্ণ ক'রে তোলার দায়িত্ব মানুষেরই। সৃষ্টির অপূর্ণতা স্রষ্টাতেও বর্তায়। আগেই বলেছি রবীন্দ্রনাথের চোখে স্রষ্টা ও সৃষ্টি একই পরম সত্তার দুই ভিন্ন রূপ। অর্থাৎ পূর্ণতার পথে মানুষ যেমন পান্থ, ভগবানও তেমনি। মানুষের কর্মক্ষেত্র মানবসমাজে সীমিত, ভগবানের কর্ম অনন্ত দেশ-কালে পরিব্যাপ্ত। অন্যদিক দিয়ে অবশ্য তিনি পূর্ণ হ'য়েই আছেন মহাকালে, সাক্ষী-চৈতন্যরূপে। তার কথা "শুধু ধূলি, শুধু ছাই" অধ্যায়ে বলেছি।

"ধর্ম ও সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে টি. এস. এলিয়ট যে-ধর্মবোধকে সাহিত্যের পক্ষে অপরিহার্য ব'লে ঘোষণা করেছেন তার মোদ্দা কথা হচ্ছে প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃতের মধ্যে স্পষ্ট ভেদরেখা টেনে অতিপ্রাকৃতকে মৌলিক ও চরম জ্ঞান করা ("primacy of the supernatural over the natural")। এ হেন বিশ্বাসের অবক্ষয়ের মধ্যেই সেকুলারিজমের সংজ্ঞা খুঁজে পেয়েছেন তিনি, এবং বলেছেন আধুনিক সাহিত্য প্রায় সবটাই সেকুলার, কাজেকাজেই নষ্ট ও ভ্রষ্ট। এই এলিয়ট-নিন্দিত অর্থে রবীন্দ্রনাথ 'সেকুলারিস্ট' কবি। মোটের উপর যে-মত ও ভাবাবেগ তাঁর সৃষ্টিকর্মকে অনুপ্রাণিত করেছে তা বিশ্বাতিগ ঈশ্বরে বিশ্বাস নয় ; মোটের উপর রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরকে দেখেছেন এবং ভালোবেসেছেন মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যেই। সেখানে যখন তাঁর পরাণসখাকে দেখতে পাননি তখন ঊষা-দিশা-হারা বোধ করেছেন তিনি, চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার দেখেছেন ; নিজের অন্তরের গোপন কবিপুরুষকে মিনতি ক'রে বলেছেন : "তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, / এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা"। কখনো, কচিৎ কখনো, এমনও হয়েছে যে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ বিলুপ্ত বোধ ক'রে,

দুঃখ ও পাপের বিরাট বিকট চেহারা সহ্য করতে না-পেরে, প্রকৃতির রঙে-রূপেই ঈশ্বরের স্বাক্ষর খুঁজেছেন আমাদের প্রকৃতিপ্রেমিক ঈশ্বরভক্ত কবি। কিন্তু মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে কি রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ থাকতে পারেন, কোনো কবি কবি থাকতে পারেন ? বেশিদিন পারেন না।

বিশ্বস্রষ্টার কথা ভু'লে গিয়ে যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা ভাবি তাহ'লে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে যাই আমরা। আকাশে-আকাশে যে কোটি-কোটি নীহারিকা-নক্ষত্র নিয়ে আতশবাজির খেলা চলছে কয়েক শত কোটি বৎসর ধ'রে, তারি মাঝখানে অন্তত একটি নক্ষত্রের একটি গ্রহে জন্মলাভ করেছে প্রাণ, প্রাণ থেকে মন, মন থেকে আত্মা—এটা কেমন ক'রে সম্ভব হ'লো ? এ-সবই কি সৃষ্টির প্রথম দিনে (আজ-কাল জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আদি সৃষ্টির কথা বলেন, সময় নির্দেশ করা হয় পাঁচ শ' কোটি থেকে হাজার কোটি বৎসর পূর্বে) আকাশময় সমানভাবে ছড়ানো জ্যোতির্কণা ও জড়কণার মধ্যে নিহিত ছিলো সম্ভাবনারূপে, ভ্রূণরূপে—যেমন জরায়ুর একটি নিষিক্ত ডিম্বাণুর মধ্যে ক্রমজোম-বিন্যাসের সাংকেতিক ভাষায় লেখা থাকে পরিণত-বয়স মানুষের দেহের অনেক-কিছু, মনেরও অল্প-কিছু ? না-কি বিশ্বের বিরাট নিরর্থক ঘটনাপ্রবাহে মানুষের জন্ম ও বিকাশ ঘ'টে গেলো নিতান্তই অকস্মাৎ, বাই চান্স্ ? যেমন এক প্যাকেট তাস নিয়ে সারাদিন লক্ষ-লক্ষ বছর ধ'রে ফেটাতে থাকলে একবার এমন বিন্যস্ত প্যাক পাওয়া খুবই সম্ভব, নিশ্চিতও বলা যেতে পারে, যাতে চারটি রঙ আলাদা হ'য়ে গেছে এবং প্রত্যেকটি রঙ টেক্কা-দুরি-তিরি ক'রে সাজানো। অথবা যেমন ঘটতে পারে কোনো বাঁদরের ফুৎকারে একটি উত্তম রাগিণীর স্বরসংযোগ :

There was once a brainy baboon
Who always piped down a bassoon,
For he said : it appears
That in billions of years
I shall certainly hit on a tune.

বেবুন না ভগবান, দৈবাৎ না দৈবী ? 'ভগবান'-এর চলতি অর্থ মনে রাখলে ঐ-শব্দটা ব্যবহার করতে কুণ্ঠা বোধ করি আমি ; কিন্তু সমগ্র বিশ্বজগতের, বিশেষত প্রাণীজগতের, অপ্রতিরোধ্য ক্রমবিবর্তনের কথা ভাবলে যে অপার

রহস্যবোধে ভ'রে ওঠে আমার মন, তার কী নাম দেবো? শেষ অবধি ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা নই; সব প্রতিকূল শক্তিকে ঠেলে, সব সাময়িক অধঃপতন সত্ত্বেও "মানবযাত্রী" এগিয়ে চলেছে মঙ্গলের দিকে, সুন্দরের দিকে অতি ধীরমন্থর গতিতে—রবীন্দ্রনাথের এ-বিশ্বাস আমাদের অনেককেই (মার্কস্ কিংবা জওয়াহরলালের মতো বিঘোষিত নাস্তিককেও) অনুপ্রাণিত করে। ঈশ্বরে বিশ্বাস একে বলবো না, তবে ঈশ্বরবাদ থেকে যতটা দূরে এর মানসিক স্থিতি, জড়বাদ থেকে তার চেয়ে বেশি দূরে।

পরম পান্থ চলেছেন যে-পথে সেটা নিশ্চয়ই সকল রাজপথের সেরা রাজপথ, সকল মানুষের অনুসন্ধেয়, সকল আনুষ্ঠানিক ধর্মে প্রার্থনার অঙ্গীভূত। যত পবিত্র ও মহান হোক্ সে-পথ, তবু তা অতিশয় বিঘ্ন-সংকুল। জড়প্রকৃতির, এবং জীবপ্রকৃতিরও, অব্যতিক্রম নিয়মশৃঙ্খলাই ভগবানের সম্মুখে বিঘ্নরূপে উপস্থিত। তিনি এখনই সব ব্যাধির নিরাময়, সব দুঃখ ও পাপের অবসান ঘটাতে পারেন না। বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম অকাট্য, নির্মম। বিশ্বরাজার পতাকায় পদ্মফুলের মাঝখানে বজ্র চিহ্নিত রয়েছে। পদ্ম সাধুসজ্জনের জন্য এবং বজ্র কেবল অসৎ লোকের জন্য—এমন কোনো অঙ্গীকার নেই তাতে। 'রাজা' নাটকের ঠাকুরদার মতো নিষ্কলুষ সাধুপুরুষের মাথার উপরও বাজ পড়ে; পর-পর তাঁর পাঁচটি ছেলে মারা যায়।

প্রকৃতির সব নিয়ম জেনে এবং দরকারমতো কাজে লাগিয়ে মানুষকেই ধীরে-ধীরে লক্ষ-লক্ষ বৎসরের অক্লান্ত অপরাজেয় তপস্যায় আপন জৈবপ্রবৃত্তিগুলিকে বশীভূত ক'রে আপন পাপক্ষয় ও দুঃখলাঘব করতে হবে। সুন্দর ফুল পাখি জ্যোৎস্নাস্নিগ্ধ সমুদ্রসৈকত বিধাতাই সৃষ্টি করেছেন, প্রাকৃতিক নিয়মতন্ত্রের অমোঘ পরিণাম তারা। কিন্তু সুন্দর সমাজের কাঠামোয় সুন্দর ব্যক্তিজীবনের বিকাশ মানুষেরই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও সৃষ্টিশক্তির যথোপযুক্ত পরিণতির উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতির নিয়মের জালে মানুষ একদিক দিয়ে বাঁধা, অন্যদিক দিয়ে স্বাধীন, অন্তত অংশত স্বাধীন, ইচ্ছাশক্তির অধিকারী; নইলে শ্রেয়োনীতিক দায়িত্ব (moral responsibility) কথাটা অর্থহীন হ'য়ে যায়। এ এক বহু প্রাচীন, বহু জটিল দার্শনিক সমস্যা; এখানে তার অবতারণা সম্ভব নয়।

যকৃতে কর্কট রোগ হয়েছে ছোট্ট ছেলের, যন্ত্রণায় ছটফট করছে সে, মৃত্যু তার

আসন্ন। দুঃখে দিশাহারা মা মন্দির, মস্‌জিদ বা গির্জার চৌকাঠে সমস্ত রাত মাথা খুঁড়লেও ঈশ্বরের করুণা হবে না। করুণা হবে সেইদিন যেদিন কর্কট-রোগের মোক্ষম ঔষধ আবিষ্কৃত এবং সকলের অধিগম্য হবে। ভল্‌তেরকে জনৈক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "প্রতিবেশীর ছাগল এসে আমার বাগান নষ্ট ক'রে দিয়ে যায় রোজ; আমি যদি চার্চে গিয়ে নতজানু হ'য়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি ঐ-ছাগলটাকে মেরে ফেলতে, তা হ'লে কি তিনি আমার প্রার্থনা শুনবেন?" ভল্‌তের বললেন: "প্রার্থনার জোর আছে বৈ-কি, তবে সেই সঙ্গে ছাগলটাকে একটু সেঁকো বিষ খাইয়ে দিতে ভুলে যেয়ো না যেন।" ঈশ্বরের দয়া ও নির্দয়তা দুই-ই প্রকৃতির নিয়মের মধ্যেই প্রকাশ পায়। তার বাইরে, তাকে লঙ্ঘন ক'রে, আমার ব্যক্তিগত দুঃখকষ্ট দূর করার জন্য ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা করার মধ্যে একপ্রকার শিশুসুলভ আবদেরেপনা আছে যেটা বয়স্কের মুখে নির্বোধ আত্মম্ভরিতার মতো শোনায়: "এই বিধানের অবিচ্ছিন্ন সূত্রে এই পৃথিবীর ধূলি থেকে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত এক সঙ্গে গাঁথা রয়েছে। আমার সুখসুবিধার জন্য যদি বলি 'তোমার বিধানের সূত্র এক জায়গায় ছিন্ন ক'রে দাও, এক জায়গায় অন্য সকলের সঙ্গে আমার নিয়মের বিশেষ পার্থক্য ক'রে দাও', তা হ'লে বস্তুত বলা হয় যে, 'এই কাদাটুকু পার হ'তে আমার কাপড়ে দাগ লাগছে, অতএব এই ব্রহ্মাণ্ডের মণিহারের ঐক্যসূত্রটিকে ছিঁড়ে সমস্ত সূর্যতারাকে রাস্তায় ছড়িয়ে ফেলে দাও'।"* মায়ের একমাত্র শিশুসন্তানকে দুঃসহ যন্ত্রণা ও অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যও ব্রহ্মাণ্ডের মণিহারের ঐক্যসূত্রটিকে ছিঁড়ে ফেলতে পারেন না বিধাতা। বিশ্ববিধাতাকে বিশ্ববিধান থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে, স্বতন্ত্র ক'রে দেখার চেষ্টা পদে-পদেই বিড়ম্বিত হবে।

ভগবান নিজে পান্থ হ'য়ে পান্থজনের সখা হ'তে পারেন, কিন্তু সখাতে-সখাতে খেলা মোটেই "মধুর" নয়: "বারে বারে বাঁধ ভাঙিয়া বন্যা ছুটেছে / দারুণ দিনে দিকে দিকে কান্না উঠেছে।" খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রে ঈশ্বরকে সহপথিক বলা হয়নি বোধকরি, কিন্তু সহদুঃখী বলা হয়েছে একাধিকবার। তিনি ধরাতলে অবতীর্ণ হয়েছেন মানুষকে পথ দেখাবার জন্য শুধু নয়, পথের নিদারুণতম কষ্ট ভাগ ক'রে নেওয়ার জন্যও। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা ও ঈশ্বরসাধনা অভিন্ন না-হ'লেও

* "বিধান", 'শান্তিনিকেতন' ১

পরস্পর-অন্তরঙ্গ, বক্ষলগ্ন। দ্বিবিধ সাধনার মর্মকথা এই গানে ("নয় এ মধুর খেলা") নিহিত রয়েছে ব'লে আমার মনে হয়। অন্য-একটি গানে ("পথে চলে যেতে যেতে কোথা কোন্‌খানে") এই কথাটাই একটু ভিন্নভাবে বলা হয়েছে। আরো কত গানে কবিতায় ও নাটকে।

পূর্বোক্ত দুটি গানের দুটি পঙক্তি ("কত বার যে নিবল বাতি, গর্জে এল ঝড়ের রাতি / সংসারের এই দোলায় দিলে সংশয়েরই ঠেলা" এবং "সহসা দারুণ দুখতাপে সকল ভুবন যবে কাঁপে / সকল পথের ঘোচে চিহ্ন, সকল বাঁধন যবে ছিন্ন") রবীন্দ্রমানসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অথচ অবহেলিত দিক উদ্‌ঘাটন করে। এই দিকটাকে চোখের সামনে রাখলে রবীন্দ্রকাব্যসাহিত্যের যে-চিত্রটি ফুটে ওঠে, বর্তমান গ্রন্থে তার দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়েছি। অবশ্য কাব্য-ভাষার আভাসে-ইঙ্গিতে যা ছিলো কুণ্ঠায় অবগুণ্ঠিত, গদ্যের অকুণ্ঠ নির্লজ্জ ভাষায় তার ঘোম্‌টা খুলতে গেলে সন্দেহ হ'তে পারে—সেই মুখ দেখছি তো ? এতখানি ভিন্ন দুই ভাষায় ঠিক একই কথা বলা যায় না। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ভাষান্তর নয়, ব্যাখ্যান বা বিস্তার নয়। উদ্দেশ্য ছিলো রবীন্দ্রনাথের গান কবিতা ও নাটকের পিছনে যে-জগৎনিরীক্ষা এবং ঈশ্বরভাবনার পটভূমিকা কখনো স্পষ্ট-গোচর কখনো আবছা রয়েছে, তারই স্বরূপ-সন্ধান।

স্বীকার করাই ভালো এবং বলা হয়তো বাহুল্য, যে-রবীন্দ্রনাথকে আমি মর্মে মর্মে পরম আত্মীয় ব'লে জেনেছি, "চিরসখা" ব'লে ভালোবেসেছি, তাঁরি কথা বলতে উৎসাহ বোধ করেছি এখানে। জানি আমার রসবোধ ও মূল্যবিচারের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের সবখানি ধরা দেয় নি। যাঁরা 'কড়ি ও কোমল'-এর প্রথম চতুর্দশপদীতে ("মরিতে চাহি না আমি এ সুন্দর ভুবনে / মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই"), বা 'নৈবেদ্য'-এর প্রথম গানে ("প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী / দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে"), বা 'আরোগ্য'-এর দশ-সংখ্যক কবিতাতে ("শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-পরে / ওরা কাজ করে") রবীন্দ্রকাব্যের মূল সুরটি শুনতে পান, তাঁদের হৃদয়মনের তন্তুজালে ভিন্ন রবীন্দ্রনাথ ধরা দেবেন। আমি রবীন্দ্রনাথের যতটুকু পেয়েছি আমার ভাবনায় ও বেদনায় তাতেই আমি ধন্য হয়েছি। সে-ধন্যতা যদি আরো পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ ক'রে নিতে পারি তবে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে। এই অনেকান্ত কবির অন্যান্য অঙ্গ (aspect)

ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে, পরেও হবে। সেইখানে তাঁর ঐশ্বর্য, আমাদের সৌভাগ্য। সব অস্ত হয়ত কোথাও গিয়ে মিলেছে তাঁর বহুবর্ণাঢ্য কবি-স্বরূপের গভীরে ; কিন্তু ঐক্য খুঁজতে গিয়ে আমরা যেন বৈচিত্র্য না হারাই। রবীন্দ্রনাথ শিল্পী, দার্শনিক নন। উপরন্তু, জৈন দার্শনিকরাও ছিলেন অনেকান্তবাদী। সত্য (reality) যদি অনেকান্ত হয়, তবে কবি তাঁর অনুভূতি ও নিরীক্ষা সত্যের একটি মাত্র অন্তের উপর সন্নিবদ্ধ রাখলে চলবে কেন। সে কবিকে আমরা অসম্পূর্ণ তথা গৌণ কবি বলব না কি ?

পূর্ব প্রকাশিত গ্রন্থ 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ'-এ দু-তিন জন প্রতিভাবান এবং পাশ্চাত্য কাব্যে আধুনিকতার পথিকৃৎ কবির দৃষ্টির একান্তিকতা বিষয়ে আমার মনোক্ষোভ ব্যক্ত করেছিলাম। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে তাঁরা কেবল বীভৎসা ও একঘেয়েমিই দেখতে পেলেন ; আর-কিছু দেখবো না—এই ছিলো তাঁদের তপস্যা। লেখক এবং পাঠক উভয়ের পক্ষে দুঃখজনক সে-তপস্যা। আর কিছু নেই কোথাও, সবই ধূসর, সবই ন্যক্কারজনক—এই ছিলো তাঁদের দাবী। একজন তরুণ কবি বললেন তাঁর গুরুস্থানীয় প্রবীণ কবি সম্পর্কে—তিনিই কবিদের রাজা, তিনি সত্যদ্রষ্টা। একদেশদর্শিতাকে সত্যদর্শন বলা শুধু বিভ্রান্তিকর নয়, হানিকরও বটে। আমি নৈতিক ক্ষতির কথা এখানে তুলছি না, যদিও শেষ পর্যন্ত তার সম্ভাবনাও কম নয়। নীতিশিক্ষা-দান কবির পক্ষে পরধর্ম, তবু সাহিত্যের আলো বা ছায়া অলক্ষ্যে পড়ে পাঠকের নীতিবোধের উপর। আমি বলছি নান্দনিক ক্ষতির কথা। আমরা মহৎ কবির কাছ থেকে প্রত্যাশা করি অনুভূতির সূক্ষ্মতা, প্রশস্ততা, উদারতা ; যদি পাই অনুভূতির সংকীর্ণতা ও তিক্ততাই তবে ক্ষোভ করবো বৈ-কি। কী আশ্চর্য সে-অনুভূতির প্রকাশ—অবশ্যই যোগ করবো শ্রদ্ধার সঙ্গে। কিন্তু শুধু রূপের পরোৎকর্ষে কোনো কবির রচনা মহত্ত্বের শিরোপা লাভ করতে পারে না। যেমন কোনো-কোনো অপরূপ সুন্দরীকে দেখে আমাদের মনে ক্ষোভ জাগে—এমন অপরিমেয় যার দেহের রূপ তার ব্যক্তিত্বের স্বরূপ এত ছোটো মাপের কেন ?

এই অনুষঙ্গে এবং এরই প্রতিতুলনায় রবীন্দ্রকাব্যালোচনার অবতারণা।

করেছিলাম। রবীন্দ্রনাথ কেবল শুভ ও সুন্দরকেই দেখেননি, কেবল "আনন্দ, মঙ্গল ও ঔপনিষদিক মোহ" বিস্তার করেননি তাঁর ষাট বছরের কাব্যরচনায়, আরো অনেক-কিছু দেখেছিলেন এবং দেখিয়েছেন আমাদের।

'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ'-এ এই কথাটা সবিস্তারে বলতে হয়েছিলো আমাকে সাক্ষীসাবুদ উপস্থিত ক'রে। তার কতকটা এ-বইতেও উপ্‌চে এসে পড়েছে দু-চার জায়গায়—কোথাও ইচ্ছায়, কোথাও অনিবার্যত। ইচ্ছায়, কারণ যেখানে আগের বইতে সে-কথার আলোচনা বড়ো সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ ঠেকলো, এ-বইতে তা আরো একটু বিস্তৃতভাবে বলবার চেষ্টা করেছি। কোথাও-বা পূর্বালোচিত প্রসঙ্গ এখানেও এত প্রাসঙ্গিক ছিলো যে সেটাকে বাদ দিতে গেলে যুক্তিতে ফাঁক থেকে যেতো। দুটি বইয়ের কোনো-কোনো অংশ পরস্পর-সম্পূরক। তবু আশা করি বক্তব্যের খুব একটা পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। কারণ প্রথমত, অনুষঙ্গ ও উদ্দেশ্য এখানে ভিন্ন, এবং বিতর্কমূলক নয়। দ্বিতীয়ত, চার-পাঁচ বছরে নতুন-কিছু শিখবার বুঝবার ভাববার ও অনুভব করবার অবকাশ পেয়েছি আমি। এ-বয়সে আবার নতুন ক'রে শেখা! হ্যাঁ, এ-বয়সেও। ভাঙা শরীর নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে আমাকে তো এগিয়ে চলতেই হবে। স্তূপীকৃত বিঘ্ন অগ্রাহ্য ক'রে যে-কোনো আধ্যাত্মিক সাধনার পথে—বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পসাহিত্য, সমাজসংস্কার, ধর্মবোধ—মানুষকে এগিয়ে চলতেই হয়। থামা (সাময়িক বিরামের কথা বলছি না, বলছি ব্যক্তি বা জাতির জীবনে দীর্ঘদিন গতিরহিত অবস্থার কথা) মানে প'ড়ে যাওয়া, পতন মানে মৃত্যু, জীবনে মৃত্যু। এমন জীবন্মৃতকে লক্ষ ক'রেই কি কবি গান বেঁধেছিলেন "হায় পথবাসী, হায় গতিহীন, হায় গৃহহারা"?

গ্রন্থরচনা ও প্রকাশনায় যে-ক'জনের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি তাঁদের মধ্যে গৌরী আইয়ুবের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। সবচেয়ে ক্লান্তিকর ও বিরক্তিকর যে-কাজ তাতেও তাঁর ক্লান্তি বা বিরক্তি ছিলো না। লেখার অনেক অংশ আমি একাধিকবার সংশোধন করেছি, একাধিকবার তাঁকে কপি করতে হয়েছে; তদুপরি প্রুফ দেখা। আমার দু-একটি বক্তব্যে তাঁর আপত্তি ছিলো (বিশেষত শ্যামার চরিত্র-বিশ্লেষণে); তার উত্তর নিবন্ধেই দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আপত্তি তবু খণ্ডিত হয়নি বোধ হয়। স্বপন মজুমদার প্রকাশনার প্রায় সব দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে তাঁর অনেক মূল্যবান সময় আমাকে দান করেছেন। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

"সূচনা" ব্যতীত এ-বইয়ের সব অধ্যায়ই 'দেশ' পত্রিকার সাপ্তাহিক বা বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিলো গেল চার বছরের মধ্যে। বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরী করতে গিয়ে সংশোধনের প্রয়োজন বোধ করেছি অনেক জায়গায়, বেশ-খানিকটা যোগ বিয়োগও করতে হয়েছে কোথাও-কোথাও।

কয়েকটি উর্দু বয়েৎ উদ্ধৃত করেছি বাংলা হরফে। স্বরবর্ণের উচ্চারণ হিন্দীর মতন হবে; যথা, 'হৈ' শোনাবে বাংলা 'হায়'-এর মতন—'হায়'-এর আকারটি অবশ্য হ্রস্বভাবে উচ্চারিত হবে। অ-কার সর্বত্র ইংরেজী out-এর u-র মতো: যথা, 'জিন্নৎ'=jinnut, jinnot নয়। 'স'=s, 'শ'=sh। উর্দু ভাষার কণ্ঠ্যধ্বনি (gutteral sound) বাঙালী কণ্ঠে সহজে আসে না। গালিব এবং ইক্‌বাল—সবচেয়ে বিখ্যাত দু-জন উর্দু কবির নামের প্রথম ব্যঞ্জনবর্ণদুটি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রায় সব বাঙালিকে "গলদঘর্ম ঘামায়"।

পান্থজনের সখা

রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান

(কল্যাণীয়া নীলিমা সেনকে শ্রদ্ধাঞ্জলি)

কোনো দূর দেশের এবং দূরতর কালের এক তরুণ কবি—অধুনা "অর্বাচীন" ব'লে ঈষৎ অবহেলিত—বলেছিলেন : "আমাদের মধুরতম গান তা-ই যাতে ব্যক্ত হয় বিষণ্ণতম ভাব।" রবীন্দ্রনাথকে অবশ্য বিশেষভাবে দুঃখের কবি বলা যায় না, যদিও তাঁর অপরিণত বয়সে প্রকাশিত প্রথম কাব্যসংকলন 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' দুঃখবিলাসী, প্রথম প্রতিভাদীপ্ত কাব্য 'মানসী'র সুর মোটের উপর বিষণ্ণই, 'সোনার তরী' আর 'কল্পনা'র প্রথম ও সম্ভবত শ্রেষ্ঠ কবিতাদ্বয় নৈরাশ্যের নিবিড় ছায়ায় ঢাকা। শেষ দশকের কবিতায় দুঃখের ভাব গভীরতায় ও ব্যাপ্তিতে অন্য-সব ভাবকে ছাড়িয়ে গেছে। তবে তাঁর সবচেয়ে বিশ্ব-বিশ্রুত কাব্যপর্বটি শান্ত, সৌম্য, দুঃখের অনুভূতিও তখন মধুররসে ডোবা। রবীন্দ্রনাথ নিজেও নিজেকে আনন্দের কবি ব'লে ভাবতে ও বলতে ভালোবাসতেন; তাঁর প্রিয়তম উপনিষদের শ্লোক বোধকরি "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি; তাঁর ভক্তিগীতির পৌনঃপুনিক বাণী :

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে
দিনরজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গগনে ॥

কিংবা :

জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।
ধন্য হল, ধন্য হল মানবজীবন।

রবীন্দ্রনাথের এই ভাবচ্ছবিটি সাধারণ পাঠক ও সমালোচকের চিত্তে বেশ উজ্জ্বল রেখায় আঁকা রয়েছে। অযথার্থ নয় এ-ছবি, বিশেষত গানের ক্ষেত্রে, এবং এই প্রবন্ধের বিষয় রবীন্দ্রনাথের গান-ই। তাঁর

আনন্দের গান বৈচিত্র্যে ও সংখ্যায় দুঃখের গানকে ছাড়িয়ে গেছে, তথ্য হিসাবে এটা মানতেই হবে। কিন্তু আর্টের বিচারে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব সামান্যই। সংখ্যায় কম হ'লেও গুণের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গানই অগ্রগণ্য—অন্তত আমার মূল্যায়নে। কেন দুঃখের গান আমার মনকে, খুব সম্ভব আরো অনেক শ্রোতার মনকে, নিবিড়ভাবে স্পর্শ করে—সে-প্রশ্নটি আপাতত এড়িয়ে গেলাম। একটি সহজ উত্তর —দুঃখ দিয়েই যে আমাদের জীবন গড়া এবং জীবনের প্রতিবিম্বই তো আর্ট—আমার মনঃপূত নয়। কে হিসাব ক'রে বলতে পারে কার জীবনে দুঃখের পরিমাণ সুখের চেয়ে বেশি না কম। সমস্যাটা ভিন্ন। জানি না কেন দুঃখের প্রতি আমাদের মর্যাদাবোধ গভীর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দুর্ভাগিনী কন্যার চূড়ান্ত দুঃখের মুহূর্তে বলেছিলেন :

তোমার সম্মুখে এসে, দুর্ভাগিনী, দাঁড়াই যখন
নত হয় মন।

এমন কথা কি তিনি বলতে পারতেন কোনো সৌভাগ্যবতীর চরম সুখের মুহূর্তে? দুঃখের শ্রদ্ধেয়তার কারণ কি তবে এই যে দুঃখের হাতুড়ি দিয়ে পিটে-পিটে মানব চরিত্র গঠন করা হয় এই মর্ত্যধামে, গঠন করেন বাউলদের সেই "নিঠুর দরদী"? অথচ কোনো-কোনো দুঃখ (যথা অ্যাসিডে পোড়া মুখ বা অনারোগ্য সংক্রামক কুষ্ঠ), এবং সব দুঃখই একটা মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে, দুঃখীর চরিত্রকে পাথরে খোদাই-করা দেবপ্রতিমার মতন সুন্দর তো করেই না, বরঞ্চ আরো দুর্বল ও কুশ্রী ক'রে ফেলে। এটি মানবজীবনের একটি গভীর জিজ্ঞাসা। তাই বলছিলাম আপাতত থাক্ সে-প্রশ্নপরম্পরা।

রবীন্দ্রনাথের বেলা শেলীর উদ্‌ধৃত পংক্তিটি মোটের উপর যদিও সত্য তবু এইসব অবিস্মরণীয় দুঃখের গানের রচয়িতা যেহেতু রবীন্দ্রনাথ, তাই দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অনুভূতির কালিমা কোথাও নিরেট নয়, অন্ধকার ঘন হ'লেও অভেদ্য নয়, কোনো-কোনো গানে দুঃখের পার

দেখা না-গেলেও তার স্নিগ্ধ পবিত্রতা অনুভব করা যায়, কোনো গানই বিশ্ববিধানের প্রতি ক্রোধ, ঘৃণা, তিক্ততা বা বিদ্রোহের ভাব জাগায় না আমাদের মনে। মানববিধানের কথা আলাদা। কিন্তু যে-সব গানে বা কবিতায় কবি মানবিক—বিশেষত সামাজিক বা রাষ্ট্রজাতিক—অন্যায় অত্যাচারের প্রতি অবিমিশ্র ধিক্কার বর্ষণ করেছেন, সেগুলি স্বভাবতই নান্দনিক স্তর থেকে স'রে গেছে নৈতিক স্তরে—যথা 'নৈবেদ্য'-এর "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে / তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে", এবং 'প্রান্তিক'-এর ১৭ সংখ্যক কবিতা।

গোড়াতেই ব'লে রাখা ভালো যে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ভাবের গানের মধ্যে যেমন দুঃখের গানই আমাকে সবচেয়ে বেশি টানে, তেমনি তাঁর বহুবিচিত্র সৃষ্টিক্ষেত্রের মধ্যে গানের ফসলকেই আমি সবচেয়ে মূল্যবান এবং কালজয়ী জ্ঞান করি। অবশ্য আমি ভুলে যাচ্ছি না যে রবীন্দ্রনাথের গান কথাপ্রধান, সুরপ্রধান নয়। তার একটি কারণ স্পষ্টত এই যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরকার পৃথিবীর মহত্তম কবিদের অন্যতম। অতুলপ্রসাদও উঁচুদরের সুরস্রষ্টা এবং রবীন্দ্রনাথের সুরশৈলীর খুব কাছে এসেও আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। কিন্তু তাঁর গানের কাব্যশক্তি এতই সীমিত যে কথার দিকে মনোনিবেশ ঘটলে খানিকটা রসভঙ্গ হয়। প্রায় সব মার্গসঙ্গীতে কথা এমন সোচ্চারভাবে অকিঞ্চিৎকর যে সেদিকে মনোযোগ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, মনে হয় যেন কথা ছেঁড়া কাঁথা প'রে ভিখারী সেজেছে নিজেকে আড়ালে রেখে রাগরাগিনীর রাজকীয় ঐশ্বর্য প্রকাশ করবার জন্য। রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুরের শিল্পোৎকর্ষ ও ব্যঞ্জনাশক্তি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই, তবু বলবো সুর সেখানে রথ, সারথী নয়, কথার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা ও আদিগন্ত বিস্তার হৃদয়ের গভীরে পৌঁছিয়ে দেওয়া তার কাজ। অবশ্য এমন কিছুসংখ্যক গানও রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন যাতে কথা ও সুর পরস্পরস্পর্ধী; আমাদের মুগ্ধ মনোযোগ গোড়ার দিকে দোল খেতে থাকে কথা থেকে সুরে, সুর থেকে কথায়,

এবং রসানুভূতি চরমে পৌঁছয় তখনই যখন গীতশিল্পের দুই অঙ্গে আমরা আর ভেদ দেখতে পাই না, উপলব্ধি করি একই দেবতার মহিমা, যিনি একাধারে হরি এবং হর। সম্ভবত এগুলিই তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট গান। উদাহরণ দিতে গিয়ে মনে জাগে "চিরসখা হে, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না", "আছ অন্তরে চিরদিন", "এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ", "কী রাগিনী বাজালে হৃদয়ে"। আবার এমন গানও তিনি রচনা করেছেন যাতে সুরের শক্তি অসাধারণ হ'লেও কথার প্রাধান্য অনস্বীকার্য। উদাহরণ : "শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু, হে প্রিয়", "সকল জনম ভ'রে ও মোর দরদিয়া", "আরো আঘাত সইবে আমার", "চিনিলে না আমারে কি", "আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা" ইত্যাদি। আমার ব্যক্তিগত পক্ষপাত এদের দিকেই, হয়তো এইজন্যেই যে আমি সুরের চেয়ে কথা অনেক বেশি বুঝি এবং একটু বেশি ভালোবাসি।

রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে তাঁর গান গাইবার সময়ে কণ্ঠশিল্পীরা যেন সুরের খাতিরে কথার অমর্যাদা না করেন। যাঁরা প্রধানত সুরের রসিক ও সাধক, কথার প্রেমে পড়তে শেখেননি, তাঁরা গায়কই হ'ন আর শ্রোতাই হ'ন, রবীন্দ্রসঙ্গীত তাঁদের জন্য নয়। "আকাশে বিদ্যুৎবহ্নি / অভিশাপ গেল লেখি", "হায় মম পথ-চাওয়া বাতি / ব্যাকুলিছে শূন্যেরে কোন্ প্রশ্নে", "আমার না বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে / তোমার ভাবনা তারার মতন রাজে", "প্রভাত আলোরে মোর কাঁদায়ে গেলে", "রজনী মূর্চ্ছাগত বিদ্যুৎঘাতে", "আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান", "আজি এ প্রাণের রুদ্ধ দ্বারে / ব্যাকুল কর হানি বারে বারে", "প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চরণে", "দিনগুলি মোর এমনি ভাবে / তোমার হাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে হারিয়ে যাবে", "হাল-ভাঙা, পাল-ছেঁড়া ব্যথা চলেছে নিরুদ্দেশে"—এমন শত-শত পংক্তি রবীন্দ্রনাথের গানে ছড়ানো রয়েছে। যাঁরা তার অলৌকিক শক্তি রক্তের শিরায়-শিরায় অনুভব করেন না, এবং সেই অনুভূতিকে কণ্ঠস্বরের

দরদে ও শব্দের মমতাপূর্ণ উচ্চারণে ফুটিয়ে তুলতে পারেন না, পারার আবশ্যকতা পর্যন্ত বোধ করেন না, তাঁদের গলা যতই পরিশীলিত হোক্ এবং সুরজ্ঞান প্রশ্নাতীত, রবীন্দ্রনাথের গানে তাঁরা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন না। শুনেছি রূপালী পর্দার কিংবা আধুনিক গানের এইসব নামজাদা গায়করা নাকি রবীন্দ্রসঙ্গীতকে জনপ্রিয় ক'রে দিয়েছেন। জনপ্রিয়তা অর্জন করবার জন্য যদি আপন সত্যমূল্য এবং অমূল্য বৈশিষ্ট্য হারাতে হয় তবে রবীন্দ্রনাথের গান অতখানি জনপ্রিয় নাই-বা হ'লো।

প্রতিভাবান শিল্পী এবং সাধারণ শিল্পরসিক ভিন্নতলের বাসিন্দা—এটা অস্বীকার করবার জো নেই। শিল্পী যদি কয়েক ধাপ নেমে আসেন তবে তিনি তাঁর সামাজিকতারই পরিচয় দেবেন। শিল্পকর্মকে খাম-খেয়ালী বা কালোয়াতি (craft-fetishist) দুর্বোধ্যতার শিখরে তুলে নিয়ে যাওয়াতে শিল্পীর গৌরব বাড়ে না। রসগ্রাহীকেও কিন্তু কয়েক ধাপ উপরে উঠবার পরিশ্রম স্বীকার করতে হবে। সুরুচি ও সহৃদয়তা জন্মসূত্রে কেউ লাভ করে না; কৃষিক্ষেত্রে যেমন, কৃষ্টিক্ষেত্রেও তেমনি কঠিন নিয়মিত ভূমিকর্ষণ অত্যাবশ্যক। একপক্ষের অভিমান একটু কম এবং অন্যপক্ষের সাধনা একটু বেশি হোক্, এই আমার আবেদন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এতই উত্তুঙ্গ ছিলো যে কয়েক ধাপ নেমে আসতে তাঁর আত্মমর্যাদায় বাধেনি, সৃষ্টিকর্মেরও তাতে কোনো ক্ষতি হয়নি। তাঁকে একেবারে ফিল্মী বা আধুনিক গানের সমতলে নামিয়ে আনার চেষ্টা সকলের পক্ষে ক্ষতিকর। নিন্দিত হোক্ এ-অপচেষ্টা।

দুঃখের গান রবীন্দ্রনাথ কম রচনা করেননি। সর্বপ্রথমে সেই গানের কথা বলি যাতে দুঃখের অনুভূতি শুধু ব্যক্তিগত নয়, সর্বজাগতিক; যাতে কবির অথবা যে-কোনো বিরহীর অন্তর্বেদনা একাকার হ'য়ে মিলেছে বিশ্ববেদনার সঙ্গে, এবং সারা জগতের বেদনা একটি ব্যক্তির হৃদয়ে জমাট বেঁধে অসাধারণ তীব্রতা লাভ করেছে:

অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে।
আজি শ্যামল মেঘের মাঝে বাজে কার কামনা ॥
চলিছে ছুটিয়া অশান্ত বায়,
ক্রন্দন কার তার গানে ধ্বনিছে—
করে কে সে বিরহী বিফল সাধনা ॥

আমাদের মনে ছবি জাগে এমন এক ভাগ্যহতের যার বিরহ কোনো কালে শেষ হবার নয় ; সে-বিরহের কারণ প্রিয়ার মৃত্যুও হ'তে পারে, অথবা প্রাকৃতিক বা সমাজিক বাধা-ঘটিত এমন বিচ্ছেদ যা মৃত্যুর চেয়ে কম দুঃসহ নয়। সঙ্গে-সঙ্গে আর-একটি ছবিও জেগে ওঠে। ঠিক ছবি নয়, কারণ এই দ্বিতীয় ভাবটি চিত্রগ্রাহ্য নয়। বরঞ্চ মনে হয় প্রথম চিত্রটি প্রতীকমাত্র। পারমার্থিক পূর্ণতা এবং পার্থিব অপূর্ণতার মধ্যে অপার বিচ্ছেদ। মিলন প্রত্যাসন্ন নয়, সহজসাধ্য নয়, আদৌ সম্ভব কিনা তা নিয়েও সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাই কামনা এমন ব্যথাতুর, ব্যথা এমন মর্মন্তুদ এবং দিগন্তব্যাপী। এ-যন্ত্রণা জগৎ-সৃষ্টিরই প্রসব-যন্ত্রণা। "দুঃখ" শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"দুঃখের যত প্রকার ব্যাখ্যাই করি না কেন, দুঃখ তো দুঃখই থাকিয়া যায়। না থাকিয়া যে জো নাই। দুঃখের তত্ত্ব আর সৃষ্টির তত্ত্ব যে একেবারে এক সঙ্গে বাঁধা। কারণ অপূর্ণতাই তো দুঃখ এবং সৃষ্টিই যে অপূর্ণ।"

জগতের মধ্যে যে নানা দোষত্রুটি কুশ্রীতা-কদর্যতা-কর্কশতা রয়েছে তা রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেন না। বিশ্বের ঐকতান সঙ্গীত রচিত হয়নি এখনো ; সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সমস্ত বেসুরকে বুকে টেনে নিয়ে সঙ্গীত-রচনার মহড়া চলছে জগৎ জুড়ে, ইতিহাস জুড়ে। মাঝে-মাঝেই তার ছিঁড়ে যায়, তাল কেটে যায়। স্বাধীন মানুষ এবং সুস্থ মানবসমাজ গ'ড়ে তুলবার পথে এমন পর্বতপ্রমাণ বিঘ্ন এসে উপস্থিত হয় যে আমরা শিউরে উঠে ভাবি এতকালের সব সাধনাই বুঝি বিফল হয়েছে, সব পথই হারিয়ে গেছে চির অন্ধকারে।

উপনিষদ বলেন, ব্রহ্ম তপস্যার দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করলেন। রবীন্দ্র-

নাথ বলছেন, সে-সৃষ্টি কোনো ধারাবাহিক মহৎ উপন্যাসের মতো এখনো ক্রমশ প্রকাশ্য, বরঞ্চ বলা উচিত ক্রমশ লেখ্য। ক্লিষ্ট রচনার পংক্তির পর পংক্তি কেটে দেওয়া পাতাগুলি, একটাব পর একটা বাতিল-করা খসড়াগুলি বিশেষভাবে দেখা যায় মানুষের মধ্যে, মানবসমাজের মধ্যে। তাই তপস্যাও চলছে এবং তপস্যা-নিঃসৃত বেদনারও শেষ নেই। সেই বেদনা "চঞ্চল বেগে বিশ্বে দিল দোলা"। তবে কি তপস্যা ক্রমশ শিথিল হ'য়ে আসছে এবং বেদনা বদ্ধমূল ও সর্বব্যাপী? না, অতখানি নৈরাশ্য-বাদী নন রবীন্দ্রনাথ। "অশ্রুভরা বেদনা" ও "বেদনা কী ভাষায় রে" গানদুটিতে ভাবগত ঐক্য আছে, দুটির বেদনাই জগৎজোড়া। কিন্তু প্রথমটি অশ্রুভবা বেদনাতে শুরু এবং শেষ। দ্বিতীয় গানের শেষে শুনি :

মনোমোহন বন্ধু--
আকুল প্রাণে
পারিজাতমালা সুগন্ধ হানে ॥

কিছুই দেখা যায় না, কিছুই বোঝা যায় না, তবু আকুল প্রাণে কোথা থেকে যেন সুগন্ধ আসে, জাগিয়ে তোলে আমাদের ভাবয়িত্রী ও কারয়িত্রী শক্তিগুলিকে, বাঁচিয়ে রাখে বেঁচে থাকার—মানুষ হ'য়ে বেঁচে থাকার—ইচ্ছাটাকে। একে বলা যায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্থায়ী ভাব। এরই অন্যতম এবং উৎকৃষ্টতব উদাহরণ :

সহসা দারুণ দুখতাপে সকল ভুবন যবে কাঁপে,
সকল পথের ঘোচে চিহ্ন সকল বাঁধন যবে ছিন্ন
মৃত্যু-আঘাত লাগে প্রাণে—
তোমার পরশ আসে কখন কে জানে।

কচিৎ-কখনো অন্ধকার আরো ঘন হয়েছে, নৈরাশ্য আরো দুরভিভব, আরো দুর্বিষহ। অনেক বেশিসংখ্যক গানে অবশ্য আনন্দধারা ব'য়ে চলেছে—প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যে আনন্দ, মানুষের অপরাজেয়

শক্তিতে আনন্দ, ঈশ্বরের অনন্ত মঙ্গলবিধানে আনন্দ। কিন্তু সংখ্যা গণনার দ্বারা তো কবির মনের সত্য পরিচয় পাওয়া যায় না। তাই আমি বলতে সাহস পাই যে গীতিরচয়িতা রবীন্দ্রনাথের হৃদয়মন যে দুই প্রত্যন্ত রেখার মধ্যে দোদুল্যমান ছিলো, তাদের মধ্যবর্তী সুস্থিতি-বিন্দু অধিকার ক'রে আছে উপরে অংশত উদ্‌ধৃত হৃদয়গ্রাহী গানটি ("পথে চলে যেতে যেতে কোথা কোন্‌খানে")।

বিপরীত নাটকীয় পরিস্থিতি এবং অনুভূতির রূপকল্প (pattern) দেখি "তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়" গানটিতে। দুঃসহ দুঃখ-আঘাতে নৈরাশ্যের অন্ধকার যখন এত ঘন যে "সকল পথের ঘোচে চিহ্ন" তখন যেমন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সান্ত্বনা ও শান্তি নেমে আসে, তেমনি যখন সবই শুভ্র সুন্দর মধুর, কোনো দিক থেকে বিপদপাতের লেশমাত্র সম্ভাবনা নেই, সমস্ত আকাশ নির্মল নীল, জল অগভীর, নিস্তরঙ্গ—ঠিক তখনই :

তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়
কোন্‌খানে রে কোন্ পাষাণের ঘায়।
নবীন তরী নতুন চলে, দিই নি পাড়ি অগাধ জলে—
বাহি তারে খেলার ছলে কিনার-কিনারায়॥
ভেসেছিল স্রোতের ভরে, একা ছিলেম কর্ণ ধ'রে -
লেগেছিল পালের 'পরে মধুর মৃদু বায়।
সুখে ছিলেম আপন মনে, মেঘ ছিল না গগনকোণে—
লাগবে তরী কুসুমবনে ছিলেম সেই আশায়॥

যে-পাষাণের ঘায়েই হোক্ তরী হঠাৎ ডুবে যাচ্ছে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগিয়ে—এ কোন্ তরী, কিসের প্রতীক এ-তরী? মনে তো হয় না এ কোনো ব্যক্তিগত ছোটোখাটো আশা-আকাঙ্ক্ষার তরী। গানের ইঙ্গিত আরো অতল-গভীর, নিমেষে জীবনের কোনো প্রান্তিক পরিস্থিতির উদ্বেগ জাগিয়ে তোলে শ্রোতার হৃদয়-মনে। মানবজীবনের সবচেয়ে বড়ো আশার তরী ডুবে যাওয়ার ট্র্যাজিক চিত্রই ফুটে উঠেছে

এই গানে। কোনো কঠোর অভিজ্ঞতার আঘাতে জগৎপিতার যে পিতৃপুরুষাগত স্নেহকরুণাকল্যাণময় মূর্তিতে আশৈশব আস্থা রবীন্দ্রনাথের মনে এতদিন সহজ মধুর নিরুদ্বেগ ছিলো, সেই জাগতিক মঙ্গলবিধানের প্রতি ভরসার তরীখানাই কি আজ হঠাৎ ডুবে যাচ্ছে? সে-তরী ডুবে যাওয়ার অর্থ যে কী মর্মবিদারক, যাঁরা কীর্কেগার্ডের লেখার সঙ্গে পরিচিত তাঁরা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। রবীন্দ্রনাথ কীর্কেগার্ডের লেখার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কিনা জানি না, সম্ভবত ছিলেন না। তবে কীর্কেগার্ডীয় আধ্যাত্মিক যন্ত্রণা তাঁর অজানা ছিলো না—এই কথাটাই বলতে চাচ্ছি।

"If God does not exist, then everything is permitted." না কিন্তু। ঈশ্বর-বিশ্বাস চ'লে গেলেও আমাদের হৃদয়কক্ষে বহুযত্নে লালিত মূল্যবিচারের একটি প্রতিমান থেকে যায়, তার নির্দেশ আমরা এড়াতে পারি না। ঠিক সময়ে সে-ই ব'লে দেয় জীবনে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিল্প-সাহিত্যে কোনটা হেয় কোনটা শ্রদ্ধেয়। সর্বজনীনতার দাবী সে রাখে না, তবু আমার পক্ষে আমার অন্তরতম মূল্যবিচারই চরম। কিন্তু কোনো নিদারুণ পরিস্থিতিতে এই মাপকাঠিও যদি ভেঙে টুকরো-টুকরো হ'য়ে যায়, ভালোমন্দ সব একাকার হ'য়ে যায়? সত্য শ্রেয় ও সুন্দরের প্রতি যে-অনুরাগ ও শ্রদ্ধা মানুষের জীবনকে নিছক জৈবিকতার গ্লানি থেকে বাঁচিয়ে রাখে, তার সাময়িক কিন্তু সম্পূর্ণ বিলয়—সেই অনির্বচনীয় ভয়ঙ্কর সম্ভাব্যতার মুখোমুখি দাঁড়ানোটাকেই বলে "encounter with nothingness"। নাস্তিকতার চেয়েও নিদারুণতর যে চূড়ান্ত নাস্তি, তার সঙ্গে ভীম পরিচয় ভক্ত ও প্রেমিক রবীন্দ্রনাথের, শুভ্র ও সুন্দরের বেদীতে আত্মনিবেদিত রবীন্দ্রনাথের যে কখনোই ঘটেনি তা নয়। না-ঘটলে তিনি এত বড়ো কবি হ'তে পারতেন না, তাঁর অভিজ্ঞতার বিস্তার থাকতো ভাববর্ণালির সংকীর্ণতর সীমার মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে। তাঁর দীর্ঘ কবিজীবন তিনি একই শ্যাম-

ছায়াঘন তীরে ব'সে কাটাননি, বারে-বারে তাঁর অন্তর্যামীর কাছ থেকে নোঙর তুলে নেওয়ার নির্দেশ পেয়েছেন, পাড়ি দিয়েছেন অজানা দুর্নাব্য সমুদ্রে ; কখনো-বা 'বীথিকা'র দুর্ভাগিনীর মতন খুঁজেছেন "কাছের বিশ্ব মুহূর্তে যা চলে গেল দূরে"—এত দূরে যে ভয় হয়েছে বুঝি-বা ডুবে যাবে অতল অন্ধকারে।

অনুভূতির বিশ্বব্যাপ্তি এবং কস্‌মিক তাৎপর্য আরো সুস্পষ্ট অন্য-একটি গানে। রবীন্দ্রনাথ অভয় বা নির্ভয়ের গান অনেক বেঁধেছেন, ভয়ের গান বিরল। আমি অবশ্য "জয় ক'রে তবু ভয় কেন তোর যায় না" বা "আজি বিজন ঘরে নিশীথরাতে আসবে যদি শূন্য হাতে / আমি তাইতে কি ভয় মানি" গোছের মধুর কোমল ভয়ের কথা ভাবছি না, যা প্রেমিক হৃদয়কে সর্বদাই অল্পবিস্তর আন্দোলিত করে ; ভাবছি সেই দুর্বার অনুভূতির কথা যা প্রবল বন্যার মতো সকল বাঁধ ভেঙে দিগন্ত থেকে দিগন্ত প্লাবিত ক'রে ফেলে :

পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে।
পিছিয়ে পড়েছি আমি, যাব যে কী করে।
এসেছে নিবিড় নিশি, পথরেখা গেছে মিশি,
সাড়া দাও, সাড়া দাও আঁধারের ঘোরে॥
ভয় হয়, পাছে ঘুরে ঘুরে যত আমি যাই তত যাই চলে দূরে
মনে করি আছ কাছে, তবু ভয় হয়, পাছে
আমি আছি, তুমি নাই কালি নিশিভোরে॥

"সাড়া দাও, সাড়া দাও আঁধারের ঘোরে"—এই আর্ত প্রার্থনার মধ্যে আশার প্রকাশ যত করুণ, "আমি আছি তুমি নাই"-তে ভয়ের ব্যঞ্জনা তার চেয়ে তীব্র। আর কী নিদারুণ সে-ভয়—মনকে যতই ভোলাই যে ঘুরে-ঘুরে তোমার কাছে যাচ্ছি ততই দূরত্ব বেড়ে যায়, অন্ধকার হয় ঘন ; শুধু দৃষ্টির নয়, ধ্যানেরও বাইরে স'রে যাচ্ছ তুমি। এই অতল আদিগন্ত অন্ধকারে আমি যদি-বা বাঁচি, আমার প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখবো কেমন ক'রে।

সঁভনলে দে অয় না-উমীদী, কেয়া কেয়ামৎ হৈ,
কেহ্ দামনে খেয়ালে ইয়ার ছুটা যায় হৈ মুঝসে।
(হে নৈরাশ্য, এ কী প্রলয় কাণ্ড! একটু সামলে নিতে দাও, বন্ধুর ধ্যানের আঁচলের যে শেষ প্রান্তটুকু আমার হাতে রয়েছে তা-ও ফসকে যাচ্ছে।
— গালিব)

নৈরাশ্য আরো নগ্ন, আরো অন্তিম রূপ ধারণ করেছে সেই গানে 'চণ্ডালিকা'র শেষে যার উপযোগিতা তর্কসাপেক্ষ। কেবলমাত্র চণ্ডালিনীর ঝি-র অনুতপ্ত বিক্ষোভ প্রকাশ করতে হ'লে এই গানের ব্যঞ্জনাকে অনেকখানি ছোটো ক'রে নিতে হয়। "মা ভয় হচ্ছে। তাঁর পথ আসছে শেষ হ'য়ে — তার পরে? তার পরে কী। শুধু এই আমি, আর কিছুই না! এতদিনের নিষ্ঠুর দুঃখ কি এতেই ভরবে? শুধু আমি? কিসের জন্য এত দীর্ঘ, এত দুর্গম পথ! শেষ কোথায় এর! শুধু এই আমাতে?" অথচ গানের প্রতিটি পংক্তি জানিয়ে দেয় যে তার অনুভূতি এর চেয়ে অনেক বড়ো, অনেক গভীর। সেইজন্যে বোধহয় আরো কয়েক বছর পরে রচিত 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা' থেকে গানটিকে বাদ দেওয়া হয়েছিলো :

পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়, কী আছে শেষে!
এত কামনা, এত সাধনা কোথায় মেশে।
ঢেউ ওঠে-পড়ে কাঁদার, সম্মুখে ঘন আঁধার —
পার আছে কোন্ দেশে।
আজ ভাবি মনে মনে, মরীচিকা-অন্বেষণে
বুঝি তৃষ্ণার শেষ নেই — মনে ভয় লাগে সেই,
হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া ব্যথা চলেছে নিরুদ্দেশে॥

এ-পথ জীবনেরই পথ, কিন্তু জীবনমাত্রের নয়, উদ্দেশ্যবিহীন, ক্ষণবিলাসী, প্রাত্যহিকতার স্রোতে ভেসে-যাওয়া জীবনের পথ নয়। যে-পথের শেষ কোথাও নেই ব'লে রবীন্দ্রনাথের মনে ব্যাকুলতা ও নৈরাশ্যের উদয় হয়েছে এ-গানে, তা নিশ্চয়ই পরমের দিকে এগুবার পথ,

পরমেশ্বরকে পাওয়ার পথ। এই পথে চলাকে মরীচিকা-অন্বেষণের সঙ্গে তুলনা করার অর্থ কি এই যে রবীন্দ্রনাথের মনে ব্যথিত ব্যাকুল সন্দেহ জেগেছে হয়তো ঈশ্বরকে ভুল পথে সন্ধান করেছেন এতদিন; নাকি ভয়ের কারণ আরো গভীর? ভুল পথে চলেছে বুঝতে পারলে মানুষ ঠিক পথের সন্ধান পেতেও পারে একদিন। কিন্তু সে যদি ক্রমশ উপলব্ধি করে যে সব পথই ভুল পথ, তখন তার কী দশা হবে? সে কি গতিশক্তি হারিয়ে ব'সে পড়বে পথের মাঝখানে, আর দেখবে তার হাল-ভাঙা পাল-ছেড়া ব্যথা চলেছে নিরুদ্দেশে, তাকে পিছনে ফেলে?

"সম্মুখে ঘন আঁধার"; তাই কাতর প্রার্থনা—হয়তো-বা বৈদিক প্রার্থনারই অনুরণন:

আর রেখো না আঁধারে, আমায় দেখতে দাও।

... ...

স্বপ্নভারে জমল বোঝা, চির জীবন শূন্য খোঁজা—
যে মোর আলো লুকিয়ে আছে রাতের পারে
আমায় দেখতে দাও।

যে-আলোর ক্ষীণতম আভাসটুকুও দেখা যাচ্ছে না, তারই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা স্থাপন ক'রে বলছেন, "যে মোর আলো"। কিন্তু সে-আলো লুকিয়ে আছে তো রাতের পারে? খোঁজা কি কোনোদিন শেষ হবে, রাত্রি কি কখনো প্রভাত হবে? "শূন্য খোঁজা"—কী ভয়ানক তার দ্যোতনা। হতাশা কতদূর মর্মঘাতী হ'লে মানুষ বলতে পারে—খুঁজবার উপযুক্ত কোনো লক্ষ্যই খুঁজে পেলাম না, তাই শূন্যকেই খুঁজছি। এ-খোঁজার শেষ হবে না শুধু তাই নয়, শেষ হবে এমন চিন্তাই আত্মবিখণ্ডিত।

এই ট্র্যাজিক উপলব্ধির সুন্দরতর প্রকাশ বর্ষার একটি গানে। গোড়াতেই আমরা অনুভব করি সেই আতঙ্ক, যার বিষয় কোনো ঘটনা বা বস্তুবিশেষ নয়, বিষয় শূন্যতা, nothingness:

যায় দিন, শ্রাবণদিন যায়।
আঁধারিল মন মোর আশঙ্কায়,
মিলনের বৃথা প্রত্যাশায় মায়াবিনী এই সন্ধ্যা ছলিছে ॥
আসন্ন নির্জন রাতি, হায়, মম পথ-চাওয়া বাতি
ব্যাকুলিছে শূন্যেরে কোন্ প্রশ্নে ॥

রাত্রি এখনো আসেনি, কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে সন্ধ্যার প্রদোষান্ধকার ইতিমধ্যে গাঢ় হ'য়ে গেছে মেঘে-বৃষ্টিতে। মিলনের কাল অবশ্য রাত্রি, কিন্তু সন্ধ্যার লগ্নেই বিরহিণী বুঝতে পেরেছে যে তার প্রত্যাশা বৃথা, মায়াবিনী সন্ধ্যার ছলনামাত্র। কেমন ক'রে বুঝলো সে? সে কি সন্দেহ করছে যার সঙ্গে মিলনের জন্য সে আকুল, সে শুধু অনুপস্থিত নয়, অবাস্তব, সে-ও সন্ধ্যারই ছলনা, অথবা তারই প্রেম-বিহ্বল মনের অভিক্ষেপ (projection)? "ব্যাকুলিছে" ক্রিয়ার প্রয়োগ এখানে অভিনব, অপ্রত্যাশিত, এবং সেই কারণে এত মর্মস্পর্শী। রেডিওতে শুনেছি কোনো-কোনো কণ্ঠশিল্পী সম্ভবত ব্যাপারটাকে সহজবোধ্য ক'রে নেওয়ার জন্য গান করেন "মম পথ-চাওয়া বাতি ব্যাকুলিছে শূন্যের কোন্ প্রশ্নে।" "শূন্যেরে"-কে "শূন্যের" বললে অর্থ যায় উল্‌টে এবং রসের বারো আনাই মাটি হয়। নির্জন ঘরে প্রতীক্ষমানা হতভাগিনীর হ'য়ে প্রদীপের কম্পমান শিখা প্রশ্ন করছে—সে কি আসবে না, সে কি বুঝবে না আমার ব্যথা? কিন্তু বাতিও জানে, প্রশ্নটি কত অর্থহীন; এমন কেউ কোথাও নেই যার কাছে প্রশ্ন পৌঁছতে পারে, সাড়া পাওয়া তো অনেক দূরের কথা। প্রশ্ন শূন্যেই হারিয়ে যাবে। শূন্যকে ব্যাকুল করার চেষ্টার চেয়ে বৃথা এবং নিষ্করুণ আর কোন্ চেষ্টা হ'তে পারে।

নাকি কবির মনে এমন অবাস্তব শিশুসুলভ আশা জাগে যে প্রশ্নের ব্যাকুলতাই—যে-ব্যাকুলতা বৃষ্টি-মুখরিত শ্রাবণ সন্ধ্যার পর থেকে তীব্রতর হ'তে থাকবে রাত্রির গভীরতার সঙ্গে-সঙ্গে—শূন্যের মধ্যে জাগিয়ে তুলবে অনন্ত প্রাণ মন হৃদয়, যে-হৃদয়ে হয়তো-বা এই

ব্যাকুলতার সামান্যতম সংক্রাম লাগবে ? অসম্ভব, এ অসম্ভব। তবে অসম্ভবের কাছে হার মানেননি এক বিশ্ববিশ্রুত সেনানায়ক, বিশ্ববিশ্রুত কবিই-বা পিছিয়ে থাকবেন কেন ?

এই গানটি 'গীতবিতান'-এ "প্রকৃতি" পর্যায়ের গানের অন্তর্ভুক্ত ; প্রেমের গান বললে পরিচয়টা আরো সঠিক হ'তো। আমার কিন্তু ভাবতে ভালো লাগে গানটিকে ভক্তিরসের গানরূপে। বলা বাহুল্য, যে-রবীন্দ্রনাথকে আমি নিবিড়ভাবে চিনি, তাঁর মনের ভক্তি সাধুসন্ত-দের ভক্তির মতো বিশুদ্ধ বিমূর্ত অনির্বাচ্য ভক্তি নয়, অত্যাশ্চর্য বচনে প্রকাশ পেয়েছে রসরূপে—যদিও ভক্তিরস নবরসের তালিকাভুক্ত নয়। ভক্তির শ্বাসরোধ ক'রে মাঝে-মাঝে নেমে আসে যে ঘনান্ধকার রাত্রি—dark night of the soul—তারই কথা বলছেন রবীন্দ্রনাথ এ-গানে। তখন ভক্তের অন্তরের অন্ধকার আর বাইরের অন্ধকার একাকার হ'য়ে যায় :

> নিবিড়-তমিস্র-বিলুপ্ত-আশা ব্যথিতা যামিনী খোঁজে ভাষা—

মনে হয় মেঘ নয়, ঘন নৈরাশ্যই ঢেকে দিয়েছে আকাশের সব তারা ; নিরালোক যামিনী হারিয়েছে তার সব ভাষা।

> দিকে দিকে কোথাও নাহি সাড়া,
> ফিরে খ্যাপা হাওয়া গৃহছাড়া।

ভক্তপ্রেমিকার খ্যাপামি ঘরের শান্ত হাওয়াকে খেপিয়ে গৃহছাড়া করেছে, কিন্তু ভক্তির ব্যাকুলতা কি দিগন্তব্যাপী শূন্যে কোনো সাড়া জাগাতে পারবে ?

ভক্ত-ভগবানের সম্পর্ক এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার। প্রেমময় ভগবান খোঁজেন তাঁর মনের মতো ভক্তকে ; পিপাসিত ভক্তি খোঁজে তার মনের মতো পাত্রকে। খোঁজার শেষ নেই, তবে পথে চলতে-চলতে কিছু তো পায় পান্থজনেরা, নইলে অন্ধকার রাত্রিতে উপলবন্ধুর কণ্টক-

সমাকীর্ণ পথে ক্ষতবিক্ষত পায়ে চলবার শক্তি সে পাবে কোথা থেকে। যদি বলি এই কুড়িয়ে বা খুঁজে পাওয়ার মধ্যে আবিষ্কারের চেয়ে সৃষ্টির ভাগ কিছু কম নয়, তবে খুব ভুল বলা হয় না। প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রেমাস্পদকে বলেছিলেন—"অর্দ্ধেক মানবী তুমি, অর্দ্ধেক কল্পনা"। ভক্ত কি ভগবানকে বলতে পারেন না—অর্দ্ধেক সত্য তুমি, অর্দ্ধেক আমারই রচনা? এই রচনার উৎস কিন্তু শিশুমন্য মানুষের বাসনা-পূরণ নয়, অন্তত রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষের ক্ষেত্রে নয়। দশ হাজার বছর আগেকার মানুষের বা দশ বছর বয়সের বালকের মনের উপাদান দিয়ে আজকের দিনেব সংস্কৃতির সর্বোচ্চ শিখরে যাঁরা আরোহণ করেছেন, তাঁদের মন বোঝার চেষ্টায় কতকটা বৈজ্ঞানিক গোঁড়ামি, কতকটা বিদ্বানী ছেলেমানুষী রয়েছে। পূর্বোক্ত "অর্দ্ধেক আমারই রচনা"র উৎস খুঁজতে হবে কবি-মনের গভীর জ্বালাময় ব্যাকুলতায়। প্রেমের বেলা যেমন অর্দ্ধেক সত্যের উপরই প্রেমিকের কল্পনা রঙ বোলাতে পারে, শূন্য ক্যানভাসের উপর নয়, ভক্তির বেলায়ও তেমনি মানবিক ও প্রাকৃতিক জগতের অভিজ্ঞতায় ঐশী গুণের আভাস না-পেলে ভক্তের ব্যাকুলতা কিছুই রচনা করতে পারবে না। কিছু যদি উদ্ঘাটিত না-হয়, সবই মনগড়া হয়, তবে তেমন রচনার সঙ্গে আফিম-খোরের দিবাস্বপ্নের তফাৎ থাকবে না।

এ-সব সত্য হ'লেও—যদি সত্য হয়—আলোচ্য গানের অনুভূতি "নিবিড়-তমিস্র-বিলুপ্ত আশা"রই অনুভূতি। মনের ভিতরের ও ঘরের বাইরের অন্ধকার এমনই ঘন যে পথের শেষ কোথায় জানা তো দূরের কথা, পথের কোনো চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না কোনো দিকে; সন্ধ্যা মায়াবিনী, রাত্রি মমতাহীনা, আকাশ "ঊষা-দিশা-হারা"।

"যায় দিন শ্রাবণদিন যায়" এবং "পথের শেষ কোথায়" গান-দুটিতে যে অন্তিম নৈরাশ্য-বিষাদের ভাব ব্যক্ত হয়েছে তা রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গানের ভাববর্ণালির প্রান্তবর্তী, প্রায় প্রান্তবহির্ভূত। 'গীতাঞ্জলি'

পর্বের যতগুলি দুঃখের গান আমরা পাই তা'র একটি-দুটি বাদে সবগুলিই স্পেকট্রামের অন্য প্রান্তে অবস্থিত। সে-দুঃখ অসীম পাথার পার হয়, সে-দুঃখের তিমিরেই জ্বলে মঙ্গল-আলোক, সে-দুঃখের বেশ ধারণ ক'রেই পরমপ্রিয় নেমে আসেন ঊর্ধ্বলোক থেকে, দাঁড়ান দুঃখিনীর পাশে, সমস্ত ভয়ডর ভুলে গিয়ে এগিয়ে আসে প্রতীক্ষায় অধীরা প্রণয়িনী, তাঁকে এই লৌহকঠিন বেশেই বুকে চেপে ধরে। ক্ষতবিক্ষত হয় তার কোমল বুক, কিন্তু সে কী প্রচণ্ড পুলক। আরো কঠিন আঘাত সইবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে তার জীবনের কম্পিত তারগুলি। এই প্রাণান্তিক যন্ত্রণা দিয়েই প্রাণোজ্জীবনী প্রেমসুধা পান করানো—এ-ও সেই নিঠুর দরদীর এক খেয়াল, একপ্রকার আধ্যাত্মিক রতিরঙ্গ; যদিও দাম্পত্য মিলনের মধুর খেলার সাথে এ-খেলা কোনোমতে তুলনীয় নয়।

নয় এ মধুর খেলা—
তোমায় আমায় সারাজীবন সকাল-সন্ধ্যাবেলা।
নয় এ মধুর খেলা॥
কতবার যে নিবল বাতি,
গর্জে এল ঝড়ের রাতি—
সংসারের এই দোলায় দিলে সংশয়েরই ঠেলা॥
বারে বারে বাঁধ ভাঙিয়া বন্যা ছুটেছে।
দারুণ দিনে দিকে দিকে কান্না উঠেছে।
ওগো রুদ্র, দুঃখে সুখে
এই কথাটি বাজল বুকে—
তোমার প্রেমে আঘাত আছে, নাইকো অবহেলা॥

"তোমার প্রেমে আঘাত আছে, নাইকো অবহেলা"—এই শেষের পংক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। হালের অভিজাত সাহিত্যিক পরিভাষায় যাকে বলে alienation, বিচ্ছিন্নতাবোধ—এ তার বিপরীত বোধ। শেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথ "উদাসীন জগতের (তার মানেই জগদীশ্বরের, কারণ জগৎকে জগদীশ্বর থেকে ভিন্ন ক'রে দেখা রবীন্দ্রমানস-বিরুদ্ধ) ভীষণ স্তব্ধতা"র কথা বলবেন, বলেছিলেন কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর বছর

চারেকের মধ্যে প্রকাশিত 'মানসী' কাব্যেও। কিন্তু মধ্য পর্বে আঘাত যতই নিদারুণ হোক্, তা অবহেলা নয়, অবহেলার চেয়ে অনেক বেশি বরণীয় ও সহনীয়। এমন আঘাতের মধ্যে জগদীশ্বরের বিশেষ একটি উদ্দেশ্য লুকানো রয়েছে, সে-উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রেম নাতিপ্রচ্ছন্ন।

যদিও রবীন্দ্রনাথ বললেন এ-খেলা মধুর নয়, তবু গানের পর গানে আমরা বুঝতে পারি যে দুঃখ দেওয়া-নেওয়ার খেলা সুখের খেলার চেয়ে কম মনোহর নয়। "কুড়িয়ে আনা, ছড়িয়ে ফেলা, এই কি তোমার একই খেলা"—এ-ভাবখানা রবীন্দ্রসঙ্গীতে যেমন, তাঁর পূর্বসূরী, মর-মিয়াদের গানেও তেমনি সুন্দর ফুটেছে। কিন্তু ভগবানের এই লীলায় ভক্ত নিজেও সমান তালে যোগ দিয়েছে, পাল্টা জবাব দিচ্ছে প্রথা-সম্মত লীলার ভাষাতেই, কিছুমাত্র কুণ্ঠা বা সন্ত্রাসের বিহ্বলতা বোধ না-ক'রে, তার আশ্চর্য প্রকাশ আমার সেই প্রিয় গানে :

সকল জনম ভ'রে ও মোর দরদিয়া,
কাঁদি কাঁদাই তোরে ও মোর দরদিয়া॥
আছ হৃদয়-মাঝে
সেথা কতই ব্যথা বাজে,
ওগো এ কি তোমায় সাজে
ও মোর দরদিয়া।
এই দুয়ার-দেওয়া ঘরে
কভু আঁধার নাহি সরে,
তবু আছ তারি 'পরে
ও মোর দরদিয়া।
সেথা আসন হয় নি পাতা
সেথা মালা হয় নি গাঁথা,
আমার লজ্জাতে হেঁট মাথা
ও মোর দরদিয়া॥

গানটি—বিশেষ ক'রে গানের প্রথম দুটি পংক্তি—শুনলে মনে হয় দাম্পত্যপ্রেমের গান। সে-প্রেমের গভীরতা ও মাধুর্য যতই থাক্, দিনানুদৈনিক সংসারযাত্রার বিচিত্র ঘটনার মধ্যে দুটি-একটির অভি-

যাতে দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার স্বাতন্ত্র্য অনিবার্যত অল্পস্বল্প ক্ষুণ্ণ হওয়ার দরুন মাঝে-মাঝে তিক্ততা এসেই পড়ে। মানসপ্রিয়া বিয়াত্রিচের বেলা কাঁদাবার কোনো প্রশ্ন ওঠে না ; বহুদূরে তার অবস্থান, হয়তো-বা মৃত্যুর সীমানা ছাড়িয়ে। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টার সম্বৎসরের সঙ্গিনীর বেলা এমন সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া শক্ত। সে যাই হোক্, গানটি কিন্তু 'গীতবিতান'-এর ভক্তিপর্বে সন্নিবেশিত, ভক্তিগীতিরূপেই সাধারণত এবং সঙ্গত-ভাবেই গাওয়া হয়। অথচ ভক্তের মুখে কি ভগবানকে বলা সাজে—কাঁদাই তোরে ? ভক্ত নিজে কাঁদতে পারে প্রেম-ভক্তির পাত্র যিনি তাঁর অভাবনীয় পূর্ণতা ও অনুত্তরণীয় দূরত্বের কথা ভেবে, নিজের অকথনীয় অকিঞ্চিৎকরতার কথা ভেবে। কিন্তু ভগবানকে সে কাঁদাবে—তার এত বড়ো শক্তি বা মর্যাদা ঠিক ধারণা করতে পারি না। ভক্তমানুষের যাবতীয় মানবিক দুর্বলতা, তার নৈতিক দুর্গতি, পদে-পদে স্খলন, এমন-কি প্রেমধর্মেও অধর্মাচরণ পরমপ্রিয়ের দুঃখের কারণ হ'তে পারে অবশ্য ; অন্তত এ-কথা আমরা ভাবতে পারি। এটাই গানের প্রথম স্তবকের সহজ অর্থ। কিন্তু শেষ অর্থও কি তাই ? অন্তত আমার মনে এবং বেদনায় আর-একটি অর্থ জাগে।

অর্থাৎ আমি তোমার মনের মতনটি হ'তে পারিনি ব'লে তোমাকে দুঃখ দিই, কাঁদাই। অনুরূপ কারণে আমিও তো কাঁদতে পারি। ভগবান, তুমি যত বড়োই হও, যত ভালোই হও, ঠিক আমার মনের মতনটি তো নও—এ-দুঃখ আমার জীবনের সবচেয়ে গভীর দুঃখ হ'তে পারে। তোমার সৃষ্টিতে ইতিহাসময় এত জ্বালাযন্ত্রণা, এত অনাচার, অবিচার, অত্যাচার কেন ? তুমি কি পরমমঙ্গলবিধাতা নও ? নাকি তোমার ক্রমসর্জমান জগৎচরাচরে মঙ্গলবিধান সুপ্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প আছে, পরিকল্পনা আছে, কিন্তু কারয়িত্রীশক্তি সীমিত। তাই কি পদে-পদে ছন্দপতন ঘটে, অশ্রুধারার বন্যা ছোটে ? অর্থাৎ ভগবান যদি মঙ্গলময় প্রেমময় হন তবে তিনি সর্বশক্তিমান নন ; আর যদি

তাঁর শক্তি কোনো দিক থেকে সীমিত বা বিঘ্নিত না-হয়, তবে তিনি মানবভাগ্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন; তাঁর পতাকায় রয়েছে পদ্মের মাঝখানে বজ্র, সে-বজ্র কখন কার মাথায় পড়ে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। প্রকৃতি চলে বিজ্ঞানগম্য নিয়মমতো, কিন্তু মানুষের সুখ-দুঃখ ঘটে মানব-ভাগ্যবিধাতার একান্ত খেয়াল-খুশিমতো, কোনোই অর্থ বা তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায় না তার। 'কাঁদি' বলতে যদি এই বোঝায় তবে কাঁদি-কাঁদাই শব্দদুটির ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা গানটিকে অন্য-এক স্তরে নিয়ে যায়। এমনতর ব্যঙ্গ্যার্থ রবীন্দ্রনাথের মনে ছিলো কিনা জোর ক'রে বলতে পারি না। আমার তো মনে হয় ছিলো, কিন্তু স্পষ্ট হ'য়ে ওঠেনি গানটির রচনাকালে। "কাঁদি কাঁদাই তোরে"—এমন বা এর কাছাকাছি স্পর্দ্ধাই রবীন্দ্রনাথের ভক্তিগীতিকে অতুলনীয় উৎকর্ষ দান করেছে। কত বিচিত্র ও কী অপরূপ এই স্পর্দ্ধার প্রকাশ তাঁর গানে। প্রধানত এই কারণেই তাঁর ভক্তিপর্বের ও প্রেমপর্বের শ্রেষ্ঠ গানগুলির মাঝখানে কোনো সীমারেখা টানা যায় না। প্রেম অলক্ষ্যে উঠে গিয়ে মিলেছে ভক্তির সঙ্গে, ভক্তি অলক্ষ্যে নেমে এসে ঘর করেছে প্রেমের সঙ্গে।

"সকল জনম ভ'রে" গানের গোড়াটা যেমন আমাদের ভাবিয়ে তোলে, ভক্তিপর্বের আর-একটি গানের শেষে পৌঁছে আমরা তেমনি চমকে উঠি:

হৃদয় আমার প্রকাশ হল অনন্ত আকাশে।
বেদন-বাঁশি উঠল বেজে বাতাসে বাতাসে।
এই-যে আলোর আকুলতা, আমারি এ আপন কথা—
উদাস হয়ে প্রাণে আমার আবার ফিরে আসে॥
বাইরে তুমি নানা বেশে ফের নানান ছলে;
জানি নে তো আমার মালা দিয়েছি কার গলে।
আজ কী দেখি পরাণ-মাঝে, তোমার গলায় সব মালা-যে,
সব নিয়ে শেষ ধরা দিলে গভীর সর্বনাশে।
সেই কথা আজ প্রকাশ হল অনন্ত আকাশে॥

শুরুতেই শুনি বেদনার বাঁশি, হৃদয়ের কথা উদাস হ'য়ে হৃদয়েই ফিরে আসছে। কিন্তু গানের অব্যর্থ গতি পূর্ণতম সার্থকতম মিলনের অভিমুখে। ঈশ্বরের প্রকাশ জগতে নানা বেশে, নানা ছলে—এটা খুবই পরিচিত কথা, রবীন্দ্রসাহিত্য-পাঠকের কাছে তো বটেই। রবীন্দ্রনাথ আজীবন প্রকৃতিকে এবং মানুষকে ভালোবেসেছেন, গল্পে গানে কাব্যে চিত্রে এমন-কি প্রবন্ধেও তাদের গলায় মালা পরিয়েছেন, এটাও আমাদের অজানা নেই। সেইসব মালা শেষ অবধি ঈশ্বরের গলায় পৌঁছেছে—এত বড়ো সুখবর আর কী হ'তে পারে? কেবল খবর নয়, পরোক্ষ জ্ঞান নয়, এ এক প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। এই চরম সার্থকতার মুহূর্তে কবি-প্রেমিক আমাদের স্তম্ভিত ক'রে দিয়ে বলছেন—ঈশ্বরকে সম্বোধন ক'রেই বলছেন—আমার দেওয়া সব মালা গলায় ধারণ ক'রে তুমি "শেষ ধরা দিলে গভীর সর্বনাশে।" কী বলতে চাইছেন রবীন্দ্রনাথ? কোনো রক্তমাংসের প্রিয়াকে বলা যায় বটে আমার সব ভালোবাসা বুকে ধারণ ক'রে তুমি আমার সর্বনাশ করেছো। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলছেন, "তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ"; কিন্তু মানবীকেই বলেছেন, দেবতাকে নয়। ভগবান যদি ভক্তের সব প্রেম ভক্তি আত্মনিবেদন গ্রহণ করেন এবং সে-কথা প্রকাশ করেন অনন্ত আকাশে—তবে সেটা তো ভক্তের জীবনের পরিপূর্ণতা, সর্বনাশ হ'তে যাবে কেন?

অবশ্য মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টান পাদ্রীদের মতো যাঁরা মনে করেন ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে অসেতুবন্ধ্য ব্যবধান, যাঁরা পরিবার-সংসার ছেড়ে প্রকৃতি ও সমাজের দিকে পিঠ ফিরিয়ে ঈশ্বর-সাধনা করেন, বহিরিন্দ্রিয় ও বাহ্যজ্ঞান এবং রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বিশ্বপ্রেম প্রত্যাহৃত ক'রে একান্ত-ভাবে অন্তর্মুখিন করেন তাঁদের যাবতীয় বোধ চিন্তা ও অনুভূতিকে, তাঁদের বেলা হয়তো ভাবা যায় যে সাধনা সফল হ'লেও অন্যদিক থেকে তাঁদের সর্বনাশ ঘটেছে; ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য "এ সুন্দর ভুবন"-কে

হারাতে হয়েছে তাঁদের ; তাঁরা ঈশ্বরকে সর্বনেশে এবং ঈশ্বরপ্রেমকে নেশা বললে বলতেও পারেন। অমিয় চক্রবর্তী প্রিয়াবিচ্ছেদের একটি অপূর্ব কবিতায় "তার বদলে" কী-কী পাওয়া যায় তার সুন্দর ফিরিস্তি দিয়েছেন, বলেছেন "একলা বুকে সবই মেলে"। কিন্তু যে-বুকে ঈশ্বরের বাস তাকে শূন্য করতে হয় না সেখানে জাগতিক সৌন্দর্যের স্থান সংকুলান করবার জন্য। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরপ্রেমের সঙ্গে বিশ্বপ্রেমের ভেদ নেই কোথাও, বিরোধের তো প্রশ্নই ওঠে না ; তিনি "হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট" মেলে জগতকেও পান কবেন, জগদীশ্বরকেও। তাঁর হাতে পরানো সব মালা যদি ঈশ্বরের গলায় পৌঁছে থাকে, তবে তাতে ক'রে এই অভূতপূর্ব সাধনায় সিদ্ধকাম ভক্তের সর্বনাশ ঘটবে আমরা এমন কথা ভাবতে পাবি না।

অথবা একদিক থেকে পারি হয়তো। ঐ যে উপান্ত পংক্তিতে বলা হয়েছে—"সব নিয়ে শেষ ধরা দিলে গভীর সর্বনাশে"—এখানে "সব" শব্দটার উপর একটু স্বরাঘাত আছে যেন। 'সব' মানে আক্ষরিক অর্থে সব, মায় আমাকে সুদ্ধ। আমাব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, আমার ব্যক্তি-স্বরূপ, সবই নিঃশেষে মিলিয়ে যাবে তোমাতে যদি আমার এ-প্রেম পৌঁছয় সার্থকতার মোহানায়। তখন বিন্দু যেমন সিন্ধুতে সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়, কিছুই তার বাকি থাকে না, তেমনি ক'রে আমার আমিত্বের সবটুকুই কি কেড়ে নেবে তুমি? এই সম্ভাবনা কবির চোখে সর্বনাশ ব'লে গণ্য হ'তেই পারে। প্রথমত, পূর্ব-সাধকরা, যাঁরা পুরোপুরি মরমিয়া সাধক বা মিস্টিক ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের মতো কাব্যসাধনা ও ঈশ্বর-সাধনাকে পরস্পর-অবিছিন্ন ক'রে তোলেননি, তাঁরা অনেকেই ঠিক এই পরিণতির কথাই ব'লে গেছেন ; উপরন্তু সিন্ধুব মধ্যে বিন্দুবৎ আত্মবিলোপকেই তাঁদের একনিষ্ঠ সাধনার চরম লক্ষ্য ব'লে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু কবির কাছে তাঁর স্বকীয়তার এবং অনন্য ব্যক্তিত্বের মূল্য অন্য-কোনো মূল্য অপেক্ষা হেয় হ'তে পারে না। তিনি যে-ঈশ্বর-

প্রেমে নিমজ্জিত হ'তে চান তার মধ্যে রয়েছে "সারা জনম ভ'রে কাঁদি কাঁদাই তোরে"র দ্বৈতসাধনা, রয়েছে সকাল-সন্ধ্যাবেলা সেই খেলা যা মধুর নয়, তবু তীব্র তাব বেদনাবিদ্ধ সুখ। কবি অনেক দিতে পারেন কিন্তু সব দিতে পারেন না। "আমার যে সব দিতে হবে" যখন বলেন তখনও 'সব'-এর মধ্যে 'আমি' পড়ে না ; বরঞ্চ কী-কী দিতে হবে তার তালিকা শেষ ক'রে গানের শেষে বলছেন :

আমার ব'লে যা পেয়েছি শুভক্ষণে যবে
তোমার ক'বে দেব তখন তারা আমার হবে।

স্পষ্টই বোঝা যায় যে এইসব দেওয়াতে 'আমি' নিজেকে রিক্ত ক'রে বিলীন ক'রে দিচ্ছে না, বরঞ্চ তাব পবিণাম 'আমি'র পূর্ণতাই।

একটি সুপরিচিত সুন্দব গানে আছে—

তোমাব অভিসাবে যাব অগম পারে
চলিতে পথে পথে বাজুক ব্যথা পায়।

অভিসারে যাওয়ার জন্য পথের যাবতীয় কষ্ট অগ্রাহ্য ক'রে এগিয়ে চলার সংকল্প দ্বিধাহীন, তার আন্তরিকতায় সন্দেহ করবার কোনোই কারণ নেই। একটা 'কিন্তু' আছে তবু :

সকলি নিবে কেড়ে, দিবে না তবু ছেড়ে
মন সরে না যেতে, ফেলিলে এ কি দায়ে।

সকলি—খ্যাতি, কীর্তি, ধনমান—নেবার পরও নিস্তার নেই, আমার আমিত্বও চাই তার। এই চূড়ান্ত আত্মদানের জন্য কোনো নারী-প্রেমিক প্রস্তুত নয় ; রবীন্দ্রনাথের মতো ঈশ্বরপ্রেমিকও দ্বিধাগ্রস্ত, মন সরে না অতদূর যেতে। শ্রীরামকৃষ্ণের মতো এমন বিশুদ্ধ ভক্তের কথাও শুনেছি যিনি নিজের ভক্তিরসের দ্বৈতভাব বোঝাবার জন্য বলেছিলেন, "আমি চিনি খেতে চাই, চিনি হ'তে চাই না।" বিশুদ্ধ ভক্তের মুখে এ-কথা

একটু চমকপ্রদ, কিন্তু কবিভক্তের মুখে এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, এটাই প্রত্যাশিত।

প্রেমের ব্যর্থতার বেদনা, বিরহ-বিচ্ছেদের বেদনা, প্রিয়তমার মৃত্যু-শোক ইত্যাদি পরম্পরাগত ভাব রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানে খুব বেশি জায়গা জোড়েনি। হয়তো-বা এ-জাতীয় অত্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক দুঃখ-প্রকাশ সম্বন্ধে তাঁর স্বভাবের মধ্যেই কিছু প্রতিরোধ ছিলো। তবু এমন গানের সংখ্যাও খুব কম নয় এবং কয়েকটি তার অসাধারণ রসোত্তীর্ণ। কিন্তু সে-সব গান বিষয়ে "তুমি কেমন করে গান করো যে গুণী / আমি অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি" ছাড়া আর-কিছু বলার নেই আমার। তবে দুঃখ একটু নতুন রূপ ধারণ করেছে যে দু-একটি প্রেমের গানে, তারই কথা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমটি হ'লো :

কিছুই তো হল না।
সেই সব – সেই সব – সেই হাহাকার-রব,
সেই অশ্রুবারিধারা, হৃদয়বেদনা॥
কিছুতে মনের মাঝে শান্তি নাহি পাই,
কিছুই না পাইলাম যাহা কিছু চাই।
ভালো তো গো বাসিলাম, ভালোবাসা পাইলাম,
এখনো তো ভালোবাসি – তবুও কী নাই॥

যাকে ভালোবাসলাম তার কাছ থেকে ভালোবাসা পেলাম – দুর্লভ অভিজ্ঞতা; আরো দুর্ঘট যে সে-ভালোবাসায় কোথাও ঘাটতি পড়েনি, চিড় ধরেনি, বছরের পর বছর (গানের ভাষা থেকে তো তাই মনে হয়) তা অক্ষয় অম্লান রয়েছে। এর চেয়ে অধিক পরিতৃপ্তি মানুষের তৃষিত জীবনে আর কী হ'তে পারে? তবু প্রেমিক-কবি বলছেন – কথার উপর বেশ একটু জোর দিয়েই বলছেন – "কিছুই তো

হল না" ; শোনাতে চাইছেন তাঁর হৃদয়ের সাহানা রাগিণী নয়, "হাহাকার-রব"। কোনো-এক পারস্য কবি দুঃখ করেছিলেন :

> সুখের সব সরঞ্জামই মজুত, কিন্তু
> বন্ধু কোথায়, বন্ধু বিনা আবার সুখ কী।

রবীন্দ্রনাথের গানে বন্ধু অত্যন্ত উপস্থিত, সম্ভবত বক্ষলগ্নই। এমন পরিপূর্ণ সুখের অবস্থায় এত তীব্র বিষাদ এবং ব্যর্থতার অনুভূতি একটু আশ্চর্য।

তবু আশ্চর্য নয়। প্রেমের পরিমিত অভিজ্ঞতায় প্রেমিক খুঁজছে অপরিমিত কিছু, অপার্থিব কিছু। যার মাধুরী জীবনের পাত্রে ধরা যাবে না, যাকে ধ্যানের ধন বললেও একটু বাড়িয়ে বলা হয়, কারণ তা সম্পূর্ণ ধ্যেয় নয়, তাকেই সে খুঁজছে একটি সীমিত, সামান্য, রক্তমাংসের ক্ষুদ্র মানবিক বেষ্টনীতে। পুকুরের চৌহদ্দির মধ্যে অকূল সমুদ্র খোঁজা কেন ? তবু মানুষ খোঁজে, অন্তত রোম্যান্টিক কবিরা খোঁজেন। কিছু-যে পান না তা নয়, পুষ্করিণীও রত্নগর্ভা হ'তে পারে। কিন্তু চাওয়া-পাওয়ার মাঝখানে ধূ-ধূ করছে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ, তাই অনিবার্যত তাঁরা ভাবেন "কিছুই না পাইলাম", ভাবেন "তৃষ্ণার শেষ নেই" কোথাও। একেই বলে রোম্যান্টিক অ্যাগনি। শিল্পীকে তো বটেই, সব সুকুমার-হৃদয় এবং কল্পনাপ্রবণ মানুষকে এ-ব্যর্থতাবোধ অল্পবিস্তর পীড়া দেয়। রবীন্দ্রনাথ এই দুর্নিবার হতাশার বেদনাকে আরো তীব্র ক'রে তুলেছেন ঘরোয়া দাম্পত্যপ্রেমের পটভূমিকার উপর তাকে চিত্রার্পিত ক'রে। সফল প্রেমের মধ্যেও এই রোম্যান্টিক অতৃপ্তির বেদনা ব্যক্ত হয়েছিলো 'মানসী'র সুপরিচিত "নিষ্ফল কামনা" শীর্ষক কবিতাটিতে। গানের ক্ষুদ্র পরিসরে সুরের সাহায্যে তার প্রকাশ আরো রসঘন, ছড়িয়ে-বাড়িয়ে বলার অবকাশ এখানে ছিলো না।

অন্য যে প্রেমের গানের কথা বলতে যাচ্ছি, তার দুঃখও প্রথম গানের মতোই ভালোবাসা না-পাওয়ার দুঃখ নয়, পাওয়ারই দুঃখ ; এবং

পাওয়ার পর এত তীব্র ঝংকারে বুকে বেজে ওঠে সে-দুঃখ যে মৃত্যুকে ডাকতে হয় সকল পরাজয়ের গ্লানি ঘুচিয়ে দেবার জন্য।

তুমি মোর পাও নাই পরিচয়।
তুমি যারে জান সে যে কেহ নয়, কেহ নয়॥
মালা দাও তারি গলে, শুকায় তা পলে পলে,
আলো তার ভয়ে ভয়ে রয়—
বায়ু-পরশন নাহি সয়॥
এসো এসো দুঃখ, জ্বালো শিখা,
দাও ভালে অগ্নিময়ী টিকা।
মরণ আসুক চুপে পরমপ্রকাশরূপে,
সব আবরণ হোক লয়—
ঘুচুক সকল পরাজয়॥

এই গানটিকে পূর্ববর্তী গানের গীতিনাটকীয় প্রত্যুত্তর ভাবা যেতে পারে। নায়কের দুঃখ—"কিছুই না পাইলাম"। নায়িকার বিক্ষোভ—"তুমি স্বর্গের পারিজাত চেয়েছিলে ; তোমার বাড়ির আঙিনায় যে-ভুঁই-চাঁপা ফুটেছে তার দিকে ফিরেও তাকাওনি।" "ঘুচুক সকল পরাজয়" —কিন্তু কিসের পরাজয় ? কারো অকৃপণ করে জীবন পূরণ না-হবার গ্লানি নয় ; পরিত্যক্ত, অবহেলিত, অবমানিত হবার আত্মধিক্কার নয়। আক্ষেপ এই নয় যে রূপে গুণে ব্যক্তিত্বে কৃতিত্বে তুমি আমাকে ছোটো ক'রে দেখেছো, আমার সব মূল্য তোমার চোখে ধরা দেয়নি। বরঞ্চ ঠিক তার উল্টো। দুঃখ এই, পরাজয় এই, যে তুমি আমাকে রক্তমাংসের মানুষ, সামান্য মানুষ, ছোটো-বড়ো নানা দোষে-ত্রুটিতে-ভরা মানুষ-রূপে দেখে ভালোবাসোনি। আমি সত্যিই যা তার পরিচয় পাওনি, তাকে দেখতে চাওনি। আমি যা নই তাকেই দেখেছো স্বপ্নের ঘোরে, তোমার আপন মনের মোহ ও মাধুর্য মিশিয়ে গড়েছো এক প্রতিমা, তারই গলায় মালা দিয়েছো। সে-মালা বৃথাই শুকায়, আমার গলায় পৌঁছায় না, পৌঁছালেও মানাতো না। "আলো তার ভয়ে ভয়ে রয়"—

কবিতার ভাষা। খুব সম্ভব উল্‌টো ক'রে বলা হয়েছে, অর্থাৎ সে-মালাই আলোর ভয়ে দোদুল্যমান। যদি আলো পড়তো আমার মুখের উপর, উদ্‌ঘাটিত হ'তো আমার সত্য রূপ, আমার সত্য 'আমি', তবে কি সে-মালা লজ্জা পেতো না আমার গলায়? যে সত্যিকার "কেহ নহে", মানসীপ্রতিমামাত্র, তার কাছেই আমি পরাজিত; এ-পরাজয়ের দুঃখ আমি কাউকে বোঝাতে পারবো না।

গানের নায়িকার দুঃখ 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের নায়িকার দুঃখের সঙ্গে প্রতিতুলনীয়। অর্জুন-বিজয় অভিযানের প্রাথমিক সাফল্যের পর চিত্রাঙ্গদার বুকও পরাজয়ের তীব্র বেদনায় বেজে উঠেছিলো, কিন্তু বিপরীত সে-পরাজয়ের রূপ। অর্জুন প্রেমে পড়লেন তার অপরূপ দেহের; তার মনের অধিকতর ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের কোনো পরিচয় পাননি, পাওয়ার কোনো প্রয়োজনও বোধ করেননি। "তুমি মোর পাও নাই পরিচয়" না-ব'লে চিত্রাঙ্গদা যা বললো তাতে নৈরাশ্য অন্তিম ছিলো না, কিন্তু অভিমান আরো প্রখর ছিলো এবং তিরস্কার-মিশ্রিত:

সে আমি যে আমি নই, আমি নই;
হায় পার্থ, হায়,
... .
শৌর্য বীর্য মহত্ত্ব তোমার
দিয়ো না মিথ্যার পায়।

পূর্বোক্ত গানের ভগ্নহৃদয় নায়িকা ভাবছে আমার প্রাপ্য মালা পরিয়েছো তোমার মনগড়া প্রতিমার গলায়; চিত্রাঙ্গদার মনঃপীড়া এই যে তার প্রাপ্য "প্রেম সঙ্গম" কেড়ে নিয়েছে তার "সতীন", তারই মনোমোহিনী দেহলাবণ্য। দুই বল্লভ-বিজয়িনী প্রেমিকাই সতীনের কাছে পরাজিত; সতীন নির্বস্তুক হ'লেও (একজনের সতীন একেবারেই অশরীরী, প্রেমিকের খেয়ালী মনের উপাদান দিয়ে গড়া; অন্যজনের সতীন নিজেরই অনিন্দ্য সুন্দর শরীরমাত্র, প্রেমিকের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাইরে সে

মনোবিচ্ছিন্ন শরীরের অস্তিত্বগৌরব যৎসামান্য।) পরাজয়টা দু-জনের বুকেই নিদারুণরূপে বাস্তবিক।

এ-গানের ব্যঞ্জনার প্রচ্ছন্ন স্তরে অন্য-এক আবছা ব্যাপক ইঙ্গিত জেগে ওঠে আমার মনে, অনুভূতিকে জিজ্ঞাসু ক'রে তোলে। স্বপ্নপ্রিয় রোম্যান্টিক কি কঠোর রিয়ালিস্ট হ'তে চাইছেন, তরুণ রোম্যান্টিকতার রঙিন আবেশ কি পীড়া দিচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে? শুধু অপরিচিতা প্রিয়া নয়, সমগ্র বিশ্বচরাচর তো একদিন তাঁকে বলবেই: "তুমি মোর পাও নাই পরিচয়", যত শুভ্র, শুভ ও সুন্দর তুমি আমাকে ভাবছো তোমার নিজেরই ভাবের ঘোরে, আমি সত্যি তো তা নই। সেইদিনের পূর্বাভাস কি এই গানে? কঠিন দুঃখ যে-আলো বিকিরণ করবে তাতেই বিশ্ব-প্রেমিক বিশ্বের সত্য পরিচয় পাবেন, তার সব আবরণ তখনই লয় হবে। জগতের কঠিন কালো বাস্তব রূপ স্পষ্ট ক'রে দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ দশকে, শেষ পর্বের কাব্যে। কিন্তু জগতের এই বজ্র-পরিচয় তাঁকে অত্যন্ত বিচলিত ও বিষণ্ণ করলেও জগৎ-বিমুখ করেনি কোনো অর্থেই।

"তুমি মোর পাও নাই পরিচয়" এবং "চিনিলে না আমারে কি"— দুটি গানের শুধু প্রথম পংক্তি পড়লে মনে হ'তে পারে গানদুটির ভাব ও বিষয়বস্তু একই। কিন্তু মোটেই তা নয়। প্রথমটি মানবিক স্কেলে রচিত, দ্বিতীয়টির স্কেল শেষপর্যন্ত হ'য়ে দাঁড়ায় বিশ্বজাগতিক।

চিনিলে না আমারে কি।
দীপহারা কোণে ছিনু অন্যমনে,
ফিরে গেলে কারেও না দেখি॥
    দ্বারে এসে গেলে ভুলে পরশনে দ্বার যেত খুলে—
    মোর ভাগ্যতরী এটুকু বাধায় গেল ঠেকি॥
ঝড়ের রাতে ছিনু প্রহর গণি'
হায়, শুনি নাই, শুনি নাই রথের ধ্বনি তব রথের ধ্বনি।
গুরুগুরু গরজনে কাঁপি বক্ষ ধরিয়াছিনু চাপি,
আকাশে বিদ্যুৎ-বহ্নি অভিশাপ গেল লেখি॥

এই গানের সঙ্গে বরঞ্চ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা আছে 'কল্পনা'র "ভ্রষ্ট লগ্ন" কবিতার। অধীর প্রেমিক যাকে পৃথিবীময় খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে কাছে পেয়েও চিনতে পারলো না, তাকেই জিজ্ঞাসা করলো, "সে কোথায়, সে কোথায় ?" এই না-চেনার লজ্জায় প্রতীক্ষমানা প্রেয়সীর হৃদয়ে যে-কথা তোলপাড় করছিলো সে-কথা কিছুতেই মুখে এলো না— "শ্রান্ত পথিক, সে যে আমি, সেই আমি।" চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে ব্যবধান অনেক, তার বেদনা রবীন্দ্রনাথ অনেক গানে ও কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু ব্যবধান যখন প্রায় কিছুই নেই, ব্যাকুল পথিক যখন পৌঁছেছে তার গন্তব্যে, প্রেমিক যখন প্রিয়ার দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন শেষ মুহূর্তে সামান্যতম বাধাটা কেন যে পর্বতপ্রমাণ হ'য়ে ওঠে ("মোর ভাগ্যতরী এটুকু বাধায় গেল ঠেকি") কিছুই বোঝা যায় না। উমর খৈয়াম একটি রুবাই-তে বলেছেন—"মদের পাত্র যখন ঠোঁটের কাছে তুলে ধরেছি ঠিক সেই মুহূর্তে পাত্রটি কেড়ে নিয়ে মাটিতে ফেলে চুরমার ক'রে দিলে। হে ঈশ্বর, বলতে নেই, তুমিও কিন্তু আমারই মতন মাতাল।" 'রোগশয্যায়'-এর ৫ সংখ্যক কবিতায় রবীন্দ্রনাথও "বিধাতার প্রচণ্ড মত্ততা"র কথা বলবেন—যে-মত্ততা যোগ দিয়েছে "বিশ্বের ভৈরবীচক্রে"। কিন্তু কেন ? বঞ্চিত মানুষের যন্ত্রণাকে আরো তীব্র, আরো অসহনীয় ক'রে তুলবার জন্যই কি দেবতাদের মধ্যে চক্রান্ত চলছে আকাশে-আকাশে, বিদ্যুৎলেখায় কি সেই নির্মম চক্রান্তের কথা নির্ঘোষিত ?

মানুষের সাধনার পথে দ্যাবাপৃথিবীর কখনো উদাসীন কখনো সক্রিয় প্রতিকূলতার ইঙ্গিত আরো ট্র্যাজিক আয়তন লাভ করেছে যে-গানে তারই আলোচনাতে দুঃখের গানের প্রসঙ্গটা শেষ করবো। এই গানটিও রবীন্দ্রনাথের দুঃখকে ভাববর্ণালির সেই প্রান্তরেখায় নিয়ে যায়, যার অভিব্যক্তি আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছি "যায় দিন, শ্রাবণদিন যায়" এবং "পথের শেষ কোথায়"-তে।

ঝরঝর বরিষে বারিধারা।
হায় পথবাসী, হায় গতিহীন, হায় গৃহহারা॥
ফিরে বায়ু হাহাস্বরে,
ডাকে কারে জনহীন অসীম প্রান্তরে—
রজনী আঁধারা॥
অধীরা যমুনা তরঙ্গ-আকুলা অকূলা রে,
তিমির-দুকূলা রে।
নিবিড় নীরদ গগনে
গরগর গরজে সঘনে
চঞ্চলচপলা চমকে, নাহি শশীতারা॥

ঝরঝর বৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি গানের পটভূমিকা রচনা করে। প্রায় সবক'টিতে দেখা যায় গানগুলি মধুররসের, বিষাদের ছায়া পড়লেও সে-ছায়া অঘন এবং ঈষৎ রঙিন—"আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদরদিনে", "আজ আকাশের মনের কথা ঝরো ঝরো বাজে", "বাদল-বাউল বাজায় রে একতারা— / সারা বেলা ধ'রে ঝরো ঝরো ঝরো ধারা", ইত্যাদি। আলোচ্য গানে কিন্তু "ঝরঝর বারিধারা"র ভূমিকা সম্পূর্ণ বিপরীত। নিশ্চয়ই কোনো কঠিন দুর্মদ সাধনা গীতরচয়িতাকে কিংবা গীতির নায়ককে ঘরে থাকতে দেয়নি, পথে টেনে এনেছে; ঘরে ফেরা আর নয়, 'পথবাসী' শব্দটা জানিয়ে দেয় যে তার বাকি জীবন পথে-পথেই কাটবে। পথ মানেই তো চলার পথ, চলতেই হবে তাকে, পথ যত দুর্গম হোক্, গন্তব্য যত দূরে থাক্। এমন পথসর্বস্ব মানুষের গতিশক্তি যদি হারিয়ে যায় তবে তার চেয়ে দুর্ভাগা আর কে? প্রথম পংক্তিটি পূর্ব অভ্যাসমতো মধুররসের খানিকটা প্রত্যাশা জাগায় আমাদের মনে, তাই দ্বিতীয় পংক্তিতে অকস্মাৎ ট্র্যাজিক সুর শুনে আমরা একটু চম্‌কে উঠি। ক্রমশ বুঝতে পারি মুষলধার বৃষ্টির সঙ্গে যোগ দিয়েছে উন্মত্ত বাতাস, উত্তাল নদী, বজ্রের গরগর হুংকার এবং পূর্ববর্তী গানের বিদ্যুৎবহ্নি। পঞ্চভূতের শক্তি-মদমত্ত দেবতারা কি একজোট হ'য়ে কোনো হতভাগাকে ঘরছাড়া ক'রে তার গতিশক্তি

কেড়ে নিয়েছেন ? মনে হয় বিশেষ কোনো বা কতিপয় মানুষের ভাগ্য নয়, সকল মানুষের এই নিদারুণ পরিস্থিতির কথা ভেবেই কবি ব্যাকুল হয়েছেন।

প্রথম দুটি পংক্তির অনভ্যস্ত বিন্যাস শ্রোতার মনকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। কিন্তু এর পর থেকে একটু যেন শক্তিমান্দ্য ঘটেছে গানের ভাষায়। বিশেষত "অধীরা যমুনা তরঙ্গ-আকুলা অকুলা রে, তিমির-দুকূলা রে"—এই পংক্তিটির লঘু চাল সমস্ত গানের গভীর গম্ভীর ব্যঞ্জনার সহযোগী নয়; অন্য কয়েকটি শব্দ এবং বাক্যাংশও দুর্বল। আমার এই ধারণা সমর্থন লাভ করে ইংরেজি অনুবাদের সঙ্গে তুলনা করলে। "ফিরে বায়ু হাহাস্বরে / ডাকে কারে জনহীন অসীম প্রান্তরে"র ব্যঞ্জনাশক্তি কম নয়, তবু সে-ব্যঞ্জনায় ক্ষীণ আশা অবশিষ্ট রয়েছে—হয়তো একদিন ডাক শুনবে সে আজ যে আছে দর্শন-শ্রবণাতীত। কিন্তু "The shrieks of the wind die away in sobs and sighs"-এর ঘন নৈরাশ্যে মৃত্যুশোকের ছায়া দেখা যায়। কে মারা গেলো যার জন্য পৃথিবীময় এমন হাহাকার—কোনো মহাপুরুষ, নাকি কোনো মহৎ আদর্শ? "রজনী আঁধারা"র অনুবাদ করেছেন: "The night is hopeless like the eyes of the blind." অসাধারণ লক্ষ্যবেধী এই উপমা। যত ঘুটঘুটে অন্ধকারই কল্পনা করি না কেন, তা চক্ষুষ্মানের অভিজ্ঞতা-পরিধির কাছাকাছিই থাকবে। জন্মান্ধের চোখের অন্ধকার তার চেয়ে অনেক গুণে ভয়ংকর, এবং কোনোদিন সে-অন্ধকার ঘুচবে বা কমবে, তার ক্ষীণতম সম্ভাবনা নেই। গানের শেষ বাক্যটি "নাহি শশীতারা" খুব বেশি কিছু বলে না; বর্ষার ঘন মেঘ আকাশের সব আলো ঢেকে দিয়েছে—এর চেয়ে পরিব্যাপ্ত অর্থ অনেকের মনে না-ও জাগতে পারে। কিন্তু "The lights of the stars are dead" পংক্তিটির মধ্যে জাগতিক প্রলয়ের ইংগিত রয়েছে।

অনুবাদ কবিকৃত, তাই স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে—ইংরেজি অনুবাদটি

মূল বাংলার চেয়ে জোরদার হ'লো কেমন ক'রে ? এটা তো সন্দেহাতীত যে বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথের প্রকাশশক্তি একেবার ঐন্দ্রজালিক। এমন অতুলনীয় অপ্রতিদ্বন্দ্বিত ক্ষমতার অধিপতিকে কবিসম্রাট বলা যায় বৈ-কি। পক্ষান্তরে, ইংরেজি ভাষার উপর রবীন্দ্রনাথের দখল সামান্যই ছিলো, প্রতিভাবান কবি ব'লে সেই স্বল্লায়ত্ত ভাষাতেও তিনি বেশ কয়েকটি রসোত্তীর্ণ অনুবাদ-কবিতা লিখে গেছেন। কিন্তু প্রকাশ-শক্তিতে ইংরেজি অনুবাদ মূল বাংলাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে—এই আশ্চর্য কৃতিত্বের দৃষ্টান্ত আরো দুটো-চারটে খুঁজে বার করা যায়। সমস্যাটি ছোটো হ'লেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কৌতূহল জাগায়।

আসলে আলোচ্য গান ও তার অনুবাদে তফাৎ এই নয় যে একই ভাবের প্রকাশ ইংরেজিতে জোরালো হয়েছে এবং বাংলায় মৃদু ; তফাৎ ভাব এবং তার অনুভূতিমণ্ডলেই। বাংলা গানের ভাষায় রবীন্দ্রনাথ যে-ভাবাবেগটি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সম্পূর্ণ প্রকাশ করে-ননি তা খুবসম্ভব তাঁর মনের আনাচে-কানাচে আত্মগোপন করেছিলো এতদিন ; অনুবাদ করবার সময়ে চৈতন্যের তলা থেকে ভেসে-উঠে-আসা আশ্চর্য নয়। সেই ঈষৎ অনভ্যস্ত ভাবের তীব্রতাকে তিনি ইংরেজির গদ্যছন্দে যথাযথ রূপ দিতে পেরেছেন। কিন্তু বাংলায় ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে গান হ'য়ে। সুরের খাতিরে ভাবকে খানিকটা করুণ-কোমল ক'রে নিতে হয়েছে, তার আগ্নেয় প্রচণ্ডতা খানিকটা উপশমিত করতে হয়েছে। 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে আমি দেখিয়েছিলাম 'সানাই'-এর "ব্যথিতা" কবিতাখানি গানে রূপান্তরিত হবার পথে তার রুদ্রতা হারিয়েছিলো ; "ক্রুর বিধাতা", "ইতর বঞ্চনা" জাতীয় শব্দগুলি গানে বর্জিত। প্রথম যৌবনে লেখা "তবু মনে রেখো" কবিতাটিরও গীতিরূপ ভাষার দিক থেকে অপেক্ষাকৃত গতানুগতিক। বলতে পারেন, সুরের, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের সুরের, চাহিদা এবং তাগিদ এই মৃদুভাষিতা।

আমার মনে কিন্তু সন্দেহ থেকে যায় যে কবি রবীন্দ্রনাথ এবং গীতি-রচয়িতা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিস্বরূপ, বিশেষত অনুভূতির স্বরূপ, খাপে-খাপে মেলে না। অনেকটা মেলে অবশ্য এবং অনিবার্যতই (দুই রবীন্দ্রনাথ যখন মোটামুটি একই ব্যক্তি), তবু লক্ষ্য করবার মতো গরমিল পাওয়া যায় সমগ্রভাবে তাঁর গানের সঙ্গে কবিতার তুলনা করলে। রবীন্দ্রনাথ যখন ছবি আঁকতে শুরু করেন তখন তাঁর বয়স সত্তর পার হয়েছে। ঐ-সময়কার কবিতায় তিনি রৌদ্রী রাগিণীতে দীক্ষা নিয়েছিলেন, তবে সহজ হয়নি সে-দীক্ষা; তপস্যা করতে হয়েছিলো এই নতুন রাগিণী আয়ত্ত করবার জন্য, এবং তপস্যা সত্ত্বেও সে-রাগিণী খুব বেশি শোনা যায় না তাঁর কণ্ঠে। শরৎকালের মাঠে যেমন আলো-ছায়ার খেলা, তেমনি রুদ্র-মধুরের পালা-বদল দেখি রবীন্দ্রনাথের শেষ দশকের কাব্যে। চিত্রে দেখা যায় রুদ্রের প্রকাশ আরো বলিষ্ঠ, এবং অক্লেশে বেরিয়ে আসছে তাঁর তুলির মুখে; মনে হয় চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ স্বভাবগুণেই রুদ্রের মন্ত্রশিষ্য।

আরো একটু সাহস সঞ্চয় ক'রে বলতে চাই যে আমার মতে সঙ্গীতকার রবীন্দ্রনাথ, কবি রবীন্দ্রনাথ, নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ, কথা-সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ, চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ, প্রবন্ধলেখক ও ভাষণকার রবীন্দ্রনাথের ভাবনা-বেদনা ঠিক একই ছাঁচে ঢালাই করা নয়। এইসব ভিন্ন-ভিন্ন মাধ্যমের ভিতর দিয়ে ন্যূনাধিক ভিন্ন-ভিন্ন রবীন্দ্রনাথকে আমরা পাই; তাঁদের মধ্যে আত্মীয়তা আছে, কিন্তু তাদাত্ম্য (identity) নেই। শিল্পী বেছে নেন প্রকাশের মাধ্যম, আবার মাধ্যমের স্বধর্মও কতকটা নির্দ্ধারিত করে প্রকাশোন্মুখ ব্যক্তিত্বের স্বরূপ। বাছাই-ঢালাই-পেটাই দু-দিক থেকে চলে। হয়তো অনেক রবীন্দ্র-প্রেমিকই আমার এ-মতে সায় দেবেন। তবে দুঃখের বিষয় যে শিল্পমাধ্যম-ভেদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতো বহু-শিল্পদক্ষ ব্যক্তির ব্যক্তিস্বরূপ-ভেদের যথাযোগ্য আলোচনা হয়নি এ-পর্যন্ত। কে এত বড়ো কাজের

দায়িত্ব নিতে পারেন জানি না। সঙ্গীত সাহিত্য ও চিত্র—তিনটি শিল্পে তাঁর অল্পবিস্তর শিক্ষা, সমঝদারিতা ও সংবেদনশীলতা থাকা চাই। *

* নাস্তিগহ্বরের মুখোমুখি দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতা (encounter with nothingness) রবীন্দ্রনাথের হয়েছিলো বলাতে কোনো-এক শ্রদ্ধেয় লেখক বিস্মিত হয়েছেন, প্রতিবাদ করেছেন। অথচ এই অভিজ্ঞতার dramatized রূপ এমন সুন্দর সরল ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ 'বীথিকা'র "দুর্ভাগিনী" কবিতাটিতে যে সেখানে ভুল বুঝবার কোনো অবকাশই নেই :

সব সান্ত্বনার শেষে সব পথ একেবারে
মিলেছে শূন্যের অন্ধকারে ;
… … …
সর্বশূন্যতার ধারে
জীবনের পোড়ো ঘরে অবরুদ্ধ দ্বারে
দাও নাড়া
ভিতরে কে দিবে সাড়া।
মূর্ছাতুর আঁধারের উঠিছে নিশ্বাস,
ভাঙা বিশ্বে পড়ে আছে ভেঙে-পড়া বিপুল বিশ্বাস।

'রোগশয্যায়'-এর ৭ এবং ৩৯ সংখ্যক কবিতায় দেখি এই নিদারুণ উপলব্ধির লিরিক আভাস। শেষ পর্বের আরো বেশ কয়েকটি কবিতায় তার কথা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে বলা আছে ; এবং মধ্য পর্বে 'কল্পনা'র প্রথম কবিতায়, 'উৎসর্গ'-এর ৩১ সংখ্যক কবিতায় ("আজিকে গহন কালিমা লেগেছে গগনে")। গদ্যের ভাষা আরো স্পষ্ট স্বভাবতই। চব্বিশ বছর বয়সে যে-মৃত্যুশোকের বর্ণনা দিয়েছেন 'জীবনস্মৃতি'তে তা ভুলতে পারে না কোনো রবীন্দ্র-প্রেমিক। দীর্ঘ বর্ণনার এক জায়গায় পড়ি : "মৃত্যু যখন মনের চারিদিকে হঠাৎ একটা 'নাই'-অন্ধকারের বেড়া গাড়িয়া দিল, তখন সমস্ত মনপ্রাণ অহোরাত্র দুঃসাধ্য চেষ্টায় তাহারই ভিতর দিয়া কেবলই 'আছে'-আলোকের মধ্যে বাহির হইতে চাহিল। কিন্তু, সেই অন্ধকারকে অতিক্রম করিবার পথ অন্ধকারের মধ্যে যখন দেখা যায় না তখন তাহার মতো দুঃখ আর কী আছে।" এ প্রচণ্ড সাক্ষাৎকার তত্ত্বকথা নয়, অভিজ্ঞতার ব্যাপার। বলা বাহুল্য, এই " 'নাই'-অন্ধকারে"র উপলব্ধি রবীন্দ্রসাহিত্যের শেষ কথা নয়, একমাত্র কথা তো নয়-ই। পার আছে তার, কিন্তু ও-পারে পৌঁছবার জন্য এই গহ্বর পার হ'তে হয়েছে রবীন্দ্রনাথকে একাধিক বার।

পদ্মের মাঝখানে বজ্র

এক

'অরূপরতন'-এর ছোটো একটি ভূমিকা লিখে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন : "এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।" হয়েছে কিনা সে-বিষয়ে মত-ভেদের অবকাশ তবু থেকে যায়। কোনো দুষ্পাঠ্য লিপির পাঠোদ্ধারে যদি মতভেদ ঘটে তবে লিপিকার ঘটনাক্রমে সেখানে এসে পড়লে আর সমস্যা থাকে না। কী লেখা আছে সে-বিষয়ে তাঁর কথাই শেষ কথা। কিন্তু দুষ্পাঠ্য হস্তলিপির সঙ্গে দুরধিগম্য শিল্পকর্ম তুলনীয় নয়। নাট্যরচনা যখন সমাপ্ত তখন নাট্যকারও তার একজন পাঠক বা দর্শক মাত্র। নিঃসন্দেহে সহৃদয় পাঠক, কিন্তু সেই পর্যন্ত। অথবা সে-পর্যন্তও নয়। স্বরচিত নাটকের ব্যাখ্যায় স্বয়ং রচয়িতার ভুল করবার সম্ভাবনা অন্য সহৃদয় পাঠকের চেয়ে একটু যেন বেশিই। "যদিও নিজের রচনা সম্বন্ধে লেখকের মনে অনেক সময় অসন্দিগ্ধ মত থাকে তথাপি তাহা যে ভ্রান্ত হইতে পারে ইতিহাসে এমন অনেক প্রমাণ আছে"—রবীন্দ্র-নাথ বলেছেন 'পঞ্চভূত'-এ। ইতিহাস না-ঘেঁটেও সে-কথা বলা যায়। রচনার পূর্বে নাট্যকারের মনে নিশ্চয়ই অস্পষ্ট একটা ভাব প্রকাশের পথ খুঁজছিলো ভাষার প্রণালী বেয়ে—উপাখ্যান, চরিত্র ও সংলাপের মাধ্যমে। কিন্তু মাধ্যমমাত্রেরই স্বভাবে বেশ-কিছু দুর্বিনয় ও দুর্নম্যতা আছে। শিল্পী চেষ্টা করেন তাকে বশে আনতে কিন্তু সম্পূর্ণ পেরে ওঠেন না; "Between the conception and the reality / Falls the shadow"। এই কালো ছায়াটির অস্তিত্ব শিল্পীর আত্মবিশ্বাসের পক্ষে হানিকর ব'লে তাঁর চোখে প'ড়েও পড়ে না। ফলে স্বরচিত নাটকের ব্যাখ্যাকালে কলমের দুই পারের সত্যের মধ্যে গোলযোগ

বেধে যাওয়ার সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। অথচ পাঠক হিসাবে আমাদের বিচার্য এ-পারের সত্যই। সেটাই নাটক। ও-পারের সত্য (নাট্যরচনার পূর্ববর্তী প্রকাশব্যাকুল ভাবপুঞ্জ) জীবনীকারের এলাকায় পড়ে; সমালোচকের কাছে তার গুরুত্ব খুবই পরিমিত।

কিন্তু এত কথায় কাজ কী। ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন, 'অরূপরতন'-এ "তাহাই বর্ণিত হইয়াছে" মেনে নিলেও আমরা মানতে বাধ্য নই যে 'রাজা'তেও তা-ই বর্ণিত হয়েছে। এ-কথা বলতে হচ্ছে এই কারণে যে একাধিক প্রখ্যাত সমালোচক 'অরূপরতন'-এর ভূমিকাকে 'রাজা' নাটকের মর্মোদ্ঘাটনের চাবিকাঠিরূপে ব্যবহার করেছেন। কৈফিয়ৎ অবশ্য আছে। উক্ত ভূমিকার শেষে রবীন্দ্রনাথ যোগ করেছেন: "এ নাট্য-রূপকটি 'রাজা' নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—নূতন করিয়া পুনর্লিখিত।" নয় বছর পরে পুরানো নাটককে নতুন ক'রে এবং সংক্ষিপ্ত আকারে লিখতে গেলে বেশ একটা নতুন নাটক লেখা হ'য়ে যেতে পারে প্রায় অজ্ঞাতসারেই—এ-সম্ভাবনাটি রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনে স্পষ্ট ছিলো না। অথচ হয়েছে তা-ই।

সুদর্শনা যে দুই নাটকের শুধু নায়িকা তাই নয়, বলতে গেলে একমাত্র চরিত্র। অন্য-সব চরিত্র তুলনায় ঝাপসা, পার্শ্বচরিত্র বললেও হয়। কিন্তু দুই নাটকের সুদর্শনা নামে এক হ'লেও চরিত্রে এক নয়। 'অরূপরতন'-এর সুদর্শনা সম্বন্ধে রাজার উক্তি—"আমার নাম নিয়ে সে সকলের চেয়ে বড়ো হবে, এই অহঙ্কারে সে আমাকে চায়"—'রাজা'র সুদর্শনা সম্বন্ধে আদৌ সত্য নয়, সম্ভবই নয়। প্রথম নাটকের প্রথম দৃশ্যে সুদর্শনা রানী হ'তে অভিলাষী; দ্বিতীয় নাটকের শুরুতেই সুদর্শনা রানী। সে রাজ-সম্মান পেয়েছে, এখন সে চায় তার চেয়ে অনেক বড়ো কিছু। বাসরঘরের অন্ধকারে যাকে চিনেছে, বাইরের আলোতে তাকে আরো সম্যক্‌রূপে চিনতে চায় সে। এই চেনার দ্বারা সে নিজেকেও চিনবে অবশ্য, কিন্তু তার দ্বারা সে নিজেকে চেনাবে, রাজ্যের সকল

লোকের চোখে সে রাজমহিষীর গৌরবে বিভূষিত হবে—এমন কামনা তার মুখে প্রকাশ পায়নি, অন্তরেও স্থান পায়নি। "ধনের বাটে মানের বাটে" 'অরূপরতন'-এর সুদর্শনার চোখ ছুটে চলেছিলো, 'রাজা'র সুদর্শনার নয়। রূপের নেশা অবশ্য লেগেছিলো তার চোখে, কিন্তু তার চেয়ে ইতর কোনো নেশা নয়। তুলনায় অনেকটা উঁচু দরের মানুষ সে, অনেকখানি গভীর ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন তার ব্যক্তিত্ব।

চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো—
ধনের বাটে মানের বাটে রূপের হাটে
দলে দলে গো।
দেখবে বলে করেছে পণ,
দেখবে কারে জানে না মন,
প্রেমের দেখা দেখে যখন
চোখ ভেসে যায় চোখের জলে গো॥

'অরূপরতন'-এর এই প্রস্তাবনা-গীতিটি 'রাজা' নাটকে দেওয়া হয়নি, দেওয়া সম্ভব ছিলো না। দ্বিতীয় নাটকের সুদর্শনা প্রথম দৃশ্য থেকে প্রেমের দেখাই দেখেছে। যাকে ভালবাসে তাকে চোখে দেখতে চাওয়াতে দোষ নেই, তাতে প্রেমের অভাব সূচিত হয় না। 'গীতাঞ্জলি' পর্বের প্রেম-ভক্তিরসে ভরা যে-গানগুলি আমাদের এত প্রিয় তার মধ্যেও এই দেখা পাওয়ার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে—"তুমি যদি না দেখা দাও / করো আমায় হেলা", "প্রভু তোমা লাগি আঁখি জাগে / দেখা নাই পাই, ব্যথা পাই," ইত্যাদি। এখানে অবশ্য বলা হবে যে 'গীতাঞ্জলি'র গানে 'দেখা' বা 'আঁখি' আলংকারিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, আক্ষরিক অর্থে নয়। রবীন্দ্রনাথ চাইছেন তাঁর হৃদয়স্বামীর প্রেম আরো সুস্পষ্টরূপে অনুভব করতে—অন্তরে ও বাইরে, অন্ধকার কক্ষে ও জগতের মাঝখানে। সুদর্শনাও তা-ই চেয়েছিলো।

"আলো, আলো কই! এ ঘরে কি একদিনও আলো জ্বলবে না" মানবাত্মার চিরন্তন আর্ত প্রশ্ন ও প্রার্থনায় নাটকের শুরু—বললে

ভালো শোনায় কিন্তু একটু ভুল ধারণার সৃষ্টি করে। লক্ষণীয় যে অন্ধকার ঘরের অন্ধকার খুব ঘন নয়, দুর্ভেদ্য নয়। সেই অন্ধকার ভেদ ক'রে রাজার বীণার ধ্বনি শুনতে পায় সুদর্শনা, ঘরে প্রবেশ করলে তাঁর উত্তরীয়ের সুগন্ধ আঘ্রাণ করে, তাঁর প্রেমালাপ শ্রবণে বঞ্চিত হয় না, প্রতি রাত্রে "সেই দীপ-নেবানো বাসরঘরে" দাম্পত্যমিলন যে সুনিবিড় নয় এমন কোনো ইঙ্গিত নেই নাটকে। সুদর্শনা প্রেমিকা, প্রেমে তার ভেজাল নেই। কিন্তু একটা অভাব ছিলো, এবং সেই অভাবমোচনের ইতিবৃত্তই 'রাজা' নাটকে বর্ণিত হয়েছে।

সুদর্শনা অন্ধকার ঘরে মিলন-সুখের মধ্যে রাজার একটি বিশেষ রূপমাত্র চিনেছিলো। তারই উপর নির্ভর ক'রে সে কল্পনা ক'রে নিয়েছিলো যে রাজা সত্যিই ও সর্বতই তা-ই, জগতের আলোতেও তিনি অবিমিশ্র মধুর, অতুলনীয় সুন্দর। তার আসল কামনা ঘরে প্রদীপ জ্বেলে রাজাকে চোখে দেখা নয়, বাইরের আলোয়, প্রকৃতি ও মানুষের মাঝখানে তাঁকে দেখতে পাওয়া। এখানে মনে রাখা ভালো যে রবীন্দ্রনাথের কিংবা সুদর্শনার রাজা রূপাতীত, বিশ্বাতিগ, নিরুপাধিক, নিষ্প্রপঞ্চক সত্তা নন। অন্তরের হাজারো ভাবনায় বেদনায় ও বাইরের হাজারো রূপের মধ্যে অরূপের প্রকাশ যদি তিনি না-দেখতেন, তবে রবীন্দ্রনাথ হতেন সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের কবি, হয়তো-বা মালার্মের মতো শূন্যবাদী কবিদের সমজাতীয়।

এই সূক্ষ্মতর নাটকের নায়িকা রূপের গর্ব, ধনের গর্ব, মানের গর্ব নিয়ে গর্বিনী নয়। কিন্তু অন্য-এক অহঙ্কার তার মনে ছিলো। যদিও সে রাজাকে কেবল দীপ-নেবানো ঘরের মধ্যেই পেয়েছে, তবু সে রাজাকে চেনে, যেখানেই দেখা হোক্ সে চিনে নেবে তাঁকে। অন্তত তার দাসী সুরঙ্গমার চেয়ে সে রাজাকে ভালো চেনে। আর-একটি অহঙ্কার : সে যেমন রাজাকে ভালোবাসে, রাজাও তেমনি তাকে ভালোবাসেন। যদিও রাজা এক সময়ে তাকে বলেছেন—"রূপে তোমায় ভোলাব না,

ভালোবাসায় ভোলাব", কিন্তু বড়ো বিচিত্র তাঁর ভালোবাসার ধরন। সাধারণ মানুষের কোমল ব্যাকুল ভালোবাসার সঙ্গে ঐ পাথুরে ভালো-বাসার কোনো তুলনাই হয় না। সেই কথাটা বুঝতে সুদর্শনার এই জন্মে জন্মান্তর ঘ'টে গেলো। "আমার রাজা নিষ্ঠুর, কঠিন, তাকে কি কেউ কোনোদিন টলাতে পারে"—এ-কথা সুরঙ্গমা আগাগোড়া জানে, কিন্তু নাটকের প্রায় শেষ অবধি সুদর্শনা বিশ্বাস করতো যে সে রাজাকে টলাতে পারবেই পারবে। "ভারি কঠিন তোমার রাজা, কিছুতেই টলেন না! দেখি, কেমন না টলেন।" মাথা খুঁড়ে হিমালয় পর্বতকে হয়তো টলাতে পারতো সুদর্শনা, কিন্তু রাজা যে আরো কঠিন।

সুরঙ্গমা তার রানীকে বোঝাতে চেয়েছে যে লোকে যাকে সুন্দর বলে রাজা তা নন, বরং তিনি ভয়ংকর দেখতে, এবং "কী নিষ্ঠুর, কী নিষ্ঠুর, কী অবিচলিত নিষ্ঠুরতা!" কিন্তু সুদর্শনা এ-সব কথা হেঁয়ালী ব'লে উড়িয়ে দিয়েছে। সে নিশ্চয়ই রাজাকে আরো ভালো চেনে, কারণ সে যে রাজার প্রণয়িনী, পরিচারিকামাত্র নয়। বুঝতে পারে না যে প্রণয়িনী ব'লেই সে রাজার একটিমাত্র দিক চিনেছে। তাঁর পূর্ণ সত্তায় যে ভয়ংকর-নিষ্ঠুর দিক রয়েছে তা তিনি দাসীর কাছে উদ্ঘাটিত করেছেন, কিন্তু প্রেয়সীর কাছে করেননি। সুদর্শনা জন্মেছিলো রাজ-কন্যা হ'য়ে, এখন সে রানী, নিরঙ্কুশ সুখে সে আজীবন অভ্যস্ত ; তার সহনশক্তি কম থাকারই কথা। রাজার সেটা অজানা নেই।

রাজকুমার সিদ্ধার্থ যেমন তাঁর সুরক্ষিত সুরম্য প্রমোদভবন থেকে বেরিয়ে নগর পথে ব্যাধি-শোক-জরা-মৃত্যুর ভয়ংকর চিত্র দেখে অভি-ভূত হ'য়ে পড়েছিলেন, সুদর্শনাও তেমনি অভিভূত হ'য়ে যাবে যদি সে রাজাকে জগতের আলোয় দেখে। রাজা তাকে বলেছেন,—"সহ্য করতে পারবে না—কষ্ট হবে।" সুদর্শনা অনভিজ্ঞ সরল মনে উত্তর দিয়েছে—"সহ্য হবে না, তুমি বলো কী। তুমি যে কত সুন্দর, কত আশ্চর্য, তা এই অন্ধকারেই বুঝতে পারি, আর আলোতে বুঝতে পারব

না?" রাজার পরিকল্পনা, তিনি ধীরে-ধীরে পর্যায়ক্রমে তাঁর সমগ্র ভীমকান্ত রূপটা সুদর্শনার চোখে উন্মুক্ত করবেন, পাছে তাঁকে হঠাৎ দিনের আলোয় দেখে ঐ রাজসুখলালিতা স্বপ্নবিলাসিনীর মনে এমন প্রচণ্ড আঘাত লাগে যা তার সহ্যশক্তির বাইরে। "সেই দুঃখ থেকে বাঁচিয়ে ক্রমে ক্রমে তোমার কাছে পরিচয় দিতে চেয়েছিলুম।" শক্ হয়তো কিছুটা এড়ানো যেতো, কিন্তু দুঃখ তো সুদর্শনাকে পেতেই হবে। ললিতমধুর কল্পনার জগতে যে নিজেকে এতদিন ভুলিয়ে রেখেছে তাকে বাস্তব কঠিন নিষ্ঠুর পৃথিবীতে টেনে নিয়ে আসতে হ'লে দুঃসহ দুঃখের পথ ছাড়া তো অন্য কোনো পথ নেই। এক ছুটে পার হ'য়ে গেলে সে কম দুঃখ পাবে, নাকি ধীর পদক্ষেপে মন্থর গতিতে রোজ একটু-একটু ক'রে হাঁটলে—সে সূক্ষ্ম বিচারে খুব কি আসে যায়? আসল কথাটা হচ্ছে বাসরঘরের সুখশয্যা ছেড়ে তাকে লোকালয়ে পৌঁছতে হবে—রাজার রূপ যেখানে বজ্রকঠিন, অবিচলিত নিষ্ঠুর।

রাজানুগ্রহ থেকে কেউ বঞ্চিত নয়, কিন্তু রাজনিগ্রহ থেকেও কারো রক্ষা নেই সেখানে। এ-নিগ্রহ কি সব সময়ে নিগৃহীতের মঙ্গলার্থে? রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতায় প্রবন্ধে অনেকবার সে-কথা বলেছেন, কিন্তু এই নাটকে তিনি রুদ্রের নিরাবরণ বাম মুখটাও দেখতে এবং দেখাতে চেয়েছেন মনে হয়। সুরঙ্গমার প্রতি রাজা নিষ্ঠুর হয়েছিলেন তাকে নষ্ট হ'য়ে যাওয়ার পথ থেকে ফেরাবার জন্য। কিন্তু ঠাকুরদা তো নষ্ট হ'তে যাচ্ছিলেন না; একে-একে তাঁর পাঁচটি ছেলে কেড়ে নেওয়া তবে কেন? "ওই আমাদের ভদ্রসেন, রাজা বলতে সে একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে, কিন্তু তার ঘরের এমন দশা যে চামচিকেগুলোরও থাকার কষ্ট হয়।" কিসের জন্য? তার কোনো উত্তর নেই। কী হেতু, হয়তো বলা যায়; কী উদ্দেশ্যে, বলা যায় না। ধর্মোপদেষ্টারা কিছু বলতে চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু বলবার সময়ে কর্মবাদ পরকালবাদ জাতীয় আপ্তবাক্যের আশ্রয় খোঁজেন। ঠাকুরদা অবশ্য অত অবাস্তব কথা বলেন না।

জিজ্ঞাসা করেন—"বন্ধুকে কি কেউ পুরস্কার দেয় ?" না, পুরস্কার দেয় না, কিন্তু বন্ধুত্বের বদলে বন্ধুত্ব তো দেয়। বন্ধুর সব-ক'টি ছেলে কেড়ে নেওয়াকে কি তার প্রতি বন্ধুত্বের অব্যর্থ প্রকাশ ভাবা যায় ? রাজাকে ঠাকুরদা তাঁর অকুণ্ঠ অবিচলিত বন্ধুত্ব দান করেছেন। প্রতিদানে রাজা সম্পূর্ণ উদাসীন। প্রাকৃতিক নিয়মের লৌহশৃঙ্খল-পরম্পরায় যা ঘটে—যত ভয়ংকর হোক্ সে-ঘটনা এবং যত বড়ো ভক্তের উপর তার আঘাতটা পড়ুক—তাতে হস্তক্ষেপ করা রাজার স্বভাব নয়। স্পিনোজার মতো মহান দার্শনিক, কীট্স্-এর মতো প্রতিভাবান কবি ক্ষয়রোগে ভুগে-ভুগে অকালে প্রাণত্যাগ করেন; জীবনানন্দ দাশের পাঁজরের হাড় গুঁড়িয়ে যায় ট্রামের ধাক্কা লেগে; শ্রীরামকৃষ্ণের মতো দেবতুল্য মানুষও কর্কট রোগের যন্ত্রণা থেকে রেহাই পান না। মানুষের দেহের মধ্যেই ব্যাক্টিরিয়ার উত্তম খাদ্য; প্রচণ্ড ভূমিকম্পে লোকালয়ও ধ্বংস হয়, হাজার হাজার মানুষের ধনপ্রাণের ক্ষয়ক্ষতি যা ঘটে তাকে "তুচ্ছ হ'তে তুচ্ছ" ভাবা যায় না; এবং সবই বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম মতোই ঘটে। বিশ্বদেবতার নিয়ম যদি ভিন্নতর-কিছু হয় তবে তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। ধর্মশাস্ত্র মেনে অবশ্য আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে এই অশ্রুধারার স্রোতের মধ্য দিয়ে কোনো নিগূঢ় মহান ঐশী অভিপ্রায় সাধিত হচ্ছে। কিন্তু তাতে ক'রে বুদ্ধিতে বিশ্বাসে আধা-আধি হ'য়ে আমাদের ব্যক্তিসত্তা দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে যায়। ত্রিভুবনেশ্বর কি আপন নিয়মের জালে আপনি বাঁধা পড়েছেন। তাই তো দেখতে পাচ্ছি।

ধর্মোপদেষ্টারূপে নয়, কবিরূপে একটি উত্তর দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। সে-উত্তর নাটকের প্রাণকেন্দ্রে যে-গানটি রয়েছে তার মধ্যে সংহত। সুখ-দুঃখ, ভালোমন্দ, জন্ম-মৃত্যুর বর্ণযোজনা এক মহান আশ্চর্য সুষমাযুক্ত চিত্র রচনা করেছে ঠাকুরদা ও তাঁর স্রষ্টার নান্দনিক দৃষ্টির সম্মুখে। যুগযুগান্তের পটভূমিকায় সেই জাগতিক চিত্র দেখে তাঁরা আনন্দিত; আনন্দিত না-ব'লে বলা উচিত সুখ-দুঃখোত্তীর্ণ প্রশান্তিতে আত্মস্থ।

হাসিকান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালোমন্দ তালে তালে,
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে,
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।

ধর্মোপদেষ্টা ভালোকেই সত্য মনে করেন, মন্দকে দৃষ্টিবিভ্রম ; অথবা মন্দ ভালোর উপায়মাত্র, সুতরাং ভালোই। চোখের ছানি কাটলে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, দিন দশেক চোখের উপর ব্যাণ্ডেজ বেঁধে শুয়ে থাকতে কষ্ট হয়। তবু সেটাকে কেউ ঈভিল বলে না, কারণ তা চিকিৎসার অঙ্গ, স্বাস্থ্যোদ্ধারের উপায়। কিন্তু এই গানে ভালো ও মন্দকে সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে ; দুটোই সত্য। রাজার যে চোখ-জুড়ানো হৃদয়-ভরানো কান্ত-মধুর রূপ সুদর্শনা অনুভবে জেনেছে, গানে শুনেছে এবং কল্পনার চোখে দেখেছে তা মিথ্যা নয় ; তবে তাই একমাত্র সত্য—এ-ধারণাটা অতীব ভ্রান্ত। সে-ভ্রান্তিমোচনের কাহিনী নিয়ে নাটকের প্লট তৈরী হয়েছে। রাজার যে অবিচলিত নিষ্ঠুর রূপ সুরঙ্গমা, ঠাকুরদা, ভদ্রসেন মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করেছে তা-ও কঠিন সত্য।

নাটকের মধ্যে এতবার এই ভয়ানক রূপটির কথা বেশ স্পষ্ট জোরালো ভাষায় বলা হয়েছে যে তা কেমন ক'রে কোনো-কোনো সমালোচক এবং অনেক পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে সেটাই আশ্চর্য। অজিতকুমার চক্রবর্তী শেষ দৃশ্যে রাজার উক্তি ("অন্ধকারের লীলা এবার শেষ হল, এখন বাইরে চলে এসো, আলোয়") উদ্ধৃত ক'রে বলছেন, "নাটকের এইখানে সমাপ্তি।"[১] কিন্তু নাটকের সমাপ্তি তো সেখানে নয়। তার পরে রয়েছে সুদর্শনার সেই নিদারুণ স্বীকৃতি যেখানে না-পৌঁছালে নাটক অত্যন্ত অসমাপ্ত থেকে যেতো : "যাবার আগে আমার অন্ধকারের প্রভুকে, আমার নিষ্ঠুরকে, আমার ভয়ানককে প্রণাম করে নিই।" অজিতকুমারের সহৃদয় রবীন্দ্র-সমালোচনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা

১. অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'কাব্যপরিক্রমা', পৃ ৪৯

আছে, কিন্তু সন্দেহ হয় যে তাঁর নিষ্ঠাবান চিত্তে এই নিষ্ঠুরকে, এই ভয়ানককে মেনে নিতে অসংজ্ঞাত প্রতিরোধ র'য়ে গেলো নাটকের শেষ পাতা পর্যন্ত; নইলে উদ্ধৃতিতে এমন জাজ্বল্যমান ত্রুটি কী ক'রে থাকতে পারে।

রাজাকে পেতে হ'লে শুধু সুন্দরের ধ্যান করলে চলবে না, সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার মতো চারিত্রিক বল, মানসিক পরিণতি ও হার্দিক দৃঢ়তা দরকার। হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা যে-সত্যের মুখ ঢাকা আছে তা মনোহর না-ও হ'তে পারে। এই সৎসাহসিক (রচনাকালের পক্ষে অত্যন্ত সাহসিক) নাটকে রবীন্দ্রনাথ বলতে চাইছেন—ভগবানকে মনের মতো ভাবা অন্যায়; এই অন্যায় আবদার যার মনে যত প্রবল, তার জীবনে দুঃখ ও দুর্বিপাক তত বেশি। মনকে কঠিনতম সত্য সহ্য করবার মতো, শুধু সহ্য নয়, ভালোবাসবার মতো ক'রে তৈরী ক'রে নিতে হবে। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে পাথরে খোদাই-করা কয়েকটি পংক্তিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন:

রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায়,
সত্য যে কঠিন
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম।

স্পিনোজার মতো রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করছেন: "The truth is cruel but it can be loved, and it makes free those who have loved it." (স্পিনোজা-দর্শনের এই অন্যতম মূলসূত্রটি সাণ্টায়ানা উক্ত বাক্যে সন্নিবদ্ধ করেছেন স্পিনোজার *Ethics*-এর ভূমিকায়।) শেষ অবধি গান্ধীও যে-সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন তা এই নয় যে ঈশ্বর কল্যাণময়, করুণাময়, প্রেমময়। তাঁর সমুজ্জ্বল হৃদয়োপলব্ধি

ও পরীক্ষিত বুদ্ধি তাঁকে পৌঁছিয়ে দিলো ভিন্ন এক সংজ্ঞায়—Truth is God ; 'ভগবান সত্য'-এর পরিবর্তে "সত্যই ভগবান"—এই সূত্রটিই তাঁর শেষ স্বাক্ষর লাভ করলো। নির্ভীক নিরাসক্ত চিত্তে আমরা যা পরম সত্য ব'লে জানবো, তাকেই ঈশ্বর ব'লে মানবো, তার কাছে, একমাত্র তার কাছেই মাথা নত করবো। এই চূড়ান্ত উপলব্ধির পথ গান্ধীর মতে ভালোবাসা, প্রাণীমাত্রকে ভালোবাসা, চরাচরকে ভালোবাসা।

যে-সত্যকে আমরা ভালোবাসি তাকে সুন্দরও বলতে পারি। বিজ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিক, নিরাবেগ, ব্যবহারিক সত্যকে সুন্দর বলতে দ্বিধা হয়, কিন্তু কবিতার সত্য ও সুন্দর অভিন্নার্থ। ভয়ংকরের সঙ্গে তার বিরোধ নেই। 'কিং লীয়র'-এর মতো ট্র্যাজিডিকেও আমরা সুন্দর বলি, যত মর্মান্তিক হোক্ তার ঘটনা-পরম্পরা ; কালবৈশাখীর বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ কালো আকাশও সুন্দর। ক্ষুদ্র, সীমিত, সুসজ্জিত ননীর পুতুলের মতো সুন্দরকে ভালোবেসেছিলো সুদর্শনা, তার উচ্ছল মনের রঙিন কল্পনার দ্বারা বাঁধতে চেয়েছিলো রাজার মহান সত্তাকে। ফলে এই জন্ম-রোম্যান্টিকের কোমল হৃদয় তো ক্ষতবিক্ষত হবেই, তার কপালে আঘাত, লাঞ্ছনা, অবহেলা তো থাকবেই। শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠুরকে ভয়ংকরকে সহ্য করতে, প্রণাম করতে শিখলো সে, তবে তার মুক্তি। শেষ পর্যন্ত সুন্দরের সাধনায় সেই স্তরে পৌঁছলো সুদর্শনা যেখানে দাঁড়িয়েও সে ঠাকুরদার ভাষায় বলতে পারে—"চিনে নিয়েছি যে—সুখে দুঃখে তাকে চিনে নিয়েছি—এখন আর সে কাঁদাতে পারে না।" সুন্দরের মধ্যে যে-ভয়ংকর রয়েছে সমগ্র পৃথিবী ও ইতিহাস জুড়ে, তাকে চিনতে হবে, নইলে রাজাকে চেনা সম্পূর্ণ হবে না। শুধু মধুরকে ভালোবাসা ভালোবাসার ভগ্নাংশমাত্র।

নিঃসন্দেহে মানুষের মধ্যে একটা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, একটা প্রেমশক্তি, একটা দৈবী প্রেরণা কাজ করছে ; মহামানবে আমরা তার স্পষ্ট রূপ দেখি। সমস্ত জড়প্রকৃতিতেও তা একেবারে অবিদ্যমান নয়, নইলে মানুষের উদ্ভব ও বিবর্তন সম্ভব হ'তো না। কেমন ক'রে বন্য হিংস্র জন্তুর

কোলে বুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন মানুষ জন্ম নিলো—সে এক বিস্ময়কর ইতিহাস। অতি মন্থর গতিতে যুগযুগান্তর পাড়ি দিয়ে পশু হ'লো মানুষ, এবং প্রায় এক কোটি বছর পূর্বে যখন আদিম মানুষ ব'লে তাকে প্রথম চিহ্নিত করা যায় তখনও সে পশু থেকে খুব ভিন্ন ছিলো না। তারপরে ধীর পদক্ষেপে অনেক বাধাবিপত্তি ও ব্যর্থতা ডিঙিয়ে তার মধ্যে এলো সমাজবোধ, কল্যাণবোধ, বিশুদ্ধ জ্ঞানের ও রূপের তৃষ্ণা। জন্ম নিলেন সক্রাৎ ও বুদ্ধ, যীশু ও মহম্মদ, শেক্‌স্‌পীয়র ও মাইকেল এন্‌জেলো, মার্কস্‌ ও আইনস্টাইন। কত অন্ধকার বন্ধুর পথ আলোকিত ও সুগম হয়েছে আমাদের সামনে, কত অসম্ভবপ্রায় ব্যাপার (যথা দারিদ্র্যের অবসান ও রোগমুক্তি) সুসম্ভব হ'য়ে উঠেছে। মানুষের তথা প্রাণীমাত্রের অস্তিত্বই এক অভাবনীয়রূপে অসম্ভব ব্যাপার। কত-কিছু উপাদান ও অবস্থার সমাবেশ ঠিক-ঠিক গুণে মাত্রায় স্থানে ও কালে তার পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয়। অথচ সবই মজুদ রয়েছে এই পৃথিবীর মাটি জল বাতাস ও বিদ্যুতে, এই সূর্যের আলো ও তাপে। মানুষকে জন্মদান ও লালন, তার চিত্তের প্রসার ও উন্নতি-সাধনই জড় প্রাকৃতিক বিবর্তনের লক্ষ্য—কথাটা ঠিক বৈজ্ঞানিক সত্য না-হ'লেও তার খুব কাছ ঘেঁসে যায়, মনে হয় যেন এটাই বৈজ্ঞানিক সত্যের অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত। এই কথাটাই রবীন্দ্রনাথ রাজার মুখে বসিয়েছেন সুদর্শনাকে উদ্দেশ ক'রে: "দেখতে পাই, যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার আমার আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায় রূপ ধরে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত ঋতুর উপহার।" কবি যদি উদ্বেল ভাবাবেগে গেয়ে ওঠেন—"আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে"—তবে বিন্দুমাত্র বেমানান ঠেকে না সে-উচ্ছ্বাস।

কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে বলতে হয়, দুই হাতে সুধার সঙ্গে গরলও ঢেলে দিচ্ছেন সেই অতি নিষ্ঠুর ভয়ংকর প্রেমিক, সেই সুদর্শনার অদর্শনীয়

কালো রাজা, যাঁর পতাকায় পদ্ম ফুলের মাঝখানে বজ্র আঁকা। তাঁরই আদেশে সমুদ্রে ভীষণ ঝড় ওঠে, তীর্থযাত্রী জাহাজ ডুবে যায়, সাত-আট শো নিরীহ নারী-পুরুষ শিশু-বৃদ্ধ অসহায় যন্ত্রণায় দম আটকে প্রাণ হারায়। সংবাদ পেয়ে তরুণ কবি বিহ্বল হ'য়ে পড়েন, চোখের সামনে ছবি ভাসে জগৎব্যাপী এক প্রাণহীন মত্ততার—"না-জানে পরের ব্যথা না-জানে আপন।" কত খরা ও প্লাবন, ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাত, রাষ্ট্র-বিপ্লব ও যুদ্ধ ঘটে। সব-কিছুকে ছাপিয়ে ওঠে প্রথম মহাযুদ্ধের ভয়াবহ ঘটনাবলী। মানুষের আর্ত স্বর হারিয়ে যায় "চৌদিকের চিরনীরবতা"য়। এটাই মানবভাগ্য, হিউম্যান কণ্ডিশান। ক্রমশ দুঃখের অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সুপরিচিত হ'য়ে ওঠেন। কিন্তু তাঁর আগেই হয়েছিলেন ঠাকুরদা। অর্থাৎ গীতিকবি রবীন্দ্রনাথের আগেই নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ অমঙ্গলের ব্যাপক অস্তিত্ব মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন।

'মানসী'র "সিন্ধুতরঙ্গ" লিখবার সময়ে রবীন্দ্রনাথ অত বড়ো দুঃসংবাদ পেয়ে দিশাহারা হ'য়ে পড়েছিলেন, বুঝে উঠতে পারছিলেন না কেমন ক'রে ঈশ্বরের দয়া ও নির্দয়তা পাশাপাশি বাস করতে পারে। কখনো মনে হ'তো ভগবান কোথাও নেই, চারিদিকে শুধু "জড়ের বিলাস"; কখনো সন্দেহ হ'তো মানুষের ভাগ্য নিয়ে বুঝি দুই সমশক্তি-মান দেবতা দ্যূতখেলা খেলছেন। 'নৈবেদ্য' এমন-কি 'বলাকা' রচনা-কালেও তিনি ভাবতে চেষ্টা করেছেন যে, মানুষের দুঃখ মানুষের পাপেরই শাস্তি। কিন্তু একজনের পাপে অন্যজন শাস্তি পায় কেন—প্রশ্ন জেগেছে মনে। যুদ্ধ যারা বাধায়, যুদ্ধের মার তো তারা অনেক ক্ষেত্রেই খায় না, মার খেয়ে মরে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ নরনারী। উত্তরে ভেবেছেন—মানুষে-মানুষে সবাই এক। সমাজদেহের এক অংশে বিষ সঞ্চার হ'লে অন্য অংশে, হয়তো-বা সারা দেহে, ফোড়া হ'য়ে বেরুবে, দুঃসহ যন্ত্রণার সৃষ্টি করবে—এমন তো হ'তেই পারে। কিন্তু উত্তর সন্তোষজনক নয়; রবীন্দ্রনাথ নিজেও এতে শেষ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হননি। যতদূর জানি, রবীন্দ্র-

নাথ কখনো এ-জন্মের দুঃখ ও অবমাননাকে পূর্ব জন্মের পাপের ফল ব'লে উড়িয়ে দেননি, কিংবা সান্ত্বনা খোঁজেননি এই ভুয়ো বিশ্বাসে যে একালের যাবতীয় দুর্ভোগের পাওনা পরকালের প্রচুরতর সুখভোগে সুদসুদ্ধ আদায় হ'য়ে যাবে। দুঃখ বজ্রকঠিন সত্য এবং কোনো সহজ ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ নয়।

তবু ঠাকুরদার চিত্ত অবিচলিত, প্রশান্ত, এমন-কি প্রফুল্ল। নিজের দুর্ভাগ্যকে তিনি দুর্ভাগ্য ব'লেই গণ্য করেন না; পরের দুর্ভাগ্যকেও নীরবে সহ্য করতে শিখেছেন। তাতে ব্যথা পান না যে তা নয়, কিন্তু নিজের ব্যথার সঙ্গে যেমন, সমব্যথার সঙ্গেও তেমনি আপোষ ক'রে নিতে মনকে তৈরী করেছেন। নিজের ব্যথাকে ঈশ্বরলাভের বা সত্যো-পলব্ধির উপায় ভাবা যেতে পারে। কিন্তু বিধবা প্রতিবেশিনীর একমাত্র ছেলে যখন কর্কট রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করে, তখন তাতে ক'রে ঈশ্বরের প্রেমকরুণাময় বা জগৎ-কল্যাণকর মূর্তি আমাদের চোখের সামনে ঝাপসা হ'য়ে যায়।

সবচেয়ে ভয়ংকর সত্য হচ্ছে পরের ব্যথা, নিজের ব্যথা নয়। 'গীতাঞ্জলি'তে রবীন্দ্রনাথ কেবল নিজের ব্যথার কথাই ভেবেছেন। কিন্তু ঠাকুরদা ভাবেন সব ব্যথাই তো বন্ধুর দেওয়া, এবং বন্ধুকে বন্ধু যদি সহ্য করতে না-পারে তবে বন্ধুত্ব কিসের। গীতার প্রার্থনা যেন তাঁর মুখে ঈষৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ ধারণ করেছে—পিতা যেমন পুত্রকে, সখা যেমন সখাকে, প্রেমিক যেমন প্রিয়াকে সহ্য করে, তেমনি হে অদৃশ্য বন্ধু, তুমি আমাকে সহ্য করো, এবং আমিও তোমাকে সহ্য করতে পারি যেন। নাটকে রাজা বারবার সুদর্শনাকে জিজ্ঞাসা কর-ছেন—আমাকে সইতে পারবে তো? অথবা জানাচ্ছেন—সহ্য করতে পারবে না। ভগবানকে সহ্য করতে হবে, এই কথাটা বলছেন ভগবৎ-ভক্ত কবি রবীন্দ্রনাথ। প্রেমভক্তির এ এক আশ্চর্য প্রকাশ। তবে কেউ যেন একে বোদলেয়রীয় ব্লাস্‌ফেমি কিংবা ভলতেরীয় আইরনির সঙ্গে

তুলনা না-করেন। ভক্তিবর্ণালির সব-ক'টি বর্ণ এমন-কি বেগনী-পারের অনুমানে জানা রঙও পাওয়া যাবে রবীন্দ্রকাব্যে, কিন্তু বিশ্বের প্রতি বিতৃষ্ণা, ঈশ্বরের প্রতি বিদ্রোহঘোষণা বা বিষোদ্গার সে-কাব্যকে স্পর্শ করেনি। শারীরিক ও সামাজিক অসুস্থতার অন্তিম যন্ত্রণাও কখনো রবীন্দ্রনাথের মানসিক বৈকল্য ঘটাতে পারেনি। কলা-কৈবল্যবাদী না-ব'লে তাঁকে বলবো কলা-অবৈকল্যবাদী।

সুদর্শনার সঙ্গে আমাদের তাদাত্ম্য ঘ'টে যায় প্রথম দর্শনেই, অথবা প্রথম শ্রবণে যখন অন্ধকার ঘরের ভিতর থেকে আমরা তার ব্যাকুল কণ্ঠ শুনি—"আলো আলো, কই, এ ঘরে কি একদিনও আলো জ্বলবে না?" মানুষ চিরকাল আলোর পিয়াসী; অন্ধকারের প্রাণী নয় সে। যাকে আলোয় পেলো না, তাকে কি সত্যি সে পেলো—এ-আশংকা তার মনকে অস্থির করবেই। পরে একদিন রবীন্দ্রনাথ গাইবেন, "আমার জীবনে তোমার আসন / গভীর অন্ধকারে।" কিন্তু সে-গানে তৃপ্তি ও সার্থকতার সুর শোনা যাবে। কারণ তাঁর জীবনে যাঁর আসন তাঁকে ইতিপূর্বেই তিনি পেয়েছেন প্রকৃতির রূপে বর্ণে গন্ধে গানে; দেখেছেন

যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ,
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ
খাটছে বারো মাস।

সবত্রই যিনি হৃদয় হরণ করছেন, সকলের চোখের আড়ালে গভীর অন্ধকারে তাঁকে পাওয়াতে পাওয়া আরো নিবিড় আরো পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু সুদর্শনা তো তার রাজাকে কখনোই আলোতে দেখেনি, লোকালয়ে দেখেনি। তাই তার আকুলতা আমাদেরও আকুল করে, তার প্রার্থনায় আমাদের প্রার্থনা মেশে।

অবশেষে মনস্কামনা পূর্ণ হ'লো সুদর্শনার। কিন্তু একেই কি বলে

পূর্ণ হওয়া? দুঃখ তার তরুণ ছিলো, চঞ্চল ছিলো, অধীর ছিলো; হ'লো সুপরিণত, সুস্থির এবং চিরস্থায়ী। সুদর্শনা অধীর হয়েছিলো পরম সুন্দরকে দিনের আলোয় দেখতে; দেখলো পরম ভয়ংকরকে। ইতিমধ্যে অবশ্য পাথরের দেওয়ালে মাথা ঠুকে-ঠুকে তার প্রেম কঠিন হয়েছে, সর্বংসহ হয়েছে। সবই সে মেনে নিলো, হাসিমুখে না-হ'লেও খুশী মনে। কিন্তু সেই খুশিতে কি অবসাদ ও বিষণ্ণতার আমেজ ছিলো না? শেষ যবনিকাপাতের অব্যবহিত পূর্বে সুদর্শনা যখন সব অহংকার চূর্ণ-হ'য়ে-যাওয়া গলায় ব'লে ওঠে—"আমার অন্ধকারের প্রভুকে, আমার নিষ্ঠুরকে, আমার ভয়ানককে প্রণাম করে নিই।" তখন সে-আত্মনিবেদনের প্রতিধ্বনি জাগে আমাদের মনেও। তবে তার বিষাদগম্ভীর কণ্ঠস্বরে আমরা শুনি হৃদয়-দগ্ধ-হ'য়ে-যাওয়া সেই সুপরিপক্কতার সুর যার মহত্তর প্রকাশ অন্য-এক মহাকবির নাটকে বহুপূর্বেই পেয়েছিলাম :

Men must endure
Their going hence even as their coming hither :
Ripeness is all.

কিন্তু যবনিকাপাতের কথা এখনই নয়। রাজাকে চোখে দেখার যে-আগ্রহ সুদর্শনাকে ব্যাকুল করেছিলো তা আমাদের মনে হয়তো-বা জিজ্ঞাসায় পরিণত হয়—এই অন্ধকার ঘরের অদৃশ্য প্রেমিক কি দিনের আলোয় জগৎসংসারের মাঝখানেও প্রেমিকরূপেই দেখা দেবেন, নাকি সেখানে তাঁর অন্য পরিচয়? তাঁর প্রেমকল্যাণময় রূপের কথা আমরা সাধুসন্তদের মুখে শুনেছি, ধর্মশাস্ত্রে পড়েছি। সে-কথা কি সত্য?

তোমার প্রণয় যুগে যুগে মোর লাগিয়া
জগতে জগতে ফিরিতেছিল কি জাগিয়া,
এ কি সত্য?

সুদর্শনার সঙ্গে আমরাও অবুঝ হ'য়ে যাই, আত্মাভিমানকে প্রশ্রয় দিই, ভাবি, হ্যাঁ, এ-কথাটাই নিপট সত্য, আর-সব মায়া মরীচিকা। তৃষ্ণার্ত

মরুপথযাত্রী যেমন দূব থেকে ঝলমলে বালির উপবে আশপাশের ঢিবিগুলির ছায়া দেখতে পেয়ে ভাবে—ঐ তো জল। তাবপর যতই সে ছোটে, জল ততই দূরে পালায়। অবশেষে শ্রান্ত ক্লান্ত হ'য়ে তপ্ত বালুকারাশির উপর লুটিয়ে প'ড়ে সে বোঝে যে পৃথিবীতে জল আছে, কিন্তু মরীচিকাও আছে; তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে ম'রে যাওয়াও আছে। নিয়মের রাজত্ব চতুর্দিকে; নিয়ম অতি সূক্ষ্ম কিন্তু হৃদয়হীন। সুদর্শনাও সে-কথা বুঝবে, আমরাও তার সঙ্গে-সঙ্গে বুঝবো।

অথবা আগেই বুঝি। নিশ্চয়ই আগে বুঝি, কারণ আমরা তো সুখে-সম্ভোগে অপবিমিত ঐশ্বর্যে লালিতা রাজমহিষী নই। যেমন আমরা আগে থেকেই জানি যে, ননীর পুতুলের মতো রূপবান রাজবেশধারী সুবর্ণ আসল রাজা নয়। তবু রূপের নেশায় মাতোয়ারা প্রেমিকার বিভ্রম স্বাভাবিক ঠেকে, পদ্মপাতায় ক'রে ফুল পাঠানো সুন্দর লাগে। তারপবেই প্রচণ্ড দুটি আঘাত এসে পড়লো সুদর্শনার মাথার উপর, অকস্মাৎ, পর-পর। সে জানলো যে, যে সুন্দর সে তার রাজা নয়; আর তার রাজা দেখতে অতি ভয়ানক। সেই ভয়ানক রূপ দেখার জন্য রাজ-প্রাসাদ এবং তার চারিপাশে বিরাট লেলিহান অগ্নিশিখার প্রয়োজন ছিলো; তার চেয়ে উপযুক্ত পটভূমিকা আর কী হ'তে পারে। অথবা ভাগ্যের পরিহাস সেটা। আলো চেয়েছিলো সুদর্শনা, ঘরে-বাইরে আগুন জ্ব'লে উঠলো। এমনি ক'রে আমাদেব প্রার্থনা ফিরে আসে আঘাত হ'য়ে।

ভয় পেলো সুদর্শনা, রাজার ভয়ানক রূপ অসহ্য ঠেকলো তার। সেই সঙ্গে সে টের পেলো যে, সুবর্ণকে অকিঞ্চিৎকর জেনেও তার মনোহর রূপ সে ভুলতে পারছে না। অশুচি বোধ করলো নিজেকে, রাজার কাছে শাস্তি চাইলো; কিন্তু রাজা কোনো প্রকাশ্য শাস্তি দেবেন না তাকে। পালিয়ে যেতে চাইলে রাজা উদাসীনভাবে বললেন—যাও যতদূর পারো। এই উদাসীনতাই দারুণতর শাস্তি। পিতৃগৃহে গিয়েও

প্রত্যাশায় প্রহর কাটাতে লাগলো—কখন রাজা আসবেন তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু তাঁর ঔদাসীন্য হিমাদ্রিতুল্য। রাজা অবশ্য এলেন, তাকে নতুন এক বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্য; কিন্তু ত্রাণকার্য সমাপ্ত হ'লে তার দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না-ক'রে চ'লে গেলেন।

এমন দুঃখের দিনে এক রাত্রে সুদর্শনার মনে হ'লো কোথায় যেন রাজার বীণা বাজছে। "যে নিষ্ঠুর তার কঠিন হাতে কি অমন মিনতির সুর বাজে। বাইরের লোক আমার অসম্মানটাই দেখে গেল, কিন্তু গোপন রাত্রের সেই সুরটা কেবল আমার হৃদয় ছাড়া আর তো কেউ শুনল না। সে বীণা তুই কি শুনেছিলি সুরঙ্গমা! না, সে আমার স্বপ্ন?" সুদর্শনার মন সন্দেহে জর্জরিত—এই মিনতির সুর তার ইচ্ছা-পূরক স্বপ্নেই শুধু বাজেনি তো? ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে দাসী সুরঙ্গমা যা বললো তা অতিশয় নৈরাশ্যজনক: "সেই বীণা শুনব বলেই তো তোমার কাছে কাছে আছি। অভিমান-গলানো সুর বাজবে জেনেই কান পেতে পড়ে ছিলুম।" এত-সব ভনিতা ক'রে কিন্তু একবারও বললো না—হ্যাঁ আমিও শুনেছি, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, রাজা সত্যি এসে বীণা বাজিয়েছিলেন। বাস্তবিক যা ঘটলো, যা ঘটে, তা অসম্মান; সবাই তা দেখে। মিনতির কোমল সুর কেবল স্বপ্নেই বাজে, কাতর হৃদয় ছাড়া আর-কেউ তা শোনে না।

আঘাতে-আঘাতে সুদর্শনার প্রেম পুনরুজ্জীবিত হ'লো, ব'লে উঠলো—আরো কঠিন আঘাত সইবে আমার। কিন্তু প্রতিদানে রাজার প্রেম আর সে পেলো না। শেষ সাক্ষাতে তাকে বলতে হ'লো—"প্রভু, যে আদর কেড়ে নিয়েছ সে আদর আর ফিরিয়ে দিয়ো না। আমি তোমার চরণের দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দাও।" বিশ্বচরাচরের রাজা বিশ্বকে হয়তো ভালোবাসেন, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষকে না। তবু তাঁকে ভালোবাসতে হয় কোনো প্রত্যাশা মনে না-রেখেই। এই হ'লো

ভগবৎপ্রেমের রীতি (বিশ্বপ্রেম কি তার থেকে ভিন্ন-কিছু ?)। মনে হয় রবীন্দ্রনাথও স্পিনোজার মতো বলতে চাইছেন, অন্তত 'রাজা' নাটকে বলতে চাইছেন : "He who loves God cannot endeavour to bring it about that God should love him in return." ঠিক এই সুরটি 'গীতাঞ্জলি'তে শোনা যায় না। দুই বিচিত্র বীণা বাজিয়েছেন একই বীণকার, কিন্তু একই রাগিণী বাজিয়েছেন ভাববার কোনো কারণ নেই। তাছাড়া, লিরিকে নাটকে ভেদ শুধু আঙ্গিকের নয়, মনোভঙ্গিরও হ'তে পারে।

দুই

'রাজা' নাটকখানি 'গীতাঞ্জলি' পর্বের প্রায় মধ্যভাগে রচিত, কিন্তু ভাবের দিক থেকে আরো পরিণত ও দূরপ্রসারী-দৃষ্টিসম্পন্ন, পৃথিবীর বাস্তবিক অবস্থা সম্বন্ধে আরো নির্ভীকভাবে সচেতন। ঐ-পর্বের অনেকগুলি গান সুর বাদ দিলেও গীতিকবিতা হিসেবে অতীব সুন্দর; ঈশ্বরপ্রেমের (নারীপ্রেম এবং প্রকৃতিপ্রেম যার অঙ্গীভূত) যে কত গোপন গভীর উৎস থেকে বেরিয়ে-আসা অনাস্বাদিতপূর্ব রস রবীন্দ্রনাথ আমাদের হৃদয়গম্য করেছেন তার তুলনা নেই কোথাও। তবু বলবো তিনি ঈশ্বরের দক্ষিণ মুখটাই সে-সব গানে দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন, তাঁর বজ্রকঠিন অটল-নিষ্ঠুর চেহারাটা তখনো গীতিরচয়িতার চোখে ঝাপ্‌সাই রয়েছে। কয়েকটি গানে অবশ্য আমরা 'নিঠুর' শব্দটি পাই, ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রবিদ্যুতের কথা শুনি, দরজা-জানলা সজোরে কেঁপে ওঠে, 'আঁধার ঘরের রাজা' আসেন প্রবল প্রতাপে ; কিন্তু এ-সবের মধ্যেও তিনি আসলে প্রেমিক, "নিঠুর চরণ ফেলে" আসছেন জানলেও অপেক্ষমাণা বিরহিণীর বিরহ মধুরই থেকে যায়, কঠোরের জন্য নিজের কোমল হৃদয়কে প্রস্তুত করতে হয় না।

আমার তো মনে হয় 'গীতাঞ্জলি'র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে' 'রাজা'র সুদর্শনা খুব ভিন্ন-হৃদয় নয়—রাজপ্রাসাদের অগ্নিকাণ্ডের আগে পর্যন্ত। কিন্তু তার পর থেকে শুরু হয় সুদর্শনার কঠিন পরীক্ষা। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে সে অবশ্য এগিয়ে চলে দ্রুত যদিও ক্ষতবিক্ষত চরণ ফেলে, পৌঁছোয় গীতিকবি রবীন্দ্রনাথের শেষ দশকের উপলব্ধির খুব কাছাকাছি। কাছাকাছি, কিন্তু একেবারে কাছে নয়—কারণ শেষ দশকের অনেক কবিতায় আমরা যে ট্র্যাজিক সুরটি শুনি তা সুদর্শনার মুখে শুনি না, যবনিকাপাতের পূর্বমুহূর্তের চরম আত্মদানেও না। তবু সে শেষ অবধি জানতে পারলো তার রাজা প্রকৃতির নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে, লোকসমাজের নৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে, কত ভয়ংকর, কী নিষ্ঠুর। ঐ অটল কঠিনের প্রতি তার প্রেম কিন্তু অবিচলিতই রইলো, যদিও তার রঙ গেলো পাল্‌টে। গীতিকবিও তাঁর 'শেষ লেখা'য় জানতে পেরেছিলেন "সত্য যে কঠিন", জেনেও বলতে পেরেছিলেন "কঠিনেরে ভালোবাসিলাম"। নাটকের প্রথম ও শেষ দৃশ্যের মধ্যে কালের ব্যবধান বেশি নয়, কিন্তু নায়িকার হৃদয়ের ব্যবধান অনেকখ'নি। তার চেয়েও বেশি হৃদয়ের ব্যবধান লক্ষ্য করা যায় 'গীতাঞ্জলি'র গীতিকবি এবং 'নবজাতক' কিংবা 'শেষ লেখা'র গীতিকবির মধ্যে।

রঙ্গমঞ্চে সুদর্শনার আবির্ভাব অসাধারণ নাটকীয় তাৎপর্যপূর্ণ, দর্শকের মনকে প্রথম থেকেই স্বরগ্রামের উঁচু পর্দায় বেঁধে দেয়। "আলো, আলো কই"—ব্যাকুল প্রশ্ন ও প্রার্থনা বৈদিক যুগ থেকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'য়ে আসছে, আজও তার বেদনার্ত তীব্রতা অনুপশমিত—বিশেষত রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ও গানে। মনে হয় যেন সুদর্শনার কাতর উক্তি কেড়ে নিয়ে গীতিকবি পদ্য ক'রে সাজিয়ে বলছেন : "আর রেখো না আঁধারে, আমায় দেখতে দাও।" কিন্তু দ্বিতীয় পংক্তিটি অন্যদিকে নিয়ে যায় শ্রোতার ব্যাকুলতাকে : "তোমার মাঝে আমার আপনারে দেখতে দাও।" এর দু-রকম অর্থ মনে

জাগে। আমার ভালোবাসা যে তুমি বুকে ধারণ করেছো, কিংবা আরো একটু দুঃসাহসিক হ'তে পারে ভক্তের স্পর্দ্ধা—তোমার বুকেও যে আমার জন্য ভালোবাসা রয়েছে, সেই কথাটা আমাকে জানতে দাও। অথবা এটা সেই বহুবিখ্যাত বৈদান্তিক মহাবাক্যের—"অহম্ ব্রহ্মাস্মি" কিংবা "যঃ অসৌ পুরুষঃ সঃ অহম্ অস্মি"—কাব্যিক রূপান্তর হ'তে পারে। দ্বিতীয় অর্থটা অবশ্য সুদর্শনার বিদ্যাবুদ্ধির বাইরে; আর যা-ই হোক্ সে দার্শনিক কিংবা ঐ-স্তরের মিস্টিক নয়। অঢেল তার প্রেম এবং গগনচুম্বী তার অভিমান। তার মনে সন্দেহ নেই যে রাজাও তাকে ভালোবাসেন। সে-ভালোবাসা তিনি সর্বসমক্ষে প্রকাশ করুন—এমন বাসনা তার মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারে। কিন্তু তার মূল এবং সবচেয়ে ব্যাকুল প্রার্থনা খুবই সোজাসুজি—"তুমি আমাকে আলোয় দেখা দিচ্ছ না কেন।" সে-আলো তার অন্ধকার ঘরে জ্ব'লে-ওঠা ঝাড়লণ্ঠনের আলো নয়, সে-আলো নক্ষত্রখচিত আকাশের আলো, দিনানুদৈনিক কর্মরত মানবসমাজের আলো।

"আর রেখো না আঁধারে" মনে করিয়ে দেয় অন্য-একটি সুন্দর গানের কথা—"এখনো গেল না আঁধার।" কিন্তু প্রথম গানে আছে "তোমার মাঝে আমার আপনারে দেখতে দাও"; দ্বিতীয় গানে বলছেন প্রায় বিপরীত কথা: "এখনো নিজেরি ছায়া রচিছে কত যে মায়া।" আসলে দুই গানে দুই ভিন্ন 'আমি'র কথা বলা হয়েছে। যে-'আমি'কে জগদীশ্বরের বা ব্রহ্মের মাঝে দেখতে চান কবি তা নিশ্চয়ই সাধারণত যাকে আমরা 'আমি' বলি তার অন্তরে এবং অন্তরালে অন্য যে-'আমি' বাস করে সেই 'আমি'। আর যে-'আমি'র ছায়ায় ঈশ্বরের জ্যোতি ঢাকা প'ড়ে যায় তা এই সাংসারিক এবং ব্যবহারিক 'আমি', উপনিষৎ যাকে জীবাত্মা ব'লে আখ্যায়িত করেন। অনেক সমালোচক ও পাঠকের ধারণা (স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তেমন ইঙ্গিত করেছেন দু-এক জায়গায়) সুদর্শনা যতদিন এই ছোটো

'আমি'র বাসনা-কামনায় নিমজ্জিত ছিলো ততদিন সে রাজাকে দেখতে পায়নি, রাজপ্রাসাদের অগ্নিদাহে এবং পিতৃগৃহের লাঞ্ছনায় যখন এই ছোটো 'আমি' পুড়ে ছাই হ'য়ে গেলো এবং তার ভস্মস্তূপের ভিতর থেকে প্রকাশ পেলো বড়ো 'আমি', তখনই তার প্রেম সার্থক হ'লো, সে রাজার সঙ্গে প্রকৃত সাযুজ্য লাভ করলো। কেন এই ঔপনিষদিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে পারিনি আমি (বিশেষত 'রাজা'র সুদর্শনার ক্ষেত্রে, 'অরূপরতন'-এর সুদর্শনার ক্ষেত্রে তার উপযোগিতা অনেকটা স্বীকার্য), এবং সুদর্শনার অন্ধকার ঘর থেকে বাইরের আলোয় রাজার হাত ধ'রে বেরিয়ে আসার অন্য ব্যাখ্যা খুঁজেছি—এই প্রবন্ধের প্রথম খণ্ডে তার বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। অবশ্য এই একান্ত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকে 'রাজা'র রাজ্য থেকে আমি একেবারে পাত্‌তাড়ি গুটিয়ে দেশান্তরিত করতে চাই না; বরঞ্চ মনে করি যে তার অস্পষ্ট আভাস নাটকটির অর্থগৌরব আরো বাড়িয়ে তোলে।

রবীন্দ্রনাথের ভক্তিসাধনার একটা রূপ যেমন আমরা দেখতে পাই সুদর্শনার দুঃখদগ্ধ লাঞ্ছনাবিদ্ধ পতিপ্রেমের ক্রমবিকাশে, তেমনি আর-একটা রূপ দেখি ঠাকুরদার অবিক্ষুব্ধ আত্মসমাহিত রাজভক্তিতে। অবশ্য ঠাকুরদাকে নাটকে যখন আমরা পাই তখন তাঁর সাধনা শেষ পর্বে পৌঁছেছে, বলতে গেলে তিনি তখন সিদ্ধপুরুষ, রবীন্দ্রমানসের আদর্শপুরুষ। একাধারে তিনি প্রেমিক জ্ঞানী এবং শেষ দৃশ্যে কর্মী। অথচ সর্বক্ষণ পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সাধারণ সব নগর ও গ্রাম-বাসী মেয়ে-পুরুষের সঙ্গে, ছোটো ছেলেমেয়ের দলের সঙ্গে হাসিঠাট্টায়, নাচে গানে মশগুল—যেন তিনি কিছুই নন, কেউই নন; কাউকে বুঝতে দেন না যে জগতের রাজার সঙ্গে তাঁর নিগূঢ় বন্ধুত্বের সম্পর্ক। তাই নাটকের শেষ অঙ্কে যখন সুদর্শনার পিতা তাঁর পতিগৃহ-ছাড়া কন্যার পাণিপ্রার্থী সাতজন রাজার মিলিত সৈন্যবাহিনীর কাছে পরাজিত হ'য়ে তাঁদের হাতে বন্দী, তখন রাজা স্বয়ং এলেন সুদর্শনা ও তার

পিতাকে উদ্ধার করতে, তখন সবাইকে আশ্চর্য ক'রে দিয়ে ঠাকুরদা ঘোষণা করলেন রাজার সেনাপতি তিনি, বিজয়ী রাজাদের যুদ্ধে আহ্বান করতে এসেছেন। আশ্চর্য আমরা দর্শকরা পাঠকরাও কম হই না, কারণ এ-যাবৎ—তার মানে প্রায় সমস্ত নাটক জুড়ে—ঠাকুরদাকে আমরা চিনেছি জ্ঞানীরূপে, কবিরূপে ; নাটকের একেবারে শেষে এসে হঠাৎ উপলব্ধি করি তাঁর সম্পূর্ণ ভিন্ন আর-এক রূপ ; দেখি তাঁকে শুধু সাধারণ কর্মীরূপে নয়, কর্মের মধ্যে যেটি সবচেয়ে চূড়ান্ত কর্ম—যুদ্ধ—সেই যোদ্ধবেশে।

অমঙ্গল সম্বন্ধে দুই ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় এই দুই ঠাকুরদার মধ্যে। অমঙ্গল যেখানে দুঃখের বেশে আসে—সন্তানের মৃত্যু, কঠিন দারিদ্র্য ইত্যাদি ঘটিত দুঃখ—সেখানে ঠাকুরদার প্রতিক্রিয়া প্যাসিভ ; প্রশান্ত চিত্তে তিনি বলেন : সবই হাসি মুখে মেনে নিতে হবে কারণ সবই তাঁর বন্ধুর দান, "ছেলে তো গেলই, তাই বলে কি ঝগড়া করে রাজাকেও হারাব। এমনি বোকা !" এ-সব দুঃখকে দৈবকৃত দুঃখ ব'লে ধরা হচ্ছে। অবশ্য আমরা, আজকের দিনের মার্কস্-পড়া পাঠকেরা, বলতে শিখেছি যে দারিদ্র্য দৈবকৃত ব্যাপার নয় ; একজন বা একশ্রেণীর মানুষের দারিদ্র্যযন্ত্রণার জন্য অন্য-একজন বা একশ্রেণীর মানুষের স্বার্থপরতা দায়ী, এবং পাপকে হাসিমুখে মেনে নেওয়াও পাপ। কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয়ে ঠাকুরদার গভীর জ্ঞান থাকলেও মার্কসীয় সমাজবাদ বিষয়ে ছিলো না ; নাট্যকারেরও বোধহয় 'রাজা'-রচনাকালে সমাজ-চেতনা মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিপুষ্ট ছিলো না। সে যা-ই হোক্, ঠাকুরদা বলতে চাইছেন সেইসব দুঃখের কথা যা অপ্রতিরোধ্য ও অপ্রতিকার্য ; বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হোক্, সমাজের যতই বিবর্তন বা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটুক, বেশ-কিছু দুঃখ থেকেই যাবে (যথা জরা ও মৃত্যু, বিশেষত প্রিয়জনের মৃত্যুশোক) যা মানবিক পরিস্থিতির অপরি-হার্য অঙ্গ। এ-সব দুঃখ হাসিমুখে সহ্য করাই ভালো। তা নিয়ে বন্ধুর

সঙ্গে (বাস্তবিক বা কাল্পনিক বিধাতার সঙ্গে) ঝগড়া করতে গেলে এ-দুঃখ বাড়বে বৈ কমবে না। আধুনিক সাহিত্যের বেশ-কিছু অংশ কি এই নিরর্থক ঝগড়ারই সাহিত্য নয়?

ঠাকুরদার এই কথাগুলি রূপকের ভাষায় বলা হ'লেও তার মর্মার্থটা কবিকল্পনা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া নাস্তিকের পক্ষেও সম্ভব নয়। অন্য যে-কথা তিনি বলেছেন তা আরো জ্ঞানগভীর ও শিল্পগর্ভ। কথাটি সবচেয়ে সুন্দর ক'রে বলা হয়েছে নাটকের মূল গানে—"মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে।" এই গানে যে-দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বদর্শন ব্যক্ত, ইতিপূর্বেই তার আলোচনা করেছি।

কিন্তু অমঙ্গল (evil) যখন পাপরূপে সামনে আসে তখন তাকে বন্ধুর দান ব'লে প্রফুল্ল চিত্তে মেনে নেওয়া যায় না। অথবা যায় হয়তো, তবে সঙ্গে-সঙ্গে আর-একটি প্রতিক্রিয়াও জাগায় সে-অমঙ্গল। আমাদের কর্মশক্তির সামনে তা একটি চ্যালেঞ্জ। বন্ধুরই আদেশে তখন ঠাকুরদাকে লৌহবর্ম ও ধারালো তরবারি ধারণ করতে হয়, অমঙ্গলের সঙ্গে প্রাণপণ যুদ্ধ করতে হয়। অশুভ শক্তিকে পরাস্ত ক'রে তবেই ঠাকুরদা আবার বর্ম ফেলে তাঁর বাসন্তী রঙের উড়ানি গায়ে দিয়ে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বসন্তোৎসবে যোগ দিতে পারেন। অর্থাৎ নিজের এবং পরের চরিত্রদোষ-ঘটিত অমঙ্গলের সঙ্গে যে-লড়াই সবে শুরু (খুব সম্প্রতি নয়, জ্ঞাত ইতিহাসমতে গৌতম বুদ্ধ ও জারা-থুস্ত্রার আমল থেকে শুরু) এবং যে-লড়াইয়ে দেশে-দেশে কালে-কালে সফলতার মধ্য দিয়ে আমরা ক্রমশ মানুষ, 'মরাল' (নীতিবোধ-বিশিষ্ট) মানুষ হ'য়ে উঠি, সে-লড়াইয়ের ময়দানে ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ নন, তার সমূহ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন মানুষেরই উপর। যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার এবং ক্রমশ সে-যুদ্ধে জয়যুক্ত হবার উপযুক্ত জড়-প্রাকৃতিক পরিবেশ অবশ্য রয়েছে। তাকে ভগবানের সৃষ্টি বললে বলতেও পারেন। বিশ্বময় প্রাকৃতিক বিধান (law of nature) ভগবানের সৃষ্টি, কিন্তু মানব-

সমাজে মঙ্গলবিধান (moral order) মানুষকেই রচনা করতে হবে। মঙ্গলবিধাতা ভগবান নন, মানুষ ; এবং দেখাই যাচ্ছে এই বিধাতৃ পর্বে মানুষের কৃতিত্ব এখনো পর্যন্ত যৎসামান্যই। মহামানব কয়েকজন "কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে" দিয়ে ধরায় এসেছেন বটে, কিন্তু স্বকীয় মানবমহিমার প্রদীপ বেশি লোকের হাতে জ্বালিয়ে দিয়ে যেতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় পূর্ণমানবের রথ অন্তরীক্ষে ধাবমান, এখনো মানবেতিহাসের পথে এসে পৌঁছয়নি। পূর্ণমানবের আদর্শ মানুষমাত্রকে চুম্বকের মতো অল্পবিস্তর টানছে বটে, কিন্তু সে-টানকে মনে-প্রাণে স্বীকার ক'রে তার দিকে এগিয়ে যাওয়া বা তাকে অগ্রাহ্য ক'রে বিপথগামী হওয়া, অথবা কোনোদিকে চলার বদলে জীবনটাকে স্রেফ শুয়ে-ব'সে হেলায় কাটানো—সবই মানুষের ইচ্ছাধীন। কাব্য ক'রে বলা যায়—"এমনি মায়ার ছলনা" ; ঈশ্বরের লীলাও বলা যেতে পারে তাকে।

একই ব্যক্তির পক্ষে অমঙ্গলের প্রতি তথা সারা জগৎ-সংসারের প্রতি দুই বিপরীত না-হ'লেও খুবই বিভিন্ন মনোপ্রতিন্যাস সর্বদা ধারণ ক'রে দুই মার্গে—ধ্যানমার্গে (জ্ঞান ও শিল্প যার দুই প্রত্যঙ্গ) এবং কর্মমার্গে—নিজেকে সার্থক ক'রে তোলা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সেই অসম্ভবের সাধক এবং প্রতীক ঠাকুরদা। নাটকের সংলাপে ও ঘটনাপ্রবাহে রাণী সুদর্শনা এবং দাসী সুরঙ্গমা যেমন রক্তমাংসের মানুষরূপে প্রতিভাত, ঠাকুরদা মোটেই সে-রকম নয় ; মানবিক পরোৎ-কর্ষের আদর্শরূপেই তাঁকে আঁকা হয়েছে, বাস্তব জীবন থেকে বেশ খানিকটা ঊর্ধ্বে তাঁর অবস্থান।

রবীন্দ্রনাথ যত বড়ো ধ্যানযোগী হ'ন না কেন, তিনি কর্মক্ষেত্র থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখেননি। তবে এ-কথা মানতেই হবে যে ধ্যানীরূপে, বিশেষত শিল্পীরূপেই, তিনি পৃথিবীর মহত্তমদের অন্যতম ; কর্মীরূপে তাঁর শক্তি ও সার্থকতা শ্রদ্ধেয় হ'লেও লেনিন, গান্ধী প্রভৃতি কর্ম-

বীরদের পাশে তাঁর স্থান হ'তেই পারে না। তবু রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বেদনা বোধ করেছেন এই ভেবে যে মানবত্বের একটা দিকেই র'য়ে গেলো তাঁর যত সাধনা ও সিদ্ধি, অন্যদিকে তাঁর সার্থকতা তুলনায় অকিঞ্চিৎকর :

মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে
যে উদ্ধার করে জীবনকে
সেই রুদ্র মানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি
অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছি চলে।
('পত্রপুট' ১২)

কিন্তু এতে অসম্মানের কিছু নেই। যে-পূর্ণতা তিনি চাইছেন এ-কবিতায় তা দেবতারই সাধ্য, রক্তমাংসের মানুষের শক্তির বাইরে। ঠাকুরদার চরিত্রে এ-পূর্ণতা তিনি আরোপ করেছেন, এবং প্রধানত এইজন্যেই তাঁকে নাটকে একটু অবাস্তব ঠেকে।

আমার বক্তব্যটা বোধহয় পরিষ্কার হয়নি; একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। আর-একটি কথাও খানিকটা বিস্তারিত আলোচনা-সাপেক্ষ। কেন জ্ঞানী ও কবিকে আমি 'ধ্যানী' আখ্যা দিয়ে এতটা কাছাকাছি এনে ফেলেছি, এবং কেনই-বা দু-জনের থেকে কর্মী মানুষকে বেশ খানিকটা দূরবর্তী মনে করি। বিশেষত বুঝিয়ে বলা দরকার এইজন্য যে হালের অনেক কবির ধারণা জ্ঞান এবং কবিতা একেবারে ভিন্ন-জাতীয় পদার্থ, জ্ঞানের স্পর্শ লাগলে কবিতা হ'য়ে যাবে অস্পৃশ্য। পক্ষান্তরে, অনেক জ্ঞানীও ভাবেন কবি সত্যদ্রষ্টা নন, স্বপ্নদ্রষ্টা। বুঝিয়ে বলতে গেলে তত্ত্বকথা কিছু এসে পড়বে। আশা করি পাঠক ধৈর্য হারাবেন না।

তিন

জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদের জীবনধারণ এবং জীবনমানের উন্নতিসাধনের কাজে লাগে। আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বেকনের একটি বাক্য—knowledge is power—স্কুলপাঠ্য পুস্তকে স্থান পেয়েও সারবত্তা হারায়নি আজও। প্রাকৃতিক প্রচণ্ড ভয়াবহ শক্তিসমূহের (বজ্রবিদ্যুৎ, ঝড়তুফান, অতিবৃষ্টি ও খরা, অগ্ন্যুৎপাত ও জলপ্লাবন ইত্যাদির) সম্মুখে হাঁটু গেড়ে পুষ্পাঞ্জলি কিংবা পশুবলি দেওয়ার, তুকতাক মন্ত্রতন্ত্র করার যুগ গেছে; আমরা জানতে পেরেছি যে প্রকৃতির বুকে খেয়ালখুশি দয়ামায়া নিষ্ঠুর-কঠিন ব'লে কিছু নেই। প্রাকৃতিক শক্তিকে পূজায় তুষ্ট ক'রে ফল পাওয়া যায় না, তবে জ্ঞানের দ্বারা বশীভূত ক'রে কাজ হাসিল করা যায়। প্রকৃতি সম্পূর্ণ নিয়মমতো চলে, তার একচুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই। সে-নিয়মশৃঙ্খলা বিষয়ে আমাদের জ্ঞান (যার নাম বিজ্ঞান) যতই সঠিক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ হবে, ততই প্রকৃতি হবে আমাদের দাসী। বেকনের ভবিষ্যদ্বাণী অনেকাংশে সফল হয়েছে। তিনি অবশ্য তিন শতাব্দী পূর্বে ভাবেননি যে আমরা ইতিমধ্যে পরমাণু বোমাযুক্ত দূর-পাল্লার মিসাইল তৈরী ক'রে পৃথিবীর অপরপ্রান্তের লক্ষ-লক্ষ নরনারীকে চোখের পলকে ছাই এবং দেশকে দেশ উজাড় ক'রে দিতে পারবো। আরো দু-চার দশক পরে তো আমাদের ধনকুবেররা চন্দ্রালোকে নৌকা-বিহার না-ক'রে মধুযামিনী যাপন করবেন চন্দ্রপৃষ্ঠেই।

এই বিজ্ঞানকে বলি ফলিত বিজ্ঞান। তার মূল্য অনস্বীকার্য। ফলিত বিজ্ঞান থেকে বঞ্চিত হ'লে আমরা ফিরে যাবো লক্ষ বৎসর পূর্বের গুহাবাসী পুরাপ্রস্তর-ব্যবহারী আদিম মানুষের যুগে, কিংবা তারও পূর্বে। কিন্তু ফলিত বিজ্ঞান স্বাশ্রয়ী নয়, পরাশ্রয়ী; আশ্রয় ক'রে আছে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের উপর। আমাদের প্রতিবেশকে, শুধু প্রতি-

বেশকে কেন, দূরতম নক্ষত্র নীহারিকাকে এবং সেই সঙ্গে নিজের অন্তর্নিহিত সত্তাকে জানার স্পৃহাও বহু প্রাচীন। উপনিষৎকারদের বিশেষ সাধনা ছিলো নিজেকে জানা—আত্মানং বিদ্ধি ; সক্রেটিসেরও তাই—know thyself। কিন্তু প্রাক্-সক্রেটিস ভাবুকরা—তাঁদের দার্শনিক বলবো কি বৈজ্ঞানিক, ঠাহর করা শক্ত—জগতের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধানী ছিলেন। সে-জানা কেবল জানাব আনন্দেই জানা। সমগ্র দ্যাবাপৃথিবীর সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করার আনন্দেই অজ্ঞান-অন্ধকার ভেদ কবার জন্য থেলিস থেকে আইনস্টাইন পর্যন্ত কত মহাবিজ্ঞানী অক্লান্ত বিনিদ্র তপস্যা ক'রে গেছেন, ক'বে চলেছেন।

জ্ঞানের বেলা যেমন, সাহিত্যের বেলাও তেমনি। একদিকে আছে বিশুদ্ধ সাহিত্য, রসানন্দ ছাড়া সে-সাহিত্যের কাছ থেকে আর-কিছুই চাই না আমরা। কিসের আনন্দ ? জীবিকার অন্বেষণে এবং ক্রমশ কঠিন-হ'য়ে-আসা জীবনসংগ্রামে আমাদের সকলের দিন কাটে, বছর কাটে, মেজাজ হ'য়ে ওঠে লড়িয়ে, স্বার্থবোধ তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হ'তে থাকে, চিন্তা ভাবনা বেদনা হয় একান্ত আত্মকেন্দ্রিক। আত্ম-নিমগ্নতার অন্য পিঠ হচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবোধ। এই মানসিক একাকীত্ব আমাদের সুকুমার হৃদয়বৃত্তিকে পীড়া দেয়। শিল্প-সাহিত্যের মধ্যে আছে সে-পীড়ার উপশম। 'সাহিত্য' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—সাহিত্য তা-ই যা জগতের সঙ্গে আমাদের নিবিড় সহিতত্ব বা সংযোগ ঘটায়। গভীর অথচ অনুত্তরঙ্গ তার আনন্দ, তার চেয়ে পরিশুদ্ধ আর-কোনো আনন্দের কথা আমরা জানি না। প্রাচীনেরা ব্রহ্মোপলব্ধির সঙ্গে তুলনা ক'রে কাব্যরসোপ-লব্ধিকে বলেছিলেন "ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর"।

সাহিত্যের অন্য পিঠে আছে ফলিত সাহিত্য। থাকবে না-ই বা কেন ? প্রাচীনকালে সাহিত্যের মাধ্যমে ধর্মশিক্ষা নীতিশিক্ষা দেওয়া হ'তো, এমন-কি দার্শনিক তত্ত্বকথাও শেখানো হ'তো, যেমন উপনিষদের

শ্লোকে, প্লেটোর ডায়ালগ-এ। ইদানীং রাজনীতিক প্রয়োজনে সাহিত্যের ব্যবহার দেখি। শ্রেণীচেতনা, শ্রেণীসংগ্রাম, সমাজবিপ্লব ইত্যাদির উপযুক্ত মনোভূমি তৈরী করা এবং বিপ্লবের পর শ্রেণীহীন সমাজগঠনে অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা জাগানো—এমনতর সব মহৎ কাজের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সাহিত্যিকরা, কোথাও স্বেচ্ছায়, কোথাও-বা রাষ্ট্রবিধাতাদের আদেশে। জবরদস্তি অবশ্য নিন্দনীয় এবং শেষ পর্যন্ত অফলপ্রসূ। কিন্তু স্বেচ্ছায় ও সোৎসাহে যদি সাহিত্যিকরা তাঁদের বহু যত্নে-গড়া এই শক্তিশালী মাধ্যমকে শ্রেণীযুদ্ধ ও সমাজগঠনের মোক্ষম অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেন তবে তাতে দোষের বা নিন্দার কিছু নেই। মহৎ কাজের মহান অস্ত্র হওয়ায় সাহিত্যের অগৌরব হ'তে যাবে কেন? অগৌরব হয় তখনই যখন এইসব সাহিত্যরথীরা কিংবা তাঁদের সারথী রাজনৈতিক নেতারা ফরমান জারি করেন—শুধু এটাই সৎ-সাহিত্য, রাষ্ট্রিক যত্নে ও সমাদরে লালনীয় সাহিত্য; বাদবাকী সব লেখাই অসৎ, ঝুটা, বুর্জোয়া, ফ্যাশিস্ট, ইত্যাদি; অতএব শুধু নিন্দনীয় নয়, কঠোর হস্তে দমনীয়।

বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, এমন-কি তার বিশুদ্ধতম শাখা বিশুদ্ধ গণিত, কোথাও অবদমিত হয়েছে ব'লে শুনিনি। তার প্রধান কারণ অবশ্য এই যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ ও ফলিত বিজ্ঞানের মধ্যবর্তী সীমান্ত-রেখা স্থির নয়, সর্বদাই চলনশীল, কখনো-বা ধাবমান। আজ যেটা বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের অন্তর্গত, অর্থাৎ জ্ঞানপিপাসা মেটানো ছাড়া মানুষের অন্য-কোনো কাজে লাগছে না, তা কালই ফলিত হ'য়ে কোনো ভয়াবহ আয়ুধ, মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ কিংবা নিছক বিলাসদ্রব্য উৎপাদনের কাজে লেগে যাবে কিনা কেউ বলতে পারে না। কাজেকাজেই কী সমাজবাদী কী পুঁজিবাদী কোনো দেশে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিকরা নিগৃহীত নন, রাষ্ট্রগুরু বা দলনায়কদের হুকুমবরদারী করতে হয় না তাঁদের, বরঞ্চ তাঁরা জামাই-আদরই পেয়ে থাকেন। কিন্তু এ-আদরের মধ্যে অপমান প্রচ্ছন্ন।

একনিষ্ঠ প্রতিভাদীপ্ত সাধনার যে মহৎ উদ্দেশ্য তাঁদের কাছে প্রতিভাত এবং তাঁদের অনুক্ষণ প্রেরণা জোগায়, সেটি হচ্ছে জগতেরই সত্যরূপকে জানা এবং সেই জানার মধ্যে আনন্দলাভ করা। এ-উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত হ'য়েও সামাজিক, কারণ জ্ঞানীদের সত্যোপলব্ধি এবং জ্ঞানানন্দ সকলের জন্যই, কোনো বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। জ্ঞানীর কাজের এই আধ্যাত্মিক মূল্য অস্বীকার বা স্বল্পায়িত ক'রে তাঁকে প্রযুক্তিবিদ্যার জোগানদার ভাবাকেই আমি বলতে চাই জ্ঞানীর অবমাননা।

সে যা-ই হোক্, আপাতত আমার আলোচনার বিষয় বিশুদ্ধ জ্ঞান ও বিশুদ্ধ সাহিত্যই।

জ্ঞানী এবং কবি। 'কবি' শব্দ দ্বারা আমি মহাকাব্য-রচয়িতা ও নাট্যকার এবং আধুনিককালের কথাসাহিত্যিক সবাইকে বোঝাতে চাই (প্রসঙ্গক্রমে ব'লে রাখি যে আমার বিবেচনায় লিরিক বা গীতি-কবিতা সাহিত্যের ক্ষুদ্র এবং গৌণ বিভাগ; জানি-না কেন তা হালের সমালোচনায় এতখানি মান ও স্থান অধিকার ক'রে বসেছে)। জ্ঞানী এবং কবি দু-জনই এই অনেকান্ত জগতের দুই ভিন্ন রূপ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন করছেন, স্বকীয় চিত্তের ঈষদাবর্জিত মুকুরে প্রতিবিম্বিত করছেন। একজন বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে চান তার যতটা বোধগম্য, যতটা সুশৃঙ্খলিত ও নিয়মানুগ। সে বোধগম্য রূপটাকে আমরা বলি সত্য। অন্যজন হৃদয় দিয়ে অনুভবের মধ্যে বিশ্বভুবনকে পেতে চান। এই অনুভূত রূপটাকে আমরা বলি সুন্দর। ব'লে রাখা ভালো যে বুদ্ধির কাজ অর্থাৎ জ্ঞানান্বেষণ কখনোই একেবারে অনুভূতি-বর্জিত নয়; এবং অনুভূতির প্রকাশ অর্থাৎ বিশুদ্ধ কাব্যও কখনো বুদ্ধি ও বুদ্ধিগ্রাহ্য জ্ঞানের স্পর্শ এড়াতে পারে না। মাত্রার তারতম্য নিয়ে কথা; সে-তারতম্য বেশি হ'লে মাত্রাভেদ গুণভেদে পরিণত হয়, অন্তত প্রতিভাত হয়। দ্বিতীয়ত, 'সুন্দর' কথাটা এখানে খুব বড়ো অর্থে ব্যবহার

করা হচ্ছে, তার মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অনেক সীমিত কুৎসিতের স্থান আছে। সব খণ্ড-খণ্ড সুন্দরের মধ্যে এই পরম সুন্দরের ইঙ্গিত থাকে, সব খণ্ড সত্যের মধ্যে এই পরম সত্যের আভাস। প্রথমটা প্রতিফলিত হয় আমাদের শিল্পে-সাহিত্যে, দ্বিতীয়টা দর্শনে-বিজ্ঞানে।

বরঞ্চ আত্মীয়তা আরো নিকট। এ-কথা কি অস্বীকার করা যায় যে আইনস্টাইনের বিশেষ ও সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ, শ্রোডিঙের হাইসেনবের্গ প্রভৃতির পরমাণুবাদ, জড়জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-তত্ত্ব, এমিবার মতো এককোষী জীব কিংবা আরো পেছিয়ে গেলে ভাইরাস-কণা (যাকে জীবপদার্থ বলবো কি জড়পদার্থ, ঠাহর করা শক্ত) থেকে মানুষ পর্যন্ত প্রাণধারার ক্রমবিবর্তনবাদ,—এ-সবও 'মোনালিসা' কিংবা 'শ্যামা' থেকে ঈষৎ ভিন্ন অর্থে কিন্তু সদর্থে সুন্দর, বোধগম্যতার স্বাদে মেশায় অগম্যের মাধুরী, পরিতৃপ্ত করে শুধু বুদ্ধিকে নয়, রহস্যবোধকেও, একটু ব্যাপকভাবে বলতে গেলে, রসবোধকেও! আবার কোনো সাহিত্যসৃষ্টিতে যদি সত্যের কতকটা তির্যক কিন্তু অন্তর্গূঢ় উদ্ভাস না-থাকে তবে তা মহৎ সাহিত্যের মর্যাদা পায় না, সৌখিন বা ডেকরেটিভ আর্টের কোঠায় পড়ে, জড়োয়া গয়নার মতন নয়নাভিরাম হ'য়েও জড়োয়া গয়নার মতনই অকিঞ্চিৎকর থেকে যায়। উদাহরণত, সত্যেন দত্তের কিছু কবিতার উল্লেখ করা যায় এখানে। ছন্দের টুং-টাং শুনতে বেশ লাগে, কিন্তু প্রায়শই তার চেয়ে নিবিড় কোনো অনুভূতি জাগায় না আমাদের মনে। "জাগিয়ে দিয়ে সকল আকাশ পূর্ণতা বিস্তারো"—রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তাঁর হৃদয়েশ্বরকে সম্বোধন ক'রে; তাঁরই হৃদয়ের প্রকাশ যে-সব মহৎ কাব্যে ও গানে, তাকে সম্বোধন ক'রেও বলতে পারতেন। বললে আমাদের মনের কথাটা বলতেন। কিন্তু "ইলশে গুঁড়ি! ইলশে গুঁড়ি! ইলিশ মাছের ডিম" কিম্বা "ঝর্ণা, ঝর্ণা, সুন্দরী ঝর্ণা"-র লেখককে সম্বোধন ক'রে আমরা সে-কথা বলতে পারি না, ভাবতেও পারি না।

কবিতার সত্য অবশ্য বিজ্ঞানের সত্য থেকে ভিন্ন; সরেজমিন তদন্ত ক'রে, অঙ্ক ক'ষে বা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে তা সাব্যস্ত করা যায় না। পাঠকের পরিণত পরিশীলিত হৃদয়ের গভীরে যদি সাড়া জাগে তবে সেই হৃদয়ের স্বাক্ষরেই কবির উপলব্ধি সত্যের মর্যাদা লাভ করে। ডেকরেটিভ আর্ট—যার একমাত্র কাজ চোখ বা কানকে খুশী করা—কোনোপ্রকার সত্যের দাবী করতে পারে না। তার সৌন্দর্যও উপরিতলের সৌন্দর্য, গভীরতা নেই তাতে।

আগেই জানিয়েছি জগতের সৌন্দর্য আমরা সম্ভোগ করি তার কুশ্রীতা-কদর্যতাকে বাদ দিয়ে নয়। এফ. আর. লীভিস্ যদি ব'লে থাকেন যে কীট্‌স্-এর সুন্দরের ধ্যান ছিলো অসুন্দরকে বেখাপকে বেসুরকে আড়ালে রেখে, তবে তিনি কীট্‌স্‌কে ছোটো ক'রে দেখেছেন। আমার বিচারে এই ভাগ্যহত ক্ষয়রোগগ্রস্ত যুবা আরো উঁচুদরের কবি। তিনি জীবনের "The weariness, the fever, and the fret" মর্মে-মর্মে বোধ করেছিলেন, চোখের সামনে দেখেছিলেন নিজের ছোটো ভাইকে অসহায় যন্ত্রণায় তিলে-তিলে ক্ষয় হ'তে—"Where youth grows pale and spectre-thin and dies"। তাঁর কবিতায় অমঙ্গলবোধ ঈষৎ প্রচ্ছন্ন থাকলেও গভীর, সমগ্র মানবজাতির যন্ত্রণায় তাঁর হৃদয় ছিলো অনুকম্পিত। রবীন্দ্রনাথের, বিশেষত শেষ পর্বের রবীন্দ্রনাথের, বেলা এ-কথা আরো সত্য, এবং সে-সত্যের প্রকাশ আরো ব্যাপক ও বিচিত্র। 'রোগশয্যায়'-এর ২১ সংখ্যক কবিতাটির মর্মার্থ সংহত হয়েছে দুটি পংক্তিতে :

লক্ষ কোটি গ্রহতারা আকাশে আকাশে
বহন করিয়া চলে প্রকাণ্ড সুষমা।

"প্রকাণ্ড সুষমা" ইংরেজি সাব্‌লিমিটির অনুরণন জাগায় মনে—যার উপাদানে awe এবং majesty দুই-ই বিধৃত। সত্যের মুখের উপর

থেকে একটার পর একটা হিরণ্ময় আবরণ উন্মোচন ক'রে সব-কিছুকে স্বীকার ক'রে, একপ্রকার বৈরাগ্যমিশ্রিত অনুরাগের গেরুয়া রঙে রাঙিয়ে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পৌঁছেছিলেন তাঁর কাব্যসাধনার শেষ পর্যায়ের ট্র্যাজিক আনন্দে।

আমি বিশ্বাস করি যে সত্যান্বেষী এবং কবি উভয়ের লক্ষ্য মানবিক ও প্রাকৃতিক জগতের সব-কিছুকে তার সমগ্র স্বরূপে দেখা। সমগ্রকে দেখতে হ'লে একটু দূর থেকেই দেখতে হয়; খুব কাছ থেকে খণ্ড-বিশেষকেই দেখা যায় এবং বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখা যায়। গাছ থেকে আপেল ফল পড়লো মাটিতে, এটা সত্য কথা কিন্তু তুচ্ছ সত্য। শুধু একটি আপেল নয়, সব-কিছুই মাটির দিকে পতনশীল। চন্দ্রও পৃথিবীর দিকে পড়ছে এবং পৃথিবী সূর্যের দিকে। সূর্যের দিকে এই টান এবং একটি প্রাথমিক-ট্যান্‌জেন্‌শাল গতিবেগের যোগফল হচ্ছে সৌরমণ্ডলের ন-টি গ্রহের উপবৃত্তাকার কক্ষপথ। গাছ থেকে একটি পাকা ফল প'ড়ে যাওয়া সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষগোচর দৈনন্দিন ঘটনা। এই ক্ষুদ্র ঘটনাকে মহাজাগতিক মাধ্যাকর্ষণতত্ত্বের প্রেক্ষিতে দেখা হচ্ছে আরো বড়ো সত্য, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে দেখা সত্য। বিজ্ঞানীর নিরন্তর চেষ্টা এমনি বড়ো ক'রে দেখা, প্রত্যেকটি ঘটনাকে একটি বৃহৎ নিয়মের দৃষ্টান্তরূপে দেখা, এবং সেই নিয়মকে আরো বৃহত্তর নিয়ম বা তত্ত্বের অঙ্গীভূত করা। এমনিভাবে যখন তিনি যে-কোনো বিচ্ছিন্ন তথ্যকে সমগ্র জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্যযুক্ত ক'রে এবং সেই তথ্যের সীমিত রূপ-রেখার মধ্যে যেন সমগ্র বিশ্বজগতের স্বরূপটিকে প্রতিফলিত ক'রে দেখেন তখনই তাঁর দেখা সার্থক, তিনি সত্যদ্রষ্টা। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবশ্য সমন্বয়ের উপলব্ধি বুদ্ধি-নির্ভর।

কবির দৃষ্টি বিশেষকে নিয়েই পুলকিত বা বেদনার্ত। তিনি বিশেষের মধ্যে তার অন্তর্নিহিত অনন্ত সত্যের রূপটি ঈষৎ উদ্‌ঘাটন করতে চান, গান বাঁধতে চান তারই ছন্দে; সাধারণ নিয়ম বা তত্ত্বের খোঁজ করেন

না ; বিমূর্ততার (abstraction-এর) সঙ্গে তাঁর জন্মের মতো আড়ি। কিন্তু বিশেষ—হোক্ তা কোনো-এক বিকেলের শারদাকাশে দেখা রামধনু, কোনো বিজন সন্ধ্যার ঘনায়মান প্রদোষান্ধকারে শোনা বুল-বুলির গান, মেঠো পথের এক পাশে প'ড়ে-থাকা পশুর কঙ্কাল, কিংবা গভীর রাত্রে রোগীর শয্যাপাশে একজন স্নেহব্যাকুলা শুশ্রূষাকারিণীর জাগ্রত আবির্ভাব—তার বিশেষত্ব ক্ষুদ্র চতুঃসীমানার মধ্যে আবদ্ধ নয়, তা কাব্যিক বিশেষ, অর্থাৎ তা স্বধর্মতঃ ইঙ্গিতময়, ব্যঞ্জনাঘন। কিসের ব্যঞ্জনা ? প্রথম স্তবে অবশ্য সেই অভিজ্ঞতার অভিঘাতে কবির মনে জেগে-ওঠা সূক্ষ্ম ও জটিল আবেগপুঞ্জেরই ব্যঞ্জনা। কিন্তু আবেগ অন্তরে অবস্থান করলেও বহিরাশ্রয়ী ব্যাপার, এবং তার আশ্রয় কাব্যোক্ত ঐ ছোটো সীমিত অনেকাংশে কাল্পনিক বস্তু বা ঘটনামাত্র নয়। কী তবে ? এটুকু বলা সহজ যে ঐ বিবৃত নির্দিষ্ট বিশেষকে ছাড়িয়ে সে ইঙ্গিত বহুদূরে প্রসারিত, বহুদূরের সংবাদবহ। "The poet speaks to us of one thing, but in this one thing there seems to lurk the secret of all." কবিও চান জাগতিক সমন্বয় উপলব্ধি করতে, গ্রীশান ভস্মাধারের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডকে দেখতে। কিন্তু দূরবীক্ষণের ভিতর দিয়ে নয়, গণিতের সাহায্যে নয় ; হৃদয় দিয়ে, কল্পনার কম্পমান প্রদীপশিখার আবছা আলোয়।

দূরে কোথায় দূরে দূরে
মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে—

শুধু কবির মন নয়, জ্ঞানান্বেষীর মনও। এইখানে আমি সত্যের সঙ্গে সৌন্দর্যের সাধর্ম্য লক্ষ্য করি।

ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য নিয়ে কর্মী—রাষ্ট্রবিপ্লবী, সমাজহিতব্রতী বা কুষ্ঠ-রোগীর শুশ্রূষাকারী—ব্যতিব্যস্ত নন। তাঁর কাজের জন্য, উপস্থিত প্রয়োজনসাধনের জন্য, যতটুকু দেখা দরকার তার বাইরে তিনি তাকাতে

নারাজ। মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরলে তাঁর কাজ চলে না অবশ্য, কিন্তু ছোটো সত্যকে নিয়ে তাঁর কাজ চলে, তাতেই কাজ বেশি ভালো চলে। বড়ো সত্যের কথা ভাবা তাঁর পক্ষে সময় ও শক্তির অপব্যয়। মঙ্গল-সাধন যাঁর ব্রত তিনি মিথ্যাশ্রয়ী নন, তবে ছোটো সত্যের ক্ষুদ্র আয়তনের উপরই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। তাঁর পক্ষে দৃষ্টির সংকোচটাই প্রয়োজনীয়; খুব বেশি প্রসার কর্মজীবনে বিঘ্ন ঘটাবে। কর্মীর মনও যদি দূরে-দূরে সকল দেশ পেরিয়ে ঘুরে বেড়াতে শুরু করে তবে কাজ এগোয় না। ধ্যানী থাকুন আপন খেয়াল ধ'রে। এমন 'খ্যাপা'র সংখ্যা অল্পই হবে সব সমাজে।

সত্য ও সুন্দরের সঙ্গে শিবের নামটিও যুক্ত, কিন্তু শিব ভিন্ন মন্দিরের দেবতা, ভিন্ন উপাচার দিয়ে তাঁর পূজা সম্পন্ন হয়। সত্য এবং সুন্দরের সাধক, অর্থাৎ জ্ঞানী এবং শিল্পী, উভয়ই ধ্যানী (contemplative) মানুষ; শিবের পূজারী সামাজিক কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ, মঙ্গলকর্মই তাঁর ব্রত, কর্মমার্গ ই তাঁর পন্থা। বলা বাহুল্য, এই অনুষঙ্গে শিবকে আমি কেবলমাত্র মঙ্গলের দেবতারূপেই কল্পনা করছি। বিরোধ বললে অতিশয়োক্তি হবে, কিন্তু বিভেদটা মৌলিক। মার্কসের ক্লাসিক ভাষাতেই তা ব্যক্ত করি—"দার্শনিকেরা এ-যাবৎ জগৎকে বুঝতেই চেয়েছেন, আসল কথা হচ্ছে জগৎটাকে ঢেলে সাজানো (the point is to change it)।" দার্শনিকরা যেমন, কবিরাও তেমনি; তবে "বুঝতে চেয়েছেন" না-ব'লে বলবো "সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন"। ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, দলভুক্ত ও দলবহির্ভূত নির্বিশেষে সকল মানুষের স্থায়ী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এই পোড়া জগৎটাকে, অন্তত তার সমাজ-ব্যবস্থাটাকে, ভেঙে নতুন ক'রে গড়ার অত্যন্ত প্রয়োজন আছে এ-কথা কে অস্বীকার করবে। এই প্রয়োজনের ডাক আমাদের অন্তর্নিহিত কর্মীসত্তাকে উদ্বুদ্ধ করে। বাইরের জীবনে যদি তার প্রকাশ না-ঘটে তবে আমরা অসম্পূর্ণ থেকে যাই এবং

অসম্পূর্ণতাবোধে কষ্ট পাই—যেমন পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কীট্‌স্, য়েট্‌স্।

কিন্তু আমাদের অন্তঃকরণে অন্য-একটি মৌল সত্তা রয়েছে, তাকে বলবো ধ্যানীসত্তা। 'আমি'র এই ধ্যানী ব্যক্তিস্বরূপের সাধনা ও সার্থকতা ঐ শুভাশুভে মিথুনীকৃত জগৎকে বুদ্ধির দ্বারা বা অনুভবের দ্বারা (কল্পনার যথোপযুক্ত ব্যবহার উভয় ক্ষেত্রেই রয়েছে) সম্যক্‌রূপে এবং সমগ্ররূপে উপলব্ধি করাতেই। ধ্যানের সুদূরপ্রসারী সর্বগ্রাহী ও সর্বংসহ দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখবো, এই অনন্ত জগৎচরাচর সত্যি-সত্যি আদ্যোপান্ত বীভৎস বা ন্যক্কারজনক নয়; ঈশাবাস্যং কি না সে-তর্ক না-তুলেও বলা যায় তা একটি বিরাট গোলাপের মতো সুন্দর—শত-শত পোকামাকড় ঝরা-পাতা মরা-পাপড়ি সত্ত্বেও। "বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে / দেখিস নে কি শুকনো পাতা ঝরা ফুলের খেলা রে"। এ-দেখা নান্দনিক, দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক দেখার সঙ্গে তার মিল না-হ'লেও মিতালি রয়েছে। কিন্তু শ্রেয়োনীতিক বিচারে বালক অমলের মতো আধফোটা ফুলের শুকিয়ে ঝ'রে যাওয়াকে 'খেলা' ব'লে অত সহজে মেনে নেওয়া যায় না।

জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় (Unity of theory and practice) ভালো কথা; আরো ভালো কথা জ্ঞান ও কর্মের সদ্ভাব, সহবাস, এবং সমমূল্যায়ন। কিন্তু কর্মের জন্যই জ্ঞান, প্র্যাক্‌টিসের জন্যই থিয়োরী —এ-কথা কারো-কারো কাছে প্রামাণিক ঠেকলেও স্বতঃপ্রামাণ্য (self-evident) নয়। প্র্যাক্‌টিসের উদ্দেশ্য তো সর্বহারাদের বঞ্চিত জীবনকে সচ্ছল ক'রে তোলা। কিন্তু শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে কী হবে যদি মন উপবাসী থাকে, যদি আমাদের কবিরা দার্শনিকেরা মনে-প্রাণে রাজনীতিক হ'য়ে পড়েন, অথবা রাজনীতিকের আজ্ঞাবহ। তাঁদের দৃষ্টি যেন কেবল উপস্থিত প্রয়োজন এবং স্বল্পকালীন দাবীদাওয়ার উপর নিবদ্ধ না হয়, যেন থাকে মহাকালে ও বিশ্বলোকে সম্প্রসারিত।

শ্রেয়োনীতিক দৃষ্টি তৎসাময়িক এবং বিশেষরূপে অমঙ্গলের উপর সংহত, অমঙ্গলের পরিব্যাপ্তিতে নিরতিশয় পীড়িত ও বিক্ষুব্ধ, ন্যায়-বিচারোত্থিত উষ্মায় অস্থির, ঈশ্বরকে পর্যন্ত ক্ষমা করতে অনিচ্ছুক। প্রতিতুলনায়, নান্দনিক তথা দার্শনিক দৃষ্টি দেশকালের কোনো ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ নয়, বিশ্বজাগতিক পটভূমিকায় সাদা ও কালোর বর্ণ-যোজনা যে প্রকাণ্ড সুষমা ফুটিয়ে তোলে তা আবিষ্কার ক'রে বিস্মিত আনন্দে, হয়তো-বা বিষাদেও, স্নিগ্ধ, সর্বদাই উষ্মা ও বিক্ষোভ-রহিত। শান্তোঽয়মাত্মা—অর্থাৎ কবির আত্মা; কর্মীর আত্মা অশান্ত থাকাই ভালো। প্রশান্তি বা ট্রাংকুইলিটি কবির স্থায়ী ভাববিন্যাস (enduring mood)। আলংকারিকরা শান্তরসকে বলেছেন সব রসের মূল রস। রাগ, ব্যস্তসমস্ততা, অধৈর্য, এমন-কি ঘৃণাও, কর্মীকে মানায়; কবির পক্ষে একান্ত বেমানান। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি লড়াই-ঝগড়া গাল-মন্দ করুন, তাতে আমাদের বলবার কিছু নেই। কবিতার মধ্যে তিনি যেন মুদ্গর না-ঘোরান, সহিষ্ণুতা না-হারান।

নান্দনিক দৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত ক্ষমাশীল, যত বিচিত্র বিসদৃশ উপাদান গ্রহণে ও আত্মীকরণে সক্ষম, শ্রেয়োনীতিক দৃষ্টি ততটা নয়। 'বিকৃতি না ঘটায় স্খলন'—বিচারটা নান্দনিক, শ্রেয়োনীতিক নয়। "প্রশ্ন" কবিতাটি শ্রেয়োনীতিমূলক ব'লেই ক্ষমাহীন; অক্ষমাই সেখানে সমুচিত ভাব :

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো।

'শ্যামা' নাটকটি নান্দনিক পরিপ্রেক্ষিতে রচিত, তাই ক্ষমায় এমন ভরপুর, ক্ষমাই তার আদি এবং অন্ত সুর :

জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের ভারে
চরণে তব বিনতা।

ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা,
পাপীজনশরণ প্রভু ॥

ঈশ্বর যাকে ক্ষমা করবেন ব'লে বজ্রসেন বিশ্বাস করে তাকে সে নিজে ক্ষমা করতে পারলো না ; এই ক্ষমাহীনতার আঘাতে এমন দুর্লভ প্রেম ভেঙে-চুরে ধূলায় লুটিয়ে পড়লো। অথচ বজ্রসেনের ক্ষমাহীনতা আমরা ক্ষমা করি, তার নীতিবোধের প্রখরতা এবং কঠোরতা আমাদের প্রশংসাই অর্জন করে—বিশেষত যখন দেখি পাপিষ্ঠা প্রণয়িনীকে শাস্তি দিতে গিয়ে সে নিজেও কী নিদারুণ শাস্তি বহন করলো। ঈশ্বরও শেষ পর্যন্ত পাপিষ্ঠা এবং পাপিষ্ঠার প্রাণদণ্ডদাতা দু-জনকেই ক্ষমা করবেন, নইলে 'পাপীজনশরণ প্রভু' এই গীতিনাট্যের অন্তিম বচন (এবং অন্তিম বিচার ?) হ'তো না।

খণ্ডকে অনন্ত দেশকালে পরিব্যাপ্ত ক'রে সমগ্রের পটভূমিকায় ন্যস্ত ক'রে দেখাকে বলেছি নান্দনিক দৃষ্টি। সাধনাসাপেক্ষ সে-দৃষ্টি। পক্ষান্তরে, যে-সব কুশ্রীতা ও বিকৃতি উপস্থিত মুহূর্তে আমাদের আশ-পাশের সমাজচিত্রকে তথা জগৎচিত্রকে ধেবড়ে দিয়েছে, শ্রেয়োনীতিক দৃষ্টিতে সেগুলিই খুব বড়ো আকারে ম্যাগনিফাইড হ'য়ে দেখা দেয়। তা-ই সঙ্গত। নইলে এ-সবের প্রতিবিধান হবে কেমন ক'রে, আমরা সংগ্রামের শক্তি ও প্রেরণা পাবো কোথা থেকে ? বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থাটাকে ঢেলে সাজাবার কাজে যিনি আপন সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছেন, তাঁর সময় কোথায় এ-বিশ্বকে তার সমগ্রস্বরূপে দেখবার ? সে-প্রবৃত্তিও তাঁর নেই।

ধ্যানীসত্তা ও কর্মীসত্তা সব মানুষের মধ্যেই আছে, তবে শুধু প্রবণতারূপে, অঙ্কুররূপে। উভয় পথে কিছুদূর এগুনো অনেকের পক্ষে অসাধ্য নয়। কিছুদূর এগুনো সকলের সাধনীয়ও বটে। কতক-গুলি পারিবারিক ও সামাজিক কর্মভার প্রত্যেক ব্যক্তিকে গ্রহণ

করতেই হয়, নইলে সে সজ্জন ব'লে গণ্য হ'তে পারে না। স্ত্রী-পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা না-ক'রে কেউ যদি অহর্নিশি সাহিত্যচর্চায় মেতে থাকে তবে সে সকলের নিন্দাভাজন হবে। কতকগুলি নৈতিক নিষেধাজ্ঞা সকলকেই পালন করতে হয়—যথা কাউকে প্রতারণা না-করা, স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরার্থে হস্তক্ষেপ না-করা, নিজের বা নিজের দলের সুবিধার জন্য কারো চরিত্রহনন না-করা, ইত্যাদি।

অবশ্যকর্তব্য কর্মের পরিধি ছাড়িয়ে আরো বড়ো সামাজিক কর্মের দায়িত্ব যিনি ঘাড় পেতে নেন, এবং সেটা সুসম্পন্ন করার জন্য অশেষ ত্যাগ ও দুঃখবরণ করেন—গান্ধীজীর মতন, শোয়াইৎসারের মতন, মাদার টেরেসার মতন, জয়প্রকাশের মতন, পান্নালাল দাশগুপ্তের মতন—তিনি নিশ্চয়ই আমাদের সকলের প্রণম্য, তাঁর কাছে আমরা সবাই ঋণী। কিন্তু যদি কেউ সে-দিকে পা না-বাড়িয়ে কবিতা লেখা, দার্শনিক চিন্তা করা, বা শুধু ভালো ফুটবল খেলার জন্য তাঁর সমস্ত অবসর সময় নিয়োগ করেন তবে তিনি কোনোমতেই নিন্দার্হ নন। নৈতিক কর্তব্য অবশ্যপালনীয়, কিন্তু নৈতিক বীর্য-শৌর্য আবশ্যিক নয়, ঐচ্ছিক। কোনো নির্জন স্থানে একজন নিরীহ পদাতিককে ঘেরাও ক'রে পাঁচজন সশস্ত্র গুণ্ডা মারছে তার মাইনের টাকাটা ছিন্‌তাই করার জন্য—এ-দৃশ্য দেখে কেউ যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে বিপন্ন লোকটির প্রাণ ও বিত্ত রক্ষা করার উদ্দেশ্যে, এবং তা করতে গিয়ে নিশ্চিত মৃত্যু বরণ করে তবে সে moral hero, বীরের সম্মান তার প্রাপ্য। কিন্তু আর-একজনের বীরত্ব যদি ছোটো মাপের হয় এবং সে এগিয়ে না-যায়, তবে সে শ্রদ্ধাভাজন নয়, কিন্তু অবজ্ঞার পাত্রও নয়। পিছিয়ে পড়ার দ্বারা সে প্রমাণ করলো যে সে অতি সাধারণ মানুষ, তার চেয়ে খারাপ কিছু নয়। এবং সে কবি বা বৈজ্ঞানিক হিসাবে অসাধারণ ও স্বক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় হ'তেও পারে।

শিল্প-সাহিত্যের বা দর্শন-বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ চর্চা সবাইকে করতে

হবে এমন কথা কাউকে বলতে শুনিনি। কিন্তু গ্রামোন্নয়ন বা শ্রেণী-সংগ্রামের ডাকে সবাইকে (বিশেষত বুদ্ধিজীবিগণকে) সাড়া দিতেই হবে এমন কথা মাঝে-মধ্যে শুনি। কথাটা ভ্রান্ত। সাহিত্যরচনা বা জ্ঞানান্বেষণ অবজ্ঞেয় কর্ম নয়। সেটা ছেড়ে চিত্তকর্মীকে চাষী-মজুরদের অবস্থার উন্নতিবিধানের কাজে (বৈপ্লবিক বা গণতান্ত্রিক উপায়ে) লাগতেই হবে—এ-দাবী অন্যায়। বিশেষ কোনো জরুরী অবস্থায়, যথা প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধাবস্থায়, সেটা সঙ্গত হ'তে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় সবাই কলম ছেড়ে বন্দুক বা লাঙল ধরলে কলমের কাজটা বন্ধ হ'য়ে যায়, পিছিয়েও পড়ে। সেটাও সমূহ ক্ষতি।

গান্ধীজী কর্মীশ্রেষ্ঠ হ'য়েও ধ্যানস্নিগ্ধ রেখেছিলেন নিজের ব্যক্তিত্ব-কে। রবীন্দ্রনাথ অত বড়ো ধ্যানী হ'য়েও অনেক শুভকর্মের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তবু গান্ধীজীকে কর্মী ব'লে আমরা ভক্তি করি, রবীন্দ্রনাথকে কবি ব'লে। একই ব্যক্তির পক্ষে যদি একাধারে ধ্যানে ও কর্মে নিজেকে সম্যক্ বিকশিত করা সম্ভব হ'তো তবে তিনি হ'তেন পূর্ণ মানুষ, নরোত্তম। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, এমন মানুষের অস্তিত্ব অত্যন্ত বিরল, ইতিহাস থেকে নজীর পাড়া খুবই শক্ত। লেনিন ও বিবেকানন্দের কথা সহজেই মনে আসে। কর্মীরূপে লেনিনের ব্যক্তিত্ব ছিলো অসাধারণ, অতুলনীয় প্রতিভা-সম্পন্ন। কিন্তু তাঁর দার্শনিক চিন্তা তুল্যমূল্য নয়; মৌলিকতার অভাব তো ছিলোই, তা ছাড়া তিনি নিজে তাঁর দার্শনিক রচনাকে রাজনৈতিক সংগ্রামের, অর্থাৎ কর্মের, অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছেন; একটি সর্বাঙ্গসুন্দর পূর্ণাঙ্গ বিশ্ব-নিরীক্ষা গ'ড়ে তোলাকে (সেটাই প্রকৃত দর্শন) চরমমূল্য দেননি। বিবেকানন্দ কর্মযোগী হিসাবে আমাদের সকলের প্রণম্য, কিন্তু দার্শনিক পর্যায়ে তাঁর স্থান উত্তুঙ্গ নয় ব'লে আমার বিশ্বাস। বলা বাহুল্য, এঁরা কেউ কবি বা শিল্পী ছিলেন না। আসল কথা, ব্যক্তিত্বের স্বরূপবৈশিষ্ট্য (personality type) অনুযায়ী কেউ বরণ করেন ধ্যানের পথ,

কেউ কর্মমার্গ। আবার ধ্যানীর মধ্যে কেউ বেছে নেন চিন্তার কাজ, কেউ সৃষ্টির।

স্থিতি ও গতির মধ্যে, ধ্যান ও কর্মের মধ্যে, সামঞ্জস্য কোথাও আছে নিশ্চয়ই। সে-সামঞ্জস্য সম্ভবত জটিল এবং তার অনেকখানি আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। একদিক দিয়ে সামঞ্জস্য কি এই যে কর্মী চান সামাজিক অবস্থার এমন পরিবর্তন যাতে সব মানুষের শুধু জৈবস্বাচ্ছন্দ্য ও আর্থিক উন্নতি নয়, স্বক্ষেত্রে নিজের-নিজের ধ্যানী-সত্তারও অবাধ বিকাশ সম্ভবপর হ'তে পারে? কিন্তু তাঁর জানা উচিত যে বাইরের অবস্থাকে কখনই সম্পূর্ণ মনের মতোটি ক'রে তোলা যাবে না, একটা coefficient of resistance থাকবেই, তার সঙ্গে চির-সংগ্রামের মধ্যেই আমরা পূর্ণ হবো, জৈব থেকে আধ্যাত্মিক হবো। নীড্‌হাম যাকে বলেছেন আমাদের ক্রীচার্‌লিনেস্‌ তার দুরপনেয় বাধা মানবিক পরিস্থিতির অবশ্যম্ভাবী উপাদান। তাকে মেনে নিতেই হবে। অর্থাৎ বাইরের পরিবর্তনের যেমন দরকার আছে, অন্তরের পরিবর্তনও তেমনি অত্যাবশ্যক। প্রাচীন ধর্মের পরিভাষায় সে-পরিবর্তনকে বলে আত্মশুদ্ধি, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভাষায় rectification of human emotions, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

> পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে,
> খসে যাবার, ভেসে যাবার
> ভাঙবারই আনন্দে রে।

বাইরের জগৎকে মনের মতন ক'রে গ'ড়ে তোলা এবং অন্তর্লোককে বহির্জগতের ছন্দে আন্দোলিত রাখা—এই দুটো বিপরীত প্রেরণাই মানবজীবনের মৌল প্রেরণা এবং চিরন্তন আদর্শ।

সামঞ্জস্য যদি-বা কোথাও থাকে, তবু ধ্যানী এবং কর্মী চলেন ভিন্ন পথে, ভাবেন ভিন্ন ভাবনা, তাঁদের চোখের সামনে বি-সদৃশ দৃশ্যপট। তাঁরা পরস্পরকে নমস্কার ক'রে চলবেন, এইটুকু কি আশা করা যায়

না? ধ্যানব্রতী যাঁরা তাঁরা হিতকর্মীর প্রতি অশ্রদ্ধাবান নন, এবং নিজের কর্মশক্তির অভাবে কিঞ্চিৎ বিবেক-পীড়িত। বলা বাহুল্য, আমি দার্শনিক ও কবির কথাই ভাবছি; সাধু-সন্ন্যাসীদের কথা নয়, তাঁরা আমার কাছে অজ্ঞেয়। দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে তেমন নয়, তবে শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে অবশ্য এমন কারো-কারো কথা আমার জানা আছে যাঁদের আত্মম্ভরিতা গগনচুম্ব' এবং অন্য সকলের প্রতি অবজ্ঞা অপরিসীম। এটাকে একধরনেব নিরীহ খ্যাপামি ছাড়া আর-কিছুই মনে করা যায় না। মনোবিজ্ঞানে বোধকরি এর নাম নার্সিসিজ্‌ম্। বর্তমান শতাব্দীতে আমাদের দেশ দুইজন মহামানবকে পেয়েছে—রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধী। এঁদের মধ্যে কে মহত্তর সে-বিচার যেমন অসম্ভব তেমনি নিরর্থক। এমনতর বিচারের কোনো মাপ-কাঠিই নেই আমাদের হাতে। তেমনি একজন মাঝারি সাহিত্যিককে একজন মাঝারি দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক বা সমাজকর্মীর চেয়ে বড়ো বা ছোটো বলার কোনো মানে হয় না।

শিল্পী-সাহিত্যিকদের দর্প থাকতে পারে, কিন্তু দাপট নেই। তাঁরা মূলত অহিংস মানুষ। ফিলিস্টাইন, বুর, বেরসিক, রুচিহীন, মূঢ় ইত্যাদি কয়েকটি শব্দের চেয়ে ক্ষুরধার বা বিষধর কোনো বাণ তাঁরা হানতে পাবেন না। ভয় হয় যখন দেখি একনিষ্ঠ সমাজকর্মীদের মধ্যে বিশুদ্ধ জ্ঞানব্রতী ও শিল্প-সাহিত্যসাধকদের প্রতি শুধু শ্রদ্ধার অভাব নয়, রীতিমত অসহিষ্ণুতার প্রকোপ—যদি তাঁরা সমাজ ভাঙা বা গড়ার অস্ত্ররূপে নিজের প্রতিভাকে ব্যবহার করতে গররাজী থাকেন। কর্ম-ব্রতীরা কর্মে মহান থাকুন, তাঁরা আমাদের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র, গর্বের বিষয়। কিন্তু তাঁরা ধ্যানব্রতীদের পথনির্দেশ করার যোগ্যতা ও অধিকার অর্জন করেছেন—এ ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হ'লে সামাজিক প্রগতির পথ সুগম হবে। ধ্যানীরা সত্য-সুন্দরের যে-রূপটি যেমন বুঝেছেন বা অনুভব করেছেন তার অনুজ্ঞাই তাঁদের পক্ষে চূড়ান্ত

অনুজ্ঞা, আর-কোনো অনুজ্ঞা মেনে চললে তাঁরা অধর্মাচরণ করবেন, স্বধর্মচ্যুত হবেন, মূলে বিনষ্ট হবেন।

সৎকর্মমার্গীরা ক্ষমতাশালী মানুষ হ'য়ে ওঠেন অনুকূল অবস্থায়। এঁরা যদি ভাবেন—কর্মের পথই একমাত্র পথ; "নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়" শুধু নয়, অন্য-সব পথ সুবিধাবাদীর পথ, শাসকশ্রেণীর দালালের পথ, ইত্যাদি; সুতরাং অন্য-সব পথের পথিকরা নিপাত যাক্—তবে ভয় হবারই কথা। পূর্ণতার পথ কোনোটাই নয়; কিন্তু দুটি পথ স্বতন্ত্র (আক্ষরিক অর্থে স্ব-তন্ত্র) হ'য়েও পরস্পরের সম্পূরক—এই ভাবচ্ছবিটি মনশ্চক্ষের সামনে রাখলেই সমাজের সর্বাঙ্গীণ কুশল নয় কি? কবির আবেদন স্মরণীয়:

এই কথাটি মনে রেখো, তোমাদের এই হাসিখেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়।

সংস্কার নয়, সর্বোদয় নয়, বিপ্লব নয়, সমাজগঠন নয়, শুধু গান গেয়েই কি কেউ সমাজের মহত্তম উত্তমর্ণদের মধ্যে গণ্য হ'তে পারেন না? *

* কথা থেকে কথা ওঠে; 'রাজা' নাটকের আলোচনাটাকে ঠাকুরদার কবি এবং কর্মী এই উভয়বিধ ভূমিকা অবলম্বন ক'রে আমি অনেক দূর টেনে এনেছি। এইখানে ক্ষান্ত হলাম। নইলে অন্য দুটি কথা প্রসঙ্গত উঠতেই পারে। প্রথমত, জ্ঞানকে বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানাভাস (ideology) এই দুই ভাগে বিভক্ত ক'রে বলা যায়—প্রাকৃতবিজ্ঞান বহির্জগৎকে প্রতিবিম্বিত করে, বিজ্ঞানাভাস (দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাসাদি) মূলত শ্রেণীস্বার্থেরই প্রতিবিম্ব। দ্বিতীয়ত, বিশুদ্ধ সাহিত্য ব'লে কোথাও কিছু নেই, সব সাহিত্যই হয় ধনিকশ্রেণীর নয় শ্রমিক-শ্রেণীর স্বার্থের কথাই রসিয়ে বলে। এ-বিতর্ক আমি বহু বৎসর পূর্বে তুলেছিলাম, কিন্তু সে-লেখাগুলি কোনো বইতে স্থান পাওয়ার যোগ্য নয়।

স খে র স খ্যঃ

(উমা দাশগুপ্ত বন্ধুবরেষু)

পাঁচ-ছয় বছরের ছেলের কথা ভাবতে গেলেই আমাদের মনে ছবি জাগে—প্রাণরসে টৈ-টম্বুর ছোট্ট এক টুকরো দুরন্তপনা হাঁফাতে-হাঁফাতে এসে মায়ের কানে দুটো কথা ব'লে একটি লজেন্স হস্তগত ক'রে ছুট দিলো সঙ্গীদের সন্ধানে: অন্য হাতে বুঝি একটা রঙীন রবারের বল ছিলো, নাকি লাটিম সেটা? যদি শুনি বাপ-মা-মরা পাঁচ বছরের ছেলে জ্বর গায়ে বিছানায় প'ড়ে-প'ড়ে কাশছে, ডাক্তারের নির্দেশে বিছানা থেকে ওঠা বারণ, তার সেরে ওঠার কোনো আশা নেই, তখন না-ব'লে পারি না—বিধাতার এ কী নিষ্ঠুর অবিচার! ঐটুকু ছেলে, সে তো জীবন থেকে কিছুই পেলো না, জগতের কিছুই দেখলো না, হৃদয়-ভরা অতৃপ্ত অস্ফুট বাসনা নিয়ে এখনই শেষ হ'য়ে যাবে—অসম্ভব, এ অসম্ভব। কিন্তু ঠিক তা-ই সম্ভব ক'রে তুললেন রবীন্দ্রনাথ। বিধাতাও তা-ই ক'রে থাকেন মাঝে-মাঝে, মাঝে-মাঝেই।

বিধাতার বিধান নিয়ে প্রশ্ন তোলা বৃথা, সে-প্রশ্নের আর্তস্বর শূন্যেই বাজতে থাকবে। তবে কবিকর্ম নিয়ে জিজ্ঞাসা সঙ্গতভাবেই জাগে মনে। কোন্ রবীন্দ্রনাথ এমন নিষ্করুণ অঘটন ঘটালেন? সেই রবীন্দ্রনাথ, যিনি তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতার প্রথম ছত্রে জগৎবাসীকে এবং দিব্যধামবাসিগণকেও সোল্লাসে জানিয়েছিলেন—শোনো তোমরা সকলে—"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে / মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।" এইটুকু ব'লে তিনি ক্ষান্ত হননি, অনেক বছর পরে সুপরিণত বয়সে ঐ তারুণিক গ্রন্থের ভূমিকায় উক্ত ঘোষণাটিকে লাল কালি দিয়ে দাগ দেবার মতন ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, সে-ঘোষণাটি তাঁর তাৎক্ষণিক হৃদয়োচ্ছ্বাসমাত্র

ছিলো না, "প্রথম আমি সেই কথা বলেছি—যা পরবর্তী আমার কাব্যের অন্তরে অন্তরে বার বার প্রবাহিত হয়েছে।" আশি বছর বয়সে বললেন, "আমি পৃথিবীর কবি", বললেন "জীবন পবিত্র জানি", অমলেরই মতন "মুক্তি বাতায়ন-প্রান্তে জনশূন্য ঘরে" ব'সে শুনলেন "ধরণীর প্রাণের আহ্বান", শুনে বললেন "ধন্য আমি"; বার-বার সকৃতজ্ঞ মনে স্মরণ করলেন "জীবনের বিধাতার যে-দাক্ষিণ্য পেয়েছি জীবনে" সেই দাক্ষিণ্য-সম্ভারকে।

জীবনকে ভালোবাসতেন রবীন্দ্রনাথ: কিন্তু জীবনেরই জন্য নয়। শিল্পের জন্য শিল্প যেমন তাঁর শিল্পদর্শন ছিলো না, তেমনি জীবনের জন্য জীবন তাঁর জীবনদর্শন ছিলো না। তাঁকে ইস্থীট্ ভাবা যেমন ভুল, তাঁকে জীবনরসসম্ভোগী ভাবাও তেমনি অসম্ভব। জীবনকে নিঙড়ে তার শেষ রসবিন্দুটুকু পান করার কোনো অভিলাষ ছিলো না তাঁর মনের চেতন বা অবচেতন স্তরে। জীবনের কবি তাঁকে বলা যায় কিন্তু এই অর্থে নয়। কোন্ অর্থে বলা যায় তা তিনি বেশ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন গদ্যে ও পদ্যে:

এক হয়ে গেছে আজ আমার জীবন
আর আমার ভুবন;
ভালোবাসিয়াছি এই জগতের আলো
জীবনেরে তাই বাসি ভালো।

মূলত তিনি ভুবনেরই কবি—এইপ্রত্যক্ষগোচর ও বস্তুনিষ্ঠ কল্পনাগোচর সুন্দর ভুবনের; ফলত পবিত্র জীবনের কবি। দর্শনের পরিভাষায় তাঁর নিজের জীবনের মূল্য তাঁর কাছে স্বাশ্রয়ী (intrinsic) ছিলো না, ছিলো পরাশ্রয়ী, বিশ্বাশ্রয়ী।

জগতের আলো এবং সে-আলোয় যা-কিছু দেখা যায় সব-কিছুকে তার ছোট্ট ক্ষীণ প্রাণের সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে বুকে টেনে নিতে চেয়েছিলো অমলও। অসুস্থ দেহে সে বেঁচে আছে কোনোমতে, মৃত্যু

তার আসন্ন, জীবনীশক্তি বেশি থাকার কথা নয়, তবু তার আশে-পাশে অন্য সবাইকে মনে হয় নির্জীব, বরঞ্চ সে-ই যার সঙ্গে কথা বলে তাকেই সঞ্জীবিত ক'রে তোলে। শরীর রুগ্ন হ'লে কী হবে, মন তার অতুলনীয়ভাবে—একমাত্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই তুলনীয়ভাবে—জীবন্ত, জীবনোন্মুখ। প্রথম দৃশ্যেই অমল তার পিসেমশায়কে এবং আমাদের সবাইকে বেশ উল্লাসের সঙ্গে জানিয়ে দিচ্ছে "আমি যা আছে সব দেখব, কেবলি দেখে বেড়াব।" এই একটি বাক্যে অমলের প্রাণভরা ব্যক্তিত্ব আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠলো। অথচ মাঠে-ঘাটে, নদীর ধারে, গ্রামে-গ্রামে, পাহাড়ে-পাহাড়ে, পাহাড়ের ওপারেও সব-কিছু দেখে বেড়ানোর তো কথাই ওঠে না, ঘর থেকে বেরুনো পর্যন্ত তার বারণ; ঘরে ব'সে জানলা দিয়ে যতটুকু দেখতে পাওয়া যায় সেটুকুও না-দেখতে পারার দিন তার ঘনিয়ে আসছে।

অমল কি সত্যিই এত অসুস্থ যে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরুনো তার পক্ষে হানিকর, নাকি পণ্ডিতমূর্খ কবিরাজ নির্বোধ বিধিনিষেধের বেড়া-জালে তাকে মিছেমিছি ঘরে আটকে রেখে দিয়েছে? ক্ষয়রোগের সঙ্গে যদি জ্বর থাকে বা হৃদরোগে আক্রান্ত হয় কেউ, তবে চলাফেরা করার শক্তি থাকলেও রোগীকে শুইয়ে-বসিয়ে রাখা হয়; ডাক্তারকে অমান্য ক'রে, বিদ্রূপ ক'রে যদি সে বেড়িয়ে বেড়ায় তবে তার মৃত্যুদিনকেই শুধু এগিয়ে নিয়ে আসা হয়। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ কবিরাজকে খুব খানিকটা ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছেন। সে-সব জায়গায় স্পষ্টই বোঝা যায় কবিরাজটি সামাজিক এবং ধর্মশাস্ত্রীয় অর্থহীন বিধিনিষেধের প্রতীক। এ হেন প্রতীকীসত্তাকে বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করলে আমাদের খুশি হবারই কথা; কিন্তু তাতে ক'রে রোগীর রোগ লঘু বা কাল্পনিক সাব্যস্ত হয় না। তা ছাড়া 'ডাকঘর'-এর মতো নাটকে ব্যঙ্গের আমেজ একটু বেখাপ ঠেকে এবং কমিক রিলিফ হিসেবে নিষ্প্রয়োজন।

কবিরাজ মূর্খের মতো যতোই বুলি কপচাক, অমল যে সত্যিই খুব

অসুস্থ, নাটকে অন্যত্র তার সাক্ষ্য রয়েছে। এক সময়ে অমল ঠাকুরদাকে বলে: "আজ সকালবেলা থেকে আমার চোখের উপর থেকে থেকে অন্ধকার হয়ে আসছে ;···কথা কইতে আর ইচ্ছে করছে না।" অবশ্য তার অব্যবহিত পরে সে কবিরাজকে অন্য কথা বলে: "আজ খুব ভালো বোধ হচ্ছে—মনে হচ্ছে যেন সব বেদনা চলে গেছে।" (ফুসফুসের ব্যথা, হৃৎপিণ্ডের কষ্ট?) ঠাকুরদার কাছে বানিয়ে বলার বা অতিশয় অসুস্থতার ভাণ করার তো কোনো কারণ নেই অমলের। কিন্তু অমল ছেলেমানুষ, ভালো বোধ না-করলেও বেশ ভালো বোধ হচ্ছে এ-কথা বানিয়ে বলতেই পারে কবিরাজকে—বাইরে বেরুবার অনুমতি আদায় করার জন্য। অন্যত্র পড়ি, ছেলের দলকে তার জানলার সামনে খানিকক্ষণ খেলা করতে ব'লেও সে ব'সে থেকে খেলা দেখতে পারে না, "জানি নে কেন আমার থেকে থেকে ঘুম পায়। অনেকক্ষণ বসে আছি আমি, আর বসে থাকতে পারছি নে—আমার পিঠ ব্যথা করছে।" কবিরাজ নয়, অমলের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল প্রহরী তাকে দেখে ব'লে ওঠে: "আহা, তাই বটে—তোমার মুখ যেন সাদা হয়ে গেছে। চোখের কোলে কালী পড়েছে। তোমাব হাত দুখানিতে শিরগুলি দেখা যাচ্ছে।" তাছাড়া আমরা তো জানিই অমলের রোগ এতদূর এগিয়েছে যে ক'দিনের মধ্যেই সে মারা যাবে। কবিরাজের মূর্খতাই তাকে ঘরের মধ্যে বন্ধ ক'রে রাখেনি, গুরুতর বাধা তার শরীরের মধ্যেই রয়েছে, অর্থাৎ বিশ্বের বিধানের মধ্যে।

"এ সব দেখে বিশ্ববিধানের 'পরে ধিক্কার জন্মায়"—এ-কথা আমরা রবীন্দ্রনাথের মুখেই শুনেছি। আজ বেঁচে থাকলে বাংলাদেশের উপর পৈশাচিক ধ্বংসলীলা ও অগুনতি নরহত্যা (অমলের মতো কত শত শিশুর বুকে বেয়নেট বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে তার হিসাব কে রাখে) দেখে এবং চীন ও মার্কিন সরকারের ঐ হত্যাকারী আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত দানব দলকে নির্লজ্জ নির্বিবেক সোল্লাস অস্ত্র-সাহায্যের সংবাদ

পেয়ে আবার ঐ একই ধিক্কার তাঁর বেদনাহত বুক থেকে বেরিয়ে আসতো। মূঢ় সমাজপতিরা আর ধর্মবিধানকর্তারাই অমলের এবং অমলের মতো সহস্র বালকের (সাবালকেরও) জীবনকে পঙ্গু ক'রে রাখেন না, স্বয়ং বিশ্ববিধাতাও রাখেন। পূর্বজন্মকৃত পাপের শাস্তি-স্বরূপ? ভগবৎভক্তি অটল থাকে কিনা তারই পরীক্ষা নেবার জন্য? (নবী যোব বা আইয়ুবের কাহিনী স্মরণীয়।) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লে পরকালে পর্যাপ্ত পুরস্কারের আশ্বাস অবশ্য দেওয়া আছে ধর্মশাস্ত্রে। এইসব অবাস্তব জল্পনা-কল্পনার সাহায্য ব্যতিরেকে বিশ্ববিধানকে প্রত্যেকটি ব্যক্তিমানুষের পক্ষে সর্বৈব শুভ ভাবা যায় না। কেন তবে ভাবি আমরা এবং নিজেদের ভোলাই? ঠিক এইসব কথাগুলি কি সজ্ঞান মনে বলতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ? খুব সম্ভব চাননি। তবু এ-সব ভাবনা অন্তত একজন পাঠকের মনে জাগালেন তিনি।

পৃথিবীর সবরকমের মানুষ এবং তাদের কাজকর্ম, প্রকৃতির সর্ব-প্রকার দৃশ্য এবং হাতছানি বিষয়ে অমলের অফুরন্ত উৎসাহ। সব-কিছু তার ভালো লাগে, সবাইকে সে ভালোবাসে এবং সবার ভালোবাসা কাড়ে। তার অত্যন্ত সীমিত বদ্ধ জীবনে সে যা দেখে তাতেই তার আনন্দের সীমা নেই। এই কথাটা এতবার এতরকম ক'রে বলা হয়েছে যে মনে হয় এটাই বুঝি নাটকের মূল বক্তব্য, তার থীম্। বরঞ্চ ডাকঘর ও চিঠির ব্যাপারটা আকস্মিকভাবে এসে পড়ে নাটকের মাঝখানে; এমন-কি রাজার চিঠি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বা প্রত্যাশা অমলের মনের ভিতর থেকে জেগে ওঠেনি, বাইরে থেকে জাগিয়ে তোলা হয়েছে। রাস্তার ও-পারের একটা বাড়িতে নিশেন উড়ছে, লোকজন আসছে যাচ্ছে দেখে অমল কৌতূহলী হ'য়ে প্রশ্ন করে— ওখানে কী হয়েছে? প্রহরী উত্তর দেয়—ডাকঘর বসেছে। কার ডাকঘর? কার আবার, রাজারই ডাকঘর হবে। রাজার ডাকঘরে রাজার কাছ থেকে চিঠি আসে বুঝি? আসে বৈ-কি, দেখো একদিন

তোমার নামেও চিঠি আসবে। অমলের বিশ্বাস হয় না, সে যে ছেলেমানুষ। প্রহরী তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে—ছেলেমানুষকে রাজা এতটুকু ছোট্ট চিঠি লিখবেন। আর তোমার বাড়ির সামনেই যখন ডাকঘর বসেছে তখন তোমার নামে চিঠি আসবে ঠিক। এত কথা শুনবার পর তবে অমলের বিশ্বাস হয় যে রাজা বুঝি সত্যিই তাকে চিঠি দেবেন। বিশ্বাস থেকে জন্মায় কামনা, প্রত্যাশা, প্রতীক্ষা।

একটি অক্ষরশূন্য কাগজ দেখিয়ে মোড়ল একদিন অমলকে ঠাট্টা ক'রে বললো—এই যে, রাজার কাছ থেকে তোমার নামে চিঠি এসেছে। অমল খুশি হ'লেও অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই সন্দেহ করলো যে মোড়ল তাকে ঠাট্টা করছে। ঠাকুরদাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : "হাঁ বাবা, আমি ফকির তোমাকে বলছি এই সত্য তাঁর চিঠি।" কেন এমন কথা বললেন সত্যবাদী ফকির ? তিনি তো অনায়াসে বলতে পারতেন—রাজা তো রোজই কত বিচিত্র অক্ষরে লেখা কত সুন্দর-সুন্দর চিঠি পাঠাচ্ছেন তোমার কাছে, আর সে-সব চিঠি তুমি এই জানলার ধারে ব'সে-ব'সে কত আগ্রহে সারাদিন পড়ছো, প'ড়ে আনন্দে তোমার বুক ভ'রে উঠছে। এমন ক'রে ক'জন রাজার চিঠি পায় আর এমন সত্য ক'রে ক'জন সে-সব চিঠি পড়তে পারে ? আমি ফকির, তোমাকে বলছি তুমি ছোট্ট হ'লে কী হবে, তুমিই রাজার প্রিয় বন্ধু, রাজা তোমাকে পাহাড়ের গায়ে, নদীর জলে, রাস্তার আঁকা-বাঁকা রেখায়, দইওয়ালার ডাকে, প্রহরীর ঘণ্টায়, বালকদের খেলায়, বালিকার তুলে-আনা ফুলে লিখে কত শত সুন্দর চিঠি পাঠিয়েছেন, আরো কত চিঠি পাঠাবেন। ঐ মোড়লের বাজে ঠাট্টায় তুমি ভুলো না, তুমি যে কবি, আমাদের কবির মতনই কবি ; তুমি তো মায়াবাদী বৈদান্তিক সন্ন্যাসী নও যে তোমার কাছে রাজা সাদা কাগজের ছেঁড়া টুকরোয় অক্ষরশূন্য চিঠি পাঠাবেন।

অথচ ফকির এ-সব কথার কিছুই বলেননি। শুধু আমরা রবীন্দ্র-

প্রেমিক পাঠকরা এই কথাগুলি চিৎকার ক'রে অমলকে 'শুনিয়ে দিতে চাই। নাকি নাটক পড়তে-পড়তে অমলের সঙ্গে একাত্মবোধ করছি আমি, আর এ-সব কথা শোনাচ্ছি অসুস্থ দেহের মধ্যে বন্দী নিজেরই অস্থির মনকে? আমিও অনেককাল যক্ষ্মায় ভুগেছি, অনেক-অনেক সকাল ও বিকাল কাটিয়েছি জানলার ধারে বা ব্যালকনিতে ব'সে রাস্তার লোক চলাচল দেখে। তবে অমলের মতো পাঁচ বছর বয়সে মৃত্যুদূত আসেনি আমার দরজায়, পঁয়ষট্টি বছরের দীর্ঘায়ু লাভ করেছি। এখন এই দিনান্তবেলায় মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে ভোলাতে পারি না যে মৃত্যুর দরজা পার হ'লে কোনো রাজাধিরাজ স্নেহ-করুণায় ডেকে নেবেন কাছে। এই দীর্ঘ জীবনে দুঃখ-যন্ত্রণা বঞ্চনা-ব্যর্থতা পেয়েছি অনেক; বেশ-কিছু আনন্দ ও অনেক ক'টি অমৃতভরা মুহূর্তও পেয়েছি —প্রিয়ার বাহুতে, বন্ধুর আলাপে, স্পিনোজার দর্শনে, রবীন্দ্রনাথের গানে। বাকী দু-চার বছর যদি শুধু কষ্টই পাই তবু ব'লে যাবো—"যা দেখেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।" ব'লে যেতে পারি যেন।

আরো বিস্ময় লাগে যখন দেখি যে সেই অক্ষরশূন্য চিঠির সঙ্গে-সঙ্গে রাজা তাঁর অনাবশ্যক রাজদূত আর রাজ-কবিরাজকেও পাঠালেন। রাজদূত ধাক্কা মেরে অথবা কুড়ুলের আঘাতে অমলের ঘরের বন্ধ দরজা ভেঙে ফেলে প্রবেশ করলো; ভিতর থেকেই কেউ খিল খুলে দেবে এতটুকু তর সইলো না তার।

> যদি এ আমার হৃদয়-দুয়ার
> বন্ধ রহে গো কভু
> দ্বার ভেঙে তুমি এসো মোর প্রাণে,
> ফিরিয়া যেও না প্রভু।

কিন্তু অমলের হৃদয়-দুয়ার তো বন্ধ ছিলো না কোনোদিন। রাজদূত দরজা ভেঙে ঢুকলো—এর অর্থ কি? রাজকবিরাজ এসে সব দরজা জানলা খুলে দিতে আদেশ করলেন। বৃথাই, আকাশের তারা দেখতে

না-দেখতেই অমলের ঘুম এসে গেলো। এমন ঘুম যে সুধা যখন তার প্রতিশ্রুত ফুল নিয়ে এলো, অর্থাৎ পৃথিবীর সব রূপরসবর্ণগন্ধ, তখনো সে-ঘুম ভাঙেনি। সে-ঘুম ভাঙবার নয়।

রবীন্দ্রনাথের ভগবানকে পেতে হ'লে কি কারো ইহলোক ছেড়ে পরলোকের দিকে যাত্রা করবার প্রয়োজন আছে? বোদলেয়রের ভগবান সম্বন্ধে এ-কথা সত্য হ'তে পারে, কারণ ঐ-কবির জগৎ ছিলো আদ্যোপান্ত ঘৃণ্য ও বীভৎস; তাঁর জগতোত্তীর্ণ ভগবানকে পেতে হ'লে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান বা পরিত্যাগ করতে হবে জগৎকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভগবান তো জগৎময় অভিব্যক্ত, এবং জগতের সব মানুষের মধ্যে—সেই অন্ধ খোঁড়া যাকে চাকার গাড়িতে বসিয়ে অমলেরই মতো একটি বালক রোজ ভিক্ষা করতে ঠেলে নিয়ে যায়,—তার মধ্যেও। নাটকের আকার যেমন অতি ক্ষুদ্র, নায়কের বয়স তেমনি অত্যল্প। এইটুকু ছেলে সে কত কী দেখতে, জানতে, করতে, হ'তে চায়, কিন্তু কিছু দেখবার, জানবার, করবার, হবার আগেই জগতের জন্য বুকভরা তৃষ্ণা নিয়ে তাকে বিদায় নিতে হ'লো জগৎ থেকে। এই বালক-শিশুটি আর-সব ভুলে গিয়ে অনন্তের মধ্যে বিলীন হ'য়ে যাওয়ার জন্য লালায়িত হ'য়ে উঠবে—এ-কল্পনাও আমার পক্ষে পীড়াদায়ক।

অথচ তা-ই বলছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। "তখন সে জড়ের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অনন্তের মধ্যে বিলীন হয়।"[১] হিন্দুধর্ম-শাস্ত্রসম্মত আধ্যাত্মিকতার এই সুপরিচিত ভাবটি যদি নাটকের মূল প্রকাশ্য হয় তবে বলতেই হবে যে 'ডাকঘর' রবীন্দ্রনাথের পক্ষে শোচনীয় আত্মখণ্ডন। জড়ের বন্ধনকে অর্থাৎ মর্ত্যজীবনকে তো কখনো বন্ধন ব'লে মনে করেননি রবীন্দ্রনাথ; জীবনের মধ্যেই জীবনাতীতকে খুঁজেছেন, পেয়েছেন এবং আমাদের সকলকে সে-পাওয়ার শরিক

১. 'রবীন্দ্রজীবনী', দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ ২৭৬

করেছেন। যে-কবি আজীবন ভুবনকে সুন্দর এবং জীবনকে পবিত্র জেনেছেন সেই "পৃথিবীর কবি" হঠাৎ জড়ের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠবেন কেন?

"সুদূরের জন্য ব্যাকুলতার ভাবটিই ডাকঘরের মূল ভাব"—বলছেন অজিতকুমার চক্রবর্তী। অথচ সুদূরের জন্য ব্যাকুলতা যেমন আছে অমলের মনে, সন্নিকটের মধ্যে আনন্দও আছে তেমনি, বা তার চেয়েও বেশি। আর সুদূর তো খুব বেশি দূর নয়, ঐ যে ছোটো পাহাড় দেখা যাচ্ছে তার ও-পারের গ্রাম নদী মাঠ, কিংবা যেখানে সুধা ফুল তুলতে যাবে সেই বন, যে-গ্রাম থেকে দইওয়ালা দই নিয়ে আসে সেই গ্রামের গোয়ালঘর; আর সব শেষে যে-রাজার কথা প্রহরী বলেছে সেই বন্ধুপ্রতিম চিঠি-লিখিয়ে রাজা—তাঁর সুন্দর প্রাসাদটি নিশ্চয়ই জেলার শহরেই হবে। 'সুদূর' মানে কি পারলৌকিক ভগবান যিনি ভক্তকে তলব করেন মৃত্যুদূত পাঠিয়ে? তাঁর কথা বালকের কল্পনায় বা বাসনায় বেখাপ; স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কল্পনাতেও কদাচিৎ স্থান পেয়েছে, যখন পেয়েছে তখনো বেশীদিন স্থায়ী হয়নি সে-স্থান। কারণ আমাদের হৃদয়স্থ রবীন্দ্রনাথের কল্পনা রোম্যান্টিক হ'লেও ঐহিক; বৈরাগ্যসাধনে নয়, সংসারের বন্ধনছেদনে নয়, প্রকৃতি এবং মানুষের মধ্যেই তাঁর মুক্তি, তাঁর ব্রহ্মবিহার।

তবু কি রবীন্দ্রনাথ কখনো মৃত্যুর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেননি, মৃত্যুকে ডাকেননি নানা প্রিয় সম্বোধনে? অর্বাচীন বয়সে লেখা 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত'-এর রবীন্দ্রমানসে পূর্ববর্তী পাশ্চাত্য কাব্য থেকে হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে-আসা একপ্রকার টলমল দুঃখবিলাস যেমন ছিলো উদ্বেল, তেমনি সে-বয়সে মাঝে-মাঝে জেগে উঠতো কানায়-কানায় রোম্যান্টিক এমন এক ভাবাবেগ যাকে মৃত্যু-সোহাগ ছাড়া আর কি নাম দেওয়া যায়? "মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান" অবশ্য নকল-নবীশী, এবং বালিকাসুলভ তীব্র অভিমানভরা আত্মহনন ইচ্ছা। "চির

বিসরল যব নিরদয় মাধব" তখন মরণই আস্থক আমার অসহ্য জ্বালা জুড়াতে। নাটকীয় গান, তবে তরুণ রবীন্দ্রনাথের আবেগপ্রবণ মনও নায়িকা রাধিকার সঙ্গে অভেদীকৃত হ'য়ে থাকতে পারে কতকটা—হয়তো-বা সেইরকম কোনো সাময়িক তীব্র অভিমানবশতই। ঈষৎ পরিণত বয়সে লেখা :

অত চুপি চুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
অতি ধীরে এসে কেন চেয়ে রও,
ওগো একি প্রণয়েরি ধরন।

আমার কাছে একটু হাল্‌কা ঠেকে, একটু যেন কবি-কবি ভাব। এবং 'চিত্রা'র অতি দীর্ঘ "মৃত্যুর পরে"কে শৌখিন মৃত্যুবিলাস বললে কি খুব দোষ হয়? চাঁদ, চকোর, ফুল, পাখি, জ্যোৎস্নালোকিত পদ্মা, তুষারাবৃত হিমালয় শুধু নয়, মৃত্যুকে নিয়েও আমি বেশ রসসৃষ্টি করতে পারি—যেন নিজের কাছে এইটে প্রমাণ করাই ছিলো উদ্দেশ্য।

কোনো মনোবিজ্ঞানী বলতেও পারেন যে, রবীন্দ্রনাথের চেতন-অচেতন মনের মধ্যবর্তী স্তরে বাল্যকাল থেকে প্রায় বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত একটা ঈষৎ-অবদমিত, কাজেকাজেই ঈষৎ পীড়াদায়ক, মৃত্যু-আতঙ্ক বর্তমান ছিলো। তাই তিনি মৃত্যুকে বার-বার নানা মধুর সম্ভাষণে ডেকেছেন, কল্পনায় বেশ খানিকটা রঙিন রোমাঞ্চকর ও প্রিয়-প্রতিম ক'রে নিতে চেয়েছেন আতঙ্ক-অবদমনের চেষ্টাকে সহজে সফল করার জন্যই। শেষ বয়সে যখন মৃত্যু সত্যিই আসন্ন তখন এই ভয় কেটে গেলো। নিজের রোগ জরা ও অন্তিম অবসাদকে জাগতিক অমঙ্গলে রূপান্তরিত ক'রে অথবা সর্বমানবের দুঃখযন্ত্রণার সঙ্গে এক ক'রে তীব্র বেদনা বোধ করেছেন, ধূসর হ'য়ে গেছে তাঁর মানসদিগন্ত, হৃতবিশ্বাস না-হ'লেও বেশ খানিকটা হতাশ্বাস ও প্রশ্নকণ্টকিত হ'য়ে উঠেছে তাঁর জাগতিক নিরীক্ষা। কিন্তু আতঙ্ক, বিক্ষোভ এবং সব-

রকমের পলায়নী মনোবৃত্তি থেকে সর্বদা মুক্ত ছিলো তাঁর মন। পূর্ববর্তী মৃত্যুরাগকে পলায়নী ভাবাবেশ এমন-কি ভাবালুতা বলতে চাই আমি। শেষ বয়সের কাব্যে মৃত্যুর উল্লেখ যথেষ্ট পাওয়া যায়, কিন্তু সুর ভিন্ন, ভাব কতকটা ট্র্যাজিক, কতকটা শৈব ; বৈষ্ণব নয় মোটেই। "মৃত্যু-দূত এসেছিল হে প্রলয়ঙ্কর তব সভা হতে"—প্রলয়েরই দূত মৃত্যু, প্রেমের নয়। জাগতিক প্রলয়কেও কখনো-কখনো আসন্ন বোধ করেছেন তিনি ঐ-বয়সে।

'বলাকা'তেই ভিন্ন সুর দেখা যায়। জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর কোনো মধুর মিতালি নেই, আছে মৌলিক বৈরিতা।

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে,
পাকে পাকে ফেরে ফেরে
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে।
... ...
তবুও মরিতে হবে, এও সত্য জানি।...
মোর আঁখি এ আলোকে লুটিবে না,
মোর হিয়া ছুটিবে না
অরুণের উদ্দীপ্ত আহ্বানে।

জগৎকে ভালোবাসার সত্য যেমন আনন্দময়, জগৎকে চিরতরে ছেড়ে যাওয়ার সত্যও কি তেমনি আনন্দময় হ'তে পারে কখনো ? জীবিতের চোখে মৃত্যুর চে'য়ে সত্য আর-কিছু নেই, কিন্তু সে এক ভয়ঙ্কর সত্য।

তবু প্রত্যেকটি শিশু সেই ভয়ঙ্কর সত্যের বিধিলিপি কপালে নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এ-পৃথিবীতে। বিদেহী আত্মা যদি বেঁচেও থাকে কোনো অতীন্দ্রিয় অপার্থিব লোকে, তাতে মায়াবাদী বৈদান্তিক সাধকের তৃপ্তি হ'তে পারে, কিন্তু প্রেমিক কবির সুখ কোথায় ? সত্য-বিরোধে জর্জরিত রবীন্দ্রনাথ তবু এমন একান্ত ক'রে চাওয়া এবং এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়ার মধ্যে "কোনোখানে আছে কোনো মিল" এই বিষণ্ণ বিশ্বাসকে 'গীতাঞ্জলি' পর্বের অবশিষ্ট ভক্তি দিয়ে আঁকড়ে ধ'রে

রাখতে চাইছেন। অথচ বিশ্বাসের দৃঢ়তা ফোটেনি কবিতাটিতে ('বলাকা', ১৯), বিষাদের ছায়াই ঘন হ'য়ে আছে। ক্ষিতিমোহন সেন-অনুলিখিত গন্থ ব্যাখ্যায় ঐ-বিশ্বাসের সমর্থনে কিছু যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেছেন কবি। যুক্তিটি দুর্বল। তা ছাড়া, কবির উপলব্ধি যেখানে প্রতিহত ও ব্যথিত সেখানে যুক্তির মশাল কি পথ দেখাতে পারবে ?

'গীতাঞ্জলি'র ভক্ত রবীন্দ্রনাথ কি কোনো সমাধানে পৌঁছেছিলেন ? তৎপূর্বে যে পৌঁছাননি সেটা কয়েক বছর আগে প্রকাশিত 'নৈবেদ্য'-এর একটি সনেটে বোঝা যায়। ৯০ সংখ্যক সনেটের গোড়াতে আমরা দেখি, কবি মৃত্যুকে রীতিমত ভয় করছেন সাধারণ মানুষের মতনই ("ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ডরে")। কিন্তু পরবর্তী অংশে নিজের ভীত-সন্ত্রস্ত মনকে বোঝাচ্ছেন—যাঁর অপার স্নেহ ও আশীর্বাদ এ-জীবনে পেয়েছি, মৃত্যুর পরও নিশ্চয়ই সেই অচেনার মুখ দেখতে পাবো। অবশেষে মৃত্যুর প্রতি যে-ভালোবাসার চেষ্টাকৃত উদ্ভেদ তা যতটা নৈয়ায়িকসুলভ ততটা কবিজনোচিত নয় :

জীবন আমার
এত ভালোবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়
মৃত্যুরে এমনি ভালোবাসিব নিশ্চয়।

প্রথমত, অত্যধিকসংখ্যক মানুষ (সবাই তো আর রবীন্দ্রনাথের ভাগ্য নিয়ে জন্মায় না) জীবনে অপর্যাপ্ত দৈবী স্নেহ ও আশীর্বাদ লাভ করে না ; উদাসীনতা, নির্যাতন ও অভিসম্পাতও কুড়ায় তার চেয়ে বেশি বৈ কম নয়। দ্বিতীয়ত, কিন্তু কবির সঙ্গে তর্ক ক'রে কী হবে। শুধু এই কবিতাতে নয়, 'নৈবেদ্য'-এর অধিকাংশ চতুর্দশপদীতেই রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা স্তিমিত, ধর্মোপদেষ্টা ও সমাজহিতৈষীই প্রকট।

'গীতাঞ্জলি' পর্বের গানগুলি অবশ্য খাঁটি কবিতা, উঁচুদরের কবিতা —কিছু ব্যতিক্রম সত্ত্বেও। সেখানেও যখন দু-একটি গানে মৃত্যুকে

প্রিয় সম্ভাষণে আহ্বান করা হয় তখন খট্‌কা লাগে। কারণ 'গীতাঞ্জলি'তে আর যে-দোষই থাক্‌ কবিকর্মজনিত কৃত্রিমতার স্পর্শমাত্র নেই কোথাও; স্বচ্ছ আন্তরিকতাই এই গানগুলিকে কবিতারূপেও চরমোৎকর্ষ দান করেছে। অথচ:

ভরা আমার পরাণখানি
সম্মুখে তার দিব আনি
শূন্য বিদায় করব না তো উহারে
মরণ যেদিন আসবে আমার দুয়ারে।

শ্লেষের সুর বেজে ওঠেনি তো গানটিতে? অনিচ্ছাকৃত অবশ্য। সকল প্রাণীর ভরা প্রাণ এবং জীবনের যাবতীয় সঞ্চয় নিতেই তো আসে মরণ, তাকে শূন্য হাতে বিদায় করার সাধ্য কি কারও আছে?

যা কিছু মোর সঞ্চিত ধন
এতদিনের সব আয়োজন
চরমদিনে সাজিয়ে দিব উহারে –
মরণ যেদিন আসবে আমার দুয়ারে।

এমন কথা তো ব্যঙ্গরসিক ভল্‌তেরও বেশ রসিয়ে বলতে পারতেন। এ যেন ডাকাত যখন বুকের কাছে ছোরা এনে সদ্য-পাওয়া মাইনের টাকাটা তলব করছে তখন তাকে বলা—এ-মাসের মাইনের সবক'টা টাকা তোমার হাতে তুলে দিলাম, তুমি আমার এ-দান গ্রহণ ক'রে আমাকে ধন্য করো।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠিক তা বলছেন না। মৃত্যু জোর ক'রে আমাদের সব-কিছু হরণ করতে পারে, কিন্তু ভালোবাসা কেড়ে নেওয়ার শক্তি তো তার নেই। তা-ও দিতে চান রবীন্দ্রনাথ।

যা পেয়েছি,   যা হয়েছি
যা কিছু মোর আশা,
না-জেনে ধায়   তোমার পানে
সকল ভালোবাসা।

মৃত্যুকে ভালোবাসা—এ কেমন কথা? মৃত্যুকে কি মানুষ সত্যিই ভালোবাসতে পারে? বছরের পর বছর কর্কটরোগের মতো কোনো যন্ত্রণাদায়ক দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগেছে যে হতভাগ্য সে মৃত্যুকে ভালোবাসতে পারে অবশ্য, কেন-না মৃত্যু ছাড়া তার আর কোনো পরিত্রাণ নেই। এমন লোক আত্মঘাতী হ'য়েও মৃত্যুবরণ করতে পারে। এই বরণকে বধূর স্বয়ংবরা হওয়ার সঙ্গে তুলনা করা যেতেও পারে এক ট্র্যাজিক অর্থে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মোটের উপর ঈর্ষ্যণীয়রূপে স্বাস্থ্য-বান ছিলেন প্রায় পঁচাত্তর বছর বয়স পর্যন্ত। মাঝে বছর কয়েক এক পীড়াদায়ক রোগে ভুগেছিলেন বটে, তবে তা দুঃসহ বা নৈরাশ্যপ্রদ কোনো রোগ নয়, এবং সম্পূর্ণ রোগমুক্তও হয়েছিলেন লণ্ডনে অস্ত্রোপ-চারের পর। প্রিয়তম কোনো বন্ধু বা নিকটতম কোনো আত্মীয়কে হারালে অনেকের এমন দশা হয় যে বেশ কিছুকাল সমস্ত কর্ম অর্থ-হীন, সমস্ত সুখ বিস্বাদ, সমস্ত ভবিষ্যৎ অন্ধকার ঠেকে, বেঁচে থাকার স্পৃহা নষ্ট হ'য়ে যায়। তখন মৃত্যুকামনা স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের জীবনে গভীর শোকের ছায়া একাধিকবার পড়েছে, কিন্তু আশ্চর্য আধ্যাত্মিক বলে ও কৌশলে তিনি সে-সমস্ত দুর্বিপাক কাটিয়ে উঠে-ছিলেন। সবচেয়ে গভীর এবং জীবনের শিকড় ছিঁড়ে ফেলার মতো শোক ঘটেছিলো তাঁর চব্বিশ বছর বয়সে। এই শোকে কিছুকাল তিনি নিশ্চয়ই মুহ্যমান ছিলেন, কিন্তু খুব বেশীকাল নয়, বছর না-ঘুরতেই শোকের বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠে তাঁর প্রিয়তমা আত্মীয়ার মৃত্যুকে এবং সমস্ত জগৎচরাচরকে প্রকৃত শিল্পীর চোখে দেখতে সক্ষম হলেন। সম্পূর্ণ ক'রে (রবীন্দ্র-অভিধানে তার মানেই 'সুন্দর ক'রে') দেখবার জন্য যে ইস্থেটিক্ ডিস্ট্যান্‌সের প্রয়োজন, মৃত্যু সে-দূরত্ব স্থাপন করলো দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মধ্যে। এটা তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি।

না, শারীরিক বা মানসিক যন্ত্রণায় পিষ্ট হ'য়ে কখনো মৃত্যু-কামনা করেননি রবীন্দ্রনাথ। এ হেন মানুষী দুর্বলতার ঊর্ধ্বে ছিলেন তিনি।

তবু তিনি দু-একটি সত্যিকার মৃত্যু-প্রেমের কবিতা লিখেছিলেন। ফ্রয়েডীয়রা ডেথ ইন্‌স্টিংক্‌টের কথা বলেন—মোটের উপর তা নির্জ্ঞান মনেরই ব্যাপার। প্রত্যেকটি শিশু জন্ম থেকেই মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে আসে। কোনো পরাবিজ্ঞানী (super scientist) ভূমিষ্ঠ শিশুর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যাবতীয় ব্যাপার সূক্ষ্মতম (অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত) যন্ত্রপাতির দ্বারা পর্যবেক্ষণ করতে পারলে বলতেন: মৃত্যুর দিকে একটা অব্যর্থ গতি দেখা যাচ্ছে এই নবজাতকের দেহে। যৌবন পার হ'য়ে গেলে তো সে-গতি সকলের চোখেই স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। ফ্রয়েড ভাবেন যে এই শারীরিক মরণাভিমুখী গতির একটি প্রতিফলন মনের আয়নায় হ'তে বাধ্য, চৈতন্যের স্তবকে তা সুগোচর না-হ'লেও। গতি যখন আছে তখন গন্তব্যের দিকে একটা আকর্ষণ অনুমান করা মোটেই অসঙ্গত নয়—যথা আপেল পড়া থেকে মাধ্যাকর্ষণ (যদিও উপাখ্যানটি ভিত্তিহীন)। আজকাল অনেকে কবিতার তথা যাবতীয় শিল্পকলার উৎস খোঁজেন অবচেতন মনে। রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃত গানটি কি তবে ফ্রয়েডীয় ডেথ ইন্‌স্টিংক্‌টের কাব্যিক প্রকাশ? এই গানে মৃত্যু শুধু প্রেমিকরূপে নয়, বররূপেও অঙ্কিত—"বিজন রাতে পতির সাথে / মিলবে পতিব্রতা"। আমি অবশ্য কবিতার মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার পক্ষপাতী নই, মনোবিকলনিক ব্যাখ্যার তো নয়-ই। তাছাড়া, ডেথ ইন্‌স্টিংক্‌ট বিষয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যেই যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে।

ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা
মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমারে কথা।

জীবনের অবসানকে জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা বলার মানে কি? কারও ব্যক্তিসত্তা যখন সৃষ্টিকর্মে, কল্যাণব্রতে বা জ্ঞানের সাধনায় পূর্ণ প্রস্ফুটিত তখনই তার মৃত্যু ঘটলে (যেমন রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী বা আইনস্টাইনের বেলা) সে বিশেষ ক্ষেত্রে মৃত্যুকে জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা বলা যেতেও পারে—এই অর্থে যে আরো কয়েক বছর বেঁচে থাকলে,

এবং সে মহান ব্যক্তিস্বরূপের ক্রমিক অবক্ষয় ও দৈন্য আমাদের চোখের সামনে ঘটতে থাকলে, অত্যন্ত পীড়িত হ'তো আমাদের মানবগরিমার উপলব্ধি ও তার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধানিবেদন। কিন্তু যাঁদের মৃত্যু ঘটে বহু বৎসরের জরা অর্থাৎ শারীরিক মানসিক ও চারিত্রিক অব-ক্ষয়ের পর (কারো নাম করতে সংকোচ বোধ করছি) তাঁদের অতি করুণ মৃত্যুও কি জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা? আর যাঁরা মারা যান প্রস্ফুটিত না-হ'য়েই, আপন অত্যল্প জীবনের পরিধির মধ্যে কোনো-প্রকার পূর্ণতা অর্জন করবার সুযোগ না-পেয়েই (যেমন তরুণ কবি সুকান্ত কিংবা বালক-শিশু অমল) এঁদের ট্র্যাজিক মৃত্যুর মধ্যে কী পরিপূর্ণতা আবিষ্কার করতে পারি আমরা? শেষ পরিপূর্ণতা বলা তো প্রায় নিষ্ঠুর ঠেকে। সত্যি কথা বলতে কি এই কবিতাটির মর্ম আমি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারি না। ভালো লাগে কিন্তু সাড়া জাগে না মনে। সে যা-ই হোক্, কিঞ্চিৎ বিস্ময় ও হতাশার সঙ্গে লক্ষ্য করি যে 'ডাকঘর'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে অমলের জীবন ও মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে খুঁজে পেতে 'গীতাঞ্জলি'র ঠিক এই কবিতাটিই উদ্ধার ক'রে এনেছেন অজিতকুমার চক্রবর্তী।

একটি ফুটফুটে সুন্দর বালক কবির মন নিয়ে সবাইকে সব-কিছুকে দেখে, ভালোবাসে; মনমরা হবার তার যথেষ্ট কারণ আছে তবু তার মন খুশিতে ভরা, সেই ভরা খুশি সে ছড়িয়ে দেয় চারিদিকে। যেখানে যা আছে সব কেবলই দেখে বেড়াবার জন্য সে ব্যাকুল। কিন্তু কঠিন রোগে ভুগে শরীর তার এত দুর্বল যে থেকে-থেকে তার ঘুম আসে, জানলার পাশে ব'সে সে যা দেখতে পারতো তা-ও দেখা হয় না। অল্প-দিনের মধ্যে শেষ নিদ্রায় তার চোখ বন্ধ হ'য়ে গেলো। এই তো নাটকের উপাখ্যান। অথচ দর্শকের মন বিষণ্ণ হ'লেও কশাহত বা দিশাহারা বোধ করে না, যবনিকাপাতের পর বিশ্ববিধানের প্রতি, সৃষ্টিকর্তার প্রতি, তিক্ততায় বা বিদ্রোহে ভ'রে ওঠে না। বরঞ্চ য়েট্‌স্ 'ডাকঘর'

সম্বন্ধে যে-মন্তব্য করেছিলেন তা-ই সত্য : "…conveys to the right audience an atmosphere of gentleness and peace."

যেখানে বিশ্ববিধানের প্রতি প্রচণ্ড বিক্ষোভ জাগবার কথা সেখানে বিনম্র মধুর প্রশান্তি জাগাতে সক্ষম হলেন রবীন্দ্রনাথ—এটাই তাঁর আশ্চর্য কলাকৌশল। ভাবতে ইচ্ছা করে যে ঘটনাবিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে এমন অপ্রত্যাশিত রসানুভূতি সঞ্চারের কথাটা মনে রেখেই এডোয়ার্ড টমসন রায় দিয়েছেন : "…and within its limits an almost perfect piece of art." এই নাটকীয় কলাসিদ্ধি সম্ভব হয়েছে ব্যঞ্জনার দ্বৈতে, বৈপরীত্যে। নাটকটি একাধারে বিয়োগান্ত ও মিলনান্ত ; অমলের ব্যর্থ রিক্ত জীবনই যেন তার সার্থক সুন্দর স্বপ্ন। তার বিবাগী হৃদয় সুদূরের জন্য ব্যাকুল ছিলো, প্রাণের মূল্যে সে তার কল্পনার রাজাকে পেলো। এই পারত্রিক অর্থদ্যোতনা নাটকের মধ্যে রয়েছে, তাতে ভুল হবার কথা নয়। ভুল হয় যখন আমরা এইখানে থেমে যাই এবং ধ'রে নিই যে এটাই নাটকের মূল ভাব, এমন-কি একমাত্র ভাব। অথচ এটা মূল ভাব হ'তে পারে না, কেন-না এর সঙ্গে নাটকের উপাখ্যান ও নায়ক চরিত্রের বেশ খানিকটা আড়াআড়ি সম্পর্ক রয়েছে। তৎসত্ত্বেও ইঙ্গিতটি আনা হয়েছে নাটকে প্রশান্তি ও নম্র মাধুর্যের ভাব ফুটিয়ে তোলার জন্য। নইলে দর্শকের হৃদয়ের উপর নাটকের অভিঘাত হ'তো ঠিক উল্‌টো। নাটকের মূল ভাব তবে কি ? রূপকের ভাষাতেই যা অভিব্যক্ত, তাকে বিশ্লেষণ ক'রে সাদামাটা গদ্যে অনুবাদ করা সম্ভব না-হওয়ারই কথা। তবু রবীন্দ্রনাথ কী বলতে চেয়েছেন কান পেতে শুনলে তার কতকটা শোনা যায় বৈ-কি।

অমল অনেক-কিছু চেয়েছিলো তার ভাগ্যহত জীবনে ; সবচেয়ে নিবিড়ভাবে চেয়েছিলো সুধা বাগান থেকে ফুল তুলে বাড়ি ফিরবার পথে তার হাতে একটি ফুল দিয়ে যায় যেন। সুধা ফুল নিয়ে এলো ঠিকই,

তবে তখন অমল মারা গেছে। উপরন্তু, সুধা এই কথাটা বিশেষ ক'রে অমলকে জানাতে চেয়েছিলো যে সে তাকে ভোলেনি। কিন্তু অমলকে তা জানতে দেননি ভগবান। তার বদ্ধ বঞ্চিত জীবনে এটাই হ'তো তার সবচেয়ে বড়ো সুখ। কিন্তু এটুকুও হ'লো না। যবনিকাপাতের পর আমার কানে যেন বাজতে থাকে—"এমন নিষ্ঠুর করুণ দৃশ্য আমি দেখেছি অনেক, তুমিও দেখে থাকবে; আমাব মতন দীর্ঘজীবন লাভ করলে আবো অনেক দেখবে। তবু ভগবানকে অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টিকে প্রত্যাখ্যান কোরো না, ধিক্কাব দিয়ো না। সে-ধিক্কার শুধু তোমার মনকেই বিকার-গ্রস্ত কববে। হৃদয়কে প্রসারিত ক'বে ভূমাকে গ্রহণ কোবো শ্রদ্ধার সঙ্গে। কিন্তু তার আগে তাকে সহ্য করতে শিখতে হবে—পিতা যেমন পুত্রকে, বন্ধু যেমন বন্ধুকে ('সখেব সখ্যুঃ'), প্রেমিক যেমন প্রিয়াকে সহ্য করে। ভালোবাসে ব'লেই সব সহ্য কবে। তেমনি ক'রে তুমিও ভালোবেসো শুভাশুভে বিচিত্র তবুও অপরূপ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে। পূর্ণবয়স্ক হোক্, স্বচ্ছদৃষ্টিসম্পন্ন হোক্, ইস্পাতকঠিন হোক্ সে-ভালো-বাসা। তবেই তা অটুট থাকবে। অমলের মৃত্যু আমার খুব কাছের কয়েকজনের নিষ্ঠুব মৃত্যুর কথা মনে কবিয়ে দেয় আমাকে। তবু সে-মৃত্যুতে তোমার চিত্ত প্রশান্ত থাক্, পরিস্নিগ্ধ হোক্। অমলের জীবনে যেমন, তার মৃত্যুতেও কি তেমনি একটি বিরাট রহস্যময় সৌন্দর্যের রূপবেখা ফুটে ওঠে না তোমার চোখে? ঈশ্বরের সৃষ্টি তোমার সৃষ্টির অপেক্ষায় আছে, তোমার দৃষ্টিরও। ভূমাতেই সুখ, তবে তা কোনো সহজ সুখ নয়। সে-সুখে বুক ভ'রে ওঠে, ফেটেও যায়। আর ভূমা তো ফুলের বাগান নয়; অথবা সেই বাগান যার অনেক গাছ জল না-পেয়ে শুকিয়ে যায়, অনেক কলি না-ফুটতেই ঝ'রে পড়ে, অনেক ফুলে কীট ধরে।" অন্তত আমার রসগ্রহণে রবীন্দ্রকাব্যসৃষ্টির শেষ দশ বৎসরের শ্রেষ্ঠ ফসলের মূলভাবও এই; প্রথম যৌবনে রচিত 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এরও।

সাধারণ মানুষের মতো সন্ন্যাসীও ছিলো রাক্ষসী প্রকৃতির কবলে অসহায় দাস। কিন্তু বিদ্রোহ জেগে উঠলো তার অন্তরে, সে প্রতিজ্ঞা করলো—একদিন নেবো প্রতিশোধ। দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যার পর তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হ'লো, "বিশ্ব ভস্ম হয়ে গেছে জ্ঞানচিতানলে···স্নেহ প্রেম দয়া—শ্মশানে পড়িয়া আছে তাদের কঙ্কাল।" গুহা থেকে বেরিয়ে সে দেখলো ধরা অতি ক্ষুদ্র, প্রকৃতি শ্রীহীন, বিস্বাদ; মানুষ নির্বোধ, অবজ্ঞেয়।

তবু অহংকারে কিছু বাড়াবাড়ি ছিলো। অনাচারী রঘুর পিতৃমাতৃ-হীন কন্যা যখন গ্রামবাসীদের কাছ থেকে আশ্রয়ের বদলে শুধু ঘৃণাই পেয়ে সন্ন্যাসীর কাছে নিরাশ কণ্ঠে আশ্রয় চাইলো তখন সন্ন্যাসী তাকে কাছে ডেকে নিলো। তার পিতৃসম্বোধনে মনের কোনো-এক নির্জ্জাত, এখনো পর্যন্ত না-ছেঁড়া তার সাড়া দিয়ে উঠলো। ধীরে-ধীরে করুণা মমতা স্নেহ সবক'টি হৃদয়বৃত্তিই জাগলো সন্ন্যাসীর মনে। বারে-বারে সে চাইলো বন্ধনমুক্ত হ'তে, বালিকাকে ছেড়ে সে চ'লে গেলো দূরে বনের মধ্যে। কিন্তু বালিকা আবার তাকে খুঁজে বার করলো, সন্ন্যাসীর আত্মসমাহিত হওয়ার চেষ্টা আবারো ব্যর্থ হ'লো, বন্ধন আরো দৃঢ় হ'তে লাগলো। অবশেষে বালিকাকে সে তার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবেসে ফেললো, তার সরল প্রাণভরা কথায় হাসিতে গানে খেলায় সন্ন্যাসীর এতই আনন্দ হ'লো যে সে-ভালোবাসা ও আনন্দ ঐ ছোটো মেয়ের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে আর আবদ্ধ রইলো না, উপচে গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত জগৎময়।

বনে পালিয়ে গিয়ে হৃদয়বৃত্তি-নিরোধের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর লোকালয়ের দিকে এগুতে-এগুতে "যাক রসাতলে যাক সন্ন্যাসীর ব্রত" ব'লে সে ছুঁড়ে ফেলে দিলো তার দণ্ড কমণ্ডলু। প্রকৃতি ও মানুষ তার চোখে বড়ো সুন্দর ঠেকলো, বড়ো আনন্দময়। যে-বিশ্বকে "মহা মৃতদেহ" মনে হয়েছিলো নাটকের গোড়াতে, তারই প্রত্যেকটি জিনিস

আজ তাকে মুগ্ধ করলো, "জগতের মুখে একি হাস্য হেরি / আনন্দ তরঙ্গ নাচে সূর্য-চন্দ্র ঘেরি।" নাটক সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন: "শেষ কথাটা এই দাঁড়াল—শূন্যতার মাঝে নির্বিশেষের সন্ধান ব্যর্থ, বিশেষের মধ্যেই সেই অসীম প্রতিক্ষণে রূপ নিয়ে হয়েছে সার্থক, সেইখানে যে তাকে পায় সেই যথার্থ পায়।"

কিন্তু তার পরেও কথা আছে। যে-বালিকার প্রতি উচ্ছল স্নেহ সন্ন্যাসীকে জগতের সব-কিছু ভালোবাসতে শেখালো, গ্রামে ফিরে এসে স্বভাবতই সর্বপ্রথমে তারি খোঁজ করলো সে। অনেক খোঁজার পর অবশেষে গুহার মুখে তাকে আবিষ্কার করলো—মাটিতে প'ড়ে আছে তার নিশ্চল হিমশীতল দেহ। একি প্রকৃতির প্রতিশোধ, না প্রকৃতির চ্যালেঞ্জ? ঈশ্বরের চ্যালেঞ্জ বললাম না, কারণ ঈশ্বরের উল্লেখ নেই এ-নাটকে; সন্ন্যাসীর উপান্ত উপলব্ধিতে ঈশ্বর আনন্দতরঙ্গ-হিল্লোলিত বিশ্বজগৎরূপেই উদ্ভাসিত। জগৎকে সে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলো, শেষে জগৎ তাকে প্রেমের বন্ধনে নিবিড় ক'রে বাঁধলো—এই হ'লো প্রকৃতির প্রতিশোধ।

কী তার চ্যালেঞ্জ? যে মধুর, ক্ষীণ অথচ লৌহ-কঠিন শৃঙ্খলে সন্ন্যাসী বাঁধা পড়েছিলো, সেই শৃঙ্খলটি যদি ছিন্নভিন্ন হ'য়ে ধূলায় লুটিয়ে পড়ে নাটকের শেষ দৃশ্যে তবে তাকে কোন্ টানে জগৎ টানবে? সন্ন্যাসীর বিশ্বপ্রেম তো আপনি জাগেনি, প্রথম দৃশ্যে তার যে আত্মস্থ ও আত্মতৃপ্ত ভাব দর্শকের কাছে প্রকট হ'লো তার মধ্যে এর কোনো পূর্বাভাস ছিলো না। কোথা থেকে একটি অনাথ অশুচি বালিকা এসে প্রতিরোধের সমস্ত দেওয়াল ভেঙে ফেলে সন্ন্যাসীর হৃদয়ে প্রবেশ করলো; সেই ছিদ্র পথ দিয়ে যেন পিছনে-পিছনে ঢুকে পড়লো বিশ্বজগৎ। মাঝখান থেকে বালিকাটি যদি জাগতিক নিয়মের অব্যর্থ পরিণামে খ'সে পড়ে তবে কি জগতের অর্থাৎ ভগবানের আসন সন্ন্যাসীর হৃদয়মনে অটল থাকবে, নাকি এই প্রচণ্ড ধাক্কায় ভেঙে চুরমার

হ'য়ে যাবে? যে-জগৎকে সে এত ভালোবাসতে শিখলো বালিকার হাত ধ'রে, সেই জগতের এই অর্থহীন "নিদারুণ প্রতিশোধে" কি বিমূঢ় চিত্তে বিদীর্ণ হৃদয়ে আবার সে ফিরে যাবে তার গুহার নিরেট অন্ধকার একাকীত্বে? নাটক শেষ হ'য়েও যেন শেষ হয় না, প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগতে থাকে, আর আমাদের আন্দোলিত চিত্ত উত্তর খুঁজে বেড়ায় পরবর্তী অলিখিত অঙ্কে। তার কি কোনো নির্দেশ রেখে গেছেন রবীন্দ্রনাথ? লিখিত অঙ্কে হয়তো রেখে যাননি স্পষ্ট অক্ষরে। কিন্তু সমগ্র রবীন্দ্রকাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই ক্ষুদ্র নাটকটি বৃহত্তর ইঙ্গিতে অন্তঃসত্ত্বা হ'য়ে ওঠে।

সন্ন্যাসীর মনে নাটকের প্রারম্ভে ছিলো কেবল বৈরাগ্য; শেষের অব্যবহিত পূর্বে দেখি কেবল অনুরাগের স্রোতে সে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে, নিজের মনের উত্তরঙ্গ আনন্দে সে ব'লে ওঠে—"আজি এ জগৎ হেরি কী আনন্দময়।" কিন্তু জগৎ যে কী দুঃখময় তা-ও তাকে নিজের প্রচণ্ড দুঃখের মধ্যে জানতে হবে। রবীন্দ্রনাথ কেবল রোম্যান্টিক প্রেমের কবি নন, বৈরাগ্য-পরিস্রুত অনুরাগের কবি; কেবল সুরক্ষিত আনন্দের কবি নন, তীব্রতম দুঃখে পোড়-খাওয়া সুস্মিত প্রশান্তির কবি। তাঁর সাহিত্যের "কঠিন সত্য" এই। সন্ন্যাসী যখন গুহাশ্রিত বৈরাগ্য-সাধনের অসারতা বুঝতে পেরে সন্ন্যাস-ব্রত ভঙ্গ ক'রে সুখী সংসারের স্বপ্ন দেখছে:

> একটি কুটিরে মোরা রহিব দুজনে,
> রামায়ণ হতে তারে শুনাব কাহিনী—
> সন্ধ্যার প্রদীপ জেলে, শাস্ত্রকথা শুনে,
> বালিকা কোলেতে মোর পড়িবে ঘুমায়ে।

ঠিক তখনি এলো দারুণতম আঘাত, তার স্বপ্নকে খান-খান ক'রে দিয়ে তার জীবনকে ওলট্‌-পালট্‌ ক'রে নতুনতর ছাঁচে ঢেলে দিতে।

সন্ন্যাসী সংসার থেকে পালিয়ে গিয়ে মানুষ ও প্রকৃতিকে অবজ্ঞা

ক'রে গুহার অন্ধকারে বসেছিলো ধ্যানে। সেটা কোনো পথ নয়, পথের উৎকট ভেংচানি। সুতরাং আবার তাকে দিবালোকিত লোকালয়াভিমুখী পথে বেরিয়ে আসতে হ'লো। কিন্তু সত্যের পথ কোনো সহজ পথ হ'তেই পারে না। সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বেলে শাস্ত্রকথা শুনে প্রিয়তমা কন্যা কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়বে—এইখানে মানবজীবনের সুখসমাপ্তি নয়, প্রাকৃতিক কিংবা ঐশী বিধান তা নয়। বিধান বড়ো কঠোর। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' লিখবার অল্পকাল পরে নাট্যকারের নিজের জীবনে এমনি এক মর্মঘাতী মৃত্যু এসেছিলো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভেঙে পড়েননি; বরঞ্চ গ'ড়ে উঠলেন। "জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে-দূরত্বের প্রয়োজন মৃত্যু সে-দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল।" সন্ন্যাসীর বেলায়ও তা-ই ঘটবে, সেইখানে প্রকৃত যবনিকাপাত। বিয়োগান্ত নাটিকার শেষে মিলনান্ত নাটকের ইঙ্গিত রয়েছে।

সহসা দারুণ দুঃখতাপে
    সকল ভুবন যবে কাঁপে
সকল পথের ঘোচে চিহ্ন,
    সকল বাঁধন যবে ছিন্ন,
মৃত্যু-আঘাত লাগে প্রাণে—
তোমার পরশ আসে কখন কে জানে।

সেই রবীন্দ্রনাথকে আমি অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেছি যিনি দুঃখের কবি, মৃত্যুর কবি হ'য়েও, হ'য়েই, আনন্দের কবি, অমৃতের কবি। গানে 'তোমার' বলতে কী বোঝায় সেটা একটু অস্পষ্ট র'য়ে গেছে; অস্পষ্টই থাক্। নিশ্চয়ই তা ধর্মশাস্ত্রের চিরকরুণাময় পরম শক্তিমান জনগণমঙ্গলদায়ক ভাগ্যবিধাতা নয়। ভীষণের মধ্যে মধুরকে এবং মধুরের মধ্যে ভীষণকে ("identity of terror and bliss") দেখতে পাওয়ার মতো দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন রবীন্দ্রনাথ—যেমন সব মহাকবি, মহাশিল্পী ক'রে থাকেন। অসামান্য বালকের রোগক্ষয়, সামান্যা বালিকার

নিরাশ্রয় মৃত্যু—এ-সবের মধ্যে "তোমার পরশ" বোধ করেন যিনি তাঁকে দাদু, কবীর প্রভৃতির তুল্য বিশুদ্ধ ভক্তকবি জ্ঞান করা সম্ভব নয়। য়েট্‌স্-এর মতন এত বড়ো অসাধারণ সংবেদনশীল সহৃদয় পাঠকের পক্ষে তা কেমন ক'রে সম্ভব হয়েছিলো তা-ই ভাবি।

পুনশ্চ : প্রবন্ধের এক জায়গায় "বিশ্ববিধানের 'পরে ধিক্কার জন্মায়" রয়েছে, অন্যত্র বিশ্ববিধানকে ধিক্কার না-দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বিরোধ দুই ভিন্ন দৃষ্টিকোণ-জনিত—চারিত্র্যনীতিক ও নান্দনিক। ধিক্কার চারিত্র্যনীতিক বিচার থেকে আসে এবং প্রকৃতপক্ষে মানবিক বিধানের প্রতিই প্রযোজ্য, প্রাকৃতিক বিধানের প্রতি নয়। বন্যায় হাজার-হাজার লোক মারা গেলে বন্যা-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাকে এবং ব্যবস্থাপকদেরকে সঙ্গতভাবে ধিক্কার দেওয়া যায়, কিন্তু বাষ্প-মেঘ-বৃষ্টিকে অথবা তারা যে-বিশ্বনিয়মের শাসনাধীন তাকে ধিক্কার দেওয়া অর্থ-হীন। অবশ্য কামুর মতো আমরা এক কাল্পনিক কুচক্রী বিশ্ববিধাতাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তাকে দোষী সাব্যস্ত ক'রে মনের সুখে গাল পাড়তে পারি, তার প্রতি "দার্শনিক বিদ্রোহ" ঘোষণা করতে পারি, ইত্যাদি। কিন্তু এ-সব সাহিত্যিক শব্দচ্ছটা মাত্র। আসল কথা হচ্ছে যে, প্রকৃতির সংহার-মূর্তি দেখে আমরা নিত্যসুপরিকল্পনারত পরম কল্যাণময় বিশ্ববিধাতার অস্তিত্ব-বিষয়ে সন্দিহান হ'য়ে উঠি। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য দেশ-বিদেশের মানবিক বীভৎসতা দেখেই ধিক্কার বোধ করেছিলেন। 'বিশ্ববিধান' শব্দটাকে এখানে আলংকারিক অতিরঞ্জন ভাবা যেতে পারে। ভূমার কথা যখন তিনি বলেন তখন ভূমা থেকে ভূমাধিরাজকে পৃথক্ ক'রে দেখেন না। ভূমার যে-অনন্তরূপ রবীন্দ্রনাথের নান্দনিক দৃষ্টিকে বিষণ্ণ আনন্দ দিয়েছে তা একাধারে ভয়ংকর এবং মনোহর তাকে ধিক্কার দেওয়া মূঢ়তা।

এ দুর্লভ প্রেম

"সব বুঝতে পারা মানে সব ক্ষমা করা।" ব্যতিক্রম অনেক পাওয়া যাবে, কোনোমতেই ক্ষমার যোগ্য নয় এমন মানুষের বা কর্মের নজীর সংবাদপত্র থেকে, ইতিহাস থেকে, উপন্যাস থেকে খুঁজে বার করতে খুব বেশি বেগ পেতে হবে না। তবু ফরাসী প্রবাদবাক্যটি অন্য-সব প্রবাদবাক্যের মতনই আপন নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে সত্য। উল্‌টোটাও কম সত্য নয়; যাদের স্বভাবে ক্ষমা কম, অতশত বুঝে দেখবার ধৈর্য তাদের থাকে না। সরল বিচারের পর সরল কর্তব্যের বাঁধানো পথ দিয়ে তারা দ্রুত হাঁটে। একটু পরেই হয়তো অনুতাপে দগ্ধ হয়। না, ঠিক অনুতাপে নয় (কারণ তারা তো কর্তব্যই করেছে), দগ্ধ হয় হৃদয়-তাপে, কাঁদায় যত নিজেও তার চেয়ে খুব কম কাঁদে না। কর্তব্য যেখানে বস্তুতই জটিল এবং দ্বিধাবিভক্ত সেখানে সহজ সমাধান ট্র্যাজিক হ'য়ে পড়ে অনেক সময়। যেমন হয়েছিলো বজ্রসেনের বেলায়।

উত্তীয় যখন শ্যামাকে বলে "ন্যায়-অন্যায় জানি নে, জানি নে, জানি নে, শুধু তোমারে জানি", সে কোনো গভীর জ্ঞানের কথা বলতে চায়নি, বলতে পারার মতো বয়স তার হয়নি; শ্যামার জন্য সব-কিছু করতে, সব-কিছু হারাতে সে প্রস্তুত—এইটুকু জানাতে চেয়েছিলো তার তরুণ কিন্তু পূর্ণবিকশিত প্রেম। নাটকীয় প্রসঙ্গক্রমে কথিত এই পংক্তিটি কিন্তু তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে কোনো অবিস্মরণীয় লিরিকের মূল-সূত্রটির মতো আমাদের নিঃসঙ্গ মুহূর্তের সঙ্গী হ'য়ে ওঠে, আপন সীমিত অর্থ ছাড়িয়ে দূর-দূরান্তরে টেনে নিয়ে যায় আমাদের জীবন-ভাবনাকে। মনে হয় এই নীতিগর্ভ অথচ নীতিপারের নাটকে মানবজীবনের অতি দুর্বোধ্য জটিলতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ আটাত্তর বৎসরের বহুবিচিত্র

বেদনায় দগ্ধবিদগ্ধ রবীন্দ্রনাথও যেন বলতে চাইছেন: মানুষকে হৃদয় দিয়ে বোঝো, ছককাটা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে যেয়ো না, রাসায়নিক নিক্তিতে পাপপুণ্য ওজন করতে চেয়ো না। অথচ পাপপুণ্যের প্রশ্নটা পদে-পদেই কণ্টকিত হ'য়ে ওঠে নাটকীয় ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে। নাটক শুরু হয় নগর-কোটালের আক্ষরিক অর্থে সাংঘাতিক অন্যায় অপবাদে, চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছোয় নায়িকার আপাত অক্ষমার্হ অপরাধ-স্বীকারে, শেষ হয় নায়কের ক্ষমাহীনতার আত্মগ্লানিতে।

জনৈক যুবক, একটি তরুণ এবং অপেক্ষাকৃত পূর্ণবয়স্কা এক নারী (তাদের বয়ঃক্রম কি পঁচিশ, ষোলো এবং বত্রিশ?) এই তিনটি প্রেমিক-হৃদয়ের উপাদানে গীতিনাট্য 'শ্যামা' রচিত। নৃত্যনাট্য না-ব'লে গীতিনাট্য কেন বলছি তার কৈফিয়ৎ শেষ পৃষ্ঠার পাদটীকায় পাওয়া যাবে। তিনজনকে এক নিদারুণ অন্তিম পরিস্থিতির মধ্যে ফেলেছেন নাট্যকার—তাদের নৈতিক প্রতিক্রিয়া কিংবা চারিত্র্য যাচাই করার জন্য নয়, বহিরাচরণের বালুকায় ঢাকা আভ্যন্তরীণ ফল্গুধারার গতিবিধির স্বরূপ খানিকটা উদ্ঘাটন করবার জন্য। হৃদয়মনের এতটা গভীরে জ্ঞানের আলো অবশ্য পৌঁছোয় না। কবির রসদৃষ্টি (যা রসসৃষ্টি থেকে অভিন্ন) তবু হাল ছাড়ে না, অন্ধকারে-প্রদোষান্ধকারে পথ খুঁজে বেড়ায়; তমসার পরপারে অথবা তমসার মধ্যেই কিছু হয়তো দেখতে পায়, নইলে কবিতা কবিতাই হ'তো না। অন্তিম পরিস্থিতি (extreme situation) কথাটা চালু করেছেন য়াস্‌পার্স; বলছেন জীবনমৃত্যু একাকার হ'য়ে যায় এমন দুঃসহ-যন্ত্রণাময়, অপার-সংকটঘন অবস্থায় না-পড়লে আমরা জীবনের তথা জগতের সীমাহীনতা এবং দৈনন্দিনের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করতে পারি না।

জাতকের শ্যামা ছিলো অগ্রগণিকা, সাজবদলের মতো প্রেমিক-বদলও তার হামেশাই ঘটতো। যার প্রতি সে সাময়িকভাবে আসক্ত হ'তো তাকে বশীভূত করা ঐ অপরূপ সুন্দরীর পক্ষে দুঃসাধ্য ছিলো।

না মোটেই; দরকার হ'লে যে-কোনো অবাঞ্ছিত প্রেমিককে জন্মের মতো সরিয়ে ফেলার ছল-কৌশলও তার অভ্যাসসিদ্ধ ছিলো। বজ্রসেনের রূপ দেখে সে মুগ্ধ হ'লো, কিন্তু ঐ মন-কাড়া যুবকটি তখন নগর-কোটালের হাতে বন্দী; প্রাণনাশ তার আসন্ন। কাজেই "চেটিকে ডাকিয়া রাজপুরুষদের নিকট পাঠাইয়া বলিল—তোমাদের বহু হিরণ্য দান করিব। অন্য এক পুরুষকে পাঠাইতেছি, তাহার পরিবর্তে বজ্রসেনকে ছাড়িয়া দিয়ো। রাজপুরুষেরা স্বীকৃত হইল। শ্যামার গৃহে উত্তীয় নামক এক শ্রেষ্ঠীপুত্র বাস করিত। শ্যামা ছলপূর্বক তাহাকে ভোজনপাত্র-সহ শ্মশানস্থিত বজ্রসেনের নিকট পাঠাইল। রক্ষীগণ শ্যামার ইঙ্গিত অনুসারে উত্তীয়কে হত্যা করিয়া বজ্রসেনকে মুক্তি দিল।"

রবীন্দ্রনাথের শ্যামা ভিন্ন জাতের, শুধু ভিন্ন জাতের নয়, ভিন্ন যুগের মানুষ। রাজনটী সে, নৃত্যগীতে অসাধারণ গুণবতী, সুন্দরীশ্রেষ্ঠা, আমাদের কালের চিত্রতারকাদের মতোই লক্ষ প্রাণের পুত্তলী। তবু আমোদপ্রমোদে ভোগবিলাসে আত্মবিস্মৃতা নয় সে, বরং খুবই আত্মসচেতন। সখীরা তাকে "গরবিনী" বলে, কিন্তু তারাও বোঝে যে এ-গর্ব রূপের নয়, ধনের নয়, মানের নয়। কিসের তবে? সখীদের অবশ্য বুঝবার কথা নয় যে এ-গর্ব তার প্রেমিক-হৃদয়ের অভিজাত রুচির। রাজা তার চোখে নগণ্য, নগরশ্রেষ্ঠী ও শ্রেষ্ঠীপুত্ররা তুচ্ছ। যৌবন চ'লে গেলে "কী দিয়ে তখন গাঁথিবে তোমার বরণমালা, হে বিরহিণী"—গায় সখীরা। আন্দাজে বোঝা যায়, যৌবনের প্রান্তে এসেও সে বিরহিণী, কারণ যাকে পেলে তার "পিপাসিত জীবনের ক্ষুব্ধ আশা" মিটতো তাকে সে পায়নি, দেখাই পায়নি তার। কামনার তৃপ্তিতে কোনো তৃপ্তি নেই এই জন্ম-রোম্যান্টিকের গভীরতর তৃষ্ণার। নিজেই সে বলে তার যৌবন অসুন্দর, তার মন বিষাদের কুহেলিকায় ঢাকা।

এই সংরাগরক্ত কিন্তু সূক্ষ্মহৃদয় শ্যামার সঙ্গে একদিকে যেমন

জাতকের স্থূলমনা স্বার্থান্ধ শ্যামার আকাশ-পাতাল প্রভেদ চোখে পড়ে, অন্যদিকে তেমনি রবীন্দ্রনাথেরই প্রায় ষাট বছর পূর্বে রচিত অন্য-এক গীতিনাট্যের ('মায়ার খেলা') আত্মনিমগ্না আত্মপ্রসন্না নায়িকার প্রতি-তুলনা লক্ষণীয়। তু-জনই নাটকের প্রারম্ভে পুরুষ প্রার্থীদের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনা, তু-জনকেই সখীরা একই ভাষায় পরামর্শ দেয়, "জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা, হে গরবিনী"। কিন্তু তাদের মানসিক পটভূমি ও প্রতিক্রিয়া একেবারে বিপরীত। প্রমদার মনে হয় প্রেম ব্যাপারটাই বড়ো বাজে, মিছেমিছি একটা ঝামেলা পাকানো। সে জীবনে অবিমিশ্র সুখ চায় অথচ সে শুনেছে যে প্রেমে অনেক ঝক্কি, অনেক জ্বালাযন্ত্রণা :

পরের মুখের হাসির লাগিয়া
অশ্রুসাগরে ভাসা,
জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া
জীবনের সুখ নাশা—

জেনে-শুনে এই ফাঁদে পা দেবার মতো মেয়ে সে নয়। আর সবচেয়ে গোড়ার কথা হচ্ছে যে সে নিজেরই প্রেমে পড়েছে, তার মনের গড়নটা হ'চ্ছে আজকালকার ভাষায় যাকে বলে নার্সিসিস্ট্। এবং এটা বুঝবার মতো আত্মবিশ্লেষণী বুদ্ধি তার আছে :

আমি আপনার মাঝে আপনি হারা
আপন সৌরভে সারা
যেন আপনার মন
আপনার প্রাণ আপনারে সঁপিয়াছি।

অনেক যাচনা অনেক সাধ্যসাধনার পর অবশেষে প্রমদা প্রেমে পড়লো। কিন্তু একেই কি বলে প্রেম? প্রার্থনা মঞ্জুর করা দেবীকে মানায়, মানবীকে নয়। তার হৃদয়মন প্রেমের জন্য এতই অপ্রস্তুত, এতই অনাতিথেয় ছিলো যে সে নিজের প্রেম ঠিক বুঝতেও পারলো না,

বোঝাতেও পারলো না। প্রেম বন্যার মতো এসে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো না, কুয়াশার মতো অলক্ষ্যে এসে অলক্ষ্যে মিলিয়ে গেলো। অমরের মনে জেগেছিলো মোহ, কুয়াশার সঙ্গে-সঙ্গে তা কেটে গেলো। প্রমদার মন ছিলো আত্মাভিমানে ভরা, প্রেম চায় আত্মদান; সুর মিললো না।

পক্ষান্তরে শ্যামার ব্যক্তিত্বের কাঠামো প্রেমের উপাদানে গড়া, এবং সে-প্রেম আত্মপ্রেম মোটেই নয়। তার আত্মমর্যাদাবোধের মধ্যে আত্ম-কেন্দ্রিকতা খুঁজে পাওয়া যাবে না। নিজেকে দিতেই চায় সে। প্রেমের অশেষ দুঃখ সে বোঝে এবং ঐ তিক্তমধুর দুঃখের জন্য সে শুধু প্রস্তুত নয়, ব্যাকুল। 'পরিশোধ' নামক নাট্যগীতির (এটি 'পরিশোধ' কাহিনী-কাব্য ও 'শ্যামা' গীতিনাট্যের মধ্যপদ) উদ্বোধনসঙ্গীতে শ্যামা গাইছে:

চরণসেবার সাধনা আনো
সকল দেবার বেদনা আনো
নবীন প্রাণের জাগরণমন্ত্র
কানে কানে বোলো।

প্রথম যৌবন থেকে শ্যামা খুঁজছে সেই উন্নতদর্শন দেবকান্তি পুরুষকে যার হাতে শুধু দেহ নয়, সমস্ত মনপ্রাণ সমর্পণ করা যায়, যার কানে-কানে বলা যায়, "আমার সব সুখদুখমন্থনধন"। সকল দেবার বেদনা নিয়েই সে বেঁচে আছে এতদিন শূন্য পথের দিকে চেয়ে। পথ চাওয়া তার সার্থক হ'লো একদিন আক্ষরিক অর্থে। বাড়ির সামনে পথে যেতেই সে প্রথম দেখেছিলো তার এতদিনের সাধনার ধনকে। কিন্তু কী নিদারুণ সে-সার্থকতা। বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, জাতক-কাহিনী দু-হাজার বছর পার হ'য়ে একেবারে আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ রোম্যান্টিক পর্বে এসে পৌঁছেছে অন্তত শ্যামার চরিত্রকল্পনায়।

উদ্ধৃত বিশেষণগুলি লক্ষণীয়। "উন্নতদর্শন" বলতে শুধু রূপবান বোঝায় না, বোঝায় এমন মানুষকে যার মুখশ্রীতে অন্তরের সৌন্দর্য ও

চারিত্র্যের আভিজাত্য পরিস্ফুট। শাস্ত্রে বলে শ্রদ্ধয়া দেয়ং; শ্যামা হৃদয়দান করতে চেয়েছিলো শ্রদ্ধার সঙ্গে, শ্রদ্ধার পাত্রকে। সেটাই হ'লো কাল। নিজে যারা শ্রদ্ধেয়, অন্যের কাছে—অন্তত প্রিয়জনের কাছে—তাদের দাবী বড়ো খাটো নয়, ত্রুটিবিচ্যুতি তারা সহজে ক্ষমা করতে পারে না। বজ্রসেন ছিলো যেমন সুন্দর, তেমনি শুদ্ধান্তঃকরণ, ন্যায়নীতিপরায়ণ, সদাজাগ্রতবিবেক। প্রথম দর্শনেই শ্যামা বুঝতে পারলো যাকে সে দেখছে সে শুধু সুদর্শন নয়, উন্নতহৃদয়ও। তার মনের তারগুলি ঝংকার দিয়ে ব'লে উঠলো—এই, একমাত্র এই মানুষটিই নবপ্রাণের জাগরণমন্ত্রে আমার শুষ্ক যৌবনকে সুন্দর ক'রে তুলবে। স্বভাবতই তার এতকালের পিপাসাক্লিষ্ট হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা সে এক মুহূর্তে ঢেলে দিলো এই দেবকান্তি পুরুষের চরণে। শ্যামার দেহমনের প্রত্যেকটি অনুপরমাণু বজ্রসেনের প্রেমে হ'য়ে উঠলো "মত্ত অধীর"। পরে কী করুণ শোনায় যখন উত্তীয়ের শান্ত ধীর উদাত্ত প্রেমের কথা বলতে গিয়ে সে বলে—"বালক কিশোর উত্তীয় তার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর মত্ত অধীর।"

তাই ব'লে উত্তীয়ের প্রেমকে একেবারে কামগন্ধহীন ভাবার যথেষ্ট ইঙ্গিত নাটকে আছে যাঁরা মনে করেন, তাঁদের সঙ্গে আমি একমত হ'তে পারি না। উত্তীয় এমন-কিছু বালক নয়—শ্যামা তাকে স্নেহকরুণায় এবং অন্যান্য বয়স্ক প্রার্থীর তুলনায় "বালক কিশোর" ব'লে উল্লেখ করলেও। আহা বেচারী বড়োই ছেলেমানুষ—ভাবটা এই-রকম কিছু। গানে আমরা তাকে যতটা চিনি তাতে তো মনে হয় অন্য দুই নাট্য-চরিত্রের অপেক্ষা উত্তীয় পরিণতবুদ্ধি, স্থিরহৃদয়। সখীরা জানে সে "বিফল বাসনা" বহন করছে, সেই বাসনার অব্যক্তবেদনা "বিরহ প্রদীপে শিখারই মতো / নয়নে তোমার উঠেছে জ্বলিয়া"; তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছে—হতাশ হ'য়ো না সখা, তোমার তাপসপ্রেমের জয় হবেই। শ্যামা জানে এই তরুণটি তার প্রেমে "মত্ত অধীর"। সে-

ধারণা খানিকটা ভ্রান্ত হ'লেও, নিত্যদিনের সাহচর্যে সে উত্তীয়কে যেমন বুঝেছে তার নারীসুলভ অনুভূতি দিয়ে তা একেবারে ভিত্তিহীন —এ-কথা বিশ্বাস করা শক্ত। আর কামবর্জিত প্রেমকে কোনো অর্থেই "মত্ত অধীর" বলা যায় না। উত্তীয়ের প্রেম কামগন্ধহীন না-হ'লেও তা পারিজাতগন্ধবহ। এই প্রেমের আলোয় আমরা শুধু উত্তীয়কে চিনি না, শ্যামাকেও চিনি। উত্তীয়ের হৃদয়ে এ অপূর্ব, প্রায় অপার্থিব সুন্দর প্রেম তো নিরালম্বভাবে জাগেনি, শ্যামাই জাগিয়েছিলো। এমন প্রেম কোনো নারী শুধু রূপ দিয়ে জাগাতে পারে না, সমগ্র ব্যক্তিস্বরূপ দিয়েই পারে। সে-ব্যক্তিস্বরূপ জাতকের শ্যামার ছিলো না, রবীন্দ্রনাথের শ্যামার ছিলো।

উত্তীয়ের আত্মাহুতির মধ্যে বরঞ্চ বীরোচিত হিতৈষণার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদের কোনো আভাস নেই, নামগন্ধ নেই। সখীরা যখন গায়—"প্রবলের উৎপীড়নে কে বাঁচাবে দুর্বলেরে" তখন তারা ভাবতেই পারে না যে এ-কাজ উত্তীয়ের দ্বারা সম্ভব। শ্যামা যখন নিরুপায় যন্ত্রণায় চারিদিকে ছোটে আর চীৎকার ক'রে গেয়ে ওঠে :

ওগো শোনো, ওগো শোনো, ওগো শোনো,
আছ কি বীর কোনো,
দেবে কি ওরে জড়িয়ে মরিতে
অবিচারের ফাঁদে
অন্যায় অপবাদে,

তখন তার কল্পনাতেও ছিলো না যে সে-বীর উত্তীয় হ'তে পারে। বাস্তবেও সে-বীর উত্তীয় নয়।

শ্যামার ডাক শুনে উত্তীয় ছুটে আসে অবশ্য, কিন্তু এসে বলে না যে একজন নির্দোষকে এমন অবিচারের ফাঁদে আমি জড়াতে দেবো না, প্রাণের মূল্যেও তাকে বাঁচাবোই। বলে—"ন্যায় অন্যায় জানি নে, জানি নে, জানি নে, শুধু তোমারে জানি, ওগো সুন্দরী।" তুমি যদি প্রাণ

দিতে বলো তবে এখনি দেবো তোমার চরণে ; কোন্ ন্যায়সঙ্গত বা অন্যায় উদ্দেশ্যে তুমি আমার প্রাণ চাও তা তুমিই জানো, আমি বিচারক নই, আমি প্রেমিক। উত্তীয়ের একটা প্রেমিক-সুলভ স্বার্থও জড়িত আছে এই আত্মদানে। সে বেশ ভালো ক'রে জানে কোনোদিনই শ্যামার বক্ষলগ্ন হওয়া তার ভবিতব্যে নেই, কারণ ঐ সুন্দরীশ্রেষ্ঠা তাকে সামান্য প্রশ্রয় দিলেও একটুও ভালোবাসে না। কিন্তু হতাশ অথচ ব্যাকুল কল্পনার চোখে সে একটি মরণোত্তর দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে —তোমার যে প্রাণপ্রিয়কে বাঁচাতে চাও আমার "প্রাণঋণ" নিয়ে :

তাহারি সঙ্গে তোমারি বক্ষে
বাঁধা রব চিরদিন মরণডোরে
কেমনে ছাড়িবে মোরে,
ছাড়িবে মোরে, ওগো সুন্দরী।

নিরাশ প্রার্থনার এত বড়ো উত্তর উত্তীয়ের কাছ থেকে পেয়ে শ্যামা হঠাৎ ছোটো হ'য়ে গেলো নিজের চোখে। যাকে সে কখনো কিছু দেয়নি, যে কিছুই চায়নি মুখ ফুটে ("এতদিন তুমি, সখা, চাহনি কিছু, / নীরবে ছিলে করি নয়ন নীচু") আজ সে তাকে দিতে এসেছে মানুষের পক্ষে সবচেয়ে মহৎ, সবচেয়ে চূড়ান্ত দান যা সম্ভব ! প্রতিদানে শ্যামা তো প্রেম দিতে পারে না। তবু জীবনের অন্তিম মুহূর্তে উত্তীয় পেলো তার মানস-সুন্দরীর কাছ থেকে অন্তরের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ; যে তাকে এতদিন শুধু করুণামিশ্রিত হাস্যপরিহাসই ক'রে এসেছে, আজ সে তার চরণে প্রণাম জানালো। এই অপ্রেমযুক্ত প্রণতি পেয়ে উত্তীয় যে শেষ গান গেয়ে গেলো ("আমার জীবন পাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান") তা অবিস্মরণীয়, তবু তার শেষ পংক্তিটি উদ্ধৃত করতে চাই ; "যারে জানো নাই / তার গোপন ব্যথার নীরব রাত্রি হোক আজি অবসান।" এই লাজুক কিন্তু উচ্চাভিলাষী প্রেমিকের আত্মদানে কি ব্যর্থ হতাশ প্রেমিকের আত্মহত্যার আমেজ ছিলো না স্বল্প পরিমাণেও ?

ওগো আমার এই জীবনের
শেষ পরিপূর্ণতা,
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।

প্রেমে পরিপূর্ণতা যদি না-পায় তার জীবন, তবে মরণেই পাক। 'ডাকঘর'-এর অমলের কাছে কিংবা রবীন্দ্রনাথের কাছে মৃত্যু আর ভগবানে ভেদ ছিলো না—এমন কথা কোনো-কোনো সমালোচক বলেছেন; আমি তাঁদের সাথে একমত নই। কিন্তু উত্তীয়ের চোখে মৃত্যু আর শ্যামা একাকার হ'য়ে গিয়েছিলো : মরণ রে তুঁহু মম শ্যামা সমান।

উত্তীয়ের নিরাশ প্রেমের দুর্নিবার পরিণাম তার আত্মাহুতি। একে চূড়ান্ত ব্যর্থতাও বলা যেতে পারে, আবার চূড়ান্ত সার্থকতাও ভাবা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ দুই দিক থেকে দেখাতে চেয়েছেন এই মর্মান্তিক ঘটনাটিকে। দুই দিক প্রায় বিপরীত অথচ পরস্পরকে নাকচ ক'রে দেয় না, নইলে সেই একই সখীদের গানে দুটো রূপ উদ্ঘাটিত হ'তো না। একটি দিক মানবিক, সাধারণ মানুষের, বিশেষত যারা উত্তীয়ের প্রতি দরদী তাদের মনে হ'তেই পারে উত্তীয় তার তরুণ জীবন "নিষ্কারণে" দিলো। সখীরা জানে যে মধুর স্বপ্নাভ প্রত্যাশায় উত্তীয় বুক বেঁধেছিলো তা তো আশার ছলনামাত্র। জীবনকালে যে-সাধনদুর্লভার হৃদয়ে স্থান হ'লো না, মৃত্যুর পরে (হোক্-না সে মহৎ মৃত্যু) তার হৃদয়ে স্থান হবে—উত্তীয় যদি তা-ই ভেবে থাকে তবে সে নিষ্কারণেই মৃত্যুবরণ করেছে। শ্যামার বুকে যা বাকি জীবন গেঁথে থাকবে তা উত্তীয়ের সুন্দর উদার প্রেম নয়, তার যন্ত্রণাদায়ক বিবেক-দংশক স্মৃতি, এবং সেই সঙ্গে নিজের প্রতি ধিক্কার। তাই সখীদের বিলাপ স্বাভাবিক :

মধুর দুর্লভ যৌবনধন ব্যর্থ করিলি
কেন অকালে
পুষ্পবিহীন গীতিহারা মরণমরুর পারে,
ওরে সখা।

এই গানের অব্যবহিত পরেই রাজপ্রহরী উত্তীয়কে বধ ক'রে বজ্রসেনকে কারামুক্ত করে। তখন সখীরা গেয়ে ওঠে সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরের গান; মনে হয় এ-সুর রবীন্দ্রনাথের আপন মনেরই সুর। সখীদের কণ্ঠে এ-ধরনের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ব্যক্ত ক'রে নিশ্চয়ই তিনি এই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে সাধারণ মানুষের পক্ষেও সম্ভব অন্তত ক্ষণ-কালের জন্য এমন-এক নান্দনিক (মিস্টিক?) স্তরে ওঠা যেখান থেকে অতি মর্মন্তুদ মৃত্যুর কালো গহ্বরের ভিতর থেকেও এক অপরূপ আলো দেখা যায়। এই আলো রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনের প্রচণ্ড-তম শোকের পরেও দেখেছিলেন, দেখে তাঁর "মনের মধ্যে একটা আকস্মিক আনন্দের হাওয়া বহিতে লাগিল।" সেই আলোরই গান শোনা যায় সখীদের কণ্ঠে :

কোন্ অপরূপ স্বর্গের আলো
দেখা দিল রে প্রলয়রাত্রি ভেদি
দুর্দিন দুর্যোগে,
মরণমহিমা ভীষণের বাজালো বাঁশি।
অকরুণ নির্মম ভুবনে
দেখিনু একি সহসা—
কোন্ আপন-সমর্পণ মুখে নির্ভয় হাসি॥

প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ এড়িয়ে গেছেন অন্তত 'নৈবেদ্য'-এর পর থেকে; প্রচলিত অর্থে মানবাত্মার অমরতা বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন না তিনি। তবু মৃত্যু সম্পর্কে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নান্দনিক দৃষ্টি তাঁর ছিলো ব'লে তাঁর হাতে বিয়োগান্ত নাটক ('প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'বিসর্জন', 'ডাকঘর' এবং সর্বোপরি 'শ্যামা') ট্র্যাজেডির খুব কাছ ঘেঁসেও ঠিক ট্র্যাজেডি হ'য়ে ওঠে না; এমন এক দুঃখস্নাত বৈরাগ্য-স্নিগ্ধ মূর্তি ধারণ করে যাকে কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞার মধ্যে ফেলা যায় না।

'শ্যামা' নাটকের উপর ট্র্যাজেডির ছায়া পড়েছে গোড়া থেকেই, প্রথম দৃশ্যেই শোনা গেলো নির্দোষ নায়কের উদ্দেশ্যে কোটালের মৃত্যু-

দণ্ড ঘোষণা: "মশানে তোমার শূল হয়েছে পোঁতা।" শেষ দৃশ্যে দেখা যায় নায়ক নায়িকার বিচ্ছেদ পূর্ণ এবং জীবন ছারখার হ'য়ে গেছে। উত্তীয়ের আত্মবলিদানের ফলে বজ্রসেন কারামুক্ত হয়, শ্যামা রাজভবনের সমাদরসম্মান ছেড়ে এসে সেই অখ্যাত অজ্ঞাত বিদেশীর পাশে দাঁড়িয়ে ভাবে অনেক দুঃখ আঘাতের পর অবশেষে তাদের মিলন পরিপূর্ণ হয়েছে, বজ্রসেন ব'লে ওঠে "দুঃখ আমার আজি হল যে ধন্য", দু-জনে পূর্ব জীবনের সমস্ত আবিলতা পিছনে ফেলে নৌকার পাল তুলে দিয়ে গান ধরে:

প্রেমের জোয়ারে ভাসাব দোঁহারে
বাঁধন খুলে দাও, দাও, দাও—

ঠিক তখনই সখীরা বুঝতে পারে যে প্রেমের তরী অচিরে খান্-খান্ হ'য়ে যাবে ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যায় প'ড়ে। প্রেমিক-প্রেমিকার অপমৃত্যুর চেয়ে প্রেমের অপমৃত্যুর ট্র্যাজেডি তীব্রতর।

প্রেমের স্বাভাবিক মৃত্যুও কম ট্র্যাজিক নয়। তারই বিষাদঘন ধূসরতা দেখা যায় 'মানসী'র অনেক কবিতায়—"ভুল", "ভুলভাঙা", "বিচ্ছেদের শান্তি", "নারীর উক্তি", "পুরুষের উক্তি" ইত্যাদিতে। কিন্তু সবচেয়ে মর্মস্পর্শী কাব্যরূপ ধারণ করেছে প্রেমের স্বাভাবিক জরা ও মৃত্যুর বেদনা সেই মিতবাক চতুষ্পদীতে, যা গানের আকারেই আমাদের অনেক বেশি পরিচিত, অথচ সুরের ঐশ্বর্য লাভ করবার জন্য কবিতাকে কিছু দৈন্য স্বীকার করতে হয়েছিলো। সনেটের প্রথম চারটি অবিস্মরণীয় পংক্তি রূপান্তরিত গানের মধ্যেও আমরা ভুলতে পারি না:

তবু মনে রেখ যদি দূরে যাই চলি।
সেই পুরাতন প্রেম যদি এক কালে
হয়ে আসে দূরস্মৃত কাহিনী কেবলি
ঢাকা পড়ে নব নব জীবনের জালে।

পুরাতন প্রেম নব প্রেমজালে ঢাকা প'ড়ে যায়—প্রেমের এই অপঘাত সাহিত্যে ও জীবনে আমাদের খুবই পরিচিত; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভাবিয়ে না-দিলে কি আমরা পুরানো প্রেমের নব-নব জীবনের জালে ঢাকা প'ড়ে যাওয়ার বেদনাটা এমন ক'রে বুঝতাম? মানুষের মৃত্যুর চেয়ে প্রেমের মৃত্যু রবীন্দ্রনাথকে দুঃখ দিয়েছে বেশি।

অদৃষ্টের ডোরে বাঁধা ঘটনার জাল ফেলে শ্যামার দুর্লভ, আক্ষরিক অর্থে অতি দুর্লভ প্রেমের নিশ্বাস-রোধ করলো যে নির্মম ব্যাধ তার প্রতিকৃতি যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে সখীরা নব দম্পতির নৌকায় উঠে ভরপুর আনন্দের গান গেয়ে পাল তুলে দেওয়ার পূর্বমুহূর্তেই:

হায়, হায় রে, হায় পরবাসী,
হায় গৃহছাড়া উদাসী।
অন্ধ অদৃষ্টের আহ্বানে
কোথা অজানা অকূলে চলেছিস ভাসি।
শুনিতে কি পাস দূর আকাশে
কোন্ বাতাসে সর্বনাশার বাঁশি।

ওরে, নির্মম ব্যাধ যে গাঁথে
মরণের ফাঁসি।
রঙিন মেঘের তলে
গোপন অশ্রুজলে
বিধাতার দারুণ বিদ্রূপবজ্রে
সঞ্চিত নীরব অট্টহাসি॥

বিধাতাকে নির্মম ব্যাধের আকৃতিতে দেখা, দৈবীবাণীর মধ্যে সঞ্চিত নীরব অট্টহাসি শোনা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অভূতপূর্ব, "they kill us for their sport"-এর চেয়েও জোরালো তার ব্যঞ্জনা। অথচ এই গানে বা তার নাটকীয় বিস্তারে নাটক শেষ হয় না। হ'লে হয়তো শেক্স্পীয়রীয় মহিমা লাভ করতো, কিন্তু রাবীন্দ্রিক সুষমা হারাতো।

শেষ হয় যে-গানে তাতে সর্বংসহ ঈশ্বরের ক্ষমার কাছে বিবেকী মানুষের ক্ষমাহীনতা লজ্জিত।

উত্তীয় যদিও হাসিমুখে প্রাণ দিয়ে স্বর্গের আলো আনলো অবিচারে-অত্যাচারে অন্ধকার পৃথিবীতে, তবু ভোলা উচিত নয় যে উত্তীয়কে আদর্শ মানুষরূপে চিত্রিত করার কোনো অভিপ্রায় ছিলো না রবীন্দ্রনাথের; তাকে এঁকেছেন আদর্শ প্রেমিক ক'রে। মানসীর অর্থাৎ মনের মতো প্রেমাস্পদার সন্ধান করেছিলেন তিনি 'মানসী' নামক কাব্যগ্রন্থে। উত্তীয় হচ্ছে সেই মানস-প্রতিমার সুযোগ্য প্রেমিক—যার কোনো দাবী নেই, শুধু দেয়ই আছে। আদর্শ মানুষ হ'তে হ'লে এক-জনকে নয়, অনেকজনকে ভালোবাসতে হয় প্রাণ তুচ্ছ ক'রে। বুদ্ধের সর্বব্যাপী মৈত্রী ও করুণা, যীশুর love thy neighbour as thy-self—এগুলিই আদর্শ মানুষের দীক্ষামন্ত্র। উত্তীয় সে-মন্ত্রে দীক্ষিত নয়। যে-মন্ত্র সে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছে তা-ও সুন্দর, মানবজীবনে তার শক্তি ও মর্যাদা কম নয়, কিন্তু তা একেবারে ভিন্ন ক্যাটিগরির। সে-মন্ত্র প্রেমের মন্ত্র: সবার উপরে প্রেম সত্য।

শ্যামার প্রেম প্রেমের পরাকাষ্ঠা নয়, জ্বলন্ত কাঠি—"যে জ্বলনে তুই মরিবি মরমে মরমে"। প্রেমের বেদীতে উত্তীয়ের আত্মবলিদানের কাছে শ্যামার আত্মনিবেদন ছোটো হ'য়ে গেছে, তার স্বার্থই বড়ো হ'য়ে দেখা দিয়েছে। অথচ সে-ও কিছু কম ত্যাগ স্বীকার করেনি সর্বাত্মক প্রেমের ডাকে। রূপে-গুণে অনন্যা এই প্রেমসাধিকা সমস্ত রাজপুরীর, সম্ভবত সমস্ত রাজ্যের স্তবস্তুতিপ্রীতি ত্যাগ করলো বিনা দ্বিধায়; ত্যাগ করলো রাজার রাজকীয় অনুগ্রহ ও অনুরাগ এবং সেই সঙ্গে তার আনুষঙ্গিক যাবতীয় ধনমান। আমরা ভুলে যাই যে শ্যামা ছিলো উঁচুদরের নৃত্যশিল্পী। চোখে পড়বার মতো সুন্দরী নর্তকী রাজার চোখে পড়তেই পারে, হারেমেও স্থান পেতে পারে। কিন্তু রাজনটী পদ পোয়েট লরিয়েটের সঙ্গে তুলনীয়; সর্বসাধারণ্যে

বিঘোষিত রাষ্ট্রীয় সম্মান পেতে হ'লে অসাধারণ গুণ থাকা চাই। কোনো কৃতার্থ শিল্পীর পক্ষে এত বড়ো প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি এক মুহূর্তে ধূলিপরিমাণ জ্ঞান ক'রে "তোমা সাথে এক স্রোতে ভাসিলাম আমি" ব'লে সত্যি-সত্যি ভেসে চ'লে যাওয়া ছোটোখাটো ত্যাগ নয়। প্রেম-তপস্বিনী অতঃপর সব ছেড়ে নিজেকে নিবেদন করলো, "জীবনে মরণে প্রভু"র চরণে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে সে হ'তে চায় প্রতিপ্রাণা। পাপ তার অন্তরকে কলঙ্কিত করে না, ক'রে তোলে সমুদ্রের মতো গভীর।

এই ভাগ্যহতার অতি নিষ্ঠুরভাবে লাঞ্ছিত প্রেমের, সকল অর্থ খুঁজে পেয়ে সকল অর্থ হারিয়ে-ফেলা জীবনের সম্মুখে আমরা স্তব্ধ হ'য়ে অশ্রু সংবরণ ক'রে দাঁড়াই, বিচারকের দণ্ড হাত থেকে খ'সে পড়ে। খ'সে পড়ে আরো এই কারণে যে যার চরণে সে সব-কিছু সমর্পণ করলো, ন্যায়-অন্যায় বিবেক পর্যন্ত জলাঞ্জলি দিলো, তারই শক্ত হাতে বিচারের দণ্ড বড়ো বেশি উদ্যত। নেপথ্যে কণ্ঠসঙ্গীত শোনা যায়—নিঃসন্দেহে তাতে কবির কণ্ঠও মিলেছে, আমাদের কণ্ঠও মিলতে চায় :

সব কিছু কেন নিল না, নিল না,
নিল না ভালোবাসা—
ভালো আর মন্দেরে।
... ...
নদী নিয়ে আসে পঙ্কিল জলধারা
সাগর-হৃদয়ে গহনে হয় হারা,
ক্ষমার দীপ্তি দেয় স্বর্গের আলো
প্রেমের আনন্দেরে—
ভালো আর মন্দেরে॥

আর-একটা কথা আমরা অনেকে ভুলে যাই—উত্তীয়ের প্রাণ-নাশের জন্য শ্যামা খুব বেশি দায়ী নয়। শেষ মুহূর্তে সে যখন ছুটে গিয়ে নগর-কোটালের কাছে স্বীকারোক্তি করলো যে এ-সব তারই ছলনা, উত্তীয় নির্দোষ, তখন কোটাল তাতে কর্ণপাতই করলো না।

বজ্রসেনকে ছেড়ে দিয়ে সে উত্তীয়কে আসামী ঠাউরেছে ; তাকেও আবার ছেড়ে দিলে চলবে কেন, "চোর চাই, হোক না সে যে কোনো লোক / নহিলে মোদের যাবে মান।" তবু বজ্রসেন তার কারামুক্তির উপায় জানবার জন্য অধীর হ'য়ে উঠলে, সব দায়িত্ব সব দোষ শ্যামা নিজের স্কন্ধেই টেনে নিলো, বললো—এ-কারাপ্রাচীরের কোনো শিলা তার হৃদয়েব চেয়ে কঠিন নয়। সমস্ত শুনে বজ্রসেন যখন নিষ্করুণ কণ্ঠে তাকে পাপিষ্ঠা, কলঙ্কিনী ব'লে ধিক্কার দিলো তখন শ্যামার মর্মাহত মিনতির প্রকাশ কথায় ও সুরে এই অতুলনীয় নাটকের বোধকরি সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ—যদিও কোনো শিল্পরচনার অঙ্গব্যবচ্ছেদ পাপ :

হে, ক্ষমা করো নাথ, ক্ষমা করো।
এ পাপের যে অভিসম্পাত
হোক বিধাতার হাতে নিদারুণতর।
তুমি ক্ষমা করো,
    তুমি ক্ষমা কবো, তুমি ক্ষমা কবো।
...   .
তোমাব কাছে দোষ কবি নাই
    দোষ কবি নাই।
দোষী আমি বিধাতাব পায়,
তিনি করিবেন রোষ—সহিব নীরবে।
তুমি যদি না করো দয়া—
সবে না, সবে না, সবে না।

বজ্রসেন কিন্তু ক্ষমা করতে পারলো না। একটু আগেই বেশ উদার কণ্ঠে বলেছিলো বটে যে, প্রেম সব পাপ ক্ষমা ক'রে প্রেমের ঋণ শোধ করে, "কালিমার পরে তার অমৃত সে বরষে" ; কিন্তু সেটা তার অন্তরের কথা নয়। অথবা স্বভাবতই সে ভেবেছিলো যে শ্যামার পাপ যা-ই হোক্ তা ছোটোখাটো আকারেরই হবে, সে যে এত বড়ো পাপের পঙ্কে ডুবে আছে তা বজ্রসেন ভাবতেই পারেনি। যখন জানলো তখন ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলো। মুহূর্তকাল একটু করুণাই হ'লো পাপিষ্ঠার প্রতি,

পাপের পঙ্কিল পথে প্রিয়া তার কাছে এসে আত্মসমর্পণ করেছে ; গ্রহণ করলে সে-ও যে পাপী হবে। পাপিষ্ঠাকে সে ক্ষমা করতে পারলো না। তবু সে অন্তরের গভীরে উপলব্ধি করলো যে এই অভাগিনী পাপিষ্ঠাকে ঈশ্বর ক্ষমা করবেন, কিন্তু ক্ষমা করবেন না তার নীতিবিশুদ্ধ ক্ষমাহীনতা। ঈশ্বরের আদেশ কি তবে এই যে মানুষ তার ন্যায়নীতি-বোধকে ক্ষুণ্ণ ক'রেও প্রেমের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবে ? মানবজীবনে প্রেমের মহৎ মূল্য অনস্বীকার্য ; কিন্তু তার স্থান কি ন্যায়নীতির ঊর্ধ্বে ?

দুই

মূল্যের সঙ্গে মূল্যের সংঘাত (conflict of values) যখন ঘটে তখন কোনো সহজ সর্বগ্রাহ্য সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না। ভালোর সঙ্গে মন্দের কিংবা শ্রেয়ের সঙ্গে প্রেয়ের (আকাঙ্ক্ষিতের) সংঘাতের চেয়ে এ-সংঘাত দারুণতর, মানুষের জীবনকে ছারখার ক'রে দেয় ; অধিকাংশ ট্র্যাজেডির উৎস এইখানে। কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় বল্লীর প্রারম্ভে রয়েছে সেই বিখ্যাত শ্লোক : "শ্রেয় আর প্রেয় ভিন্ন, এ দুই লক্ষ্যবস্তু বিভিন্নভাবে মানুষকে বাঁধে। যারা শ্রেয়কে বরণ করে তাদের মঙ্গল হয়, আর যারা প্রেয়কে বরণ করে তারা মনুষ্যত্বের সত্য অর্থ থেকে পতিত হয়।" কিন্তু শ্রেয় বা নিঃশ্রেয়স্ (ultimate good) তো একমেবাদ্বিতীয়ম্ নয়, একাধিক। প্রেম নিশ্চয়ই তার অন্যতম। প্রাচীনেরা তার আস্বাদ পেয়েছিলেন ব'লে তো মনে হয় না ; তাঁরা নারী-পুরুষ সম্বন্ধে কামকেই বড়ো ক'রে দেখেছিলেন। এই সম্বন্ধের যে উন্নীত ভাবস্তরকে আমরা প্রেম বলি, তার কথা প্রাচীন সাহিত্যে খুব-একটা পাওয়া যায় কি ? প্লেটো যদি-বা প্রেমের আলোচনা করেছেন তাঁর বিখ্যাত কথোপকথনে, প্রেমপাত্র করেছেন কমবয়সী প্রিয়দর্শন যুবককে, নারীকে রাখতে চেয়েছেন কামতৃপ্তি, গৃহ-

কর্ম ও সেবার কাজে। সাফোর কবিতা উঁচুদরের প্রেমের কবিতা, তবু তাতে নারী-পুরুষের সম্পর্ক বিধৃত হয়নি; প্রেমিকা ও প্রেমাস্পদ দুই-ই নারী। মেঘদূত-এর বিরহী যক্ষ কামার্ত, তার কল্পচিত্রগুলি কামুকের মানসজাত, প্রেমিকের নয়। তপোবনবাসিনী শকুন্তলাও দুষ্মন্তকে দেখে কামার্তা হয়েছিলো, প্রেমাকুলা নয়। বজ্রসেনকে দেখে শ্যামার মনে যে-ভাব জেগেছিলো ("কে ওই পুরুষ দেবকান্তি") তার সঙ্গে তুলনীয় নয় শকুন্তলার কম্পিত বক্ষের স্বেদবিন্দু-শোভিত মুখমণ্ডলের ব্যঞ্জনা —যদিও শ্যামা রাজনটী, কোনো মুনিঋষির সৎশিক্ষায় ও মহৎ দৃষ্টান্তে তার মন গ'ড়ে ওঠেনি। পরবর্তী অঙ্কে অবশ্য শকুন্তলার মনে শুদ্ধ পাতিব্রত্যের উন্মেষ দেখা যায়; কিন্তু প্রথম দর্শনে শ্যামা প্রেমে পড়েছিলো, শকুন্তলা কামবিদ্ধ হয়েছিলো।

প্রাচীন শাস্ত্রে যখন অর্থ, কাম, ধর্ম ও মোক্ষকে চতুর্বিধ পুরুষার্থ বলা হয়েছিলো তখন ঠিক কী অর্থে বলা হয়েছিলো সেটা খুব স্পষ্ট নয় আমার কাছে। ধর্ম ও মোক্ষ যে-অর্থে পুরুষার্থ, অর্থ ও কাম তো ঠিক সেই অর্থে পুরুষার্থ হ'তে পারে না। বোধহয় সাইকোলজিক্যাল অর্থে তাঁরা ধনলাভ ও আসঙ্গসুখকে পুরুষার্থ বলেছিলেন। অর্থাৎ অত্যধিক সংখ্যক লোকের মনে এই লক্ষ্যগুলির আকর্ষণ দুনিবার; তারা প্রবলভাবে ধন এবং নারীসঙ্গ চায়। চাওয়া উচিত কিনা সে-প্রশ্ন আলাদা। পুরুষার্থের অন্য অর্থ এথিক্যাল: পুরুষার্থ হচ্ছে সেই লক্ষ্যবস্তু যা না-চাইলেও চাওয়া উচিত, যার আকর্ষণ বাস্তবিক ক্ষেত্রে অনেকের মনে ক্ষীণ হ'লেও যা আমাদের সকলের জীবনসাধনার সম্যক্ যোগ্য আদর্শ। পুরুষার্থের মধ্যে যখন অর্থ ও কামকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তখন এই দ্বিতীয় অর্থে 'পুরুষার্থ'-এর বদলে 'নিঃশ্রেয়স্' শব্দটা ব্যবহার করলে ভুল বোঝার সম্ভাবনা কম থাকে।

কেবল কামের তৃপ্তি নিঃশ্রেয়স্ ব'লে গণ্য হ'তে পারে না, কিন্তু

প্রেমের সার্থকতা হ'তে পারে। মানবজীবনের গভীরতম ও মহত্তম আনন্দের অন্যতম উৎস প্রেম। প্রেমকে কামগন্ধহীন হ'তে হবে এমন কোনো কথা নেই, কিন্তু কামনার চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম গভীর ও পরিব্যাপ্ত প্রেমানুভূতি। নগ্ন কামনা শ্রীহীন, কিন্তু প্রেমের মধ্যে যখন কামনা স্থান নেয় তখন তার রূপ আলাদা, প্রিয়ার দেহ তখন কোনো সুদক্ষ শিল্পীর হাতে-গড়া মূর্তির সুষমা লাভ করে। নিবিড় প্রেমের অঙ্গীভূত ইন্দ্রিয়সুখ অন্য-এক পর্যায়ে উঠে যায়, তার সঙ্গে শিল্পকর্ম-সঞ্জাত রসানন্দের তুলনা অসমীচীন নয়।

প্রেমের সঙ্গে সুনীতির (মরালিটির) যদি বিরোধ বাধে তবে কোন্‌টাকে ছেড়ে কোন্‌টাকে রাখবো আমরা? সুনীতিই কি নির্ব্যতিক্রমে বরেণ্য? মনে রাখা ভালো যে, সুনীতির কোনো বিধানই সব সময় অলঙ্ঘনীয় নয়। নরহত্যা পাপ, কিন্তু বিচারপতি যখন ফাঁসির হুকুম দেন, সেনাপতি যখন শহরের উপর বোমা ফেলতে আদেশ করেন তখন নরহত্যা, নিরস্ত্র নাগরিক-হত্যাও পাপ নয়। নিষ্ঠুরতা পাপ, কিন্তু মা যখন তার একমাত্র পুত্রকে জড়িয়ে ধ'রে বলে—তোকে আমি কিছুতেই শত্রুর কামানের মুখে যেতে দেবো না, তখন দেশের স্বাধীনতা-রক্ষায় নিবেদিত-প্রাণ পুত্র নিষ্ঠুরভাবে মায়ের হাত ছাড়িয়ে সীমান্ত-গামী ট্রেন ধরতে চ'লে যায় এবং আমাদের সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

এক হিসাবে অবশ্য সুনীতি মৌলিক, কারণ সুনীতির উপরই সমাজ দাঁড়িয়ে আছে। আর সমাজের ভিৎ যদি টলে তাহ'লে ব্যক্তিজীবনও বিপর্যস্ত হয়, সব সাধনাই পণ্ড হ'য়ে যায়। তবে কিনা সমাজরক্ষা করতে গিয়ে যদি ব্যক্তিকে এমন নিয়মনীতি বিধিনিষেধের জালে জড়িয়ে ফেলা হয় যে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই লোপ পায়, তাহ'লে সে-সমাজ নিয়েই বা আমরা করবো কী? ব্র্যাড্‌লি বড়ো সুন্দর বলেছিলেন: "মানুষ মানুষই নয় যদি সে সামাজিক না-হয়, তবে সে

পশুর চেয়ে খুব একটা ঊর্ধ্বে ওঠে না যদি সামাজিকের চেয়ে বেশি কিছু না-হয়।" সুনীতির মূল্য সম্পূর্ণরূপে সামাজিক ; তার একমাত্র লক্ষ্য সমাজের কল্যাণ। কল্যাণ বলতে ঠিক কী বোঝায় তা অবশ্য একটা জটিল প্রশ্ন। যা-ই বোঝাক্, সুনীতির লক্ষ্য সার্বিক কল্যাণ, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষের কল্যাণ নয়।

শিল্প ও জ্ঞানের মূল্য সামাজিক কি ব্যক্তিক বলা একটু শক্ত। এটা ঠিক যে জ্ঞানী (ফলিত বিজ্ঞানের কথা বলছি না) বা শিল্পীর সাধনা—তপস্যাই বলা উচিত—পরোপকারার্থে নয়, তিনি নিজের তৃষ্ণা মেটাবার জন্যই আলো বা রূপের সন্ধান করেন। কিন্তু যাতে তাঁর নিজের তৃষ্ণা মেটে তাতে অন্যেরও, সুধী ও রসিক-জনেরও, তৃষ্ণা মেটে। তাই তিনি প্রত্যক্ষত না-চাইলেও পরোক্ষত পরোপকারী, সুখস্বাচ্ছন্দ্য দিতে না-পারলেও গভীরতর আনন্দদানে সক্ষম। এক-জন প্রখ্যাত নীতিশাস্ত্রবিদ্ (নিকলাই হার্টমান) এঁদের চরিত্রে যে-সদ্‌গুণ দেখতে পেয়েছেন তাকে "প্রভাকর পুণ্য" ("radiant virtue") আখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ এঁরা লোকহিতৈষী না-হ'য়েও লোকহিত সাধন করেন স্বভাবগুণে, প্রদীপ যেমন স্বগুণেই আলো বিকীরণ করে, মানুষকে পথ দেখায়। বরঞ্চ যিনি চতুর্থ পুরুষার্থ, অপবর্গ বা মোক্ষের সাধক, তিনি অসামাজিক মানুষ, কারণ তিনি পর্বতগুহায় ধ্যানাসনে ব'সে কঠোর তপস্যার ফলে ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভ করলে কার কী এসে যায় তাতে। অবশ্য তিনি যদি মহাযান বোধি-সত্ত্বের মতো পরিনির্বাণের দরজা থেকে ফিরে আসেন, তমসাচ্ছন্ন যারা তাদের সবাইকে তাঁর আবিষ্কৃত পথ দেখিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য, তবে অন্য কথা।

স্বীকার করতেই হবে যে প্রেমের মূল্য সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত। রবীন্দ্রনাথের মতো কবিপ্রেমিকের কথা আলাদা ; তাঁরা সহৃদয় পাঠকের মনেও প্রেমের অনুভূতিকে গভীর এবং সূক্ষ্ম ক'রে তোলেন,

এই ব্রহ্মসাক্ষাৎসহোদর আনন্দ বিষয়ে তাদের স্তিমিত মূল্যবোধকে জাগ্রত রাখেন। কিন্তু অ-কবি প্রেমিক যে চরম-মূল্যের সাধনা করছেন, তাতে তাঁর নিজের জীবনই ধন্য হবে, অন্যের হবে ব'লে তো মনে হয় না। তাই প্রেমিক তাঁর প্রেমসাধনায় সিদ্ধিলাভ করবার জন্য যদি কোনো অসামাজিক অসৎ আচরণ ক'রে বসেন, তবে তাঁকে আমরা সহজে ক্ষমা করতে পারি না।

বরঞ্চ জ্ঞানী ও শিল্পীকে পারি, কারণ তিনি তাঁর জীবনদেবতাকে তুষ্ট করবার জন্য যদি একদিক দিয়ে সমাজের ক্ষতি করেনও, সঙ্গে-সঙ্গে অন্যদিক দিয়ে ক্ষতিপূরণ ক'রে দেন। তবু কোনো অভাবগ্রস্ত ভাস্কর যদি একটি বিধবা বৃদ্ধাকে গলা টিপে মেরে ফেলে তার গয়না-গাটি হস্তগত ক'রে সেই টাকা দিয়ে মহার্ঘ প্রস্তরখণ্ড কিনে এক অসাধারণ সুন্দর মূর্তি গড়েন, তাহ'লে আমাদের বিচার কী হবে? তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করলেও তাঁকে ক্ষমা করতে পারবো না বোধ-করি। রবীন্দ্রনাথের শ্যামা তেমনি আমাদের গভীরভাবে ভাবিয়ে তোলে; নাট্যকারকেও ধাঁধায় ফেলেছিলো নিশ্চয়ই। পাপের পথে প্রেমের সাফল্য চেয়েছিলো এই দুর্ভাগ্যবতী সাধিকা। বিধাতার কথা বিধাতাই জানেন, কিন্তু আমরা কি তাকে ক্ষমা করতে পারি? বজ্রসেনের মতো আমরাও এই পাপিষ্ঠাকে ভালো না-বেসে পারি না, কিন্তু পাপের মার্জনা তাতে হয় না। হয় কি? বজ্রসেনের বিচারে শ্যামা পাপিষ্ঠা। বিচার শুনে শ্যামা কেঁদে বলে—আমি পাপ করেছি, কিন্তু তোমার কাছে আমি দোষী নই, দোষী আমি বিধাতার চরণে। কথাটা শোনায় বড়ো মধুর এবং করুণ, কিন্তু এইভাবে কি পাপের শ্রেণীভেদ করা যায়? মানুষকে খুন করানো যদি পাপ হয়, তবে বিধাতার চোখেই কেন হবে, মানুষমাত্রের চোখে তা পাপ; প্রেমিকও তো এত বড়ো জ্বলজ্যান্ত সত্যের দিকে চোখ বন্ধ ক'রে থাকতে পারে না।

শ্যামার প্রাণাধিক এবং সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত বজ্রসেনকে "কঠিন শৃঙ্খলে" বেঁধে তার চোখের সামনে দিয়ে বধ করতে নিয়ে যাচ্ছে কোটাল। এই দৃশ্য দেখে সে প্রায় দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হ'য়ে যায়, বিশেষ ক'রে উত্তীয়কে নয়, সহৃদয় বা মানবদরদীমাত্রকে সম্বোধন ক'রে আর্তস্বরে ডেকে ওঠে—এই নির্দোষ বিদেশীর প্রাণরক্ষা করতে পারে এমন বীর কি কেউ নেই কোথাও! তার ডাকে সাড়া দিলো কোনো বীরপুরুষ নয়, ভীরু বিনম্র নতচক্ষু উত্তীয়। এমন শক্তিমান সে নয় যে বলপ্রয়োগ ক'রে কোটালের হাত থেকে তার নিরপরাধ বন্দীকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসতে পারে। এমন কূটবুদ্ধিসম্পন্ন সে নয় যে কোটালকে বুদ্ধির প্যাঁচে ফেলে কার্যোদ্ধার করবে। বলে নয়, কৌশলে নয়, একমাত্র যে-উপায়ে প্রেয়সীর দয়িতকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনা তার পক্ষে সম্ভব—মিথ্যা স্বীকারোক্তি ক'রে চুরির অপবাদ নিজের ঘাড়ে নিয়ে প্রবলের তলোয়ারের সামনে ঘাড় পেতে দিয়ে—তা-ও বীরোচিত, কিন্তু ভিন্ন অর্থে। একে ছল বলা যায়, কিন্তু এমন ছলনাকারীর কথা ভাবলে আমাদের মাথা নত হয় নীরব শ্রদ্ধায়। সেই ছলনাময় আত্মোৎসর্গের প্রস্তাব উত্তীয় করলো শ্যামার কাছে। শ্যামা সম্মত হ'লো; বিদায়মুহূর্তে তার হাত ধ'রে ঠেকাতে গিয়েও পারলো না। এ ভয়ংকর সম্মতি অপরাধ নিশ্চয়ই, নিন্দনীয় নিঃসন্দেহে। কিন্তু একেবারে অমার্জনীয় কি?

নাটকের শ্যামার পাপ অবশ্য জাতকের শ্যামার পাপের মতো জঘন্য নয় মোটেই। তবু রবীন্দ্রনাথ তাকে নিষ্পাপ ক'রে আঁকতে চাননি: চাইলে নাটক অর্থহীন হ'য়ে যেতো। তিনি শুধু দেখাতে চেয়েছেন শ্যামার পাপ যত বড়োই হোক্, তার প্রেম আরো বড়ো। উপরন্তু যে-রবীন্দ্রনাথ কাব্যে আধ্যাত্মিকতার প্রতিভূ ব'লে পৃথিবীময় খ্যাত এবং যাঁর প্রতি হালের কোনো-কোনো বাঙালী সমালোচক সুনীতি বায়ু-গ্রস্ত, পিউরিটান ইত্যাদি ব'লে কটাক্ষ করেন সেই রবীন্দ্রনাথ আজ

আটাত্তর বছর বয়সে আমাদের অবাক ক'রে দিচ্ছেন 'শ্যামা' গীতি-নাট্যের শেষ গানে জানিয়ে দিয়ে যে এত বড়ো পাপও বিধাতার চোখে, অর্থাৎ শাশ্বত ন্যায়নীতির চোখে, ক্ষমার্হ। এবং আমরা সবিস্ময় লক্ষ করি আমাদের শুদ্ধাত্মা কবি কতখানি বুঝ, কতখানি দরদ দিয়ে এই প্রেমার্তা "মৃত্যু-পিপাসিনী"র চরিত্র এঁকেছেন। ডস্টয়েভস্কীর উপন্যাস কি তিনি ভালোবাসতেন?

'শ্যামা' নাটকে মূল্যের সঙ্গে মূল্যের সংঘাতের কথা বলেছি। যাঁরা প্রেমকে জীবনের উচ্চতম মূল্যের মধ্যে গণ্য করেন, তাঁরাও হয়তো আপত্তি তুলবেন যে শ্যামার মনে যে-ভাব জেগেছিলো তা প্রেম নয়, মোহ (infatuation); কারণ প্রথম দর্শনে মানুষ রূপ ছাড়া আর কী দেখে, এবং রূপের প্রতি মোহ ছাড়া আর কী জন্মাতে পারে। আমি অবশ্য ইতিপূর্বে বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে, শ্যামা বজ্রসেনের শুধু রূপ দেখেনি, রূপের পর্দায় একটি অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ঝলক দেখে-ছিলো, এবং তার মনের গভীরে যে প্রবল আকর্ষণ জন্মেছিলো সেটা শুধু রূপের প্রতি জাগেনি, জেগেছিলো সমগ্র মানুষটার প্রতি।

কচিৎ-কখনো এমন লোক আমাদের চোখে প'ড়ে যাকে দেখে চম্‌কে উঠে বলি, কী আশ্চর্য মুখশ্রী। এই আশ্চর্যানুভূতি কেবল মুখের রঙে রেখায় গড়নে জাগে না, জাগে চারিত্র্যের বা ব্যক্তিত্বের আভাসে-বিভাসে। অবশ্য ভুল করতেও পারি আমরা, পরে হয়তো শুধরে নিয়ে বলতে হয় প্রথম দর্শনে যা ভেবেছিলাম মেয়েটি (বা পুরুষটি) মোটেই সে-রকম নয়। শুধু প্রথম দর্শনে কেন, দু-চার বছর চিনবার পরেও কোনো-কোনো ক্ষেত্রে আমাদের বলতেই হয়—ভুল চিনেছিলাম, লোকটির হৃদয়মনের অনেক-কিছুই ধরা দেয়নি এতদিনকার পরি-চয়ে; আজ বুঝলাম এ তো আমার ভালোবাসার যোগ্য নয়। যা-ই হোক্, আমার বক্তব্য এই যে শ্যামা বজ্রসেনকে দেখে তেমনি চম্‌কে উঠেছিলো।

তবু যদি পাঠক বা দর্শকের ভুল হ'য়ে থাকে যে বজ্রসেনের প্রতি সত্যিকার প্রেম জাগেনি শ্যামার মনে, সে তার রূপ দেখেই মজেছিলো, তবে সে-ভুল ভেঙে যায় শ্যামাকে যখন বজ্রসেন চূড়ান্ত অপমান এবং নির্মমভাবে আঘাত ক'রে পরিত্যাগ করে। এর পর কোনোপ্রকার মোহই টিকতে পারে না; কিন্তু সত্যিকার প্রেম আরো সত্য, আরো গভীর হ'তে পারে। পরে একলা পথে উদ্‌ভ্রান্তের মতো হাঁটতে-হাঁটতে বজ্রসেন যখন তাকে ডাকে :

এসো এসো এসো প্রিয়ে
মরণলোক হ'তে নতুন প্রাণ নিয়ে,

তখন মান অপমান অভিমান অভিযোগ সব মুছে ফেলে ফিরে আসে শ্যামা সেই প্রেমিকের কাছে যে একটু আগে তাকে কলঙ্কিনী ব'লে ধিক্কার দিয়েছিলো, নিজের নীতিবিশুদ্ধতা রক্ষা করার জন্য তাকে মেরে ফেলতে পর্যন্ত চেয়েছিলো। ফিরে আসে মুখে কোনো নালিশ, চোখে কোনো কান্না নিয়ে নয়। "এসেছি প্রিয়তম, ক্ষম হে মোরে ক্ষম"— এ-ছাড়া আর-কিছু চাইবার বা বলবার নেই তার। আবার সে কুড়ায় শুধু লাঞ্ছনাই এবং লাঞ্ছনাকারীর পদধূলি নিয়ে চ'লে যায় বনের অন্ধকারে, চিরকালের মতো। শেষ অঙ্কের শেষ গানের পর আমাদের মনে সন্দেহ থাকে না যে এই সর্বংসহা সর্বত্যাগিনী সর্বসুখবঞ্চিতা প্রেমিকার ঐকান্তিক প্রেম মূল্য হারানো দূরের কথা, শাশ্বতকালের রসিক হৃদয়ে অকুণ্ঠিত না-হোক্, বেদনার্ত স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ন্যায়নীতিতে সুদৃঢ়, বিবেক-দংশনে জর্জরিত বজ্রসেনের চরিত্রাঙ্কনে রবীন্দ্রনাথের মতো শুদ্ধচিত্ত কবির মনে সহানুভূতির অভাব থাকবার কথা নয়। আমরা নাট্যামোদীরা মানুষ হিসেবে বজ্রসেনকে শ্রদ্ধা করি, প্রেমিক হিসেবে নিন্দা করি; অথচ জানি মনুষ্যত্বের মূল্য রক্ষা করতে গিয়েই সে প্রেমের অমর্যাদা ঘটিয়েছিলো। "পাপীরে দিতে শাস্তি শুধু পাপেরে ডেকে এনেছি"—ঠিক বুঝে উঠতে পারি না এ কি তার তীব্র

মানসিক যন্ত্রণারই প্রকাশ, নাকি তার স্থিরবুদ্ধি আত্মবিচার। সে কি সত্যিই ভাবছে পাপ এড়াতে গিয়ে সে পাপী হ'লো? শ্যামাকে ত্যাগ ক'রে বজ্রসেন অশেষ দুঃখ পেলো নিশ্চয়ই, কিন্তু তার বিবেক-পীড়া কি উপশমিত হয়েছিলো? তার নৈতিক দৃঢ়তা কি প্রেমের বলহীনতার কাছে লজ্জিত হ'য়েই থাকবে, চরিত্রবানের আত্মসন্তোষ প্রেমিকের হৃদয়যন্ত্রণাকে লাঘব করতে পারবে না? যে অন্তিম পরিস্থিতিতে প'ড়ে বজ্রসেন "এই দারুণ রৌদ্রে, এই তপ্ত বালুকায়" উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো, তার কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা চৌহদ্দির ভিতর থেকে বেরুবার কোনো সোজা রাস্তা বা সুড়ঙ্গ পথ বজ্রসেনের জানা নেই; আমাদেরও জানা নেই। এত বড়ো পাপকে সহজ মনে ক্ষমা করতে পারলেও তো সে নিজেকে পাপী ভাবতো, সে-ভাবনায় আমাদের মন সায় দিতো।

পাপিষ্ঠাকে মর্মান্তিক শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্তই বজ্রসেন গ্রহণ করলো; সে-সিদ্ধান্তের ফলে দুটি জীবন ভেঙে টুক্‌রো-টুক্‌রো হ'য়ে গেলো। এ দুর্লভ প্রেম মূল্য হারায়নি, কিন্তু সার্থকতা হারালো। সুনীতি কি রক্ষা পেলো? শ্যামার নৈতিক বলহীনতার গ্লানি মৃত্যুদিন পর্যন্ত তার মর্মপীড়ার কারণ হবে; প্রেমের বলহীনতা কি বজ্রসেনকে লজ্জা দেবে? শ্যামা প্রেমকে বলি দিয়ে ধর্মরক্ষা করতে পারতো, কিন্তু প্রেমও কি শ্যামার মতো জন্ম-রোম্যান্টিকের স্বভাবধর্ম নয়? বজ্রসেন প্রেমকে বলি দিয়েই তার নীতিধর্ম রক্ষা করলো। তবে সে নিজেকে পাপী জ্ঞান করছে কেন? অনেক প্রশ্নই ভাবিয়ে তোলে আমাদের রসাভিষিক্ত মনকে; নাট্যকারের মনে যদি-বা কোনো উত্তর জেগে থাকে এ-সব প্রশ্নের, সে-উত্তর তিনি স্পষ্ট ক'রে তোলেননি নাটকে। অবশ্য কাব্যে গোধূলির আলো-আঁধারিই মানায়, প্রখর দিবালোক নয়।

আমরা জানি বজ্রসেনের বুকে যে-শূলটি শেষ দিন অবধি বিঁধে

থাকবে তা শ্যামার মতো প্রেমিকাকে পেয়ে হারানোর যন্ত্রণা শুধু নয়, শ্যামার মতো পাপীকে ক্ষমা করতে না-পারার সন্তাপও। ভিন্ন অর্থে দু-জনই পাপী। কিন্তু গান শেষ হয় কবি ও শ্রোতার একাত্ম এই তুলনামূলক ট্র্যাজিক উপলব্ধিতে যে পাপিষ্ঠা শ্যামাকে ভগবান তবু ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু ক্ষমাহীন চরিত্রবান বজ্রসেন ক্ষমার পাত্র নয়। তবে কি পুণ্যের চেয়ে প্রেম বড়ো? আধুনিক রবীন্দ্রনাথ কি তা-ই বলতে চেয়েছেন এই সাহসিক নাটকে? নাকি সমাপ্তি-সঙ্গীত শুধু নাটকীয় প্রয়োজনসাধন করছে, নাট্যকারের মন তাতে একটুও ধরা দেয়নি? হয়তো ধর্মদার্শনিক চারিত্র্যনীতিনিষ্ঠ সমাজ-চেতন রবীন্দ্রনাথের সায় ছিলো না প্রেমের এমন চূড়ান্ত জয়গানে। "এ দুর্লভ প্রেম মূল্য হারালো কলঙ্কে অসম্মানে"—সম্ভবত এটাই সেই রবীন্দ্রনাথের মনের কথা। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথের, আমাদের রবীন্দ্রনাথের, হৃদয় মিলেছে বজ্রসেনের হৃদয়ের সঙ্গে শেষ গানে। আমরা কেমন ক'রে ভুলবো যে রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের কাব্যের অনুরণন ট্র্যাজিক হ'লেও তাঁর সমগ্র কাব্যের মূল সুরটি রোম্যান্টিক। এবং রোম্যান্টিক কবির চোখে রোম্যান্টিক প্রেমের চেয়ে বড়ো সত্য আর-কিছু নেই। মনে হয় 'শ্যামা' রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে: শাশ্বত ধর্মভাবনার সঙ্গে কবির সংরক্ত অনুভূতিকে মেলাতে পারেননি। এই ব্যঞ্জনাদ্বৈধের ফলে নাটক কিন্তু খণ্ডিত হয়নি, নাটকীয় মূল্যে আরো সমৃদ্ধ হয়েছে।

এত সূক্ষ্ম, অনুভূতির গভীরতায় বিস্তারে ও বিবর্তনে এমন ঐশ্বর্যবান, ভালোমন্দের বর্ণযোজনায় এবং টানাপোড়েনে এমন নিগূঢ় দুটি মানব চরিত্র (তিনটিই বলা উচিত, কারণ উত্তীয়ের সঙ্গে পরিচয় ক্ষণিক হ'লেও সেই ক্ষণকালের মধ্যে গভীর রেখাপাত ক'রে যায় সে আমাদের মানসপটে) মাত্র কয়েকটি গানে রবীন্দ্রনাথ কেমন ক'রে ফুটিয়ে তুললেন —ভাবতে গেলে বিস্ময়ে অভিভূত হ'তে হয়। আমার কোনো সন্দেহ

নেই যে কথা ও সুরের যুগ্মসৃষ্টি 'শ্যামা' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এই গীতিনাট্যের প্রথম কাব্যরূপ কাহিনী-কাব্য 'পরিশোধ'-ও একটি অসাধারণ কবিতা। 'কল্পনা'-পূর্ববর্তী পর্বের রবীন্দ্রকাব্যে তার তুলন নেই।*

* 'শ্যামা'কে নৃত্যনাট্য বলছি না শুধু এই কারণে যে কাব্যে ও সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের সৃজনীপ্রতিভা এবং আঙ্গিক-সিদ্ধি যেমন অনন্য ছিলো, তার তুলনায় শতাংশের একাংশও নৃত্যকলাবিৎ ছিলেন না তিনি। 'শ্যামা'তে কথা ও সুরের সংযোগ মণিকাঞ্চন যোগ হয়েছে, কিন্তু নৃত্যকে মনে হয় অসম প্রতিদ্বন্দ্বী। রঙ্গমঞ্চে যতবার 'শ্যামা' দেখেছি, আমার মনে হয়েছে নৃত্যের অংশটা বাদ দিলেই ভাল হ'তো। বিশেষত কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন শ্যামার গানগুলি তাঁর অপূর্ব কণ্ঠে অনবদ্য আঙ্গিকে গেয়ে যান তখন দুঃখের সঙ্গে ভাবি সেই গীত-মাধুরীকে নৃত্যরূপ দান করতে পারেন এমন নৃত্যশিল্পী কোথায়। যতদিন-না রবীন্দ্রকাব্যে সহৃদয়া অথচ নৃত্যকলায় পূর্ণসিদ্ধা কোনো শিল্পীর আবির্ভাব হচ্ছে এ-পার বা ও-পার বাংলায় ততদিন নৃত্যনাট্য 'শ্যামা'র নৃত্য ভাগটা রসিকবৃন্দের কল্পনাতেই প্রতীক্ষমাণ থাকবে। বিশেষ ক'রে 'শ্যামা'র, কারণ শ্যামা যে রাজনটী; সাধারণ কোনো নৃত্যসাধিকা তার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন দেখলে না-ভেবে পারি না যে ভারসাম্য বা রসসাম্য রক্ষা পায়নি। তা ছাড়া 'শ্যামা'র মতো অতুলনীয় সৃষ্টির রূপায়ণে সামান্য ত্রুটি ঘটলেও মনে হয় যেন দেবমূর্তি অসম্মানিত হয়েছে।

প্রেমের দুই রূপ

চণ্ডালিনীর ঝি ও রাজেন্দ্রনন্দিনী

এক

চণ্ডালকন্যা প্রকৃতির রঙ কালো হ'লে কি হবে, দেখতে সে বড়ো সুন্দব। শুধু দেহের নয়, মনের গড়নও তার আর পাঁচজনেব মতন নয়; সাধারণ মেয়েব পর্যায়ে তাকে কোনোমতেই ফেলা যায় না—যদিও সে কখনো চিত্রাঙ্গদার মতো গর্ব ক'রে বলেনি "নহি আমি সামান্যা রমণী।" যেমন প্রখব তার আত্মমর্যাদাবোধ তেমনি তীব্র তার স্পর্শ-কাতরতা। এক বাজপুত্র মৃগয়া কবতে এসে তার রূপে মজলো, নিয়ে যেতে চাইলো তাকে রাজবাড়িতে। প্রকৃতি ঘৃণাভরে সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো। মা জিজ্ঞাসা করে: "কেন গেলি নে রাজার ঘরে? রূপ দেখে সে তো ভুলেছিল।" প্রকৃতি: "ভুলেছিল না তো কি। ভুলেই ছিল যে আমি মানুষ; চোখে ঠেকে পশুকেই, তাকেই চায় বাঁধতে সোনার শিকলে।" সমবয়সী উচ্চবর্ণেব প্রতিবেশিনীরাই কি তাকে মানুষ ব'লে গণ্য করে? কথায়-কথায় নাক সিট্‌কায়, দইওয়ালা কাঁকনওয়ালাকে সাবধান ক'রে দেয়—"ওকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না ছি। ও যে চণ্ডালিনীর ঝি।" ফুল কিনতে গেলে ফুলওয়ালি পর্যন্ত তাকে ঘৃণা ক'রে চ'লে যায় অন্যদিকে।

যখন অবিচার অত্যাচার অবমাননা একটা সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন রাজার বিরুদ্ধে প্রজারা বিদ্রোহ করে, ধনিকতন্ত্র মালিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয় কলকারখানা ও খেতখামারের নিপীড়িত মজুররা। পদে-পদে বঞ্চিতা ও অপমানিতা এই ওজস্বিনী চণ্ডালিকা যে বিদ্রোহিনী হবে ঈশ্বরতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই:

যে আমারে পাঠালো এই অপমানের অন্ধকারে
পূজিব না, পূজিব না, পূজিব না সেই
দেবতারে, পূজিব না।
কেন দেব ফুল, কেন দেব ফুল,
কেন দেব ফুল আমি তারে—
যে আমারে চিরজীবন রেখে দিল এই ধিক্কারে।

খুবই যুক্তিসঙ্গত কথা, ন্যায়নীতিসম্মত কথা, এবং তেমনি সৎসাহসপূর্ণ বলিষ্ঠ তার প্রকাশ। কোনো সামাজিক বা রাষ্ট্রিক বিদ্রোহ যদি আমাদের সমর্থন লাভ ক'রে থাকে কোনোদিন, তবে তার চেয়ে কম সমর্থনযোগ্য নয় এই ধার্মিক বিদ্রোহ।

আমরা প্রাচীনকাল থেকে শুনে আসছি ঈশ্বরলাভ করতে হ'লে সাধকের অনেক গুণ থাকা দরকার, অনেক দুঃখবরণ, অনেক তপশ্চরণ করতে হবে তাকে। কঠোপনিষৎ বলেন: "যে পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত হয় নাই, ইন্দ্রিয়লোলুপতা হইতে বিরত হয় নাই, একাগ্রচিত্ত হয় নাই, কিংবা সমাধির ফললাভ বিষয়ে অস্থিরতা বর্জন করে নাই, সে এই আত্মাকে প্রজ্ঞান-সহায়ে লাভ করিতে পারে না" (১।২।২৮)। গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক এই অখ্যাত চণ্ডালকন্যাই কি প্রথম আমাদের মনে করিয়ে দিলো যে ব্যাপারটা একতরফা হ'লে চলবে না; ঈশ্বরেরও কিছু সৎ এবং মহৎ গুণ থাকা অত্যাবশ্যক, আমাদের পূজা লাভ করতে হ'লে তাঁকেও সম্যক্‌রূপে পূজনীয় হতে হ'বে। রাজার বিধানে যদি অত্যাচার ঘটে তবে আমরা রাজানুগত হ'তে পারি না, ঈশ্বরের বিধানে যদি অন্যায় ঘটে তবে আমরা ঈশ্বরভক্ত হবো কেমন ক'রে? বহুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ একটি গানের শেষে লিখেছিলেন:

জানি গো আজ হা হা রবে
তোমার পূজা সারা হবে
নিখিল-অশ্রু-সাগর কূলে।

কিন্তু পৃথিবীসুদ্ধ মানুষ যদি দুঃখে যন্ত্রণায় অবমাননায় চোখের জল

ফেলতে থাকে তবে সে-হাহাকারের মধ্যে কি পূজা অন্তর থেকে স্বতঃই উৎসারিত হ'তে পারে? আমাদের উপাস্য দেবতা কি শুধু শক্তিরই দেবতা, তিনি কি মঙ্গলের দেবতা নন? যদি মঙ্গলের দেবতা হন তবে তাঁর মঙ্গলবিধানে এত ত্রুটি, এত পক্ষপাত কেন? প্রশ্ন তুলেছে চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি; 'চণ্ডালিকা'-রচয়িতার মনেও কি সেই প্রশ্ন জাগেনি তাঁর জীবনের শেষ দশকে যখন ঐ-নাটকটি লেখা হয়?

প্রকৃতির দেবদ্রোহিতার উত্তরে দেবতা অথবা তাঁর অধিবক্তা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বলতে পারতেন, বলেছিলেন হয়তো—'তোর ধিক্কৃত অপমানিত জীবন অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত, অত্যাচারের কোনো প্রশ্ন নেই এতে। চণ্ডালী, তুই পূর্বজন্মে বহু গুরুতর পাপ করেছিলি, তারই শাস্তি তোর ইহজীবনের এই লাঞ্ছনা। শাস্তি সম্পূর্ণ হ'লে এবং চণ্ডালজন্মে তোর পুণ্যকর্ম যথোপযুক্ত হ'লে পরে তুই উচ্চবর্ণে জন্মলাভ করবি।' 'তৃষ্ণার্তকে জলদান, ক্ষুধার্তকে অন্নদান—এ তো নিঃসন্দেহে অতিশয় পুণ্যকর্ম, এ হেন পুণ্যের অধিকারিণী নই কেন আমি?' 'শাস্ত্র-বিহিত কর্ম ক'রে পবিত্র বর্ণাশ্রমধর্ম রক্ষা কর, তাতেই তোর উদ্ধার। মেলা বকিস নে।' রবীন্দ্রনাথের এবং আমাদের সকলের শ্রদ্ধাভাজন তেজো-বুদ্ধি চণ্ডালিকা এর কী প্রত্যুত্তর দিতো তা সহজেই অনুমান করা যায়: 'আমার পূর্বজন্ম ব'লে কিছু ছিলো, সে-জন্মে আমি অনেক পাপ করেছিলাম—এ-সব তোমাদের বানানো কথা, আমি তাতে ভুলবার পাত্রী নই। আমি বেশ বুঝতে পারছি ঐ আষাঢ়ে কৈফিয়ৎ তৈরী ক'রে তোমরা তোমাদের ইহজন্মের ঘোরতর অন্যায় অবিচারকে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করছো। আমি তার কিছুই মানি না। "যে-ধর্ম অপমান করে সে-ধর্ম মিথ্যা।" আর যে-দেবতার রাজ্যে আমার নিষ্পাপ জীবন ("বিনা অপরাধে এ কী ঘোর অন্যায়") তোমাদের পাপের বোঝায় অহরহ পিষ্ট হচ্ছে তাঁকে সুদ্ধ মানি না।'

হিন্দু ধর্মের বিশাল স্রোতধারায় যে কত মত কত পথ এসে

মিলেছে তার ইয়ত্তা নেই। ঈশ্বরবাদীও আছেন, ঈশ্বরে অবিশ্বাসীও আছেন তাতে, আছেন কর্মযোগী ও কর্মসন্ন্যাসী এবং তারই পাশে স্বর্গলাভের আশায় সকামকর্মী, আছেন সাকার দেবদেবীর পূজারী ও নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসক। এমন উদার পরমতসহিষ্ণু ধর্মসমাজ আর নেই পৃথিবীতে। কিন্তু কী আশ্চর্য, এঁরা সবাই জন্মান্তর ও কর্মফল মানেন। মতবিশ্বাসের কথা যদি ভাবি তাহ'লে হিন্দুকে অহিন্দু থেকে তফাৎ করা যায় এই জন্মান্তরবাদ দিয়ে। ভুল বললাম, প্রাচীন বৌদ্ধরা ঈশ্বর মানতেন না, বেদ বেদান্ত মানতেন না, তবু তাঁরা কর্মফল মেনে নিয়েছিলেন। কিছু বৈশিষ্ট্য ছিলো তাঁদের কর্মবাদে, তবে ঠিক কোন্‌খানে এবং কতটুকু তা আমার কাছে খুব স্পষ্ট নয়। একটি কথা অবশ্য স্পষ্ট। তাঁরা অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন, বললেন—পূর্বজন্মের কর্মফল মানুষকে ভোগ করতেই হবে, কিন্তু তার জন্য সমাজে এই উচ্চ-নীচ, শোষক-শোষিত, অপমানকারী-অপমানিত ভেদব্যবস্থা রাখা সঙ্গত নয়, মর্যাদায় এবং সুস্থ স্বাধীন জীবনযাপন করার অধিকারে সব মানুষ সমান, ব্রাহ্মণের সঙ্গে চণ্ডালের, সিংহাসনে সমাসীন রাজার সঙ্গে পথের ভিখারীর প্রভেদ নেই।

দেবদ্রোহিনীকে সেই কথাটা জানাবার জন্য কি দেবতা পাঠিয়েছিলেন সৌম্যকান্তি উন্নতদর্শন ("ভোর বেলাকার আলো দিয়ে তৈরি তাঁর রূপ") বৌদ্ধ ভিক্ষু আনন্দকে? কুয়ো থেকে জল তুলছিলো প্রকৃতি, তার কাছে এসে দাঁড়ালেন পথক্লান্ত তৃষ্ণার্ত এই দেবদূত, বললেন: "জল দাও, আমায় জল দাও।" প্রকৃতির বুক ফেটে গেলো বলতে, তবু বলতেই হ'লো—"তোমায় দেব জল হেন পুণ্যের আমি নহি অধিকারিণী, আমি চণ্ডালের কন্যা।" তার উত্তরে আনন্দ শুনিয়ে দিলেন ভগবান তথাগতের মহান বাণী—"যে মানব আমি সেই মানব তুমি, কন্যা।" এর পরে জল দিতে আর কোনো সংকোচ রইলো না চণ্ডালিনীর মনে; জল গ্রহণ ক'রে জলদাত্রীর কল্যাণ কামনা ক'রে

চ'লে গেলেন ভিক্ষু। কয়েকটি মুহূর্তের ব্যাপার। কিন্তু দেহে-মনে শিক্ষায়-সাধনায় সম্পূর্ণ পৃথক্ দুই ব্যক্তির জীবনে বিপ্লব ঘটিয়ে দিলো "শুধু একটি গণ্ডূষ জল।" প্রকৃতির মনে হ'লো সে মুক্তি পেয়েছে, জন্ম-জন্মান্তরের কালিমা তার ধুয়ে গেছে! মা-র অবশ্য সে-সব কিছুই মনে হয়নি; তিনি দেখেছেন অনেক, অনেক বেশিকাল যাবৎ খেয়েছেন সমাজের মার। পাকা সিনিকের মতো বললেন: "মনে রাখিস, প্রকৃতি, ওদের কথা কানেই শোনবার, কাজে খাটাবার নয়। অদৃষ্টদোষে যে-কুলে জন্মেছিস তার কাদার বেড়া ভাঙতে পারে এমন লোহার খোন্তাও নেই কোনোখানে।"

এ-পর্যন্ত নাটকের ভূমিকা মাত্র। এর পর থেকে আমরা ভুলে যাই হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতার কলুষ এবং গৌতম বুদ্ধের সে-কলুষমোচনের মহৎ প্রচেষ্টার কথা। ঝাপসা হ'য়ে আসে এ-সব নীতিকথা, ধর্মকথা। তার চেয়ে অনেক বড়ো হ'য়ে ওঠে প্রকৃতি ও আনন্দের মানসিক পট-পরিবর্তন এবং চারিত্রিক সংঘাতের ইতিবৃত্ত। অবশ্য আনন্দের মানসিক যন্ত্রণাবিদ্ধ সংগ্রাম এবং ক্রমিক পরাজয়ের চিত্রপরম্পরা কেবল প্রকৃতির মায়াদর্পণে (অর্থাৎ মনোদর্পণে) দেখি আমরা। এই নাটকীয় কৌশল অবলম্বন ক'রে নাটককে আরো নিবিড় করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'চণ্ডালিকা' ডাইড্যাক্‌টিক্ নাটক নয়। নীতিশিক্ষা তার রসরূপের সম্পূর্ণ অঙ্গীভূত এবং অত্যন্ত ক্ষুদ্রাঙ্গ।

প্রথম দর্শনে এই গৌরবর্ণ পীতবসন যুবকটির প্রতি যে বহুবর্ণ ভাবসমাবেশ হয়েছিলো প্রকৃতির মনে তার মধ্যে শারীরিক আকর্ষণও ছিলো, অবশ্য প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা এবং আত্মসম্মানের মধ্যে নবজীবন লাভ করার উল্লাসের পাশে। কিন্তু সেটা স্বল্পক্ষণের ব্যাপার। প্রখর রোদে কুয়োর ধারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'সে থাকতে দেখে মা অবাক হ'য়ে জানতে চাইলো: "পুরাণে শুনি নাকি তপ করেছেন উমা রোদের জ্বলনে—তোর কি হল তাই?" "হ্যাঁ মা, আমি বসেছি তপের

আসনে।" তপস্যাই বটে। উমা তপস্যা করেছিলেন শিবকে বররূপে লাভ করার জন্য। প্রকৃতিরও সেই তপস্যা, শিবতুল্য আনন্দকে সে চায় খুব কাছে—কয়েক মুহূর্তের জন্য নয়, বাকী জীবনের মতো। কিছুকাল পরে প্রকৃতি দেখতে পেলো অন্য ভিক্ষুগণকে সঙ্গে নিয়ে আনন্দ চলেছেন সবার আগে-আগে। তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। ক্ষোভে অভিমানে হতাশায় প্রকৃতির বুক পুড়ে গেলো :

হতভাগিনী, কে তোরে আনিল আলোতে
শুধু এক নিমেষের জন্যে।
থাকতে হবে তোরে মাটিতে
সবার পায়ের তলায়।

আনন্দ অবশ্য আগেই উপদেশ দিয়েছিলেন :

তিনি বলে গেলেন আমায়—
নিজেরে নিন্দা কোরো না,

তবে এ-উপদেশের মূল্য কতটুকু ? চণ্ডালিনীর ঝি অবশ্য সাহস ক'রে উচ্চবর্ণ ভিক্ষুর করপুটে জল ঢেলে দিলো ; কিন্তু ঐ পর্যন্ত। সে যখন গাঁয়ের উচ্চবর্ণ লোকেদের সামনে গিয়ে বুক ফুলিয়ে বলবে—আমি তোমাদের সবার সমান, "মানবের বংশ আমার, মানবের রক্ত আমার নাড়ীতে", তখন কি তাদের ধিক্কার আরো তীব্র, আরো নিষ্ঠুর হবে না ? আনন্দের উদার বাক্য ("যে মানব আমি সেই মানব তুমি, কন্যা") যদি শুধু ধর্মদেশনা নয়, তাঁর গভীর অন্তরের ভাব প্রকাশ ক'রে থাকে, তবে তিনি ফিরে এসে বসুন তার পাশে, শুধু এক নিমেষের জন্য নয়, দিনের পর দিন সবাইকে জানান যে প্রকৃতিকে সকল লাঞ্ছনা থেকে উদ্ধার করেছেন : "দেখুক সবাই আমার স্পর্ধা। গৌরব করে বলতে চাই, আমি তোমার সেবিকা ; নইলে সংসারে সবারই পায়ের কাছে চিরদিন বাঁধা পড়ে থাকতে হবে দাসী হয়ে।" মায়ের বস্তুতান্ত্রিক এবং অত্যন্ত

সমুচিত উপদেশ—"আকাশের চাঁদের পানে হাত বাড়াস নে"—ভাবে বিভোর কন্যার কানে পৌঁছলো না।

কিন্তু এহ বাহ্য, এ-সবই প্রকৃতির অন্তরের ক্যালিডস্কোপিক পরিবর্তনের দ্রুতবিলীয়মান বর্ণসমাবেশ মাত্র। আসল কথা হচ্ছে যে এ-সবের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতির মনে এক অভিনব অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতি জেগেছে যার রূপরেখা সে দেখতে পাচ্ছে না, যার তল সে খুঁজে পাচ্ছে না। প্রেম কাকে বলে সে জানতো না এতদিন, আজ একটি গণ্ডূষ জল দিতে গিয়ে সে ডুবে গেলো অকূল সমুদ্রে। "জল দাও" অতি সামান্য কথা, কিন্তু প্রকৃতির মর্মতলে পৌঁছে অসামান্য হ'লো তার মর্ম ও মূল্য, আদিগন্ত বিস্তৃত হ'লো তার অর্থ :

কালো মেঘ পানে চেয়ে
এল ধেয়ে
চাতক বিহ্বল—
বলে দাও জল, দাও জল।
ভূমিতলে হারা উৎসের ধারা
অন্ধকারে
কারাগারে।
কার সুগভীর বাণী
দিল আনি
কালো শিলাতল—
বলে দাও জল, দাও জল।

তার হর্ষবেদনায় কম্পিত বক্ষ থেকে, তার প্রতি রোমকূপ থেকে বেরিয়ে এলো গান :

না, না, ডাকব না, ডাকব না, অমন করে বাইরে থেকে,
পারি যদি অন্তরে তার ডাক পাঠাব আনব ডেকে।

মা-র সন্দেহ হ'লো কেউ বুঝি তার রূপসী কন্যাকে মন্ত্র করেছে, "বাছা মন্ত্র করেছে কে তোকে ?" উত্তর দিতে গিয়ে প্রকৃতি কতকটা বুঝতে

পারলো কী ঘটেছে তার হৃদয়ে, দেখতে পেলো যা কখনো সে দেখোন, প্রেমের আলোয় উদ্ভাসিত তার মনেব এতদিনকাব ঘনান্ধকার কক্ষ। কোনো আবরণ না-রেখে, কোনোপ্রকাব লজ্জা বা দ্বিধা বোধ না ক'বে সে বলতে পারলো :

সে যে পথিক আমাব,
    হৃদয় পথের পথিক আমার।
হায় বে, আব সে তো এল না, এল না
    এ পথে এল না,
আর সে যে চাইল না জল।

জল তো আর জল নয় তাব চোখে, রূপান্তরিত হয়েছে এতদিনকার অবদমিত, আসংজ্ঞাত মনেব গভীবে উতরোল প্রেমবসধাবায়। আনন্দেব সদুপদেশ নয়, সহৃদয় ব্যবহার নয়, নিজের অজান্তে যে অদম্য প্রেম ও প্রেম-পিপাসা তিনি জাগিয়ে দিয়ে গেলেন এই লোকসমাজে লাঞ্ছিতা তরুণীর হৃদয়ে, তাই তাকে তুলে দিলো সকল লাঞ্ছনার উর্ধ্বে, সদ্বংশজাত সাধারণ মানুষের শুধু সমস্তরে নয়, আরো উপবিতলে, বায়ু যেখানে নির্মল, দৃষ্টি যেখানে দূরপ্রসারিত। সেইখানে দাঁড়িয়ে সে অসংকোচে বলতে পারলো :

আমি ভয় করি নে, মা, ভয় করি নে।
ভয় করি মা, পাছে সাহস যায় নেমে,
পাছে নিজের আমি মূল্য ভুলি।
এত বড স্পর্ধা আমার, এ কি আশ্চর্য!

বলতে পারলো :

ভিক্ষুরে নিয়ে আয় অমানিতার পাশে,
সেই তারে দিবে সম্মান—
এত মান আর কেউ দিতে কি পারে।

অনেকপ্রকার মন্ত্র জানতো মা কিন্তু প্রেমের মন্ত্র সে শেখেনি কোনোদিন,

তাই তার পক্ষে বোঝা সহজ নয় যে তার মেয়ে এখন আর সাধারণ মেয়ে নয়, অসাধারণ কিছু ঘ'টে গেছে তার দেহে মনে আত্মায়। "এত বড় স্পর্ধা" যে-প্রেম দিতে পারে সে-প্রেমের আয়তনও এমন মহাসাগরতুল্য যার তল নেই, তীর নেই। সেই প্রেমের মধ্যে প্রকৃতির জন্মান্তর ঘটেছে, এক নিমেষের জন্য একটি উচ্চবর্ণ আগন্তুকের তৃষ্ণা-মেটানো সম্মানলাভে নয়। স্বভাবতই মা মেয়েকে একাধিকবার বলতে বাধ্য হয়েছে "আমি যে তোর ভাষা বুঝি নে।" সাধারণ মেয়ের অগম্য এই মহান প্রেমানুভূতির প্রকাশ মহৎ ভাষাতেই সম্ভব। সে-ভাষা কবিতার ভাষা। গদ্যভাষিণী মা (অর্থাৎ গদ্য ভাষার পরিধির মধ্যেই যার মনন ও বেদন সীমাবদ্ধ) কেমন ক'রে বুঝবে তার কন্যাকে ; সে যে কবিতার ভাষায় কথা কইছে।

রবীন্দ্রনাথকে অনেকে জানেন ভক্ত কবি ব'লে, কেউ-কেউ বলেছেন প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ; কেউ-বা বলেছেন তিনি প্রধানত মানবিকতার কবি। আমি সাহস ক'রে বলতে চাই—মূলত ও সর্বোপরি প্রেমেরই কবি রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ঈশ্বরপ্রেমের পরতে-পরতে নারীপ্রেম রবীন্দ্র-কাব্যভাষার ক্রোশে দিয়ে বোনা। শতসহস্র উদাহরণের মধ্যে এখনই আমার মনে জাগছে :

মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন-পরে
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো।

তাঁর সেইসব প্রকৃতিপ্রেমের কবিতা ও গানই আমাদের স্মৃতিপটে অপরিমোচনীয় হ'য়ে থাকে যাতে প্রকৃতির ছবির রেখায় রঙে আর একটি অস্ফুট ছবি ফুটে উঠতে চায় কিন্তু ওঠে না—সে-ছবি প্রিয়ার কি ঈশ্বরের তা-ও আমরা বুঝতে পারি না অনেক সময়ে :

সজল হাওয়ায় বারে বারে
সারা আকাশ ডাকে তারে।

বাদল দিনের দীর্ঘশ্বাসে জানায় আমায় ফিরবে না সে,
বুক ভরে সে নিয়ে গেল বিফল অভিসার।

প্রেমের অভূতপূর্ব ঐশ্বর্যমণ্ডিত ভাষা তৈরী করেছেন রবীন্দ্রনাথ, এবং সে-ভাষা আমাদের হৃদয়পটে মুদ্রিত ক'রে গেছেন তাঁর ষাট বছরের বহু সাধনায় বহু বেদনায় রচিত কাব্য ও গানের নানা বর্ণের কালি দিয়ে। রবীন্দ্রনাথেরই কবিতাতে গানে নাট্যকাব্যে আমাদের প্রেমীসত্তা জন্মলাভ করেছে, যৌবনে পৌঁছেছে।

তবে কি রবীন্দ্র-পূর্ব যুগে কোনো বাঙালী প্রেমে পড়তো না? পড়তো, কিন্তু পড়তোই। প্রেম যে আমাদের জীবনকে কত উপরে তুলতে পারে অর্থ ও কামের ক্লান্তিকর একঘেয়ে গ্লানিমা থেকে, বর্তমান যুগের (অর্থাৎ রেনেসাঁস-পরবর্তী যুগের) আবিষ্কৃত ও পরিশীলিত এই পরমাশ্চর্য অনুভূতিতে যে কত বর্ণ কত গন্ধ, কত দেহলী কত অন্তঃপুর, কত রবিকরোজ্জ্বল সোনালী রূপালী শিখর কত অন্ধকার ভূগর্ভস্থ গোপন কক্ষ, কত সমুদ্র কত আকাশ লুকানো রয়েছে তা কি আমরা আগে জানতাম? মহাজন-পদাবলীতে তার পূর্বাভাস পেয়েছিলাম, পূর্ণ স্বাদ পাইনি। শৃঙ্গার এবং ভক্তি দুটো রসই বড়ো সুন্দরভাবে ফুটিয়েছেন বৈষ্ণব কবিরা; কিন্তু দুটোর যোগফল নয় প্রেম। শরীরকে বাদ দিলে প্রেম স্বধর্মচ্যুত হবে; এই রক্তমাংসের পাত্রকে অনন্ত রহস্যে ভরপুর ক'রে তোলাই প্রেমের ধর্ম। সে-রহস্য তো শুধু পার্থিব নয়, এক অপার্থিব ইঙ্গিতও থাকে তাতে। সেই প্রেমের কবি রবীন্দ্রনাথ। জানি না অন্য কোনো ভাষায় প্রেমের এমন সূক্ষ্ম গভীর দিগন্তবিস্তৃত বিকাশ ঘটেছে কিনা; জানি না আর কোন্ দেশের মাটিতে প্রেম এসেছে এমন "মহা সমারোহে"।

সেই প্রেমের সিংহদ্বারে পৌঁছলো চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি ধাপে-ধাপে কয়েকটি অনতিভিন্ন অনুভূতির সোপান বেয়ে। মায়ের বুঝতে দেরী হচ্ছে, দ্বিধা হচ্ছে দেখে এই কালো মেয়ে (নিশ্চয়ই তার "কালো

হরিণচোখ"ও বাঙ্ময় হ'য়ে উঠেছিলো) অলজ্জ অবিজড়িত অনাবিল কণ্ঠে জানিয়ে দিলো :

আমি চাই তাঁরে
আমারে দিলেন যিনি সেবিকার সম্মান,
ঝরে-পড়া ধুৎরো ফুল
ধুলো হতে তুলে নিলেন যিনি দক্ষিণ করে।
ওগো প্রভু, ওগো প্রভু,
সেই ফুলে মালা গাঁথো,
পরো পরো আপন গলায়,
ব্যর্থ হতে তারে দিয়ো না, দিয়ো না॥

নাট্যকার রূপকের ভাষায় আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে প্রকৃতি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে জানতে পেরেছিলো (যেমন সব মেয়েই জানতে পারে) তার বাঞ্ছিত প্রথম দর্শনেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন—"কোনো কথা না বলে তবু কথা দিয়ে গিয়েছিলেন"। প্রকৃতির কাছে এ-ও অস্পষ্ট রইলো না যে এ-আকর্ষণ তার অনিন্দ্যসুন্দর শ্যামকান্তি দেহের ভাস্কর্যের প্রতি যতটা, তার সিকি ভাগও নয় তার অনন্যসাধারণ মনের তেজস্বিতা ও মাধুর্যের প্রতি। তবে তা-ই হোক্, আমার রূপের টানেই তিনি আসুন, না-এলে আমার নতুন জন্ম যে একেবারে ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। মাকে বললো : "তাই তো ডাকছি দিনরাত, শুনতে যদি না পান, ভয় নেই, দে তোর মন্তর প'ড়ে। সবই তাঁর সইবে।" এ-মন্ত্র "দেহের আকর্ষণী মন্ত্র", মনুষ্যজাতির আদিমতম মন্ত্র।

প্রকৃতি প্রাণপণে চাইতে লাগলো তার রূপের টান আরো মজবুৎ হোক্, কিছুতেই আনন্দ যেন এই মোহিনী মায়া কাটাতে না-পারেন। সে মনে-মনে জানে শুধু একবার ভিক্ষু যদি সন্ন্যাসব্রত ভঙ্গ ক'রে তার কাছে এসে বসেন তার আধো-আঁচলে তাহ'লে দেওয়া-নেওয়ার বিষমতা যাবে ঘুচে। মায়াবিনী তো শুধু মায়ার ফাঁদ পেতে রাখেনি, ফাঁদের

তলায় ঢাকা আছে তার সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে-দেওয়া প্রেমের সাধনা, বেদনা ও ব্যাকুলতা।

আজ জেনেছি আমি নই-যে অভাগিনী।
দেবই আমি, দেবই আমি, দেবই
উজাড় করে দেব আমারে।

প্রকৃতি যখন তার দেহের সঙ্গে তার কানায়-কানায় ভরা প্রেমিক-হৃদয় তুলে ধরবে আনন্দের ওষ্ঠাধরে, তখন কি আনন্দের পক্ষে শুধু দেহ গ্রহণ ক'রেই ক্ষান্ত থাকা সম্ভব হবে? সব নেবেন তিনি, এবং সব না-দিয়ে পারবেন না। "আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসায় ভোলাব" গানটি 'চণ্ডালিকা'য় নেই, কিন্তু প্রকৃতির মুখে মানাতো ভালো। রূপের টানে একবার শুধু আসুন তিনি, তারপরে বাঁধবো তাঁকে ভালোবাসার বন্ধনেই; সে-বন্ধনে তাঁরও মুক্তি, আমারও।

'চণ্ডালিকা' নাটকে চণ্ডালকন্যার প্রেমের ক্রমবিকাশ ও স্তরে-স্তরে আরোহণ দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। নাটকের শেষে প্রকৃতির প্রেমে মাটির গন্ধ যতটা পাওয়া যায় তার চেয়ে আকাশের নীলিমা দেখা যায় বেশি। যত্রতত্র ব্যবহারের ফলে 'আধ্যাত্মিকতা' শব্দটার অর্থ এত তরল হ'য়ে গেছে যে আমার বলতে সংকোচ হচ্ছে প্রকৃতির প্রেম প্রাণিকতা থেকে অবশেষে উঠে গেলো আধ্যাত্মিকতার স্তরে। তুলনায় রাজেন্দ্রনন্দিনী চিত্রাঙ্গদার প্রেম প্রথম থেকে শেষ অবধি পার্থিব, প্রাণধর্মী। নাটকে আমরা দেখি সে-প্রেমের ক্রমবিবর্তন নয়, ক্রমউদ্ঘাটন। প্রারম্ভেই যে-প্রেম চিত্রাঙ্গদার মনের মধ্যে একপ্রকার পূর্ণতায় পৌঁছেছিলো তা-ই নাটকের শেষে অর্জুনকে পতিরূপে লাভ ক'রে সার্থকতার তীর্থে পৌঁছলো। কেমন ক'রে, কী আশ্চর্য কৌশলে—তা নিয়েই নাটক। চিত্রাঙ্গদার চরিত্রমর্যাদা প্রকৃতির অপেক্ষা অনুজ্জ্বল নয় কোনোমতেই, তবু ভিন্ন উপকরণে গড়া সে-মর্যাদা। এই দুই অখ্যাত অনার্য নারীর বহুস্তর-বিন্যস্ত ব্যক্তিস্বরূপের পাশে তাদের খ্যাতিমান আর্যবল্লভদ্বয়ের

সরল, সাদামাঠা, অপেক্ষাকৃত অপরিণত চরিত্রের জ্যোতি নিষ্প্রভ হ'য়ে যাবারই কথা। নাটকদ্বয়ের সাফল্য এই যে এ লক্ষণীয় পরিণামটি আমাদের চোখের সামনে ঘটে অথচ আমরা লক্ষ করি না; ভাবি (প্রায় ভেবে ফেলি) বৌদ্ধ ভিক্ষু আনন্দই উদ্ধার করেছেন কামার্ত চণ্ডালকন্যাকে, গাণ্ডীবধন্বা অর্জুনই বুঝি ধন্য করেছেন মণিপুরের রাজকন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ ক'রে।

দুই

রূপে নয়, গুণে এবং অবশ্য ভালোবাসায় ভোলাতে চেয়েছিলো চিত্রাঙ্গদাও তার মনোবাঞ্ছিত বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে—"এই পার্থ, আজন্মের বিস্ময় আমার!" তরুণ বয়সে মণিপুর রাজ্যের নৃপতিকন্যার মনে একটি "বাল্য দুরাশা" জাগরূক ছিলো—"পার্থ-কীর্তি করিব নিষ্প্রভ আমি নিজ বাহুবলে।" কিন্তু মৃগয়ায় বেরিয়ে একদিন অকস্মাৎ ঐ শ্রুতকীর্তি বরেণ্য পুরুষের "সরল সুদীর্ঘ দেহ" এবং "আপনাতে আপনি অটল মূর্তি" দেখে এতদিনকার তারুণিক স্পর্ধা এক মুহূর্তে সম্পূর্ণ মুছে গেলো তার মন থেকে, জেগে উঠলো দুর্বার উদ্বেল প্রেম—"যে ভূমিতে আছেন দাঁড়ায়ে/সে ভূমির তৃণদল হইতাম যদি।" ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো সে অর্জুনকে পাওয়ার জন্য, রণক্ষেত্রে নয়, হৃদয়ক্ষেত্রে তাঁকে জয় করবার জন্য। অর্জুন কিন্তু অবজ্ঞাসূচক স্মিতহাস্য ক'রে অন্যদিকে চ'লে গেলেন "বুঝি সে বালক মূর্তি হেরিয়া আমার।"

নিজের চারিত্র্যশক্তি, ধীশক্তি এবং অন্যান্য উচ্চপর্যায়ের গুণাবলির প্রতি চিত্রাঙ্গদার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিলো, আস্থা ছিলো, কিঞ্চিৎ গর্বও ছিলো:

সঙ্গীরূপে থাকিতাম সাথে,
রণক্ষেত্রে হতেম সারথি, মৃগয়াতে

রহিতাম অনুচর, শিবিরের দ্বারে
জাগিতাম রাত্রির প্রহরী, ভক্তরূপে
পূজিতাম, ভৃত্যরূপে করিতাম সেবা,
ক্ষত্রিয়ের মহাব্রত আর্ত-পরিত্রাণে
সখারূপে হইতাম সহায় তাঁহার।
একদিন কৌতূহলে দেখিতেন চাহি,
ভাবিতেন মনে মনে, "এ কোন্ বালক,
পূর্বজন্মের চিরদাস, এ জনমে
সঙ্গ লইয়াছে মোর সুকৃতির মতো।"
ক্রমে খুলিতাম তাঁর হৃদয়ের দ্বার,
চিরস্থান লভিতাম সেথা।

কিন্তু হায়, গুণের দ্বারা কারো হৃদয় জয় করতে বড়ো বেশি সময় লাগে, আর বনে-বনে ভ্রাম্যমাণ অর্জুন তো কয়দিন পরেই মণিপুর রাজ্য ছেড়ে চ'লে যাবেন অন্যত্র। এরই মধ্যে জয়-পরাজয়ের পালাটা শেষ করতে হবে তাকে। অতএব অগত্যা সে তার অপরূপ দৈহিক সৌন্দর্য ও মাধুর্যের মায়াবন্ধনে অর্জুনকে বাঁধতে উদ্যত হ'লো। এ-কাজটা দ্রুত-সাধ্য। কুরূপা মধ্যযৌবনা চিত্রাঙ্গদাকে সুরূপা সদ্যোদ্ভিন্নযৌবনা চিত্রাঙ্গদায় রূপান্তরিত করার ব্যাপারে মদন ও মদনসখা বসন্তের ভূমিকা প্রতীকী। এই অলৌকিক কাণ্ডের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ শুধু এটুকুই বোঝাতে চেয়েছেন যে নারীর দেহলাবণ্য অত্যন্ত স্বল্পকালীন এবং বাহ্যিক ব্যাপার। ("এ যে তার বাইরের জিনিষ, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহবিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে";) চারিত্র্যশক্তিতেই নারীর আসল রূপ ফোটে, তা-ই তার "স্থায়ী পরিচয়", "জীবনের ধ্রুব সম্বল"।

সুতরাং চিত্রাঙ্গদা পুরুষালী মৃগয়া-সমুচিত কেজো কিন্তু শ্রীহীন বেশ ফেলে দিয়ে ধারণ করলো এমন মেয়েলী সুপরিমিত আবরণ ও আভরণ যাতে তার নারীদেহের পূর্ণ যৌবনের সমূহ মোহিনী মায়া অর্জুনের "অটল মূর্তিতে" ফাটল ধরিয়ে দিতে পারে; উপরন্তু পুষ্করিণীর জলবিম্বে

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজের রূপ দেখার ছল ক'রে অদূরে দণ্ডায়মান অর্জুনকে দেখার সুযোগ দিলো তার দেহের "মর্ত্যে অতুল্য" ঐশ্বর্য। যাকে পুরুষ-বেশে দেখে অর্জুন তাচ্ছিল্য ক'রে অন্যদিকে চ'লে গিয়েছিলেন তারই অপরূপ দেহলাবণ্যের মায়াজালে ধরা দিলেন এবার। চিত্রাঙ্গদার মর্ম-বেদনা এই যে অর্জুন বড়ো সহজেই ধরা দিলেন, "লহ মোর খ্যাতি, লহ মোর কীর্তি, লহ মোর পৌরুষগর্ব" বলতে-বলতে যেন ছুটে এসে লুটিয়ে পড়লেন তার পায়ের কাছে।

রূপের মদিরা পান ক'রে মাতাল অর্জুন দুই ব্যগ্র বাহু সম্প্রসারিত ক'রে ডেকে উঠলেন: "এসো এসো, যে হও সে হও।" তার সোজা-সুজি অর্থ কি প্রায় এইরকম দাঁড়ায় না—তুমি রূপজীবিনী হও, জন্মহাবা হও কিম্বা শত্রুপক্ষের ক্রূরবুদ্ধি গুপ্তচর—তাতে কিছু এসে যায় না, এই অপরূপ দেহ যার তাকেই আমার চাই। এর পরে

শুধু একা পূর্ণ তুমি
সর্ব তুমি
বিশ্ববিধাতার গর্ব তুমি
অক্ষয় ঐশ্বর্য তুমি
এক নারী সকল দৈন্যের তুমি মহা অবসান
সব সাধনার তুমি শেষ পরিণাম,

ইত্যাদি পংক্তিগুলি একটু ফাঁকা শোনায় বৈ-কি। নারীর মধ্যে তার বহিরঙ্গের রূপচ্ছটা ছাড়া আর-কিছুই কি তখনো দেখতে শেখেননি অর্জুন? দৃষ্টিশক্তি যাঁর এতখানি শরীরান্ত তিনি তো অর্জুন নামের, পুরুষোত্তম উপাধির, যোগ্য নন। স্বভাবতই চিত্রাঙ্গদার মনে ধিক্কার জন্মালো: দ্বিবিধ ধিক্কার—বিশ্বজয়ী অর্জুনের প্রতি, এবং অর্জুনবিজয়ী নিজের মায়াবী দেহের প্রতি।

যে-অর্জুন তার আবাল্য ভাবজগতের হিরো, সেই অর্জুনকে জয়

করার আনন্দ মলিন হ'য়ে গেলো প্রথম মুহূর্তেই।' অর্জুনকে সে চেয়েছিলো প্রেমিকরূপে, পেলো কামার্তরূপে।

> কে আমি, কী আছে মোর, কী দেখেছ তুমি,
> কী জান আমারে ?

আমার দেহই কি আমার সব, সর্বোত্তম সত্তা, সব গুণের সেরা গুণ? আমার মধ্যে আর-কিছু তুমি দেখতে পাওনি সে-দুঃখ বড়ো কম নয়; তার চেয়েও তীব্র জ্বালাময় আমার ব্যর্থতা এই যে আর-কিছু তুমি দেখতে চাওনি। "কোথায় গেলো প্রেমের মর্যাদা, কোথায় রইলো প'ড়ে নারীর সম্মান?" সব নারী এতে অসম্মানিত ও ক্ষুব্ধ বোধ করতো না, কিন্তু চিত্রাঙ্গদা করলো—নৃপতিকন্যা ব'লে নয়, স্বভাব-প্রেমিকা ব'লে। সে-স্বভাব এতদিন চাপা পড়েছিলো তার স্থূল পুরুষ-বেশে, পৌরুষের কঠিন সাধনায়, রাজকুমারোচিত কর্মভারে। আজ যথাযোগ্য উদ্দীপকের আঘাতমাত্রে সে প্রেমীসত্তা উদ্দাম হ'য়ে উঠলো তার নারী-বক্ষে। রাজকার্যে, মৃগয়ায় ও অন্যান্য পুরুষোচিত দুরূহ বিদ্যায় বিদূষী চিত্রাঙ্গদা অনঙ্গদেবের কাছে আক্ষেপ ক'রে বলেছিলো যে সে মনোহরণের বিদ্যা শেখেনি, তাই তার বাঞ্ছিত-সম্মিলন ব্যর্থ হ'লো। কামদেব ঠিকই উত্তর দিয়েছিলেন—এ-বিদ্যা কোনো নারীকে শিখতে হয় না, যৌবনই শিখিয়ে দেয় পূর্ণমাত্রায়। কিন্তু অন্য অর্দ্ধোচ্চারিত আক্ষেপটি সত্য—অর্জুন প্রেমের পাঠে নিরক্ষর। বর্ণপরিচয় থেকে আরম্ভ ক'রে তাঁকে প্রেমের বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষিত ক'রে তোলার দায়িত্ব নিলো এই স্বভাবে ও সাধনায় অসাধারণ গুণান্বিতা রাজকুমারী—সম্পূর্ণ সজ্ঞানে না-হ'লেও একেবারে অজ্ঞাতসারেও নয়।

কামের উদ্দীপনায় আত্মহারা অর্জুনকে অনর্জুন ব'লে ধিক্কার দিয়ে ফিরিয়ে তো দিলো চিত্রাঙ্গদা, কিন্তু সত্যিই কি তাঁকে ও-রকম ক'রে ফেরানো যায়? হোক্ কাম, কিন্তু তা যে অর্জুনের কাম, কোনো সামান্য লোকের কাম নয়। আর যতই অসামান্য হোক্ চিত্রাঙ্গদা তার

বহুবিধ চিৎপ্রকর্ষে, তবু তো সে নারী, রক্তমাংসে গড়া তার দেহ, কামনায়-তৃষ্ণায় ভরা তার হৃদয়, তার প্রতি অঙ্গ।

হায়, হায় সে কি ফিরাইতে পারি! সেই
থরথর ব্যাকুলতা বীরহৃদয়ের,
তৃষ্ণার্ত কম্পিত এক স্ফুলিঙ্গনিশ্বাসী
হোমাগ্নিশিখার মতো, সেই, নয়নের
দৃষ্টি যেন অন্তরের বাহু হয়ে কেড়ে
নিতে আসিছে আমায়; উত্তপ্ত হৃদয়
ছুটিয়া আসিতে চাহে সর্বাঙ্গ টুটিয়া,
তাহার ক্রন্দনধ্বনি প্রতি অঙ্গে যেন
যায় শুনা। এ তৃষ্ণা কি ফিরাইতে পারি?

শত তিরস্কার শুনেও অর্জুনের পক্ষেই কি ফিরে না-আসা সম্ভব? রূপ-হুতাশনে যে দু-জনেই দগ্ধ হচ্ছে, দগ্ধ ক'রে মারছে পরস্পরকে। অর্জুন আবার ফিরে এলেন—লজ্জিত হ'য়ে নয়, নতমস্তকে নয়, আগুনের লেলিহান অভ্রভেদী শিখা হ'য়ে। আর চিত্রাঙ্গদা?

দাঁড়ানু উঠিয়া। মিথ্যা শরম সংকোচ
খসিয়া পড়িল শ্লথ বসনের মতো
পদতলে। শুনিলাম, "প্রিয়ে, প্রিয়তমে!"
গম্ভীর আহ্বানে, মোর এক দেহমাঝে
জন্ম জন্ম শতজন্ম উঠিল জাগিয়া।
কহিলাম, "লহ, লহ, যাহা কিছু আছে
সব লহ জীবনবল্লভ!" দুই বাহু
দিলাম বাড়ায়ে।—চন্দ্র অস্ত গেল বনে,
অন্ধকারে কাঁপিল মেদিনী। স্বর্গমর্ত্য
দেশকাল দুঃখসুখ জীবনমরণ
অচেতন হয়ে গেল অসহ্য পুলকে।

এই অসহ্য পুলকের পর ভোরের প্রথম আলোয় দেখা গেলো শ্রান্ত কিন্তু সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত অর্জুন ঘুমিয়ে আছেন পুষ্পশয্যায়, "শ্রান্ত হাস্য লেগে আছে ওষ্ঠপ্রান্তে তাঁর ··রজনীর আনন্দের শীর্ণ অবশেষ।"

চিত্রাঙ্গদার মনে কিন্তু স্বর্গমর্ত্য কাঁপিয়ে-তোলা এই প্রচণ্ড অভিজ্ঞতার অবশেষ কোনো প্রশান্ত প্রসন্ন অনুভূতি নয়, বেদনা ও গ্লানিই। কেন এই অপ্রত্যাশিত দেশকালপাত্র-অসমুচিত তিক্ততার স্বাদ? অদ্ভুত কথা বলছে চিত্রাঙ্গদা :

বহুকাল সাধনায় এক দণ্ড শুধু
পাওয়া যায় প্রথম মিলন, সে-মিলন
কে লইল লুটি আমারে বঞ্চিত করি।
... ...
আজ প্রাতে উঠে, নৈরাশ্যধিক্কারবেগে
অন্তরে অন্তরে টুটিছে হৃদয়। মনে
পড়িতেছে একে একে রজনীর কথা।
বিদ্যুৎবেদনাসহ হতেছে চেতনা
অন্তরে বাহিরে মোর হয়েছে সতিন।

দেহ আর মনকে কি এতই বিচ্ছিন্ন করা যায় যে পরস্পর-সম্পর্ক হ'য়ে দাঁড়ায় দুই সতিনের সম্পর্কের মতো তিক্ত ও ঈর্ষা-পীড়িত? এই অসম্ভব উপমা শুধু চিত্রাঙ্গদার মুখে নয়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মুখেও শুনে আমি বিস্ময় বোধ করি : "সেই সঙ্গে কেন জানি হঠাৎ আমার মনে হল সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তা হলে সে তার সুরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিষ, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহবিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে।"

দেহকে এতখানি বাইরের জিনিষ, ধার-করা জিনিষ, ব্যক্তিসত্তায় তার অবদানকে—বিশেষত প্রেমের মতো অমূল্য অভিজ্ঞতায় তার অবদানকে—এত নগণ্য ও পরিহার্য রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই ভাবেননি। তাই চিত্রাঙ্গদা পড়তে-পড়তে (বা শুনতে-শুনতে) আমার মনে এই

প্রসঙ্গে যে মৃদু অতৃপ্তি ও অস্বস্তি রেখায়িত হ'য়ে ওঠে তা তাঁর অন্য একাধিক শ্রেষ্ঠ কাব্যপাঠে সহজেই মুছে যায়। শ্যামার কাছে তার দেবকান্তি প্রেমাস্পদ দেহে আর মনে একাকার হ'য়ে গিয়েছিলো, যেমন হয়েছিলো চণ্ডালিকার কাছেও প্রেমের প্রথম পর্বে। কামনার সঙ্গে শ্রদ্ধা, রূপমুগ্ধতার সঙ্গে গুণমুগ্ধতা, শরীরের মূল্যবোধের সঙ্গে ব্যক্তিস্বরূপের মূল্যবোধ অবিশ্লেষ্য সাযুজ্য লাভ ক'রে যে অমূল্য রসানুভূতি দানা বাঁধে তা-ই প্রকৃত প্রেম, পরিপূর্ণ প্রেম। 'সানাই'-এর "পূর্ণ হয়েছে বিচ্ছেদ যবে" কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবক একবার পড়লে কেউ কখনো ভুলতে পারে না :

এমনি রাত্রে কতবার, মোর বাহুতে মাথা,
শুনেছিল সে-যে কবির ছন্দে কাজরি-গাথা,
রিমি ঝিমি ঘন বর্ষণে বন রোমাঞ্চিত,
দেহে আর মনে এক হয়ে গেছে যে-বাঞ্ছিত।
এল সেই রাতি বহি শ্রাবণের সে-বৈভব—
মন শুধু বলে, অসম্ভব এ অসম্ভব।

'চিত্রাঙ্গদা' নাটকে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন কথা বলতে চেয়েছেন ; বলতে চেয়েছেন—অন্তরের রূপই সত্য, মানুষের সত্য পরিচয় তাতেই ; বাহিরের রূপ মিথ্যা, কোনো-এক দেবতার ছলনা, বা প্রকৃতির জৈব উদ্দেশ্য সাধন করবার ছল। চিত্রাঙ্গদা তার দেবানুগ্রহে প্রাপ্ত রূপকে ব্যবহার করেছে অর্জুনকে দেহের দেহলি পার ক'রে অন্দরমহলের উপরতলায় পৌঁছিয়ে দেবার সোপান-রূপে। একবার পৌঁছতে পারলেই হ'লো, তারপরে সোপানটির আর কোনো প্রয়োজন থাকে না। মনে হয় রাষ্ট্রনীতিতে বিদগ্ধ এই রাজকুমারী বহু যত্নে রচিত একটি এক-সালা পরিকল্পনার খসড়া চোখের সামনে রেখে অর্জুনের সঙ্গে প্রেম-লীলা শুরু করেছিলো ঐ বীরশ্রেষ্ঠের হাত ধ'রে তাকে আত্মহারা কাম থেকে আত্মপ্রতিষ্ঠ শুভ্র সুন্দর প্রেমে ধীর পদক্ষেপে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সে-প্রেমের ফল হবে আদর্শ দাম্পত্য জীবন ; তারা

পরস্পরকে নিয়ে আর ব্যাপৃত থাকবে না; সকল শুভকর্মে এমন-কি "দুরূহ চিন্তাতে"ও হবে একান্ত সহধর্মী ও সহকর্মী।

প্ল্যানটা খুব জটিল বা সূক্ষ্ম নয়, তবে অর্জুনের পক্ষে তা-ই যথেষ্ট। তাঁর দেহ যেমন ঋজু, মনও তেমনি সরল। চিত্রাঙ্গদা মনস্থির করলো তার দেহলাবণ্যে অভিভূত অর্জুনকে সেই লাবণ্যসুধা এমন আকণ্ঠ পান করাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস যে বছর না-যেতেই ঐ কামমত্ত বীরপুরুষ হাঁফিয়ে উঠবেন, বলতে বাধ্য হবেন, আর না, ঢের হয়েছে, এবার অন্য-কিছু চাই, অন্য কোনোখানে যেতে চাই। "কেন রে ক্লান্তি আসে আবেশভার বহিয়া"—নির্বোধ, বুঝতে পারছো না ক্লান্তি আনাটাই বুদ্ধিমতীর অভিপ্রেত ছিলো? "নারীর ললিত লোভন লীলায়" ক্লান্ত হবার আগেই অর্জুন ইচ্ছা প্রকাশ করলেন লোকালয়ে গিয়ে ঘর বাঁধবার; সামাজিক কাজকর্ম লোকহিত পূজাপার্বণ নিয়ে দিন কাটাবার কথা বললেন; রাত্রি থাক্‌ প্রেমের জন্য, কামের জন্য। চিত্রাঙ্গদা রাজী নয়। অর্জুন চাইলেন মৃগয়ায় গিয়ে তাঁর অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিতে। চিত্রাঙ্গদা রাজী নয়। একদল গ্রামবাসী পাশ দিয়ে ছুটে পালাচ্ছিলো দস্যুভয়ে। অর্জুনের ক্ষাত্রশক্তি তখনই উদ্যত হ'লো শত্রুনাশ ক'রে আর্তের পরিত্রাণের জন্য এগিয়ে যেতে। চিত্রাঙ্গদা রাজী নয়। তার একই ওজর: আমার বাহুপাশ থেকে যদি স্বল্পকালের জন্যও মুক্ত হ'য়ে অন্যত্র যেতে চাও, তবে আর ফিরে পাবে না আমাকে, আমার রূপযৌবন কারো জন্যে অপেক্ষা করতে পারে না—"এ বন্য হরিণী···চকিতে ছুটিয়া যায় কে জানে কখন স্বপনের মতো।" স্বভাবতই অর্জুনের বোধ হ'লো এবং ব্যথা হ'লো বোধ ক'রে যে "বহুদিন রয়েছে অলস হয়ে ক্ষত্রিয়ের বাহু।"

ক্লান্তি ও অস্থিরতা যখন চূড়ান্তে পৌঁছেছে তখন অর্জুন ব'সে-ব'সে ভাবতে লাগলেন—চিত্রাঙ্গদার কতপ্রকার গুণের কতরকমের প্রশস্তি তিনি পথিক বা পলাতকজনের কাছ থেকে শুনেছিলেন

উদ্‌যাপিত বছরের কত দিন। কামচর্চায় বিভোর অর্জুন তখন সে-সব কথা কানে শুনলেও মন দিয়ে শোনেননি। এখন বছর শেষে সেইসব কথা ভাবতে-ভাবতে অর্জুন যেন আর-এক চিত্রাঙ্গদার সন্ধান পেলেন। এতদিনে সর্বপ্রথম তাঁর মনে হ'লো যে-চিত্রাঙ্গদাকে শুধু চোখে দেখে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে তিনি ব'লে উঠেছিলেন "এক নারী সকল দৈন্যের তুমি মহা অবসান", সে-নারীর মন-মাতানো দেহের আড়ালে যে-মন লুকানো রয়েছে তার পরিচয় তো এখনো বলতে গেলে তিনি পানইনি ; সেই অন্তঃপুরবাসিনী চিত্রাঙ্গদার হৃদয়মনের ভাবনা-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, এষণা-উদ্দীপনা নিয়ে যে-ব্যক্তিসত্তা রচিত তার রূপ-রেখা এখনো অতিশয় ঝাপসা রয়েছে তাঁর মনশ্চক্ষে। একটি অপূর্ব উপমা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ অর্জুনের এই সময়কার ভাবনা প্রকাশ করেছেন :

যেন পান্থ আমি প্রবেশ করেছি গিয়া
কোন্ অপরূপ দেশে অর্দ্ধরজনীতে।
নদীগিরিবনভূমি সুপ্তিনিমগন,
শুভ্রসৌধকিরীটিনী উদার নগরী
ছায়াসম অর্ধস্ফুট দেখা যায়, শুনা
যায় সাগরগর্জন ; প্রভাত প্রকাশে
বিচিত্র বিস্ময়ে যেন ফুটিবে চৌদিক ;
প্রতীক্ষা করিয়া আছি উৎসুক হৃদয়ে
তারি তরে।

এরপর নাটক দ্রুতগতিতে এগোয় সুখময় সমাপ্তির অভিমুখে। এতদিন যাকে শুধু চোখেই দেখেছিলেন অর্জুন, শুধু পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়েই যার সান্নিধ্য সম্ভোগ করেছিলেন, আজ সমূহ হৃদয়মন দিয়ে উপলব্ধি করলেন যে সেই বরাঙ্গনার দেহই শুধু মর্ত্যে অতুল্য নয়, তার মন এবং চরিত্রও তেমনি বা ততোধিক সুন্দর। উপলব্ধির ফলে তাঁর হৃদয়ানুরাগ আরো গাঢ় হ'লো কিন্তু রঙ তার গেলো পাল্‌টে, কামের রক্তিম পটে

ধীরে-ধীরে ফুটলো প্রেমের শ্বেতপদ্ম। অর্জুনের প্রেমিক দৃষ্টিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো চিত্রাঙ্গদার সমগ্র সত্তার রূপ। আগেই বলেছি চিত্রাঙ্গদার বহিঃরূপকে মিথ্যা এবং অন্তঃস্বরূপকে সত্য ব'লে রবীন্দ্রনাথ আমাকে ধাঁধায় ফেলেছেন। বলা বাহুল্য, 'সত্যমিথ্যা' শব্দগুলি এখানে বৈজ্ঞানিক অর্থে প্রয়োগ করা হয়নি, প্রয়োগ করা হয়েছে মূল্যদ্বয়ের দুস্তর তারতম্য বোঝাবার জন্য। কিন্তু যা ক্ষণিক বা স্বল্পকালীন তার মূল্য নগণ্য—এ-কথা মানতে আমার মন সরে না। রবীন্দ্রনাথও অনেক সময়ে মানেননি। বিশেষত শেষ পর্বে তিনি বার-বার এমন অমৃতভরা মুহূর্তের কথা বলেছেন যা আমাদের শুষ্ক শূন্য জীবনে পারিজাতগন্ধ বহন ক'রে নিয়ে আসে, দিনানুদৈনিক, বৎসরানুবাৎসরিক নিরর্থকতাকে অর্থবান ক'রে তোলে। তাছাড়া, মননশক্তি ও চরিত্রশক্তি দিয়ে গড়া অন্তরের রূপও তো চিরস্থায়ী নয়। প্রৌঢ়ত্বের স্পর্শে যদি দেহের সৌন্দর্যে ক্ষয় ধরে, বার্ধক্যের স্পর্শে তেমনি মনের বা আত্মার সৌন্দর্যেও বিকারের চিহ্ন স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। মরবার অনেক আগেই আমাদের দেহে এবং মনে মৃত্যুর কালিমা দিনে-দিনে প্রকট হ'তে থাকে। মৃত্যু নয়, জরা—দেহের এবং ফলত, অনিবার্যত, মনের জরা—মানবজীবনের সবচেয়ে দুঃসহ অভিশাপ।

সে যা-ই হোক্, অর্জুন চিত্রাঙ্গদার সম্পূর্ণ রূপ দেখে আবার নতুন ক'রে প্রেমে পড়লেন ; তাঁর দেহমনের অবসাদ, বিষাদ গ্লানি সম্পূর্ণ ঘুচে গেলো। এই পুনরুজ্জীবিত ও পূর্ণতর প্রেমে দেহের অনুপাত কতখানি এবং মনের কতখানি সে-বিচারে কাজ নেই। যবনিকাপাতের অব্যবহিত পূর্বে চিত্রাঙ্গদার সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত বাক্যচ্ছটা শুনে অর্জুন অভিভূত হয়েছিলেন কিন্তু ঠিক বুঝতে পারেননি তার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা। পাঠকসমাজেও এটি স্ত্রী-স্বাধীনতার অদ্ব্যর্থ প্রকাশ ব'লে গৃহীত হয়েছে, অথচ দ্ব্যর্থতা ছিলো তাতে। সমগ্র নাটকটাই যে নারী-শ্রেষ্ঠতার মৃদুকণ্ঠ কিন্তু অব্যর্থ ঘোষণা।

হায় পার্থ, হায়, তুমি কি বুঝতে পারলে কার পাণিগ্রহণ ক'রে তুমি ধন্য হয়েছ ? সে যে পূর্ণমানব (রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে যতখানি পূর্ণ হওয়া সম্ভব), একাধারে পুরুষ এবং নারীর সমূহ শ্রেষ্ঠ গুণে বিভু— "স্নেহবলে তিনি মাতা, বাহুবলে তিনি রাজা" ; শুধু বাহুবলে নয়, যাবতীয় রাজকার্যসংক্রান্ত বিদ্যাবলেও। অর্জুনের সঙ্গে বৎসরকাল-ব্যাপী কাম ও প্রেমচর্চায় নিমগ্ন হবার পূর্বে :

স্থাপন করিয়া গেছে সতর্ক প্রহরী
দিকে দিকে, বিপদের যত পথ ছিল
বন্ধ করে দিয়ে গেছে বহু তর্ক করি।

তুমি তো কেবলই পুরুষোত্তম, অর্থাৎ পূর্ণমানবের আধখানা, তোমার মধ্যে নারীর শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর তো কিছুই নেই। যতদিন তুমি মণিপুর-রাজ্যে বাস করবে ততদিন চিত্রাঙ্গদার পাশে তুমি নিষ্প্রভ হ'য়ে থাকবে না কি — পূর্ণচন্দ্রের পাশে অর্দ্ধচন্দ্র ? এমন অত্যন্ত শোভন মধুর কৌশলে এই মানবোত্তমা তোমার চরণে নিজেকে নিবেদন করলো যে তুমি টের পাওনি কে গ্রহীতা এবং কে গৃহীত, টের পাওনি যে তোমার চরিত্র-শক্তিকে বেশ খানিকটা সম্প্রসারিত ও সমুন্নত ক'রে, তোমার প্রখ্যাত বীর্যশৌর্যের মাটিতে এতাবৎকাল অনুদ্গত অধ্যাত্মবোধ (প্রেমবোধ) বহু যত্নে অঙ্কুরিত এবং বেশ খানিকটা পরিস্ফুট ক'রে তবে তোমাকে পতিরূপে গ্রহণ করলো চিত্রাঙ্গদা। শুধু তার চারুশীলিত হৃদয় নয়, তার অতি সূক্ষ্ম বহুদর্শী বুদ্ধি, তার মসৃণ কোমল কর্মকুশলতা কোথায় পাবে তুমি ? তুমি যে কেবলি পুরুষ !

তিন

চিত্রাঙ্গদা এবং প্রকৃতি ভিন্ন জাতের মানুষ, ভিন্ন তাদের সামাজিক পরিবেশ ও আশৈশব শিক্ষাদীক্ষা, ভিন্ন তাদের পরিণত ব্যক্তিস্বরূপের

সংস্থাপনা। তবু দুই নাটকের গোড়াতে আমরা দুই নায়িকাকে যে-পরিস্থিতিতে দেখি তা কতকটা একইপ্রকারের। দু-জনের জীবন-পরিধির মধ্যে অকস্মাৎ পদার্পণ করলেন রূপে-গুণে দুই অসাধারণ পুরুষ ; দুই নায়িকাই প্রথম দর্শনে তাঁদের প্রেমে পড়লো ; প্রতিদানে দু-জনই পেলো প্রেম নয়, কাম। এই পর্যন্ত। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য তুলনা নয়, প্রতিতুলনা ; এবং প্রতিতুলনা করবার মতো অনেক-কিছু আছে এই দুটি তুলনীয় নাটকে।

বীরশ্রেষ্ঠ তৃতীয় পাণ্ডবের খ্যাতি ভারতময় ছড়িয়ে পড়েছিলো, পূর্বপ্রান্তবর্তী ক্ষুদ্র রাজ্য মণিপুরের রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদার মনের গভীরে অর্জুনের সমুজ্জ্বল ভাবচিত্র অঙ্কিত ছিলো বালিকা বয়স থেকেই। অর্জুন ছিলেন তার জীবনের আদর্শ নায়ক, হৃদয়ের বরেণ্য পুরুষ। প্রকৃতি কি বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য আনন্দ ভিক্ষুর খ্যাতি আগেই শুনে-ছিলো? হয়তো শুনেছিলো। অন্তত জানতো তিনি শুধু উচ্চ বর্ণের নয়, উচ্চস্তরের জ্ঞানী-গুণী মানুষ; তদুপরি তিনি রূপবান, এমন রূপ সে আগে কখনো দেখেনি। "এই পার্থ, আজন্মের বিস্ময় আমার"— না, এমনতর অন্তরের ধন ছিলেন না আনন্দ, তবু প্রকৃতি একাধারে পুলকিত ও বিস্মিত হ'লো যখন আনন্দ খুব কাছে এসে দাঁড়ালেন তারই অশুচি কুয়োর ধারে। সে-বিস্ময়ের অবধি রইলো না যখন তিনি এই চণ্ডাল-কন্যার হাতে জল খেতে চাইলেন। আনন্দিত বিস্ময় কেমন ক'রে বেদনার্ত প্রেমে পরিণত হ'লো, একটি গণ্ডুষ জল হ'য়ে গেলো হৃদয়ের অকূল সমুদ্র, তার কথা আগেই বলেছি।

নাটকে চিত্রাঙ্গদার রূপকে বলা হয়েছে দেবদত্ত, পূজায় তুষ্ট হ'য়ে অল্পকালের জন্য অনঙ্গদেব ঐ-বর দিয়েছিলেন তাপসিনীকে ; ঋণ বললে আরো সঙ্গত হয়, কারণ এক বছর পরে প্রত্যর্পণের প্রতিশ্রুতি তার অঙ্গীভূত। অধমর্ণার মনে সন্দেহ ছিলো না যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সে তার দয়িতের কামকে প্রেমে পরিণত ক'রে তুলতে সক্ষম হবে,

দেহলাবণ্যের কথাটা তখন আপনিই গৌণ এমন-কি বাহুল্য হ'য়ে উঠবে দু-জনের হার্দ্য সম্পর্কে। চণ্ডালিনীর রূপ কিন্তু প্রকাশ্যতই মা বসুন্ধরারই দান, এবং এ-ক্ষেত্রে তার মেয়াদ হ্রস্ব কি দীর্ঘ সে-প্রশ্ন তোলা হয়নি। বিশ্বজয়ী অর্জুন ছলনাময়ী নারীর রূপের কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছিলেন ব'লে চিত্রাঙ্গদা প্রথম দফায় ধিক্কার দিয়েছিলো অর্জুনকে। কিন্তু সে-ধিক্কার সম্পূর্ণ আন্তরিক ছিলো না। অব্যবহিত পরেই কামের বন্যা দু-জনকেই ভাসিয়ে নিয়ে গেলো; তাদের মিলন হ'লো রূপসাগরে ডুব দিয়েই। কেমন ক'রে তারা অরূপরতন, প্রেমের রতনের সন্ধান পেলো, 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের মূল বিষয় তা-ই।

'চণ্ডালিকা' নাটকের মূল বিষয় বেশ-একটু ভিন্ন। প্রথম দর্শনে আনন্দ মুগ্ধ হয়েছিলেন বটে, তবে জলগ্রহণ ক'রেই প্রকৃতির রূপের মায়া কাটিয়ে আত্মসংবৃত ভিক্ষু রূপসীর দিকে দ্বিতীয়বার দৃক্‌পাতমাত্র না-ক'রে চ'লে গেলেন। কিন্তু শেষ অবধি ফিরে আসতেই হ'লো তাঁকে। আর ফিরে আসা মানেই তাঁর আধ্যাত্মিক পতন। বুদ্ধদেবের এতদিনকার মহান শিক্ষা ও সাহচর্য থেকে যে-শক্তি পেয়েছিলেন তা ব্যর্থ হ'লো এই দুরূহ হার্দ্য পরীক্ষায়। অবশেষে আত্মজয়ের উপযুক্ত বল দিলো সেই অবলা যে তাঁকে রূপের যাদুতে পথভ্রষ্ট ও ভূলুণ্ঠিত করেছিলো। এ-ব্যাপারে চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে তার মিল দেখা যায়: দু-জনই উদ্ধার করলো তাদের দয়িতকে সেই কামের গ্রাস থেকে যেখানে রূপের মায়াজাল বিস্তার ক'রে তারাই টেনে এনেছিলো। কিন্তু অর্জুন উদ্ধার পেলেন প্রেমে, আনন্দ উদ্ধার পেলেন প্রেম-অপ্রেমের ঊর্ধ্বে নির্মল আত্মশুদ্ধিতে। 'চিত্রাঙ্গদা' মিলনান্ত নাটিকা; 'চণ্ডালিকা'কে ট্র্যাজেডির ভারতীয় সংস্করণ ভাবা যায় হয়তো। পরিসমাপ্তি তার চূড়ান্ত বিচ্ছেদে, কিন্তু চূড়ান্ত দুঃখে নয়। আনন্দ ফিরে গেলেন সেই ঊর্ধ্বলোকে যেখান থেকে তিনি নেমে এসেছিলেন; আত্মসমাহিত

প্রকৃতি স্থির দাঁড়িয়ে রইলো তার কুটীর-প্রাঙ্গণে, কিন্তু মনে-মনে অনুসরণ করলো তাঁকে যাঁকে সে নিজেই উদ্ধার করেছিলো।

'চণ্ডালিকা' নাটকের প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রকৃতির দুঃখে ভরা ; শেষ মুহূর্তে যখন সে দুঃখজয়ী তখনই দুঃখ তার সবচেয়ে মর্মান্তিক। বিষের জ্বালার চেয়ে "বিষকে বিষের দাহ দিয়ে" দহন ক'রে মারার যন্ত্রণা কম নয় ; তবু পরিণাম তার মৃত্যু নয়, অমৃত। বুদ্ধদেবের মূল শিক্ষাকে দুঃখের কারণ আবিষ্কার ক'রে দুঃখকে সমূলে বিনাশ করার শিক্ষা ভাবা ভুল ; দুঃখের মধ্যে থেকেই দুঃখের উপরে থাকাব, জীবনের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে প্রশান্তি খুঁজে পাওয়ার শিক্ষাই তিনি দিয়ে গেছেন। দুঃখের পরিধি আর জীবনের পরিধি যে এক। প্রদীপকে যেমন ভোর হওয়া পর্যন্ত জ্বলতে হয়, মানবজীবনের জ্বালাও তেমনি মৃত্যুর আগে শেষ হবার নয়—বলেছেন গালিব।

আমরা দেখি, প্রকৃতির মনের দর্পণেই দেখি, কী প্রাণান্তকর সংগ্রাম করছেন আনন্দ এই রূপসীর মায়াবন্ধন ছিন্ন ক'রে এতদিন যে-মুক্তির একনিষ্ঠ সাধনা তিনি ক'রে এসেছেন বুদ্ধের প্রিয়শিষ্যরূপে, সেই মুক্তলোকে ফিরে গিয়ে নিষ্কাম ধ্যানে ও কর্মে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'তে। "নিজেরে মারছেন বহ্নির বেত্র / শেল বিঁধছেন আপনার মর্মে"—কত দূরে আমরা ফেলে এসেছি বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে যিনি এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁর ব্রহ্মচর্য্য-পালনের ব্রত, বুক ফুলিয়ে বলেছিলেন "পৌরুষের সে অধৈর্য / তাহারে গৌরব মানি আমি।" চিত্রাঙ্গদাও তাকে গৌরব ব'লে মেনে নিতে দ্বিধা বোধ করেনি যখন অর্জুন শুধু তার দেহের নয়, মনেরও প্রেমে পড়লেন। আনন্দের আত্মযুদ্ধ ("কী ভয়ঙ্কর দুঃখের ঘূর্ণিঝঞ্ঝা") যোদ্ধার পক্ষে যেমন আগাগোড়া যন্ত্রণাদায়ক ও গ্লানিকর, মায়াদর্পণে দর্শিকা প্রকৃতির পক্ষেও তদ্রূপ—"আমি দেখব না তোর দর্পণ / বুক ফেটে যায়, যায় গো, বুক ফেটে যায়।" অথচ এই যুদ্ধে যদি আনন্দ পরাজিত হন, তবে সে তো প্রকৃতিরই পরম জয়,

চরম·লাভ। কিন্তু তা নয়। প্রেমের বাজিতে জয়ের আকাঙ্ক্ষা তার মনে জেগেছিলো স্বভাবতই; তবে অন্য-একটি ভাব, একটি আশঙ্কা ক্রমশ প্রবলতর হ'য়ে উঠলো—"মহান বনস্পতি ধূলায় কি লুটোবে / ভাঙবে কি অভ্রভেদী তার গৌরব।" সন্ন্যাসী আনন্দের মনোভূমিতে যেমন বন্ধন ও মুক্তির শক্তিপরীক্ষা চলেছে, প্রেমিকা প্রকৃতির মনেও তেমনি প্রেমাস্পদকে পাওয়ার তীব্র ইচ্ছা এবং না-পাওয়ার শুভানুধ্যানের মধ্যে যেন সেই যুদ্ধের প্রতিবিম্ব দেখি আমরা। একবার সে ভাবে :

বুকের জ্বালা দিয়ে আমি জ্বালিয়ে দিব দীপখানি—
সে আসবে, ও সে আসবে।
... ...
দুঃখ দিয়ে মেটাব দুঃখ তোমার,
স্নান করাব অতল জলে বিপুল বেদনায়;

কিন্তু যখন দেখতে পায় যে তিনি সত্যি ফিরে আসছেন, একেবারে তার বাড়ির সামনে এসে পৌঁছেছেন, তখন শিউরে ওঠে সে—প্রত্যাসন্ন শুভলগ্নের তীব্র হর্ষে নয়, অশুভ পরিণামের বিপুল আশঙ্কায়: "মা ভয় হচ্ছে, তাঁর পথ আসছে শেষ হয়ে, তার পরে? তার পরে কী? শুধু এই আমি, আর কিচ্ছু না! এতদিনের নিষ্ঠুর দুঃখ এতেই ভরবে?" অত্যাশ্চর্য এই ভাবনা। প্রেম কত গভীর, কত দিগন্ত-ছোঁয়া, কত গগনচুম্বী হ'লে যে-মিলন বুকের কাছে এসে পৌঁছেছে তাকে উপেক্ষা ক'রে চিরবিচ্ছেদকেই বুক পেতে গ্রহণ করার মতো এমন প্রেমাতীত ভাবনা জাগাতে পারে প্রেমিকার মনে—তা আমরা নাটকের অন্তিম দৃশ্যে স্তব্ধ বিস্ময়ে উপলব্ধি করি।

এমন ভাব চিত্রাঙ্গদার মনে জাগেনি, জাগতে পারতো না; হয়তো সে রাজেন্দ্রনন্দিনী ব'লে একদিক থেকে যেমন উঁচু পর্দায় বাঁধা তার মন, অন্যদিক থেকে তেমনি প্রাণ ও মনের সর্ববিধ উৎকর্ষসাধনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। উপনিষদ যাকে 'আনন্দ' বলেছেন, বুদ্ধদেব যার ইঙ্গিত

করেছেন 'অমৃত' শব্দের দ্বারা, তার সন্ধান চিত্রাঙ্গদা পায়নি, তার স্বাদ সে জানে না। অর্জুনকে নিয়ে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা অন্যবিধ : অর্জুন যদি আমার রূপের টানে ফিরে আসেন, তার পরে কী, শুধু এই আমার সুন্দর শরীর? "সে আমি যে আমি নই, হায় পার্থ!" আমার উজ্জ্বল মনের এবং বহুবিধ কর্মশক্তির রূপ দেখে যদি তুমি মুগ্ধ হও তবেই আমরা দু-জনে পৌঁছাবো এক মহান সার্থকতার তীর্থে। সে যখন প্রজাদের বলেছিলো তোমাদের রাজকুমারী এক বৎসরের জন্য তীর্থযাত্রায় বেরুচ্ছেন, তখন সে খুব একটা বানিয়ে বলেনি। প্রেমের চেয়ে বড়ো আর কী তীর্থ আছে মানবজীবনে? অন্তত চিত্রাঙ্গদার জীবনে এটাই সর্বোত্তম তীর্থ। চিত্রাঙ্গদাকে বলতে পারি পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের ভাবজগতের মানুষ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূল্য তার কাছে সর্বোচ্চ। রেনেসাঁসের অরুণোদয়ে যে রোম্যান্টিক প্রেমের উন্মেষ ঘটলো তাতে আত্মত্যাগের দাবী ছিলো, এমন-কি মৃত্যুবরণ পর্যন্ত সে-দাবী নিয়ে যেতে পারতো প্রেমিককে ; তবু তাতে ব্যক্তির সীমানা ছাড়িয়ে যাওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই ; বরঞ্চ পেত্রার্কা থেকে য়েট্‌স্‌ পর্যন্ত দেখা যায় প্রায় সব কবি ও নাট্যকার এবং তাঁদের নায়ক-নায়িকারা রোম্যান্টিক প্রেমের মধ্যে ব্যক্তিত্বেরই সুন্দরতম স্ফুরণ সন্ধান করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মনেও এই ভাবধারা প্রবল। তবে তিনি একাধারে আধুনিক এবং প্রাচীন (যাঁরা উপনিষদের আলোয় রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন তাঁরা ভুল দেখেননি), রোম্যান্টিক এবং রোম্যান্টিকতা-উত্তীর্ণ। অল্পকালের ব্যবধানে রচিত তিনটি নৃত্যগীতি-নাট্যের মধ্যে তিনি 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'শ্যামা'তে দেখিয়েছেন রোম্যান্টিক প্রেমের পরাকাষ্ঠা, 'চণ্ডালিকা'য় তার স্বাতিক্রমণ।

রাজকন্যা পারেনি, কিন্তু চণ্ডালকন্যা পারলো নিজের অকূল-সমুদ্র-তুল্য প্রেমকে উত্তরণ করতে, নিজের সমুজ্জ্বল প্রাণময় ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করতে। মনের এই শরীরাতিগ অহমোত্তীর্ণ বিশালতা

"শুধু একটি গণ্ডুষ জল" ঘটিয়ে দেয়নি ; আগে থেকেই প্রেম-সাধিকার মন প্রস্তুত ছিলো, মহত্তর ভাব ধারণ করার মতো পাত্র তৈরী ছিলো তার অবচেতনে, আগেভাগেই নিজগুণেই সে হয়েছিলো দেবদ্রোহী এবং অবশ্যই সমাজদ্রোহী। তরুণ বয়স থেকে সে তপ করছিলো চিত্তের গহনে আনন্দের মতন কোনো জ্যোতিষ্মান পুরুষের জন্য। আনন্দের সঙ্গে ক্ষণিক মিলনের বহু পূর্ব থেকেই "বিচ্ছেদ-দহন" তার মনে গোপন ছিলো, যদিও যাঁর বিচ্ছেদে সে ব্যাকুল তিনি তখন অপ্রকাশ ছিলেন। সে-ও শ্যামার মতো গাইতে পারতো যদিও তখন বাক্যহীন ছিলো তার হৃদয় :

পিপাসিত জীবনের ক্ষুব্ধ আশা
আঁধারে আঁধারে খোঁজে ভাষা।

তাই তো আনন্দকে দেখে সে এই অদ্ভুত কথা বলতে পারলো—"বচন-হারা আমাকে দিয়েছে বাক।" প্রকৃতির মনের গভীরতলের এই নিভৃত পিপাসা শ্যামার 'ক্ষুব্ধ আশা'র চেয়ে গভীরতর ছিলো, ছিলো সুদূরতর ও মহত্তরের জন্য।

অনুমান করতে বাধা নেই যে বুদ্ধের শাস্ত্রবর্জিত মানববাদী বৈপ্লবিক ধর্মের বাণী হাওয়ায়-হাওয়ায় ঈষৎ ক্ষীণ হ'য়ে পূর্বাহ্নেই প্রকৃতির কানে পৌঁছেছিলো ; মা-ও শুনেছিলো সে-সব কথা, কিন্তু খুব-একটা গুরুত্ব আরোপ করতে পারেনি তাতে—"ওদের কথা কানেই শোনবার, কাজে খাটাবার নয়।" মেয়ে কিন্তু "মানুষের তৃষ্ণা-মেটানো সম্মান" পাওয়ার আগে থেকেই জানতো আনন্দ কিসের সাধক, কিসের প্রতীক। সেই প্রতীককেও সে ভালোবেসেছিলো, শুধু তাঁর দৈহিক বাস্তবিকতাকে নয়। সেইখানে বাধলো দ্বন্দ্ব, ঘটলো বিপদ, সর্বনাশও ঘটতে পারতো কিন্তু ঘটেনি, ঘটতে দেয়নি এই অশিক্ষিত অদীক্ষিত ছোটো জাতের মেয়ে।

প্রাণধর্মী প্রেম দিয়ে সে আনন্দকে টেনে আনতে চেয়েছিলো তার পাশে, শয্যাসঙ্গীরূপে, স্বামীরূপে। অন্য-এক মহানুভব প্রেম দিয়ে সে আগেই আঁচ করতে পেরেছিলো, পরে চোখে দেখলো, যিনি এলেন তিনি তার ধ্যানের "সেই দীপ্ত উজ্জ্বল, সেই শুভ্র নির্মল, সেই সুদূর স্বর্গের আলো" নন। 'সুদূর' কথাটা লক্ষণীয়; যাকে নিয়ে আমাদের চিত্তের গহনে তপশ্চরণ, তিনি আধো আঁচলে এসে বসলে বা তাঁর জন্য রচিত শয্যায় বাহুতে মাথা রেখে শুয়ে পড়লে তপস্যা পূর্ণ হওয়ার বদলে তপস্যা ভঙ্গ হবে, ব্যর্থ হবে। ভোরবেলার আকাশের আলো দিয়ে তৈরী যাঁর রূপ তাঁর জন্য প্রেমিকার তপস্যা অনন্ত তপস্যা। সুদূরত্ব হ্রাস পেতে থাকবে কিন্তু কখনোই শূন্যে এসে ঠেকবে না। দূরের বন্ধুই সুরের দূতী পাঠাতে পারেন, কাছের—একেবারে দাম্পত্য অব্যবধানের—বন্ধু পারেন না। দাম্পত্যপ্রেমের বেসুর বাজবে মাঝে-মাঝে; মেনে নিতে হবে সেটা। এই তিক্ত-মধুর রসের স্বাদ আলাদা।

প্রকৃতির অনুপম রূপলাবণ্যের মন্ত্রবলের সঙ্গে প্রাণান্ত সংগ্রাম ক'রেও তাকে কাটাতে না-পেরে যখন আনন্দ তার প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালেন তখন সে মর্মে ম'রে গিয়ে দেখলো কী সর্বনাশ করেছে সে: "কী ম্লান, কী ক্লান্ত, আত্মপরাজয়ের কী বোঝা নিয়ে এলে আমার দ্বারে! মাথা হেঁট করে এলে।" দৈহিক কাম থেকে রোম্যান্টিক প্রেমে সমুত্তরণে কিন্তু আনন্দের উদ্ধার সম্ভব নয়, যেমন সম্ভব হয়েছিলো অর্জুনের ক্ষেত্রে। কাজেই সে-দিকে পা বাড়ালো না চণ্ডালকন্যা, যদিও তা-ই সে ভেবেছিলো গোড়ার দিকে। প্রেমে পরিপূর্ণ কিন্তু প্রেমেই পরিসমাপ্ত ছিলো না এই তরুণীর সুপরিণত মন। অন্য পথে, আরো অনেক দুর্গম, দুর্জ্ঞেয়, দুর্বিষহ বেদনার পথে পা রাখলো সে। দেড় হাজার বছর পরে হাফিজ জানলেন এবং লিখলেন: "ইশ্‌ক্ আসান নমুদ্ আউ-ওয়াল্, ওয়ালে উফ্‌তাদ্ মুশ্‌কিল্‌হা" (প্রথম পদক্ষেপে প্রেম বড়ো সহজ ঠেকেছিলো, পরে কঠিন থেকে কঠিনতর হ'য়ে এলো পথ)।

আনন্দ "এতদিনের নিষ্ঠুর দুঃখে" যে-সাধনমার্গে অনেক দূর এগিয়েছিলেন তার মূল কথা হচ্ছে আত্মকেন্দ্রিক কামনা-বাসনার নিত্য-প্রজ্জ্বলিত অগ্নি নির্বাপিত ক'রে সর্বমানুষ, এমন-কি সর্বজীবের প্রতি মৈত্রীভাবনার অনুশীলন। মৈত্রীভাবনার নির্যাসস্বরূপ যে-শ্লোকটি রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার উদ্ধৃত করেছেন তা বড়ো সুন্দর—"মা যেমন একটিমাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন, সমস্ত প্রাণীতে সেই প্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করিবে।" বুদ্ধের এই মহান শিক্ষার উজ্জ্বল প্রতীক আনন্দ—অন্তত প্রকৃতির চোখে। রোম্যান্টিক প্রেমে কি তাঁর উদ্ধার সম্ভব? প্রেম যতই না কেন মহাসাগরতুল্য বিশালতা লাভ করুক, তবু প্রেমের দৃষ্টি একটি ব্যক্তিবিশেষে সীমিত। আমরা ভাবতে পারি যে প্রেমিক-প্রেমিকা দু-জনই নিজের-নিজের স্বতন্ত্র অহমতা হারিয়ে গ'ড়ে তুলেছে একটি যুগ্মসত্তা : এই যদি হয় প্রেমের পরাকাষ্ঠা তবু মৈত্রীভাবনা ভিন্ন স্তরের ভাব। প্রেমিকযুগলের কাছে সমাজ-সংসার সব মিছে হ'য়ে যাবে, মিছে এ-জীবনের কলরব—এমন কোনো কথা নেই। বরঞ্চ তাতে ক'রেই প্রেমের আয়ু দ্রুত ক্ষয় হয়। উভয়েই নিজ-নিজ সর্ববিধ সামাজিক কর্তব্য যথোচিত পালন করুক, এটাই সুস্থ প্রেমের চাহিদা। তবু কর্তব্য কর্তব্যই। মা নিজেকে সব দিক দিয়ে বিলিয়ে দেয় যখন তখন তো সে তার একমাত্র পুত্রের প্রতি কর্তব্য পালনের কথা ভাবে না। এটা তার হৃদয়ের ধর্ম, ন্যায়ধর্ম নয়।

এই হৃদয়ধর্মের অনন্ত প্রসারই শিক্ষা দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দকে। এত বড়ো ধর্ম থেকে চ্যুত হ'য়ে আনন্দ এসেছেন প্রকৃতির কাছে যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত, আত্মপরাজয়ের গ্লানিতে পাংশুবর্ণ, এসেছেন মাথা হেঁট ক'রে। এ-দৃশ্য প্রকৃতি সইতে পারলো না। আনন্দের যন্ত্রণা ও গ্লানি ততোধিক যন্ত্রণাবিদ্ধ ও গ্লানিপূর্ণ করলো তাকে। এই নিদারুণ আঘাতে তার হৃদয়তন্ত্রের রাগরূপ পাল্‌টে গেলো এক মুহূর্তে; যুবতীর রোম্যান্টিক প্রেম নিজের সীমানা ছাড়িয়ে পরিণত

হ'লো মৈত্রীভাবনায়। (সংস্কৃত জাতকে আমরা দেখি প্রকৃতি পরে বৌদ্ধ-ধর্ম গ্রহণ ক'রে ভিক্ষুণী হয়েছিলো।) "পা দিয়ে মন্ত্রের উপকরণ ছড়িয়ে ফেলে দিল সে", হাত বাড়িয়ে আনন্দের হাত ধ'রে তুললো তাকে মাটি থেকে ; যিনি ছিলেন সর্বতোভাবে পরাজিত তাঁর হেঁট মাথা তুলে ধ'রে বললো আশ্চর্য কথা—"জয় হোক, তোমার জয় হোক, তোমার জয় হোক।" বানানো কথা নয়, প্রবোধবাক্য নয়, এমন আন্তরিকতায় উদ্ভাসিত, বিশ্বাসের বলে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বললো যে তার কথাই সত্য হ'য়ে উঠলো, আনন্দ ফিরে পেলেন তাঁর তেজোদৃপ্ত অথচ বিনম্র মহদাশয়তা, তাঁর এতদিনকার শীলিত আত্মসমাহিতি। ফিরে গেলেন তাঁর স্বকীয় সাধনার পথে। যেতে-যেতে আবার পূর্বের মতো স্থির কণ্ঠে ব'লে গেলেন—"কল্যাণ হোক তব কল্যাণী।" কল্যাণী তার নারীসুলভ সহজ মহৎ বিনয়ে বললো বটে—"প্রভু, এসেছ আমাকে উদ্ধার করতে, তাই এত দুঃখ পেলে" ; কিন্তু কোনো শ্রোতা বা পাঠকের মনে সন্দেহ থাকে না প্রকৃতপ্রস্তাবে কে কাকে উদ্ধার করলো, কার দুঃখ তীব্রতর, শ্রেয়তর, শ্রদ্ধেয়তর।

প্রেমোত্তীর্ণ প্রেমিকা অশ্রু সংবরণ ক'রে স্থির নেত্রে তাকিয়ে রইলো তার হৃদয়-পথের পথিকের দিকে, দু-হাত দিয়ে বুক চেপে দেখলো তাঁর উল্‌টো পথে ফিরে যাওয়া, সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করলো তাঁর ফিরে-না-চাওয়া। মনে-মনে হয়তো বলেছিলো—"এ-ও কি রেখে গেলে।"

* না, শেষ উদ্ধৃতিটি রবীন্দ্রনাথ থেকে নয়, অমিয় চক্রবর্তীর অত্যাশ্চর্য কবিতা "বিনিময়" থেকে।

এ-আলোচনা 'চণ্ডালিকা' গদ্যনাট্য ও গীতিনাট্য এবং 'চিত্রাঙ্গদা' পদ্যনাট্য ও গীতিনাট্য—উভয়ের উপর আশ্রিত। গোড়ার দিকে একক উল্‌টো কমার বেষ্টনীতে ন্যস্ত অল্প-কিছু সংলাপ কল্পিত, উদ্ধৃত নয়।

পান্থজনের সখা

য়েট্‌স্‌ তাঁর আত্মজীবনীতে নিজেকে ধর্মপ্রাণ মানুষ ব'লে বলছেন : "আমার বাল্যকালের সরল ধর্মবিশ্বাস কেড়ে নিলেন হাক্সলি এবং টিণ্ড্যাল। সেজন্য আমি তাঁদের ঘৃণার চোখে দেখতাম।" খ্রীষ্টান ধর্মের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হ'য়ে য়েট্‌স্‌ এক নতুন ধর্মের কাঠামো রচনা করতে উদ্যোগী হলেন আইরিশ পুরাণ ও কাব্যগাথা এবং লোকমুখে বংশপরম্পরায় আগত নানাপ্রকার আইরিশ রূপকথা-উপকথা থেকে উপাদান সংগ্রহ ক'রে ; "আমি রীতিমত একটি ডগ্‌মাও তৈরী ক'রে ফেলেছিলাম।" কিন্তু সত্যিকার ধর্মজিজ্ঞাসা বা ঈশ্বরানুসন্ধানে তাঁর মন ছিলো না (যেমন ছিলো রবীন্দ্রনাথের) ; য়েট্‌স্‌ শুধু খুঁজছিলেন তাঁর কাব্যের উপজীব্য এবং তাঁর কবিমানসের জন্য একটি শান্ত শোভন বাসভূমি নিজের দেশের মাটিতে অথচ নিজের কালের কোলাহল থেকে বেশ খানিকটা দূরে। এলিয়টের মতো কোনো চার্চ্‌-অনুশাসিত, শাস্ত্রনির্ভর, বাঁধাধরা ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের কোলে আশ্রয় নেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিলো ; তাঁর মনের গড়ন ছিলো অনেক বেশি পরীক্ষাপ্রবণ, মৌলিক, সূক্ষ্ম এবং সর্বদা সব বিষয়ে এমন-কি নিজের বিষয়েও ঈষৎ ব্যঙ্গরসিক।

য়েট্‌সের প্রথম পর্বের কবিতার অতিরোম্যান্টিকতা কতখানি স্বাভাবিক আর কতখানি স্বরচিত তা নিয়ে তর্ক তোলা বৃথা। আধুনিক বিজ্ঞানকে তো তিনি ঘৃণা করতেনই, আধুনিক জগৎ ও আধুনিক জীবন থেকেও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, কারণ তার রূঢ়তা, তার ব্যক্তিব্যস্ততা, তার ছন্দহীনতা য়েট্‌সের ছন্দবিলাসী সৌম্যকান্তিপ্রিয় মনকে আঘাত করতো। ইব্‌সেন-এর নাটকে তাঁর ঘোরতর অরুচি ছিলো, এবং হেতুটি অতিশয় য়েট্‌সীয়—"ঐ-সব নাটকের সংলাপ আধুনিক

শিক্ষিত মানুষের মৌখিক ভাষার এত কাছাকাছি যে তাতে স্টাইলের কোনো অবকাশ নেই।" আধুনিককালের বেসুরো বেতালা আওয়াজ শুনে তাঁর মৃগতুল্য ভয়চকিত মন পালিয়ে গেলো প্রাচীন আইরিশ পুরাণে ও লোকগাথায়। কিন্তু সেখানে তো বেশিদিন থাকা সম্ভব নয় য়েট্‌সের মতো প্রতিভাসম্পন্ন চঞ্চলহৃদয় কবির পক্ষে।

সুদূরের তৃষ্ণা য়েট্‌স্‌কে বাস্তব জগৎ থেকে আরো দূরে নিয়ে গেলো। নানাপ্রকার আজগুবি প্রেতলৌকিক এবং ঐন্দ্রজালিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি মশগুল হলেন ; উদ্দেশ্য ছিলো ব্লেকের মতো, সুয়েডেনবোর্গের মতো এক মিস্টিক উপলব্ধিতে পৌঁছনো যার আলো তাঁর বাকী জীবনকে উদ্‌ভাসিত ক'রে তুলবে। শেষ পর্যন্ত ভূত-প্রেতের সাহায্য ব্যতিরেকেই পৌঁছেছিলেন এমন এক উপলব্ধিতে যা কবির পক্ষে, তাঁর কবিতার পক্ষে, এবং আমাদের সকলের পক্ষে মূল্যবান। পৌঁছলেন ভিন্ন পথে, অতিশয় নিদারুণ পথে, দীর্ঘকালব্যাপী তীব্র যন্ত্রণার পথে।

নবযৌবনে য়েট্‌স্ এমন এক অথৈ প্রেমে পড়লেন যার ছাপ র'য়ে গেলো তাঁর সারাজীবনের কাব্যে ও কর্মে। পাত্রী আয়ারল্যাণ্ডের সেরা সুন্দরী, শুধু রূপে নয়, নানা গুণেও ঐশ্বর্যবতী, মড গন। গোড়ার দিকে মড তরুণ কবির প্রেমে সাড়া দিলেও বিবাহের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন। এই তেজস্বিনী নারী সমাজকর্মেও উদ্যোগী ছিলেন এবং আইরিশ বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত। স্বভাবতই তাঁর স্বয়ম্বর সভায় স্বপ্নালু কবির চেয়ে বরেণ্য হলেন বিপ্লবী বীর। য়েট্‌স্ তাঁর ব্যর্থকাম বেদনাকে অমর ক'রে দিয়ে গেছেন এমন কয়েকটি কবিতায় যা আমার মনে হয় লিরিক কবিতার পরাকাষ্ঠা। উদাহরণস্বরূপ এখানে "Broken Dreams"-এর শুধু প্রথম স্তবকটি উদ্ধৃত করি :

There is grey in your hair.
Young men no longer suddenly catch their breath

When you are passing ;
But may be some old gaffer mutters a blessing
Because it was your prayer .
Recovered him upon the bed of death.
For your sole sake—that all heart's ache have known,
And given to others all heart's ache,
From meagre girlhood's putting on
Burdensome beauty—for your sole sake
Heaven has put away the stroke of her doom,
So great her portion in that peace you make
By merely walking in a room.

মনে হয়—এ মনে হওয়ার কোনো বাস্তব ভিত্তি জানা নেই আমার, তবু মনে হয়—শেষ দুটি পঙক্তির মৃদু অনুরণন শোনা যায় 'রোগশয্যায়'-এর শেষ কবিতার শেষের দিকে :

দেখি, তুমি নতশিরে বুনিছ পশম
বসি মোর পাশে
সৃষ্টির অমোঘ শান্তি সমর্থন করি।

রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের কাব্যের সঙ্গে য়েট্‌সের যৌবনকালের কাব্যের সাদৃশ্য অধিক ব'লে অনেকের ধারণা। য়েট্‌স্ নিজে 'গীতাঞ্জলি'র কবি রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে তাঁর পক্ষে ক্ষতিকর জেনে তার থেকে সযত্নে বেশ খানিকটা দূরে স'রে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও শেষ পর্বের কাব্যে 'গীতাঞ্জলি' পর্বের কাব্য থেকে দূরে স'রে এসেছিলেন। অথচ আশ্চর্য এই যে, দুই যুবক কবির মধ্যে যতটা মিল সহজেই ধরা পড়ে, দুই বৃদ্ধ কবির মধ্যে আত্মীয়তা তার চেয়ে ঈষৎ প্রচ্ছন্ন হ'লেও ঘনিষ্ঠতর। অনাত্মীয়তাও কম নয় অবশ্য। এবং যতদূর জানা যায় তাঁরা পরস্পরের সুপরিণত বয়সের গভীরতর ভাবনা-বেদনার দুঃসাহসিক কাব্যের সঙ্গে খুব একটা পরিচিত ছিলেন না।

বস্তুতপক্ষে শুধু প্রেমের কবিতা নয়, য়েট্‌সের অধিকাংশ রসোত্তীর্ণ

কবিতায় এক অপরূপ মাধুর্য সঞ্চার করেছে তাঁর জীবনের সবচেয়ে আনন্দঘন, সবচেয়ে হৃদয়বিদারক এই মহৎ—সব অবিচক্ষণতা, খ্যাপামি ও ছেলেমানুষি নিয়েও মহৎ—প্রেমের অভিজ্ঞতা। অনিবার্যভাবে বাঙালী পাঠকের মনে জাগে আর-এক বহুগুণান্বিতা রূপসী মহিলার কথা যাঁর কবি-সমাদৃত ডাক নাম ছিলো হেকেটি; ঠাকুরবাড়ির দেওয়া নামটিও কাব্য থেকেই সঞ্চয়িত। একজনের প্রত্যাখ্যানের এবং অন্যজনের আত্মহত্যার আঘাত-হানা বিরাট বহু-আয়তন বেদনা এ-যুগের দুই শ্রেষ্ঠ কবির প্রতিভাকে কত বিচিত্রভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলো, কী প্রশান্ত সামুদ্রিক গভীরতা ও বিস্তার এনেছিলো তাঁদের কাব্যে, তার যথাযোগ্য আলোচনা হয়তো কোনো সাহিত্যবিদ্ সুসাহিত্যিক করবেন একদিন।

কতকটা মড গনের অনুপ্রেরণাতেই য়েট্‌স্ আইরিশ বিপ্লবের খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বিপ্লব অবশেষে সফল হ'লো, তবু যেন ব্যর্থ হ'লো কবির চোখে।

We, who seven years ago
Talked of honour and of truth,
Shriek with pleasure if we show
The weasel's twist, the weasel's tooth.

অন্তরের ও বাইরের ব্যর্থতা য়েট্‌সের অন্তিম দশকের মনে ও কাব্যে তিক্ত নৈরাশ্যের আমেজ ঘটিয়েছিলো। তার একটা পরিণাম এই যে, তিনি নিজের বার্ধক্য ও বার্ধক্যজনিত শক্তিক্ষয়কে মেনে নিতে পারছিলেন না, মনে করতেন এটা বিধির স্থূল পরিহাস। সে-পরিহাসের সমুপযুক্ত উত্তর দেওয়ার মন্ত্র অবশ্য তাঁর জানা ছিলো:

An aged man is but a paltry thing,
A tattered coat upon a stick, unless

Soul clap its hands and sing, and louder sing
For every tatter in its mortal dress.

তবু যেন জানা ছিলো না। শরীর-পারের আধ্যাত্মিকতার জয়ধ্বনি করতে কোথায় যেন বাধছিলো তাঁর স্বভাবে ; আত্মসচেতন হাস্যরস-বোধেই সম্ভবত। সেই কথাটা তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন এমন ভাষায় ও ভঙ্গিতে যার পরোৎকর্ষ আমাকে অভিভূত করে

All men live in suffering,
I know as few can know,
Whether they take the upper road
Or stay content on the low,
Rower bent in his row-boat
Or weaver bent at his loom,
Horseman erect upon horseback
Or child hid in the womb,
Daybreak and a candle end.
That some stream or lightning
From the old man in the skies
Can burn out that suffering
No right-taught man denies.
But a coarse old man am I,
I choose the second best,
I forget it all awhile
Upon a woman's breast.
Daybreak and a candle end.

নিজের সমাধিফলকের জন্য যে সংক্ষিপ্ত লেখ্য রচনা ক'রে গেলেন—

Cast a cold eye
On life, on death.
Horseman, pass by!

তার থেকেই বোঝা যায়, য়েট্‌স্‌ জীবন এবং জগৎকে ঠিক মেনে

নিতে পারেননি, একপ্রকার স্টোইক্ নির্বেদে ভ'রে উঠেছিলো তাঁর মন। কিন্তু শুধু নির্বেদে নয়। এমন কয়েকটি কবিতাও তিনি লিখে গেছেন যা আমাদের ভাবতে প্ররোচিত করে যে, তাঁর বেদনা ও সাধনার শেষ কথা ট্র্যাজিক আনন্দই, তিনিও রবীন্দ্রনাথের মতো যাওয়ার আগে অনুভব ক'রে গেলেন সমস্ত দুঃখ ও পাপের কালিমাকে ছাপিয়ে সমগ্র জগৎ-চরাচরে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে "a terrible beauty is born."।

য়েট্‌সের মতো রবীন্দ্রনাথও যে-ধর্মসমাজ ও ধর্মবিশ্বাসের কোলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং লালিত হয়েছিলেন, তার চৌহদ্দী থেকে বেরিয়ে এলেন যৌবন শেষ না-হ'তেই। এ-ক্ষেত্রে কারণটা কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের অভিঘাত নয়, তাই বিজ্ঞানের প্রতি বৈরিভাব পোষণ করার কোনো অবকাশ ঘটেনি তাঁর মনোবিবর্তনে। বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ঘৃণা করা দূরে থাক্, সম্যক্ না-হ'লেও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার চোখেই দেখতেন তিনি। সে-শ্রদ্ধা বয়সের সঙ্গে গভীরতর হ'লো এবং উত্তীর্ণ-সত্তর রবীন্দ্রমানসের অন্যতম প্রধান উপকরণ হ'য়ে দাঁড়ালো। খুব সম্ভব কেবল গ্যেটে ব্যতীত আর-কোনো মহৎ কবির বিশ্বনিরীক্ষায় বিজ্ঞান ও যুক্তির এমন প্রশস্ত আসন খুঁজে পাওয়া যাবে না। ১৩১৮ সালে প্রকাশিত "ধর্মের নবযুগ" প্রবন্ধে লিখেছেন : "মানুষের জ্ঞান আজ যে-মুক্তির ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেইখানকার উপযোগী হৃদয়বোধকে এবং ধর্মকে না পাইলে তাহার জীবনসঙ্গীতের সুর মিলিবে না, এবং কেবলই তাল কাটিতে থাকিবে।" বর্তমানকালের দু-একজন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের লেখায় এমন কথা পেয়েছি, অন্য-কোনো কবির লেখায় পাইনি। এই মুক্ত বুদ্ধি ও মুক্ত হৃদয় রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য।

আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের বিশ্বনিরীক্ষায় যে কী প্রকাণ্ড বিপ্লব ঘটিয়েছে সে-বিষয়ে দেশবিদেশের, বিশেষত এ-দেশের, সাহিত্যিক ও

সাহিত্য-সমালোচকগণ যথেষ্ট সচেতন নন। এই বিপ্লবকারী বৈজ্ঞানিক চিন্তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাণীবিজ্ঞানে ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ। ডারুইনিস্টরা দেখালেন যে, মানবাত্মা অকস্মাৎ স্বর্গধাম থেকে পতিত নয়, বানর-জাতীয় নিকৃষ্ট জীবের দেহমন থেকে ক্রমশ উত্থিত। অভ্যুত্থানের ইতিহাস বড়োই দীর্ঘ, কোটি বৎসরের মাপকাঠিতে পরিমেয়; এবং যেমন দীর্ঘ তেমনি হিংস্র, রক্তাক্ত। প্রাণীতে-প্রাণীতে খুনোখুনি তো চলেইছে, একতরফা খুনের পরিসংখ্যানও বিরাট। বাঘ ছাগল খায়, সোনালী ডানার চিল হাঁস-মুরগীর ছানা দেখতে পেলেই ছোঁ মেরে নিয়ে উড়ে যায়, অদৃশ্য অসংখ্য ব্যাকটিরিয়া মানুষকে খেয়ে শেষ করে। এই তো সেদিন পর্যন্ত বসন্ত, ওলাউঠা, কালাজ্বর, ম্যালেরিরা, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের জীবাণুর কাছে মানুষ অসহায় ছিলো। শুধু তা-ই নয়। লক্ষ-লক্ষ জন্তু-জাতি প্রাণ-বিবর্তনধারায় ভূতলে বা সমুদ্রগর্ভে দেখা দিয়েছে এবং কিছুকাল ব্যর্থ সংগ্রামের পর নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে; অথবা জীবাশ্মের কিছু ভগ্নাংশ রেখে গেছে বর্তমানকালের প্রাণীতত্ত্ব-বিদ্‌দের কৌতূহল মেটাবার জন্য। টেনিসন-বর্ণিত "Nature red in tooth and claw"-র কথা ভাবেননি রবীন্দ্রনাথ যখন লিখেছিলেন: "এই তো তোমার প্রেম ওগো হৃদয়হরণ / এই যে পাতায় আলো নাচে সোনার বরণ"। পরে ভাবতে হয়েছিলো তাঁকে।

দ্বিতীয়ত, মনের সঙ্গে দেহের, বিশেষত স্নায়ুতন্ত্রের সম্পর্ক যে এত ঘনিষ্ঠ, এতখানি পরস্পর-নির্ভরশীল, তা রবীন্দ্রনাথের জন্মের সময়ে জানা ছিলো না পশ্চিম য়োরোপেও। সত্তর বছর বয়সে যখন তিনি তাঁর কাব্যের শেষ পর্বে পৌঁছলেন তখন এ-বিষয়ে ভূরি-ভূরি তথ্য পুঞ্জীভূত হয়েছে, ধোপে টেকে এমন মতবাদ গঠিত হয়েছে; আরো সত্তর বছর পরে স্নায়ুবিজ্ঞান যে-বিপ্লব ঘটাবে আমাদের জ্ঞানে, কর্মে ও অনুভূতিতে তা অভাবনীয়। ইতিমধ্যে তার আভাস-ইঙ্গিত দেখতে

পাচ্ছি আমরা। ইংল্যাণ্ডের সেরা স্নায়ুবিশেষজ্ঞ রাসেল ব্রেন্‌-এর লেখা থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করি :

> In this connection, behaviour disorders are of particular general interest, because it is often held that a sense of social and moral responsibility is a distinctly human characteristic. Attention was first directed to this aspect of brain damage by the disease known as encephalitis lethargia, which appeared in epidemic form during the decade following 1916. It was then noted that some children who had been attacked by this infection and as a result suffered from destruction of the basal parts of the brain, became delinquent. They were often aggressive, committed criminal offences, and proved quite unamenable to ordinary social and legal sanctions. Temporary outbursts of aggressive and sometimes violent behaviour are known to occur in patients with other lesions, particularly in the temporal and less often in the frontal lobes, and in some cases surgical removal of the lesion leads to cessation of the outbursts of violence."*

কিমাশ্চর্যম্‌ অতঃপরম্‌। অতঃপর মানুষের মরদেহের সঙ্গে একটি অমর আত্মা সংযুক্ত থাকে এবং দেহ ভস্মীভূত বা কবরস্থ হওয়ার পর সেই আত্মাটি পরলোকে অবস্থান ক'রে কিংবা ইহলোকেই পুনঃ-পুনঃ জন্মলাভ ক'রে পাপ-পুণ্যের মাত্রানুযায়ী শাস্তি-পুরস্কার ভোগ করে—প্রাচীন শাস্ত্রলব্ধ এই বিশ্বাসটাকে টিকিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়ালো।

* **Russell Brain in *The Humanist Frame*, edited by Julian Huxley, London, George Allen & Unwin, 1961, p. 29**

রামমোহন রায়ের ধারণা ছিলো যে সব ধর্মমতাবলম্বীরাই এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। এ-বিষয়ে কিন্তু তর্কের অবকাশ আছে। যে-বিশ্বাসটি সব ধর্মমতে বাস্তবিকই পাওয়া যায় তা আত্মার অমরতায় বিশ্বাস। এই বিশ্বাসকে বলা যেতে পারে ধর্মমতের (রিলিজনের) বিশেষ লক্ষণ। বিশেষ কিন্তু মৌলিক নয়। প্রচলিত সব ধর্মের মূল কথা হচ্ছে যে জগৎ শুধু নিয়মের রাজত্ব নয় (সেটা তো বিজ্ঞানের ধ্যেয়), জগৎ ন্যায়নীতির রাজত্বও বটে। অথচ শুধু ইহজীবনের খতিয়ান নিলে দেখা যায় অনেক নিষ্পাপ ও শুভকর্মী মানুষের জীবন দুঃখে ভরা, অনেক অত্যাচারী অনাচারী মানুষ সুখেই জীবন কাটায়। ন্যায়ের রাজত্বে (moral government-এ) আস্থা রাখতে হ'লে পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করা অনিবার্য হ'য়ে পড়ে। সেইকালে ঠিক-ঠিক হিসাব মিলে যায়—একালের পাপ-পুণ্যের ফলের হিসাবে যত গরমিলই থাক্-না কেন। আজ যদি বিজ্ঞানীরা বলতে শুরু করেন—মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার ক'রে বা অন্য ডাক্তারী উপায়ে মানবদরদীকে মানবদ্বেষী ও হিংস্র, কিংবা তার বিপরীতটা, ঘটানো সম্ভব, তবে আমাদের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস প্রচণ্ড আঘাত পায়—কোপার্নিকাস, ডারুইন এবং ফ্রয়েডের কাছ থেকে যতটা পেয়েছিলো তার চেয়ে বেশি বৈ কম নয়।

ম্যাক্সওয়েল-প্রণীত থার্মোডাইনামিক্সের দ্বিতীয় নীতির ভূমিকা আরও সাংঘাতিক। তাকে অভিব্যক্তিবাদের উল্‌টো অর্থাৎ অবক্ষয়-বাদও বলা যেতে পারে। ম্যাক্সওয়েলের অবক্ষয়বাদের পরিধি অবশ্য অনেক বেশি ব্যাপ্ত ও মৌলিক। প্রাকৃতিক জগতে বস্তু এবং শক্তির বিনাশ নেই, শুধু পরিবর্তন আছে। তবে লাভ-লোকসানের খতিয়ান নিলে দেখা যাবে পরিবর্তন এমনভাবে ঘটছে যে কেজো শক্তি ক্রমাগত খরচ হ'য়ে অকেজো শক্তির তহবিলে জমা হচ্ছে; সর্বমোট হিসাবে কোনো ভুল নেই। সিলিণ্ডারে বাষ্প চাপা থাকলে তা আমাদের

পরিবহনের বা অন্যবিধ কাজে লাগে ; বাতাসে ছড়িয়ে পড়লে তার দ্বারা কোনো কাজ হাসিল করা যায় না। এই ছড়িয়ে ফেলার দিকেই প্রকৃতির ঝোঁক। আর-একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝা যাক্ ব্যাপারটাকে। একটি বাক্সের একদিকে পঞ্চাশটি লাল গুলি এবং অন্যদিকে পঞ্চাশটি সাদা গুলি সাজিয়ে বাক্সটিকে ক্রমাগত নাড়া দিতে থাকলে গুলিগুলোর বিন্যাস অবিন্যাসে পরিণত হ'তে থাকবে, মোটের উপর বিশৃঙ্খলা বাড়তে থাকবে—যে-পর্যন্ত না সাদায়-লালে সব একাকার হ'য়ে যাচ্ছে। প্রাকৃত জগৎকে আমরা কস্‌মস্ বলি কিন্তু তার গতি কেঅসের দিকেই। মাঝে-মধ্যে এখানে-ওখানে শৃঙ্খলা (order) বৃদ্ধি পেতে পারে কিন্তু জাগতিক বিশৃঙ্খলতার প্রবাহকে তা ঠেকাতে পারে না। ফলত এই বিশ্বব্যাপী অবক্ষয়ের পটভূমিকায় একটি ছোটো গ্রহপৃষ্ঠে যে প্রাণের (অপ্রাণ জগতে প্রাণীই সবচেয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যাপার, এবং এমিবার চেয়ে মানুষ লক্ষ গুণ বেশি জটিল হ'য়েও সেই পরিমাণে সুশৃঙ্খল) উদ্ভব তথা বিকাশ দেখে আমরা উল্লসিত তা অত্যন্ত স্থানিক ও স্বল্প-কালীন ব্যাপার। যেন এক বিরাট খরতোয়া নদীর মাঝখান দিয়ে একটি ছোট্ট ডিঙি কোনোগতিকে উজান বেয়ে চলেছে, কিছুদূর এগিয়েই মাঝিদের দাঁড় টানবার শক্তি আর থাকবে না, নৌকো স্রোতোবেগে উল্‌টো দিকে ভেসে চলবে, অবশেষে সীমাহীন সমুদ্রগর্ভে কোথায় হারিয়ে যাবে তার কোনো চিহ্নও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আধুনিক বিজ্ঞান যে বিরাট বিপ্লব ঘটিয়েছে আমাদের চিন্তায়, অনুভূতিতে এবং সমগ্র জীবনে সে-বিষয়ে আই. এ. রিচার্ডস্ খুবই সচেতন ছিলেন। ফলত তিনি দুর্ভাবনায় পড়েছিলেন কবিতার ভবিষ্যৎ নিয়ে। তাঁর ধারণা যে, আধুনিক বিজ্ঞানের নিরাসক্ত নিরপেক্ষ গবেষণালব্ধ এইসব যুগান্তকারী তত্ত্ব শিল্প-সাহিত্যের পক্ষে মারাত্মক। সাবেকী রিলিজন বা আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দিয়ে দেখা বিশ্বছবি—অবজ্ঞাভরে

যার নাম দিয়েছেন তিনি magical view of the world— বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির ফলে সম্পূর্ণ বাতিল হ'য়ে গেছে। অথচ তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় যে সেই বাতিল-করা দৃষ্টিভঙ্গি সাহিত্যরচনার পক্ষে যেমন অনুকূল ছিলো, প্রকৃতি ও মানুষ বিষয়ে নববিজ্ঞান যে মোহমুক্ত দৃষ্টিদান করেছে তা তেমনি প্রতিকূল। তবে কি শিল্প-সাহিত্যের দিন ফুরিয়ে এসেছে, যেমন ফুরিয়ে এসেছে শাস্ত্রমানা ধর্মকর্মের দিন? জগৎ-কে আধ্যাত্মিকতার রঙে রাঙিয়ে না-দেখলে কি কবিরা আর কবিতা লিখতে পারবেন? দুশ্চিন্তা জাগে কাব্য-দার্শনিক কাব্য-প্রেমিক রিচার্ডস্-এর মনে।

কিন্তু রিচার্ডস্ কবিতাকে বাঁচিয়ে রাখবেন এই সহমরণের হাত থেকে। যদিও আধ্যাত্মিক বা ম্যাজিকাল বিশ্বনিরীক্ষায় বিশ্বাস রাখা আমাদের পক্ষে আর সম্ভব নয়, তবু, রিচার্ডস্ বলছেন, বিশ্বাস-বিশ্বাস খেলা করতে তো কোথাও আটকায় না। কবিতা লিখবার সময়ে এই খেলাচ্ছলে বিশ্বাস বা মেকি বিশ্বাসের সুযোগ গ্রহণ করবেন কবিরা, কিন্তু ভুলবেন না যে, এ-সব বাতিল-করা বিশ্বাসের পুনরুদ্ধার নিতান্তই তাৎক্ষণিক, কেবলমাত্র আমাদের হৃদয়বোধগুলির (attitudes-এর) মধ্যে স্বস্তি, শান্তি ও সামঞ্জস্য আনবার জন্য। সেই ঘর-গড়া ক্ষণভঙ্গুর সামঞ্জস্য নাকি কবিতার পক্ষে অত্যাবশ্যক।

এই অবিশ্বাসী যুগে কাব্যরচনার জন্য রিচার্ডস্ যে-ফর্মুলাটি উদ্ভাবন করেছেন তা আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকে। এ-যুগের মানুষের অশান্ত বিভ্রান্ত চিত্ত য'দ কোনো ধর্মবিশ্বাস বা দার্শনিক নিরীক্ষার মধ্যে শান্তি লাভ করেও তবে তার জন্য সততার প্রয়োজন; আস্থা যদি খুব দৃঢ় না-ও হয় তবু মনোপ্রতিন্যাসটি সীরিয়স্ হওয়া দরকার। কেউ-কেউ মনে করেন, কবির মন শিশুর মতো সরল থাকা ভালো। কিন্তু সেই সঙ্গে যদি তাঁর মনের আর-একটা দিক জীবনের বিচিত্র এবং নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতায় পোড় না-খেয়ে থাকে তবে কি তিনি উঁচুদরের কবি হ'তে

পারবেন? তাঁর বিশ্বাসে যদি আন্তরিকতা না-থাকে, হৃদয়মনের কমিট্‌মেণ্ট না-থাকে, তিনি যদি সত্যি-সত্যি কাব্যরচনাকালে ছোটো ছেলের মতো ভাবেন—আমি রাজা, এ রানী, তুমি মন্ত্রী, আর এই মাটিতে পোঁতা কাঠিগুলি আমাদের সেনাবাহিনী, তবে তাঁর কাব্যরচনাও ছেলে-খেলা হ'য়ে যাবে না কি—ছন্দ নিয়ে, মিল নিয়ে, ধ্বনিবিন্যাস নিয়ে, চিত্রকল্প-সংযোজনা নিয়ে এবং হৃদয়ভাব ও ধর্মবিশ্বাস নিয়ে খেলা?

কবিতায় অবশ্য কল্পনার স্থান খুবই প্রশস্ত, তবে সে-কল্পনা আপনাতে আপনি সমাপ্ত নয়। কল্পনার তুলি দিয়ে আঁকা চিত্রের সঙ্গে চিত্র যোগ ক'রে যে-চিত্রকল্প রচনা করেন কবি তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য অবশ্য কবির হৃদয়ভাব ও ভাবনারই প্রকাশ। কিন্তু সে-ভাব ও ভাবনা নিরালম্ব নয়। আলম্বন তার মানবিক, প্রাকৃতিক বা সর্বজাগতিক বিশ্ববোধ। অর্থাৎ যত আভাসে-ইঙ্গিতে হোক্, যত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হোক্, শেষ পর্যন্ত কবি প্রকাশ করতে চান তাঁর বিশিষ্ট হৃদয় তথা সমগ্র ব্যক্তিস্বরূপ দিয়ে দেখা মানুষের রূপ, প্রকৃতির রূপ এবং মানুষ ও প্রকৃতিকে নিয়ে যে-ভূমা তারি রহস্যময় রূপরেখা। সে-রহস্য আমাদের মনের দরজায় সর্বদাই অত্যন্ত মৃদু করাঘাত করে কিন্তু দরজা খুললেই দেখা যায়—নেই, কোথাও কেউ নেই, কিছু নেই। যে-সব কবিতা, গান, নাটক ও উপন্যাস আমাদের জীবনমরণের সঙ্গী হ'য়ে ওঠে তা রিচার্ডসের ফর্মুলা-অনুযায়ী রচিত নয়। তাতে এমন-কিছু থাকে যার স্পর্শে জগৎ ও জীবনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক, আমাদের ভাবনা ও বেদনা, আমাদের আশা-নৈরাশ্য অল্পবিস্তর রূপান্তরিত হ'য়ে ওঠে, সত্যতর হ'য়ে ওঠে। সত্যের উপর বিজ্ঞানের একচেটিয়া দখলদারী আমি মানি না। সত্য বহুরূপী, জৈন দার্শনিকদের পরিভাষায় সত্য অনেকান্ত। সাংবাদিক সত্য, ঐতিহাসিক সত্য, বৈজ্ঞানিক সত্য, সত্যের এক-একটি অন্ত (aspect); সাহিত্য আর-একটি অন্ত। অনেকান্ত মহাসত্যকে ধরবার জন্য, ধারণ করবার জন্য, আমাদের বহুভাষী হ'তে

হয়। কবিতার সত্য সাংবাদিক, ঐতিহাসিক কিংবা বৈজ্ঞানিকের ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাই ব'লে তাকে মেকি সত্য বা সত্য নিয়ে খেলা বলার মতো একগুঁয়েমি যেন আমাদের না হয়।

মেকি বিশ্বাসের (make believe-এর) উপর ভর ক'রে মহৎ কবিতা দাঁড়াতে পারে না এ-কথা রিচার্ডসের অজানা ছিলো না। বহুল দার্শনিক ও মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অবতারণার পর বিজ্ঞান-যুগের সংকট থেকে কবিতাকে উদ্ধার করবার জন্য একটি বিভ্রান্তিকর সূত্র রচনা করতে-করতে এক ফাঁকে উল্‌টো কথাটা ব'লেই ফেললেন আত্মখণ্ডনের চক্ষুলজ্জা ত্যাগ ক'রে, কারণ সেটাই কবিতা সম্বন্ধে খাঁটি কথা, শ্রদ্ধেয় কথা। ট্র্যাজেডিকে আমরা সবাই প্রায় একবাক্যে সাহিত্যের শীর্ষস্থানে বসাই, এবং কে না-জানে যে, ট্র্যাজিক উপলব্ধি সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে যিনি প্রচলিত অর্থে ভগবানে, সর্বশক্তিমান সর্ব-কল্যাণময় বিধাতার অমোঘ নৈতিক বিধানে, এবং প্রধানত নৈতিক বিধান রক্ষা করার জন্যই মানবাত্মার অমরতায়, পরকালে বা জন্মান্তরে, দৃঢ় বিশ্বাসী। অর্থাৎ ট্র্যাজেডির মধ্যে মন-জুড়ানো ধার্মিক মতবিশ্বাসের তথা সর্বপ্রকার ম্যাজিকাল ভিউ-এর শুধু যে স্থান নেই তা নয়, ট্র্যাজিক ভিউ আর ম্যাজিকাল ভিউ পরস্পর-বিরোধী। রিচার্ডস্‌ ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে যে খাঁটি কথাটা ব'লে ফেলেছেন ("Tragedy does not shy away from anything, it does not protect itself with any illusion, it stands uncomforted, unintimidated, alone and self-reliant."), তা অভিজ্ঞান-চিহ্নিত ট্র্যাজেডির পরিসরের মধ্যেই শুধু নয়, মহৎ সাহিত্যমাত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

য়েট্‌স্‌ এবং রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন মেজাজের কবি ব'লে পথ তাঁদের ভিন্ন হবারই কথা। তবু অনেক পথ হেঁটে, অনেক পুরানো পথ হারিয়ে, অনেক নতুন পথ আবিষ্কার ক'রে বা কেটে অবশেষে বার্ধক্যের প্রান্তে

পৌঁছে তাঁরা পাশাপাশি এসে দাঁড়ালেন রিচার্ডস্‌-বর্ণিত এই নির্ভীক, নির্জন, অপ্রবোধ ট্র্যাজিক চেতনায়। "Lapis Lazuli"-তে য়েট্‌স্‌ যে-আত্মশুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তাই অথবা তার খুব কাছাকাছি এক বিষণ্ণ আত্মস্থতা দেখি রবীন্দ্রনাথের বৃদ্ধ বয়সের কবিতায়। 'পরিশেষ' ও তৎপরবর্তী (কখনো-বা ঈষৎ পূর্ববর্তীও) কাব্যে লক্ষ করি সকল মোহাবরণ, সর্বপ্রকার ছলনাজাল তিনি একে-একে ছিন্ন ক'রে দিচ্ছেন, মনকে শক্ত ক'রে কঠিন সত্যকে চিনতে চাইছেন রক্তের অক্ষরে-অক্ষরে। উভয় বৃদ্ধ কবি সম্বন্ধে বলা যায় যা একজন বলেছেন উক্ত কাব্যের শেষ স্তবকে :

There on the mountain and the sky,
On all the tragic scenes they stare,
One asks for mournful melodies ;
Accomplished fingers begin to play.
Their eyes mid many wrinkles, their eyes,
Their ancient, glittering eyes, are gay.

য়েট্‌সের অন্তিম কাব্যেও প্রতিধ্বনিত রবীন্দ্রনাথের উক্তি :

মুক্তাকাশে দেখো চেয়ে প্রলয়ের আনন্দ স্বরূপ।
ওরে শোকাতুর, শেষে
শোকের বুদ্‌বুদ তোর অশোক-সমুদ্রে যাবে ভেসে।

কিন্তু সেটা পরে আলোচ্য। আপাতত ফেরা যাক্‌ আগের প্রসঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করলেন যে-সব কারণে তার মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান উল্লেখযোগ্য নয়। একটি প্রশ্ন প্রথমেই জাগে—তিনি কি আদৌ অনুগত ছিলেন? প্রশ্নটি অমূলক নয়। 'আত্মপরিচয়'-এর ১১৩ পৃষ্ঠায় পড়ি "জন্মকাল হতে আমার যে প্রাণরূপ রচিত হয়ে উঠেছে তার উপরে কোনো জীর্ণ যুগের

শাস্ত্রীয় অবলেপন ঘটে নি।" ব্রাহ্মধর্ম অবশ্য জীর্ণ যুগের উত্তরাধিকারে পাওয়া ধর্ম নয়, তবু তার প্রতিষ্ঠা তো মূলত খ্রীষ্টপূর্ব যুগে রচিত উপনিষদ থেকে সংকলিত শাস্ত্রবচনের উপরেই। কথাটা আরো পরিষ্কার হ'য়ে যায় *The Religion of Man*-এ : "It was though an ideosyncracy of my temperament that I refused to accept any religions teaching merely because people in my surrounding believed it to be true."

আগেই বলেছি যে আধুনিককালের মুক্তবুদ্ধির সঙ্গে ক্রমোন্নত ধর্মবোধের মিতালিতে রবীন্দ্রনাথ আস্থাবান ছিলেন, বুদ্ধি ও বুদ্ধিপ্রসূত জ্ঞানের একাধিপত্য না-মানলেও এমন কোনো ধর্মমত তাঁর পক্ষে শেষ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয় যা বুদ্ধিকে খর্ব বা খণ্ডিত করে। এইখানে য়েট্‌সের কবিদৃষ্টির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টির মৌলিক প্রভেদ।

অথচ রবীন্দ্রনাথের মনে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি উৎসাহ দেখে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সেই তেইশ-চব্বিশ বছরের যুবককে ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের মতো দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেছিলেন। যতদূর জানা যায় ঐ-পদের যাবতীয় কর্তব্য তরুণ সম্পাদক নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন। এমনও হ'তে পারে যে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে নিজেকে নিবিড়ভাবে যুক্ত করতে পেরেছিলেন আবাল্য অভ্যাসবশেই, কিন্তু ক্রমশ বুঝতে পারলেন যে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে—ঈশ্বরসাধনা এবং সর্বপ্রকার ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণের ক্ষেত্রে—পরাশ্রয়তা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। প্রতিভার একটি বড়ো অঙ্গ মৌলিকতা। "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শিল্পসাহিত্যে যেমন ধর্মমতেও তেমনি, যা গোষ্ঠীগত তার মূল্য সামান্যই। প্রকৃতপক্ষে এটা পরস্পর-অনুকরণের সংক্রামকতা ছাড়া আর-কিছু নয়। আমি কেবল একটি মুখোশ প'রে সত্যের জীবন্ত স্বরূপ ঢেকে রেখেছিলাম—বহুদিন ধ'রে এই চেতনার সঙ্গে যুঝে অবশেষে আমার ধর্মসমাজের (church) সঙ্গে আমি

সম্পর্ক ছিন্ন করলাম।"* মোটের উপর রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এলেন কারণ কোনো দলীয় মতবিশ্বাস বা ধর্মসামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে পুরোপুরি এবং আন্তরিক সঙ্গতি রক্ষা ক'রে তাঁর স্বকীয় আত্মবিকাশ সম্ভব ছিলো না।

ধর্ম মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন না-ঘটিয়ে বিচ্ছেদ ঘটাচ্ছে দেখে ব্যথিত হয়েছিলেন রামমোহন রায়। এ-ব্যথা উত্তরাধিকারসূত্রে রবীন্দ্রনাথও পেয়েছিলেন। রামমোহনের মতো একাধারে কারয়িত্রী ও ভাবয়িত্রী প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তির পক্ষে এ-ব্যথা নীরবে বহন করা দুষ্কর ছিলো। কিন্তু তার প্রতিকারকল্পে এক নতুন সর্বজনীন ধর্মমত ও ধর্মানুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা তাঁর অভিপ্রেত ছিলো না। খ্রীষ্টান মুসলমান বৌদ্ধ জৈন পারসী সবাইকে দূরে রেখে কেবল হিন্দু একেশ্বরবাদীদের নিয়ে একটি স্বতন্ত্র ধর্মসমাজ গ'ড়ে তোলার কাজটি সম্পন্ন করলেন তাঁর শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ। রামমোহন খুবই অবহিত ছিলেন কেমন ক'রে পূর্বতন মহাপুরুষেরা—গোতম বুদ্ধ, যীশু খ্রীষ্ট, হজরৎ মুহম্মদ—সর্বজনীন ধর্মপ্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন এবং সেই ব্যর্থতার পরিণামস্বরূপ গ'ড়ে উঠলো কয়েকটি বিবদমান, কখনো-কখনো যুযুধান ধর্মসম্প্রদায়। কাজেকাজেই রামমোহনের সর্বজনীন ধর্মভাবনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হ'লো। তিনি তাঁর বিরাট প্রতিভা ও কর্মশক্তি নিয়ে বৈদিক, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয় ও ইসলামী ধর্মশাস্ত্রে (পরবর্তীকালের প্রক্ষিপ্তি, বিকার ও বিকৃত ব্যাখ্যা থেকে পরিশোধিত ধর্মশাস্ত্রে) এমন একটি অন্তর্বস্তুর অনুসন্ধানে উদ্যোগী হলেন যাকে সর্বধর্মের সারাৎসার বলা যায় এবং যা প্রকৃতই সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর মিলন ও প্রীতির সেতু রচনা করতে পারে। ভারত-পথিক-নির্দেশিত এ-পথ কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পথ নয়।

* Rabindranath Tagore, *The Religion of Man*

ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা, একাকীত্ব ও অনন্যতা তাঁর সমগ্র জীবন ও জীবনদর্শনের পটভূমিকায় মোটামুটিভাবে সত্য। কিন্তু মধ্যজীবনে—প্রায় এক দশক কাল—তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। ঐ-সময়ে 'নৈবেদ্য' রচিত হয় এবং ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হয়। ব্রাহ্ম-সমাজ থেকে বেরিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথ সোজা গিয়ে ঢুকলেন না তাঁর গোপন বিজন হৃদয়কক্ষে, তখনি মশগুল হলেন না সেই মরমিয়া সাধনায় যাতে "তুমি একা আর আমি একা, কঠোর মিলন-মেলা।" প্রবেশ করলেন আরও বৃহত্তর ও প্রাচীনতর সমাজে, হিন্দু সমাজে। শতাব্দীর সন্ধিক্ষণ ও পরবর্তী কয়েকটি বছর ছিলো প্রখর দেশাত্মবোধ, স্বাজাত্যাভিমান এবং স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। স্বদেশপ্রেম যতই প্রবল হ'য়ে উঠলো রবীন্দ্রনাথের মনে, হিন্দুসমাজকে ততই নিবিড়-ভাবে তিনি স্বসমাজ ভাবতে লাগলেন। দুই ভাবের অভ্যুদয় এবং অবক্ষয় মোটামুটি যেন একই বক্ররেখার দ্বারা ছক-কাগজে অঙ্কিত। "সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি" অনুভূতিটি সুন্দর ও শুভ, তবে 'সকল দেশের সেরা আমার দেশ', ভাবখানিতে যে-অহংকার প্রকাশ পায় তা ব্যষ্টি এবং সমষ্টির মনকে খর্ব করে, যেমন খর্ব করে 'সকল সম্প্রদায়ের সেরা আমার সম্প্রদায়' ভাব। তাকেই বলে সাম্প্র-দায়িকতা। দুটোরই উপরে উঠতে না-পারলে রবীন্দ্রনাথ কি রবীন্দ্রনাথ হতেন?

বছর কয়েকের জন্য কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বেশ-একটু সংকীর্ণ অর্থেই 'হিন্দু' হ'য়ে উঠেছিলেন। এই হিন্দুত্বের (নাকি আর্যত্বের?) সবচেয়ে উগ্র প্রকাশ বোধহয় ১৩০৪ সালে লেখা প্রবন্ধ "হিন্দুর ঐক্য"। "... যাহাদের আমরা কিছুতেই খেদাইয়া রাখিতে পারি নাই, আমাদের বেড়া-দেওয়া উদ্যানের মধ্যে যে-সকল আগাছা আপনি আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে তাহারা ক্রমে অনবধান অথবা অভ্যাসের জড়ত্ব-বশত আমাদের সহিত এক হইয়া গিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহারা কী

শরীরসংস্থানে, কী বুদ্ধিবৃত্তিতে আর্যদের স্বশ্রেণীর বা সমকক্ষ নহে। তাহারা সব বিষয়েই নিকৃষ্ট। এই কারণে তাহারা আর্য সভ্যতার বিকার উৎপাদন না করিয়া থাকিতে পারে না। তাহারা যেমন আর্যরক্তের বিশুদ্ধতা নষ্ট করিয়াছে, তেমনি আর্যধর্ম আর্যসমাজকেও বিকৃত করিয়া দিয়াছে।" স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববাসীর সঙ্গে মিলনের পথ তো খুঁজছেনই না, ভারতবাসীর মধ্যেও আর্য-অনার্য বিচ্ছেদের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন নন।

সকলের জানা আছে যে বোলপুরে যখন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বেশ কয়েক বছর পঙক্তিভোজনের ব্যবস্থা ছিলো সেখানে, ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ ছেলেরা কখনো পাশাপাশি ব'সে খেতো না। অন্য-একটি ব্যবস্থা আজকের নীতিবোধে ততোধিক বেদনাদায়ক ঠেকবে। ব্রাহ্মণ ছাত্ররা ব্রাহ্মণ শিক্ষকদেরই কেবল পদধূলি নিতো, অব্রাহ্মণ শিক্ষকদের হাত তুলে নমস্কার করতো। ব্যবস্থাপক অবশ্য আশ্রম-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ক্যাথলিক ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সম্মতি না-থাকলে তো এমন গুরুত্বপূর্ণ রীতি-নীতির প্রচলন সম্ভব ছিলো না সেই আশ্রমে যার 'গুরুদেব' পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ-অধিষ্ঠানও ব্রহ্মবান্ধবের কীর্তি। বলা-বাহুল্য 'গুরুদেব' রবীন্দ্রনাথের সত্যিকার পরিচয় নয়। পরে একাধিকবার তাঁকে প্রতিবাদ করতে হয়েছে, বুঝিয়ে বলতে হয়েছে যে তাঁর সত্য পরিচয় তাঁর কবিতার মধ্যে পাওয়া যাবে; ধর্মশিক্ষা বা নীতিশিক্ষার মধ্যে নয়।

সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে যখন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী'র দ্বিতীয় খণ্ডে পড়ি যে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের এই ভেদনীতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মত কী জিজ্ঞাসা করা হ'লে তিনি এক পত্রে জানালেন: "প্রণাম সম্বন্ধে আপনার মনে যে দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে তাহা উড়াইয়া দিবার নহে।

যাহা হিন্দুসমাজ-বিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবে না; সংহিতায় যেরূপ উপদেশ আছে ছাত্ররা তদনুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগকে পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম ও অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে নমস্কার করিবে এই নিয়ম প্রচলিত করাই বিধেয়।"

জন্মসূত্রে ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের ঐ-সময়কার প্রখর হিন্দুত্বের ছায়া পড়েছে জন্মসূত্রে খ্রীষ্টান গোরার চরিত্রে। আশ্চর্য শিল্পনৈপুণ্যে আঁকা সেই চরিত্র। গোরার হাবভাব কথাবার্তায় হিন্দুত্বের বাড়াবাড়ি আমাদের যতই অসহ্য লাগুক, আমরা তাকে শ্রদ্ধা না-ক'রে পারি না। দেশপ্রেমে এমন সমুজ্জ্বল, এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন উন্নতশির মানুষ জীবনে যেমন বিরল, উপন্যাসেও তেমনি। সে ব্রাহ্মণ-সন্তান নয়, নিহত আইরিশ দম্পতির শিশুসন্তান, ব্রাহ্মণ ঘরে আশ্রিত ও পালিত মাত্র—এই কথা মৃত্যুশয্যায় শায়িত তার পালক-পিতার মুখে শোনার প্রচণ্ড আঘাতে গোরার হিন্দুত্ব যখন ভেঙে খানখান হ'য়ে গেলো তখন বুঝতে পারি ভাঙবার জন্যই এই প্রাণোদ্দীপ্ত মূর্তিটি গড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর নিজের হিন্দুত্বের গণ্ডি ভাঙলো অবশ্য অন্তরেরই প্রসারে। শেষ অধ্যায়ে শুনি গোরার মুখে রবীন্দ্রনাথই যেন বলছেন তিনি ব্রাহ্ম হিন্দু সকল বদ্ধ জলাশয় থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন ভারত মহাসাগরের তীরে—"আমি দিনরাত্রি যা হতে চাচ্ছিলুম কিন্তু হতে পারছিলুম না, আজ আমি তাই হয়েছি। আমি আজ ভারতবর্ষীয় ··· আপনি আমাকে সেই দেবতার মন্ত্র দিন যিনি হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম, সকলেরই; যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।" উপন্যাসের এবং উপন্যাসের নায়ক গোরার এইখানে সমাপ্তি। কিন্তু 'গোরা'র স্রষ্টার সন্ধান এগিয়ে চললো; আরো কয়েক বছর পরে দেখা যাবে তিনি সমস্ত পৃথিবীর সকল মানুষের দেবতার মন্দির-দ্বারে এসে পৌঁছেছেন। সেখানেও মানসযাত্রার শেষ নেই। দেবতাও যে পান্থ তাঁকে খোঁজা শেষ হবে কেমন ক'রে।

"ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা" শীর্ষক ভাষণে পড়ি: "বিশ্বমানবের উত্তরোত্তর সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে বর্তমান যুগে ভারতবর্ষের সাধনাই সকল সমস্যার, সকল জটিলতার সমাধান করে দেবে—এই একটা আশা ও আকাঙ্ক্ষা বিশ্বমানবের বিচিত্র কণ্ঠে আজ ফুটে উঠেছে।" রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিকে সহজ অর্থে ধরলে অতিশয়োক্তি কিংবা স্বদেশাভিমানের উগ্র প্রকাশ মনে হ'তে পারে। কিন্তু আসলে এমনতর প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষা বিশ্বমানবের মনে না-জাগলেও রবীন্দ্রনাথের মনে জেগেছিলো। এত বড়ো অভিলাষকে বাস্তবায়িত করবার অপরিহার্য শর্তরূপে আর-একটি আকাঙ্ক্ষাও তাঁর মনে জাগলো। সেটি এই যে ভারতবর্ষের চিরাগত সাধনায় লব্ধ মূল আধ্যাত্মিক সত্যটিকে নতুন সাঁচে ঢালাই করতে হবে যাতে বিশ্বজনের কাছে তা সহজেই গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে।

১৩১৭ ও ১৩১৮ সালে যে দুটি প্রবন্ধ-সংকলন প্রকাশিত হয় ('সঞ্চয়' ও 'পরিচয়') তাতে রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তায় অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। তিনি এখন আর বৈদিক যুগের বিশুদ্ধ আর্যভাবের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে ভারতবর্ষের সকল সমস্যার সমাধান ব'লে মনে করছেন না—যেমন করেছিলেন "হিন্দুর ঐক্য" প্রবন্ধে। প্রথমত, শুধু ভারতবর্ষের কথা এখন ভাবছেন না তিনি, ভাবছেন সমগ্র পৃথিবীর সমস্যার কথা। দ্বিতীয়ত, ধর্মের সনাতনত্বের উপর আর জোর দিচ্ছেন না: জোর দিচ্ছেন ধর্মভাবনা ও ধর্ম-এষণার ক্রমবিবর্তনের উপর: "ধর্মমত জড়পদার্থ নহে, মানুষের বিদ্যা-বুদ্ধির অবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বিকাশ আছে।" তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত প্রবন্ধ "ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা"তে দেখিয়েছেন যে অন্তত খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীগুলিতে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়েরা ভারতীয় ইতিহাসে দুই বিপরীত ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন; ক্ষত্রিয়েরা প্রবহমান কালের ও পরিবর্তমান সামাজিক অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে ধর্মসাধনায় ধর্মভাবনায় ধর্মাচরণে নানারূপ মৌলিক পরিবর্তন আনবার

চেষ্টা করেছেন, মোটের উপর তাঁরা গঠন করেছিলেন দেশের প্রগতিশীল ও প্রসারণশীল শক্তি। পক্ষান্তরে, ব্রাহ্মণরা ছিলেন এস্ট্যাব্লিশমেণ্টের ধারক ও বাহক, তাঁদের মনে সব সময় ভয় ছিলো পাছে রাজ-দার্শনিক ও রাজর্ষিরা এমন ভুঁইফোড় কিছু ক'রে বসেন যাতে প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিকের সম্পর্ক ছিন্ন হ'য়ে যায়; তাই তাঁরা প্রাচীন মত ও পথের রক্ষক হ'য়ে দাঁড়ালেন, তাঁরা গঠন করলেন সমাজের রক্ষণশীল ও সংকোচনশীল শক্তি। আমাদের বুঝতে বিলম্ব হয় না যে রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক সহানুভূতি ও সমর্থন প্রগতিশীল ক্ষত্রিয় রাজাদের দিকেই। পরে খ্রীষ্ট-পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে, যখন ক্ষাত্রশক্তি নিরুদ্যম হ'য়ে গেলো রাজকার্যের ঊর্ধ্বস্থ সকল ক্ষেত্রে (কী কারণে, রবীন্দ্রনাথ তা বিশ্লেষণ ক'রে দেখাননি) এবং ব্রাহ্মণদের আধিপত্য একছত্র হ'লো, তখন ধর্মনীতি ও ধর্মসমাজের এই ব্রাহ্মণ প্রহরীরা সমাজকে অনম্য বিধানের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে এমন অনড় অসাড় মৃতবৎ ক'রে ফেললেন যে হিন্দুসমাজকে তথা সমগ্র দেশবাসীকে পুনরুজ্জীবনের জন্য অপেক্ষা করতে হ'লো ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাম-মোহন রায়ের আবির্ভাব পর্যন্ত। ইসলামিক মরমিয়া সাধনার ও সামাজিক ভাবধারার অভিঘাতে হিন্দুসমাজ খানিকটা ন'ড়ে উঠেছিলো, তার ফলে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়াশীলতা দুই-ই দেখা দিলো। তবে সেটা স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়।

নবযুগের মন্ত্রদাতা রামমোহন কিন্তু ধর্মভাবনায় কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রবর্তক ছিলেন না। এক অর্থে অবশ্য ছিলেন। তখনকার দিনে এমন কথা বলা যে, সব ধর্ম মূলত এক, এবং ধর্মের কাজ সম্প্রদায় গঠন ক'রে মানুষে-মানুষে বিভেদ, বিবাদ ও সংঘর্ষের বিষাক্ত বাতাবরণ সৃষ্টি করা নয়, ধর্মের সার্থকতা সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সারা দুনিয়ার মানুষকে মানবজীবনের সর্বোচ্চ স্তরে মেলানো—একটা বিপ্লব বটে। আমি অন্যদিক থেকে ভাবছি। রামমোহন উপলব্ধি করলেন সত্যধর্মের

মূলকথা হচ্ছে বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্ববিধাতা এক পরম শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করা, এবং কর্মক্ষেত্রে স্বার্থত্যাগ ক'রে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষের উপকারের জন্য সচেষ্ট হওয়া। তাছাড়া তিনি ঘোষণা করলেন যে এটাই সব ঐতিহাসিক ধর্মের মূলকথা। ঘোষণা ক'রেই লক্ষ করলেন কোটি-কোটি খ্রীষ্টান তো এক নয়, তিন ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, এবং কোটি-কোটি হিন্দু বিষ্ণু শিব দুর্গা কালী ইত্যাদি বহু দেবতায় বিশ্বাস করেন, উপরন্তু তাঁদের মূর্তি গ'ড়ে সেইসব মূর্তিরই পূজা করেন। সুতরাং তিনি প্রাচীন আর্যশাস্ত্র অনুসন্ধান ক'রে প্রমাণ করতে ব্যস্ত হলেন যে প্রাচীনকালের মুনি-ঋষিরাও একেশ্বরবাদী ছিলেন; গ্রীক ও হিব্রু ভাষা শিখে তাঁর খ্রীষ্টান বন্ধু ও পাঠকদের জানালেন যে ঐ-সব ভাষায় লিখিত আদি খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে এক ঈশ্বরের সত্যই বিঘোষিত হয়েছিলো, তিন ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা পরবর্তীকালের মতবিকার। চললো পণ্ডিত এবং পাদ্রিদের সঙ্গে বাদানুবাদ।

একটি বিতর্ক কিন্তু রামমোহন এড়িয়ে গেলেন। তিনি ভুলে গেলেন যে এ-দেশে গৌতম বুদ্ধ ঈশ্বরের প্রসঙ্গ বাদ দিয়েছিলেন তাঁর ধর্মশিক্ষা থেকে। স্বয়ং বুদ্ধকে ঈশ্বর-জ্ঞানে পূজা করা আরো পরের ব্যাপার, এবং এটাকেই এ-ক্ষেত্রে মতবিকার বলা যেতে পারে। সাংখ্যকাররাও ছিলেন অনীশ্বরবাদী। দ্বিতীয়ত, রামমোহন খোঁজ নিলেন না যে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট য়োরোপীয় চিন্তানায়ক ও দার্শনিকরা— হিউম্ ও ভলতের তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য—বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্ববিধাতা পরম শক্তিমান পরম কল্যাণস্বরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেননি। কেন পারেননি সে-বিষয়ে আরো-একটু অবহিত থাকলে রামমোহনের ঈশ্বরভাবনা ভিন্ন রূপ ধারণ করতো, যেমন করেছিলো রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে।

শাস্ত্র ঘেঁটে এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা এবং ভিন্ন শাস্ত্রাবলম্বীদের সঙ্গে তাই নিয়ে বাদানুবাদ করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অসম্ভব

ছিলো, তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর যুগ উভয়ই ছিলো প্রতিকূল। রবীন্দ্র-জীবনীকার বলছেন হিন্দুধর্মকে বিশ্বজনীন রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ তার যে-ব্যাখ্যা দিলেন "তাহা কি সনাতনী কি অর্বাচীন হিন্দু কেহই স্বীকার করিতে পারেন নাই।" পরে বিদেশে গিয়েও তিনি সে-ব্যাখ্যার কাঠামোয় রচিত অনেক সারগর্ভ অথচ সুললিত বাণী শোনালেন, কিন্তু একইভাবে নিরাশ হলেন। ঐ-সময়ে প্রবক্তা রবীন্দ্র-নাথের কোল ঘেঁষে দেখা দিলেন মিস্টিক রবীন্দ্রনাথ। এই রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ গদ্যে (নিবন্ধে বা ভাষণে) নগণ্য, কিন্তু পদ্যে ও গানে অতুল-নীয়। মরমীয়া সাধনার কাব্যরূপ দেশ-বিদেশের অসংখ্য রসিকচিত্ত সানন্দে স্বীকার করলো, কিন্তু তার ধর্মরূপ ক'জনের কাছে পৌঁছলো ? পৌঁছবার কথাও নয়। "এ যে আমার লজ্জাবতী লতা"রূপে যে অপূর্ব 'ঈশ্বরানুভূতি ধীরে-ধীরে মঞ্জরিত হ'য়ে উঠেছিলো, শীতের হাওয়া লেগে তার শুকিয়ে যাওয়ার কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি।

অবশেষে রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনা বহু নদনদী ঘুরে, বহু ঝড়ঝঞ্ঝা উত্তীর্ণ হ'য়ে গিয়ে ঠেকলো সেই পশ্চিম তীরে যার নাম দিয়েছেন তিনি 'মানুষের ধর্ম', 'The Religion of Man'। নামের নেতি-বাচক অর্থটা লক্ষণীয়—মানুষের ধর্ম অর্থাৎ কিনা যা গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, জাতি বা দেশ-বিশেষের ধর্ম নয়। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের কোনো-কোনো শ্লোকের হিউম্যানিস্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন, বিশেষভাবে ঋণ স্বীকার করেছেন বাউল গীতরচয়িতাদের কাছে। কিন্তু এ-ধর্মভাবনা প্রধানত ঊনবিংশ শতাব্দীর পশ্চিম য়োরোপীয় নাস্তিক মনীষীদের অবদান। তাঁরা বললেন—পরম মূল্যের সন্ধান আমরা ইহলোক ও ইহজীবনের বাইরে করবো না, কারণ পরলোকে বা মানবোত্তীর্ণ কোনো আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাস করার মতো নির্ভরযোগ্য যুক্তি আমরা

খুঁজে পাই না ; মানুষের মূল্যের প্রতিমানেই আর সব-কিছুর মূল্য পরিমেয়।

এই 'রিলিজন অফ ম্যান' পর্যায়ে এসে রবীন্দ্রনাথ অবতীর্ণ হলেন সেই তর্কে যা রামমোহন এড়িয়ে গিয়েছিলেন। মনে হয় নাস্তিকদেরই, বিশেষত পশ্চিমী নাস্তিকদেরই, সম্বোধন ক'রে বলছেন : তোমরা যদি সৃষ্টির স্রষ্টা, জাগতিক ও নৈতিক বিধানের বিধাতা কোনো পরম সত্তা মেনে নিতে না-পারো তবে নাই মানলে। তবু তো তোমরা মানো যে মানবজীবন প্রাণধারণের গ্লানিকর চেষ্টায় বা শরীরসুখ, বিষয়সুখ, প্রতাপসুখ জাতীয় সব তুচ্ছ সুখের পিছনে ছোটাতে পরিসমাপ্ত নয়। মানো যে মানবজীবন তার অর্থ খুঁজে পায় পূর্ণমানব হ'য়ে ওঠার অক্লান্ত অনির্বাণ সাধনায়। পূর্ণমানব বলতে কী বোঝায় সেটা অবশ্য আমাদের সকলের নিরবধি অন্বেষণের বিষয়। মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ কী তা নিয়ে যুগে-যুগে জাতিতে-জাতিতে এমন-কি ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে মতভেদ থাকতে পারে। আমার মনের গভীরে পূর্ণমানবের যে-ভাবচ্ছবি রয়েছে তাকেই আমি ভগবান বলি, তোমার মনের ভাবচ্ছবিকে ভগবান বলতে তোমার কোথাও বাধবে কেন? প্রশ্ন করতে পারো—একি কেবলই ছবি ? তা নয়। আমাদের জীব-ধর্ম আমাদের জন্য যে-কক্ষপথ নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছে তার বাইরে যখনই আমরা পা বাড়াই ("মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা") তখনই আমরা অনুভব করি পরম মানবিক সত্তা যেন আমাদের টানছে।

রবীন্দ্রনাথ যে-সব ধর্মভাবনার ভিতর দিয়ে তাঁর সাধনার পথ কেটে এগিয়েছেন, তাতে ইতিপূর্বে কোথাও তিনি আধুনিক বিজ্ঞানের অভিঘাত খুব একটা অনুভব করেননি। ব্রাহ্মধর্মে নয়, হিন্দুধর্মে নয়, 'গীতাঞ্জলি'র প্রেমধর্মে নয় ; এই 'মানুষের ধর্ম' পর্বে এসেই বৈজ্ঞানিক চিন্তার সঙ্গে তাঁর ধর্মচিন্তার সংঘাত বাধলো। য়েট্‌সের বাল্যকালের

খ্রীষ্টধর্ম কেড়ে নিয়েছিলেন তখনকার বৈজ্ঞানিকরা; রবীন্দ্রনাথ তাঁর সত্তর বছর বয়সের হিউম্যানিস্ট ধর্মবিশ্বাস প্রায় হারাতে বসলেন নববিজ্ঞানীদের আঁকা বা উদ্‌ঘাটন-করা অমানুষী বিশ্বছবি দেখে। "অমানুষী" শব্দটা এখানে আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করছি—অর্থাৎ এমন ছবি যাতে মানুষের ও মানবিক মূল্যের কোনো বিশেষ মর্যাদা স্বীকৃত নয়, সুরক্ষিত তো নয়ই।

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

হিউম্যানিজম্-এর সংজ্ঞা হিসাবে কি এই ঘোষণাটি ব্যবহার করা যায়? কিন্তু যিনি ভগবানে বিশ্বাস করেন তিনি তো বলতে পারবেন না—ভগবানের উপরে মানুষ সত্য। উপনিষদকাররা উল্‌টো কথাই ঘোষণা করেছিলেন সকল মর্ত্যলোকবাসী এবং দিব্যধামবাসীগণকেও সম্বোধন ক'রে—সবার উপরে ব্রহ্ম সত্য, সা কাষ্ঠা, সা পরাগতি। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রের মন এতে সায় দেবে। তাঁরা কি তবে কেউ হিউম্যানিস্ট ব'লে স্বীকৃতি লাভ করতে পারেন না?

রেনেসাঁস যুগে যখন হিউম্যানিস্ট ভাবধারা সবচেয়ে সোচ্চার হ'য়ে উঠলো তখনকার প্রথম হিউম্যানিস্ট পেত্রার্কা, এবং সবচেয়ে প্রতিপত্তি-শালী হিউম্যানিস্ট এরাসমাস। এঁরা দু-জনেই ভগবানে বিশ্বাস করতেন। তাঁদের কাছে ভগবানও সত্য, মানুষও সত্য, কে বেশি সত্য সে-কথা ভাববার প্রয়োজন তাঁরা বোধ করেননি। মানুষের ব্যক্তিসত্তা এবং ঐহিক জীবনের সত্যমূল্য সকলের চোখে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তাঁরা, কারণ এই মহৎ সত্যটা চাপা পড়েছিলো মধ্যযুগের চার্চশাসিত অনুষ্ঠান-ভিত্তিক রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মের জগদ্দল পাথরের তলায়। গান্ধীজী প্রথম যৌবন থেকে মৃত্যুদিন পর্যন্ত মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, সে-উৎসর্গের তুলনা মেলা ভার। তিনি হিউম্যানিস্টদের মধ্যে সেরা হিউম্যানিস্ট ব'লে গণ্য হ'তে পারেন সঙ্গতভাবেই। অথচ তিনি নিশ্চয়ই বলতে রাজী হতেন না যে, ভগবানের উপরে মানুষ

সত্য। যা বলতেন তা অনুমান করা শক্ত নয়। ভগবান তো তোমার সেবার অপেক্ষা রাখেন না, তাঁর কী সেবা করবে তুমি ? ঠাকুরের ভোগ রান্না ক'রে এবং ঐ-জাতীয় অন্যান্য ধর্মকর্ম ক'রে সময় নষ্ট কোরো না। চেয়ে দেখো চারিদিকে কত অসংখ্য মানুষ কী অবর্ণনীয় দুঃখে কষ্টে দিনাতিপাত করছে। এসো আমার সঙ্গে, তাদের সেবায় আমরা জীবন-দান করি, ব্রতধারণ করি যে প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রত্যেকটি অশ্রু-বিন্দু মুছবো আমরা। মানুষই ভগবানের সর্বোত্তম সৃষ্টি, সর্বপ্রিয় সৃষ্টি। মানুষের সেবা করলেই ভগবানের সেবা করা হবে।

রেনেসাঁস হিউম্যানিস্টদের যে-অর্থে হিউম্যানিস্ট বলা হয় সে-অর্থে রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই হিউম্যানিস্ট ছিলেন—'প্রভাত সঙ্গীত' থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত, এমনকি 'গীতাঞ্জলি' পর্বে যখন তিনি মানুষ থেকে বেশ খানিকটা দূরে স'রে গিয়ে নিজেকে ঈশ্বর-ভাবে বিভোর ক'রে তুলে-ছিলেন, তখনও। 'খেয়া'র "অনাবশ্যক" শীর্ষক অতি সুন্দর কবিতাটিতে তিনি গান্ধীর পূর্বোক্ত কথাটাই বলেছেন কাব্যের তির্যক ভাষায়—তোমার প্রদীপ ঈশ্বরের পূজার জন্য নিয়ে যাচ্ছ বৃথাই, সেখানে তো চন্দ্র-সূর্য-তারকার লক্ষপ্রদীপ সর্বক্ষণই জ্বলছে ; যে দুঃখী মানুষের ঘরে আলো জ্বলেনি তার ঘরের অন্ধকার তোমার প্রদীপের আলোয় দূর করো।

এই জীবনব্যাপী ব্যাপকতর অর্থবাহী হিউম্যানিজম্-এর পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-অনুভূতি ও ধর্মচিন্তা একটি বিশেষ রূপ গ্রহণ করে-ছিলো 'মানুষের ধর্ম' ও *The Religion of Man* নামক বক্তৃতা-মালায় ; সেটাই আমার আলোচ্য এখানে। এই বক্তৃতাগুলিতে এবং সমসাময়িক কোনো-কোনো কবিতাতে তিনি মানুষকেই ঈশ্বররূপে ধ্যা[illegible]রতে চান, বলছেন—মানুষের বাইরে মানুষকে ছাড়িয়ে যদি ঈশ্বরের কথা ব'লে থাকেন কেউ, তবে আমার কাছে তার কোনো অর্থ নেই। এ কোন্ মানুষ ? নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষ নয়, নিশ্চয়ই

চোরজোচ্চোর খুনে নারীধর্ষণকারী অত্যাচারী মানুষ নয়। তাদেরকে পূজনীয় জ্ঞান করা দূরের কথা, যে-মহাপুরুষেরা ব'লে গেছেন এদেরও ক্ষমা করো ভালোবাসো, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের ফিরিয়ে দিচ্ছেন ব্যর্থ নমস্কারে। পক্ষান্তরে, মহাপুরুষের পূজায় তাঁর মন ওঠেনি কোনোদিন; অবতারবাদে তাঁর সায় ছিলো না। গৌতম বুদ্ধ ও যীশু খ্রীষ্টকে তিনি শ্রেষ্ঠ মানুষ বলেছেন, দেবতা জ্ঞান করেননি কখনও। অথচ হিবার্ট লেকচারের আরম্ভে ঘোষণা করলেন—আমার বক্তৃতার বিষয় "Humanity of God"। কী অর্থে?

মানুষের সত্তায় দ্বৈধ আছে—বলছেন রবীন্দ্রনাথ। একদিকে সে প্রকৃতির সন্তান, প্রকৃতির কোলে জন্ম নেয়, লালিত-পালিত হয়, প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা চালিত; বস্তুতপক্ষে সে-নিয়মাবলি সরাসরি লঙ্ঘন করার ক্ষমতা তার নেই। জড়বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত যাবতীয় নিয়ম জীবজগতেও খাটে; জীববিজ্ঞান ফিজিকো-কেমিক্যাল নিয়ম রদ করে না, তারই উপর নিজের ভিত্তিস্থাপনা করে। একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবের দেহ যে-কোনো জড়পিণ্ডের চেয়ে অনেক বেশি জটিল; তার গতিবিধির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও সেই পরিমাণে জটিলতর হবে। কিন্তু অসম্ভব নয়। কোনো বিজ্ঞানী সন্দেহ করেন না যে বাইঅলজি একদিন—অদূর ভবিষ্যতে একদিন—ফিজিক্স-কেমিস্ট্রির শাখা হ'য়ে দাঁড়াবে। তবু একটি বিড়াল ঘরে ঢুকলে সে কোনদিক দিয়ে কোন চেয়ারে আসন গ্রহণ করবে সেটুকু বলার সাধ্য নেই কোনো জীববিজ্ঞানীর। ঘরের কোণে এক টুকরো মাছ প'ড়ে থাকলে বিড়ালটি যে সোজা ঐ-দিকে যাবে এ-কথা আমরা অবিজ্ঞানীরাও বলতে পারি। কিন্তু মাঝপথে যদি সে তার ছানার চীৎকার শুনতে পায় তবে কি থমকে দাঁড়াবে, ফিরে আসবে ছানার কাছে, না কি সে ডাক অগ্রাহ্য ক'রে মাছের দিকেই এগুবে—বলা কি সম্ভব হবে কোনোদিন? বিজ্ঞানী অবশ্য আশা ছাড়বেন না; বলবেন বিড়ালটির মস্তিষ্ক ও

যাবতীয় স্নায়ুতন্ত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করার উপযুক্ত ইলেক্‌ট্রনিক যন্ত্রপাতি যে-দিন আবিষ্কৃত হবে সেইদিন থেকে বিড়ালটির সম্ভাব্য গতিবিধির রেখাচিত্র আমরা মোটামুটি আঁচ ক'রে নিতে পারবো।

কিন্তু মানুষের বেলা কি তা কোনোদিন সম্ভব হবে? কোনো দেহাত্মবাদী মনস্তাত্ত্বিক (অথবা দেহতাত্ত্বিক) কি একজন মহাকবির স্নায়ুতন্ত্র ও তাঁর পরিপার্শ্ব বিষয়ে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ ক'রে ভবিষ্যৎ-বাণী করতে পারবেন উক্ত কবির পরবর্তী কবিতা বা নাটক কী রূপ ধারণ করবে, কী ভাব ব্যক্ত করবে? অবশ্য আমাদের মিটিয়রলজিস্টরা আবহাওয়ারই ঠিকমত পূর্বাভাস দিতে পারেন না এখনও; তবুও আবহাওয়াতত্ত্বের প্রগতি থেকে অনুমান করা যায় যে বছর দশেকের মধ্যে নির্ভরযোগ্য ফোরকাস্ট আমরা পাবো। কিন্তু দশ হাজার বছর পরেও মানুষের আচার-আচরণের সঠিক পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হবে, এ-কল্পনা অলীক ঠেকে। মানুষের বেলা সব-কিছুর জটিলতা যে পর্বত-প্রমাণ, শুধু তা-ই নয়; সে-বাধা দুর্লঙ্ঘ্য, কিন্তু অলঙ্ঘনীয় নয়। একটা নীতিগত বাধাও আছে।

মানুষের চালচলন প্রাকৃতিক কার্যকারণ-শৃঙ্খলার দ্বারা নিরূপিত, অন্তত তার বহির্ভূত নয়। বলা যেতে পারে তাকে যেন পিছন থেকে ঠেলে কোনো ভৌতিক বিজ্ঞানগম্য শক্তি চালনা করছে—মোটের উপর প্রাণধারণের দিকেই। অবশ্য মধ্যবয়স পার হ'য়ে গেলে এই শক্তির ধাক্কাই তাকে জরার খানায় ফেলবে এবং ক্রমশ বেশ দ্রুত গতিতে ঠেলে নিয়ে যাবে মৃত্যুগহ্বরে নিক্ষেপ করার জন্য। এই হ'লো মানুষের ভাগ্য, বিশ্বজাগতিক পটভূমিকায় মানবিক পরিস্থিতি। কিন্তু শুধু এটাই মানুষ সম্বন্ধে সব কথা নয়, শেষ কথা তো নয়ই। হ'লে মানুষে কুকুরে ভেদ থাকতো না। কুকুরের স্বভাবে দ্বৈধ নেই, যেমন আছে মানুষের স্বভাবে।

মানুষ সম্বন্ধে অন্য কথা এবং বড়ো কথা হচ্ছে এই যে তাকে

সামনের দিক থেকেও সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকার আর-এক শক্তি টানছে। টানা-পোড়েন নয়, টানা এবং ঠেলার লীলাক্ষেত্র হচ্ছে মানুষের দেহমনোভূমি। মাধ্যাকর্ষণ বা চুম্বকাকর্ষণের মতো অমোঘ নয় এ-টান; তবু অবিসন্দিগ্ধ। ন্যূনাধিক আমরা সবাই এ-আকর্ষণ অনুভব করি, অল্পবিস্তর আমরা সবাই তাতে সাড়া দিই। কিন্তু কোনো জবরদস্তি, কোনো বাধ্যবাধকতা নেই এই অতিপ্রাকৃত বা আধ্যাত্মিক শক্তির আকর্ষণে। আমরা স্বেচ্ছায় তাকে বরণ করি, কিংবা স্বেচ্ছায় তাকে এড়িয়ে চলি। সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে যে-জন সে পশুতুল্য, অনেকখানি মেনে চলে যে-জন তাকে বলি মহাপুরুষ; সম্পূর্ণ মেনে চলতে পারে না কেউ, পারলে সে হ'তো অবতার বা সাক্ষাৎ ভগবান। খ্রীষ্টীয় এবং হিন্দুশাস্ত্রে অবতার-বাদের স্থান আছে, রবীন্দ্রশাস্ত্রে নেই।

কী এই শক্তি? কেবলমাত্র প্রাণধারণ ও বংশবৃদ্ধিতে মানুষের তৃপ্তি নেই, সে উঠবে আরো উপরে, হবে আরো বড়ো, আরো পূর্ণ। প্রকৃতি তাকে এই আরো বড়োর দিকে ঠেলে দিতে পারে না, কিংবা বড়োজোর হাজার-হাজার বংশ পরম্পরায় যে-সব সূক্ষ্ম শারীরিক পরিবর্তন দৈবাৎ ঘ'টে যায় (chance mutation) এবং তারই ফলে যেটুকু বিবর্তন—মানসিক বিবর্তনও—সম্ভব যোগ্যতমের উদ্বর্তন নিয়মানুযায়ী, সেইটুকু উন্নতিসাধন করা প্রকৃতির কাজ। কিন্তু মানুষ যুগ-যুগ ধ'রে অপেক্ষা ক'রে থাকতে রাজী নয়। পরিপূর্ণতার, পরোৎ-কর্ষের বা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় পরম মানবের যে-আদর্শ সে হৃদয়ে ধারণ করে, সেই আদর্শের অনুপ্রেরণায় (তাড়নায় নয়) সে আরো দ্রুত এগিয়েছে, আরো অনেক দূর দ্রুততর গতিতে এগুবে। "এই যে অনিশ্চিতের মধ্যে, অনাগতের মধ্যে তার চিরনিশ্চিতের সন্ধান অক্লান্ত—তারই সংকটসংকুল পথে মানুষ বার বার বাধা পেয়ে ব্যর্থ হয়েও যাত্রা বন্ধ করতে পারলে না। এই অধ্যবসায়কে বলা যেতে পারত পাগলামি, কিন্তু মানুষ তাকেই বলেছে মহত্ত্ব। এই

মহত্ত্বের আশ্রয় কোথায়। অলক্ষ্য একটি পরিপূর্ণতার দিকে মানুষের মনের আকর্ষণ দেখতে পাই; অন্ধকার ঘরের গাছে, তার শাখায় প্রশাখায়, যেমন একটা স্বাভাবিক ব্যাকুলতা প্রাচীরের ওপারের আলোকের দিকে। আলোক যেমন সত্য, পূর্ণের আকর্ষণ নিয়ত যেখান থেকে প্রেরিত সেও যদি তেমনি সত্য না হত তাহলে জীবিকার প্রয়োজনের বাইরে আত্মার উৎকর্ষের জন্যে মানুষ যা কিছু চিন্তা করে, কর্ম করে, তার কোনো অর্থই থাকে না। এই সত্যকে ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করি আমাদের আদর্শে।"

দুটো প্রশ্ন ওঠে। এই 'সত্য' যাকে রবীন্দ্রনাথ চিরমানব, পূর্ণ পুরুষ, মনুষ্যত্বের আদর্শ, ইত্যাদি আখ্যা দিয়েছেন, কেমনতর সত্য (real)? স্পষ্টতই. তা চন্দ্র-সূর্যের মতো প্রত্যক্ষ বা ইলেক্‌ট্রন-প্রোটনের মতো বৈজ্ঞানিক প্রমাণে সিদ্ধ সত্য নয়। মানুষ না-থাকলেও চন্দ্র সূর্য থাকতো, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারা নির্ধারিত হ'তো তাদের গতিপথ। কিন্তু মানুষ না-জন্মালেও মনুষ্যত্বের আদর্শ (পূর্ণ পুরুষ) থাকতো বলার কোনো মানে হয় না। উপনিষদের ব্রহ্ম কিংবা খ্রীষ্টান কি মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের ঈশ্বর সৃষ্টি-সাপেক্ষ নন, জগৎ-সৃষ্টি না-হ'লেও তাঁর পূর্ণতার কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হ'তো না। প্রতিতুলনায় 'মানুষের ধর্ম'-এ রবীন্দ্রনাথ যে-ঈশ্বরভাবনায় উপনীত হয়েছেন সে-ঈশ্বর মানুষের হৃদয়েই আসীন। এই আসনটি রচিত না-হ'লে তাঁর সত্তা কোনো প্রমাণেই সিদ্ধ হয় না। মানুষের হৃদয়ে ভাবনায় ও কর্ম-উদ্যোগে তিনি যতখানি অভিব্যক্ত ততখানিই সত্য, মানব-নিরপেক্ষ সত্য নন।

রবীন্দ্রনাথ আরও বলতে চান যে এই পরিপূর্ণতার বা পরোৎকর্ষের আদর্শ বিষয়ে মানুষের বোধ যুগে-যুগে বদলেছে, ক্রমশ উন্নততর হয়েছে। আর-সব বিষয়ে যেমন "পূজার বিষয় কল্পনায়"ও মানুষের ভ্রম ঘটেছে বার-বার, বার-বার তা সংশোধিত ও শুদ্ধ হয়েছে: "এই ভ্রমের বিচার মানুষেরই শ্রেয়োবুদ্ধি থেকেই, মানুষের দেবতার বিচার

মানুষেরই পূর্ণতার আদর্শ থেকে।" তাই ব'লে যাঁকে আমরা পূজো করবো, যাঁর ডাকে সাড়া দেবো তাঁকে আমরা খেয়ালখুশি মতো তৈরী করেছি—এমন কথা ভাবা যায় না; ভাবলে পূজা আর পূজা থাকে না, কর্মের উদ্দীপনাও নষ্ট হ'য়ে যায়। কোন্ দেবতাকে হবিঃ দান করবো—এ-প্রশ্ন বৈদিক যুগ থেকে অদ্যাবধি আমাদের সবাইকে ব্যাকুল করেছে, কিন্তু যে-দেবতাকেই আমরা বরণ করি, পারি না ব'লেই করি। ব্লাউজের ডিজাইন বা মোটর গাড়ির রং পছন্দ করবার মতো সৌখীন ব্যাপার নয় ধর্মসাধনা, একটা বাধ্যকতা এবং বাধ্যকতাবোধ আছে তাতে।

বাধ্যকতা আছে বিচারে, কর্মে নয়। শ্রেয়ের পথ কোন্ দিকে নির্দিষ্ট জেনেও আমরা হেয় কর্ম করতে পারি; কিন্তু নারীধর্ষণ বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিককে হত্যা ক'রে নিজের পথ পরিষ্কার করাকে ইচ্ছা-মতো শ্রেয় জ্ঞান করতে পারি না। এককালে দেবতা ছিলেন পরম ভয়ের পাত্র; সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে তিনি হয়েছেন পরম শ্রদ্ধা ও প্রেমের পাত্র। রবীন্দ্রনাথ আরও তর্ক তুলেছেন যে বিজ্ঞানও তো যুগে-যুগে ভুল করে এবং ভুল শোধরায়, তাতে ক'রে বৈজ্ঞানিক সত্য তো মনগড়া কাহিনী হ'য়ে যায় না। বিজ্ঞানের সত্য আর ধর্মের সত্য ভিন্নপ্রকার, ভিন্ন তাদের উপলব্ধি ও সিদ্ধি। কিন্তু কোনোটাই খেয়ালের ব্যাপার নয়।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হ'লো: "তারই সংকটসংকুল পথে মানুষ বার বার বাধা পেয়ে ব্যর্থ হয়েও যাত্রা বন্ধ করতে পারল না।" যে-মানুষ পরম মানুষের ডাক শুনেছে সে যাত্রা বন্ধ করতে পারবে না। বোঝা গেলো, এতটা আকর্ষণশক্তি পরম মানবের আছে।

শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর-পানে

ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপখানি।

কিন্তু বাধা ব্যর্থতা সংকট আসে কোথা থেকে? মানুষই কি মানবিক পরিপূর্ণতার পথের সন্ধান পেয়েও কোনো উল্‌টো বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হ'য়ে নিজের পূর্ণ বিকাশের পথকে নিজেই সংকটসংকুল ক'রে তুলেছে?

"মানুষের সত্তায় দ্বৈধ আছে," ঠিক কথা; কিন্তু এ-দ্বৈধের উৎসমূল কোথায়? একদিকে সে পরম মানবিক সত্তা অর্থাৎ ঈশ্বরের দ্বারা আকৃষ্ট; অন্যদিকে সে পরম জাগতিক সত্তার নিয়মজালে বদ্ধ। এই নিয়মের আওতায় তার জন্ম ও বৃদ্ধি. তার যাবতীয় প্রবৃত্তির উদ্ভব ও পরিণতি। সে-প্রবৃত্তিকে আমরা বলি জৈব প্রবৃত্তি। প্রত্যেকটি জীবকে (মানব-নামধারী জীবকেও) তার জৈবপ্রবৃত্তি শেখায় আপন একান্ত স্বাতন্ত্র্যকে, অহংকে, বাঁচিয়ে রাখতে এবং যে-কোনো মূল্যে বাড়িয়ে তুলতে, সব প্রতিবন্ধক সরিয়ে দিয়ে, সব প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি বা দলকে মাড়িয়ে দিয়ে। বলা যেতে পারে যে অহং-এর সঙ্গে পরমের দ্বন্দ্ব চলে প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে। কিন্তু তাতে সব কথা বলা হয় না। কারণ এই অহং তো ভুঁইফোড় কিছু নয়, সমগ্র জাগতিক সত্তার মধ্যে সে গ্রথিত, সেইখান থেকে পায় তার সংকল্প, তার শক্তি। সৃষ্টির বিচারে শক্তির পরিমাপে এই পরমপ্রতাপশালী জাগতিক সত্তাও ঈশ্বরের আর-এক রূপ অথবা ভিন্ন এক ঈশ্বর।

প্রাচীনকাল থেকে এই দুই ঈশ্বরকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। আমরা ঈশ্বরকে বলি সত্যশিবসুন্দর, অর্থাৎ সমস্ত চরম মূল্যের পরম আধার। তাই তিনি আমাদের প্রেম-ভক্তি কাড়েন, আমাদের সাধনাকে উদ্বুদ্ধ করেন, কর্মকে উদ্দীপ্ত করেন। আবার ঈশ্বরকে বলি সর্বশক্তিমান, সর্বঘটন-পটীয়ান, আদি স্রষ্টা এবং সর্বোচ্চ ও সর্বকালীন বিধাতা, রাম-মোহনের ভাষায় The Eternal Governor of the Universe।

গোল বাধে সেইখানে। সর্বশক্তিমান বিধাতার সৃষ্টি বড়ো সুন্দর, বড়ো সুশৃঙ্খল, বড়ো সুনিয়ন্ত্রিত। বিজ্ঞান তার সাক্ষী এবং সাক্ষ্য ক্রমশ জোরদার হচ্ছে, সুপ্রতিষ্ঠিত ও সর্বব্যাপী হচ্ছে। যাঁরা শক্তির পূজারী তাঁরা এই পরম শক্তিমানকে পূজা করবেনই। কিন্তু যাঁরা শ্রেয়কে, শ্রেয়োনীতিকেই পরম ব'লে জেনেছেন তাঁরা চারিদিকে তাকিয়ে বিহ্বল হ'য়ে যান—এত অন্যায়, এত নির্যাতন, এত ব্যর্থতা, এত অসহনীয় যন্ত্রণা কেন ? একজনের পাপই যে আরেকজনের বুকে আঘাত হানে তা-ই নয়, প্রাকৃতিক বৈরিতার আয়তনও বিরাট। রোগ শোক জরা মৃত্যু তো আছেই, সার্থকতার তীরে পৌঁছে অনেকের ভরাডুবি হয়, যেমন হ'লো সেদিন আমাদের বন্ধু ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চানের। সবই নিয়মমতো ঘটে, কিন্তু সে-নিয়ম প্রাকৃতিক, শ্রেয়োনীতিক নয়। পরকাল, পুনর্জন্ম ইত্যাদি রোমান্‌স্‌ রচনা ক'রে মানবলোকে নৈতিক বিশৃঙ্খলার ব্যাখ্যা দেওয়া শুধু নিজেকে ভোলানো। রবীন্দ্রনাথ এ-সব ধর্মশাস্ত্রীয় প্রবোধ-বাক্যে কর্ণপাত করেননি। স্টপফর্ড ব্রুককে বলেছিলেন, "আমাদের বর্তমান জন্মের বাইরের অবস্থা সম্বন্ধে কোনো নির্দিষ্ট কল্পনা আমার মনে নাই, এবং সে সম্বন্ধে আমি চিন্তা করা আবশ্যক মনে করি না।" মানুষের দুঃসহ দুঃখের মতো এত বড়ো প্রকাণ্ড ব্যাপার তাঁর চিন্তা-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ করেনি এমন কথা আমরা ভাবতে পারি না। কাজেই ভাবতে হয় যে তাঁর চিন্তা সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত ছিলো।

ধর্মতাত্ত্বিকদের মধ্যে কেউ-কেউ বলেন বিশ্বজাগতিক ভগবানের শক্তি সীমিত, সেই সীমিত শক্তি নিয়ে জড়ের বাধা কাটিয়ে মানুষের যতটা ভালো করা সম্ভব ততটা তিনি করছেন। রবীন্দ্রনাথও তেমন কথা বলেছেন মাঝে-মধ্যে। "দেখছি এত স্খলন ঘটে, ছন্দ মেলে না, ওজনে ভুল হয় ; বুঝতে পারি তিনি সর্বশক্তিমান নন, সেই জন্যে তাঁকে এত কাটাকুটি করতে হয়, সেই কাটাকুটির দুঃখ আমরা এড়াব

কী করে।” বলা বাহুল্য যে স্খলন ঘটে নৈতিক শৃঙ্খলায় (moral order-এ), প্রাকৃতিক শৃঙ্খলায় নয়। কিন্তু 'মানুষের ধর্ম' পুস্তকে তিনি আরো স্বচ্ছবাক্। স্পষ্ট জেনেছেন এবং জানাচ্ছেন যে অভাব শক্তির নয়, অভাব মঙ্গলবিধানের এবং মমতাবোধের; যিনি জগৎস্রষ্টা এবং বিশ্ব'বধাতা, মানুষের ভালোমন্দ সুখদুঃখ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। “পরম মানবিক সত্তাকে পেরিয়ে গিয়েও পরম জাগতিক সত্তা আছে। ··জাগতিক ভূমা আমাদের জ্ঞানেব বিষয়, মানবিক ভূমা আমাদেব সমগ্র দেহমনের ও চরিত্রের পরিতৃপ্তি ও পরিপূর্ণতার বিষয়।···নৈর্ব্যক্তিক জাগতিক সত্তাকে প্রিয় বা কোনো-কিছু বলার অর্থ নেই। তিনি ভালোমন্দ সুন্দর-অসুন্দরের ভেদবর্জিত। তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ নিয়ে পাপ-পুণ্যেব কথা উঠতে পাবে না।” কিন্তু তাঁকে বাদ দিয়েই বা ওঠে কেমন ক'বে? মানুষের হিংসা, স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত হিংস্রতা তো বিশ্বজাগতিক ব্যবস্থারই বিবর্তনধাবাব অনিবার্য পরিণাম।

শুভ এবং অশুভ বিপরীত শক্তির দেবতাদ্বয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা হচ্ছে না এখানে—যে-কথা বলা হয়েছিলো প্রাচীন পারসিক ধর্মশাস্ত্রে। খ্রীষ্টানেরা এবং মুসলমানেবা এক প্রচণ্ড শক্তিমান অমঙ্গল-বিলাসী শয়তানকে খাড়া কবেন ভগবানের পাশাপাশি। শয়তানও ভগবানের সৃষ্টি, অথচ মানুষকে বিপথে নিয়ে গিয়ে ভগবানের উদ্দেশ্য পণ্ড ক'রে দেওয়াই তার কাজ। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য আধুনিক যুগের মানুষ, পৌরাণিক কাঠামোতে তাঁর ধর্মচিন্তা বিধৃত নয়। তিনি বলছেন কঠিন বাস্তবের সঙ্গে মহান আদর্শের দ্বন্দ্বের কথা। ঠিক এই কথাটা বলছেন না, তবু তাঁর বলা কথার ফাঁকে-ফাঁকে এসে পড়ে এই না-বলা কথা। পরম মানবিক সত্তাকে ছাড়িয়ে আছে যে বিশ্বজাগতিক সত্তা, তার কথা তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু এই দুই সত্তার মধ্যে কী সম্পর্ক সে-প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন। “বিশ্বজাগতিক সত্তা” কি বিশ্বজগৎ থেকে স্বতন্ত্র

কিছু ? অনেক প্রাচীনপন্থী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এই স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস করেন, জগৎকে ছাড়িয়েও জগদীশ্বরের নিরঞ্জন সত্তার স্থান আছে তাঁদের ভক্তহৃদয়ে। আমার কাছে এবং খুব সম্ভবত শেষ পর্বের রবীন্দ্রনাথের কাছে জগৎব্যাপার ও জগদীশ্বরের পার্থক্য বাচনিক, বাচ্য একই।

বিশ্বদেবতা সৃষ্টি করেছেন মানুষকে, ভাষান্তরে বিশ্বজাগতিক বিবর্তনধারায় মানুষ জন্মলাভ করেছে। কী আশ্চর্য কৌশলে এ-সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে তা যাঁরা আধুনিক নৃতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব ও ভূতত্ত্বের স্বল্প চর্চাও করেছেন (রবীন্দ্রনাথ যেমন করেছিলেন) তাঁরা জানেন ; জেনে বিস্ময়ে, সম্ভ্রমে, রসানন্দে অভিভূত হ'য়ে ব'লে ওঠেন — এ কোন্ মহান গাণিতিক-শিল্পীর অপরূপ রচনা অনন্ত দেশকালের পটভূমিকায় ! প্রকৃতির নবতম সন্তান মানব-নামধারী বুদ্ধিযুক্ত প্রাণী স্বভাবতই বিশ্বপ্রকৃতিকে জানতে বুঝতে চায়। তাতে ক্ষান্ত না-হ'য়ে পরম পিতাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তাঁর সৃষ্টিকর্মের মূল্য বিচার করে ; বলে, তোমাকে শ্রেয় বলা যায় না, তবে হেয়ও তুমি নও, তুমি নির্মম, তুমি উদাসীন, বিপরীত তুমি ললিতে-কঠোরে। তোমার রাজত্বে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায় এবং খিদে পেলেই বাঘ গোরুকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে খানিকটা খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি ক'রে বাকিটা শেয়াল-কুকুরের জন্য ফেলে দিয়ে চ'লে যায় ; তুমি কত সহস্রপ্রকার কোটি-কোটি ব্যাক্‌টিরিয়া সৃষ্টি করেছো এবং ঐটুকু অদৃশ্য প্রাণীর দেহে উপজ্ঞা দিয়েছো যে মনুষ্যদেহই তাদের প্রকৃষ্ট খাদ্য ; ইত্যাদি।

তবু তুমি আমাদের পিতা। সুদীর্ঘ শৈশবকালে আমাদের অর্থাৎ মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব রক্ষা করেছো তৎকালীন ভয়াবহ সব বিপদ-আপদ থেকে। ভূপ্রকৃতির অবস্থা-পরম্পরায় একটু এ-দিক ও-দিক হ'লেই তো আমরা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেতাম। তিন চার শ' বছর আগে আমাদের বুদ্ধিকে সাবালক ক'রে তুলেছো বিজ্ঞানের উন্মেষ ঘটিয়ে। তারপর থেকে আমরা তোমার সামনে ভীতসন্ত্রস্ত হৃদয়ে করজোড়ে দাঁড়িয়ে নেই।

তোমার বিধি-বিধান জেনে নিয়ে তোমারি উপর আংশিক রাজত্ব স্থাপন করতে শুরু করেছি। সবে শুরু। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেছি, কিন্তু ভূমিকম্পের বেলা আমরা আজো অসহায়। রোগের জীবাণুতত্ত্ব আবিষ্কার করেছি, ইতিমধ্যে অনেকরকমের ভ্যাক্সিন আর অ্যান্টিবায়োটিক তৈরী ক'রে বসন্ত, কলেরা, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, নিয়মোনিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগকে কাবু ক'রে ফেলেছি; ক্যানসার এবং থ্রম্বোসিসকেও শীঘ্রই বশে আনবো। তবে যুদ্ধ, গণহত্যা, হিট্‌লর, স্তালিন, নিক্‌সন, ইয়াহিয়া প্রভৃতি জঘন্য সব ব্যাধির প্রকোপে আমাদের যন্ত্রণার শেষ নেই। তার ওষুধ তোমার কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। যেতে হবে অন্য দেবতার কাছে, যিনি শুভের দেবতা, সুন্দরের দেবতা। কারণ শুভবুদ্ধি ব্যাপকভাবে জাগ্রত না-হ'লে তো এইসব ব্যাধির প্রতিষেধক আর-কিছু নেই, তাঁর কাছেই প্রার্থনা করতে হবে—বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু। জ্ঞান, নীতিবোধ, সৌন্দর্যবোধ কিছুদূর পর্যন্ত এগোয় জৈবিক নিয়মে, তারপর হ'য়ে দাঁড়ায় জীবনরক্ষার দায় থেকে মুক্ত এক আধ্যাত্মিক সাধনা, সত্য শিব সুন্দরের আরাধনা। কোথায় বিভাজনী রেখা টানা যায়, অথবা আদৌ টানা যায় কিনা, বুঝতে পারি না।

মানবিক দেবতা অপেক্ষাকৃত নবীন। উপনিষদে এঁর আভাস পাওয়া যায়, গৌতম বুদ্ধ এঁর কথা আরো বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন পরোক্ষে, প্রত্যক্ষত তিনি ঠাকুর-দেবতা মানতেন না। রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় শেষ পর্বে এমন কথা বলেন যেন বাউলদের 'মনের মানুষ' (রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায় তার অর্থ মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ) অথবা হিউ-ম্যানিস্ট দার্শনিকদের ideal humanity-ই একমাত্র দেবতা, তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কোনোপ্রকার দেবকল্পনা ভুয়ো: "আমাদের ধর্মশাস্ত্র (*theology*) পরমেশ্বরে যে গুণই আরোপ করুক্, প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি মনুষ্যত্বের অনন্ত আদর্শই, যাঁর দিকে সমগ্র মানবজাতি এগিয়ে চলেছে, যাঁর সঙ্গে তারা প্রেমের পথে মিলিত হতে চায়; যাঁকে আদর্শ

পিতা, বন্ধু ও প্রিয় বলে জানে।" এমন-কি এতদূর পর্যন্ত দাবী করেছেন যে মানুষ নিজের ধর্মসাধনার যে-নামই দিক, আমাদের পরিচিত সকল ধর্মের মূল কথা হচ্ছে এই আদর্শ মানব বা চিরমানবের সাধনা—প্রেমে, জ্ঞানে ও কর্মে। ভুলে গেছেন যে অধিকাংশ নিষ্ঠাবান হিন্দু, ইহুদী, খ্রীষ্টান, মুসলমান তাঁদের উপাস্য দেবতাকে সর্বশক্তিমানরূপেও দেখেন; অথচ রবীন্দ্রনাথের পরম মানবিক সত্তায় সর্বশক্তিমত্তা খুঁজে পাওয়া যায় না; তিনি মানুষকে আকর্ষণ করতে পারেন, বিশ্বজগৎকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না।

সে যা-ই হোক্, রবীন্দ্রনাথের 'মনের মানুষ' বিষয়ে আরো কয়েকটি প্রশ্ন জাগে আমার মনে। সকলের মনের মানুষ কি একই বা একই প্রকার গুণসমুচ্চয়? মনে রাখা দরকাব যে 'মনের মানুষ' একটি মত-বাদ বা মতবিশ্বাসের ব্যাপার নয়, যাঁকে আমি প্রেমে, জ্ঞানে, কর্মে সত্য করে তুলতে প্রয়াসী আমার জীবনে, তিনিই আমাব 'মনের মানুষ'। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই পরম মানবকে সত্য ক'রে তুলবার জন্য নিরন্তর সাধনা করেছিলেন; গান্ধীও; আইনস্টাইনও। কিন্তু কত বিচিত্র এই সাধনা-আরাধনার গতি ও গন্তব্য। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন আদর্শ শিল্পী হ'তে মূলত, গৌণত কিছু কর্মের দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। অসাধারণ সিদ্ধিলাভ করেছিলেন মহাশিল্পীরূপে; কর্মী বা জ্ঞানীরূপে তাঁর অবদান শ্রদ্ধেয় হ'লেও অল্পই। গান্ধীজী ভক্তিকাব্য ছাড়া অন্য কোনো সাহিত্যের বা শিল্পের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেননি; বলতেন, আমার জীবনই আমার কবিতা। সে-কবিতা পাঠ ক'রে আমরা মুগ্ধ হয়েছি, ধন্য হয়েছি। তবু বলবো পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ তাঁর মনের মধ্যে জাগরূক ছিলো না, ছিলো মহাকর্মী বা মহাসেবীর আদর্শ। আইনস্টাইন এ-যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, কিন্তু সমাজসেবীরূপে তাঁর সাধনা ও সিদ্ধি নগণ্য। অবশ্য জ্ঞানকর্ম ও শিল্পরচনাও একপ্রকার সমাজসেবা, তবু সাধারণত সমাজসেবা বলতে আমরা আরো প্রত্যক্ষ

সেবা বুঝি। গান্ধীজী নাকি একবার অধ্যাপক রামনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আপনার গবেষণাগারে যে-সব অতি সূক্ষ্ম কাজ হচ্ছে তাতে কি আমাদের গরীবদের গ্রাসাচ্ছাদনের কিছু সুরাহা হবে। রামন উত্তর দিয়েছিলেন—ঠিক লক্ষ্যটা সামনে রেখে তো আমরা বৈজ্ঞানিক গবেষণা করছি না। গান্ধীজী হতাশ কণ্ঠে বললেন—তবে সে-গবেষণার বিশেষ কোনো মূল্য নেই আমার কাছে।

'চিত্রা' কাব্যের জীবনদেবতার কথা মনে পড়ে। জীবনদেবতার কল্পনায় বহুত্ব ছিলো, প্রত্যেক মানুষের জীবনদেবতা স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত। সেই কাব্যে ও তার ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ শুধু নিজের জীবনদেবতার কথাই বলেছিলেন; সর্বজনের জীবনদেবতার কথা ভাবেননি। জীবনদেবতা ও মানস-সুন্দরী (কাব্যলক্ষ্মী) খুব কাছাকাছি ধারণা, তবু পৃথক্। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা শুধু যে তাঁর কাব্যরচনার পরম আদর্শ ও অনুপ্রেরণারূপে কল্পিত, তা নয়: "এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন তাঁহাকেই আমার বা আমি জীবনদেবতা নাম দিয়াছি।" আরো স্পষ্ট ক'রে বলছেন, "চিত্রা কাব্যে আমি একদিন বলেছিলুম আমার অন্তর্যামী আমাকে দিয়ে যা বলাতে চান আমি তাই বলি, কথাটা এই রকম শুনতে হয়। কিন্তু চিত্রায় আমার যে উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে সেটি অন্য শ্রেণীর। আমার একটি যুগ্মসত্তা আমি অনুভব করেছিলুম যেন যুগ্মনক্ষত্রের মতো, সে আমারই ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত, তারই আকর্ষণ প্রবল। তারই সংকল্প পূর্ণ হচ্ছে আমার মধ্য দিয়ে, আমার সুখে দুঃখে আমার ভালোয় মন্দয়। এই সংকল্প-সাধনায় এক আমি যন্ত্র এবং দ্বিতীয় আমি যন্ত্রী হতে পারে, কিন্তু সংগীত যা উদ্ভূত হচ্ছে—যন্ত্রেরও স্বকীয় বিশিষ্টতা তার একটি প্রধান অঙ্গ। পদে পদে তার সঙ্গে রফা করে তবেই দুয়ের যোগে সৃষ্টি।"

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে জীবনদেবতা জগদীশ্বর নন, সর্বজনের দেবতাও নন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিজের 'যুগ্মসত্তা' ব'লে অভিহিত করছেন, অর্থাৎ নিজের আদর্শস্বরূপ ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক ব্যক্তিটি যে-শক্তি যে-সম্ভাবনা যে-সুযোগ নিয়ে জন্মেছেন, সেগুলির সম্যক্ বিকাশ যদি ঘটে তবে তিনি যা হ'তে পারেন তাঁকেই বলছেন তাঁর জীবনদেবতা। পদে-পদে সন্দেহ করছেন, আশঙ্কা করছেন, জীবন-দেবতাকে বুঝি তিনি খুশী করতে পারেননি, তাঁর সূচিত পথে বেশি দূর এগুতে পারেননি।

জীবনদেবতার কল্পনায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্থান আছে, বেশ বড়ো-রকমের স্থান। এতই বড়ো যে দেবতাকে সুদ্ধ individualize করা হচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তির দেবতা স্বতন্ত্র, একান্ত তারই দেবতা, সর্ব-লোকের দেবতা নন। স্বকীয় জীবনদেবতার প্রতি রবীন্দ্রনাথ গভীর অনুরাগ প্রকাশ করেছেন, অন্যদিক থেকেও ব্যতিহারী (reciprocal) তীব্রতা অনুভব করছেন নিজের মনের গোপন কোণে ; দাম্পত্যপ্রেম ও মিলনরজনীর চিত্রকল্পকে ভিত্তি ক'রে রচনা করেছেন 'জীবনদেবতা' নামক কবিতাখানি।

দুঃখ সুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিত দ্রাক্ষা সম।

কিন্তু জীবনদেবতার প্রতি যে-ভাব ব্যক্ত হয়েছে এই কবিতায় এবং জীবনদেবতা বিষয়ে অন্যান্য কবিতায় তাকে ঠিক মরমিয়া ভাবের কোঠায় ফেলা যায় না, ভক্তির এমন-কিছু আমেজ ঘটেনি এ-প্রেমে ; এ যেন নারীপুরুষ-প্রেম এবং ভক্তভগবান-প্রেমের মধ্যবর্তী এক অভিনব অনুভূতির স্তর।

'গীতাঞ্জলি'তে রবীন্দ্রনাথ এ-স্তর পেরিয়ে পরিপূর্ণ ভক্তির স্তরে

পৌঁছেছেন, যদিও অধিকাংশ গানে নারীপুরুষ-প্রেমের আধারেই ভক্তিরস ঢালা হয়েছে। 'গীতাঞ্জলি'র প্রথম গানেই অন্যবিধ অনুরাগের সুর লেগেছে, ইঙ্গিত তার স্পষ্ট; কবি যাঁর চরণ-ধূলার তলে মাথা নত করতে চান তাঁকে তাঁরই পরিপূর্ণীকৃত যুগ্মসত্তা বা তাঁর বিশিষ্ট ব্যক্তিস্বরূপের পরিপূর্ণতার আদর্শ ভাবা যায় না। রামমোহন রায় অথবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে একমেবাদ্বিতীয়ম্ আদি স্রষ্টা এবং সর্বলোকের বিধানকর্তা পরমেশ্বরের বন্দনা করতেন, 'গীতাঞ্জলি'তে তিনিই অবতীর্ণ। তৎসত্ত্বেও এই ত্রিভুবনেশ্বর, এই রাজাধিরাজ, এই সর্বমানবের জীবননাথের সঙ্গে 'গীতাঞ্জলি'র কবি নিজেকে বাঁধতে পেরেছেন, পূজা নয়, প্রেমের বন্ধনে। এ-প্রেম প্রেমাস্পদকে যতই উঁচুতে তুলে ধরুক, ভাবনায় যত খুশী বিস্তার ও গভীরতা সঞ্চার করুক তাতে ভুল করার এবং পরে ভুল ভাঙার কোনোই আশঙ্কা নেই, কারণ প্রেমের পাত্র তো রক্তমাংসের সামান্যা নারী নয়; পাত্র স্বয়ং ভগবান, সর্বগুণাধার, সর্বদোষমুক্ত, সর্বসীমারহিত, ইংরেজিতে, যাকে বলে Perfect Being। অথচ কবির কল্পনায় ইনি সামান্য এক প্রেমিক ভক্তকেও ভালোবাসেন, রাজার রাজা হ'য়েও তার কাছে ভিখারী সেজে আসেন, তার জন্য চোখের জল ফেলেন। তিনখানি গীতাখ্য-সংকলনে আমরা এই অভিনব আধ্যাত্মিকপ্রেমের বা সংরাগরক্ত ভক্তির অতুলনীয় গীতি-সুধারস পান করলাম।

ভুল ভাঙার কথাটা তুলেছি 'মানসী' কাব্যের রেশ টেনে। 'মানসী'র প্রথম দুটি কবিতার শিরোনাম "ভুল" এবং "ভুল ভাঙা।" নারীপুরুষের প্রেমের মধ্যে ভুল অনিবার্য। প্রেমের প্রথম উচ্ছ্বাসে প্রেমাস্পদ বাস্তবিক যা তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর এবং মহৎ ব'লে প্রতিভাত হয় প্রেমিকের চোখে। এটাকে মোহ বলা যেতে পারে, কিন্তু মোহ-ভঙ্গের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এর চেয়ে বড়ো সত্য কিছু নেই প্রেমিকের হৃদয়মনে। "নারীর উক্তি" ও "পুরুষের উক্তি" সংলাপধর্মী

কবিতাদ্বয়ে প্রেমের একটা শাশ্বত দিক বা দুর্বলতা উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। নারীর ব্যথিত প্রশ্ন :

কেন আনো বসন্ত নিশীথে
আঁখিভরা আবেশ বিহ্বল
যদি বসন্তের শেষে শ্রান্তমনে ম্লান হেসে
কাতরে খুঁজিতে হয় বিদায়ের ছল ?

পুরুষের উত্তর

প্রাণ দিয়ে সেই দেবীপূজা
চেয়ো না, চেয়ো না তবে আর।

খানিকটা ভুল উত্তর, কারণ নারী সত্যি-সত্যি দেবী-পূজা চায়নি ; সে তার দোষগুণ নিয়ে যা আছে তাকে ঠিক তা-ই জেনেও প্রেমিক যেন আপন সমস্ত হৃদয়ে তাকে স্থান দিক সারা জীবন ভ'রে—এই ছিলো তার একান্ত মনোবাঞ্ছা।

এখন হয়েছে বহু কাজ
সতত রয়েছ অন্য মনে।
সর্বত্র ছিলাম আমি, এখন এসেছি নামি
হৃদয়ের প্রান্তদেশে, ক্ষুদ্র গৃহকোণে।

কিন্তু বহু কাজ তো আসবেই মানুষের জীবনে। শুধু যে জীবিকা উপার্জনের জন্য তাকে দৈনিক আট-দশ ঘণ্টা সময় ও অনেকখানি মন দিতে হয় তা-ই নয়, আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্যও সাধনা করতে হয় তার চেয়েও অধিক পরিমাণ মনোনিবেশ সহকারে। কারো সমস্ত হৃদয় জুড়ে চিরজীবনের মতো আসন অধিকার করার দাবীটাই ভুল, প্রেমের প্রাথমিক ভুল।

আসলে 'মানসী'র প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যে একটা অবাস্তবতার আমেজ রয়েছে। যুবক রবীন্দ্রনাথ হয়তো নিজেই বুঝতে পারেন নি যে তাঁর হৃদয়ে এমন এক বিরাট অনুভূতি জেগেছিলো যার পরি-

তৃপ্তি ক্ষুদ্র মানবীর দ্বারা সম্ভবপর নয়। তিনি প্রেমাস্পদের মধ্যে খুঁজছিলেন এমন এক পরিপূর্ণতা, এমন অসীমতা যা মানবীর সীমানা ছাড়িয়ে যায় বহুদূরে।

বুঝতে পারেননি কেন বললাম, বুঝতে তো পেরেইছিলেন। এক পত্রে লিখছেন: "ভালো করে দেখতে গেলে 'মানসী'র ভালোবাসার অংশটুকু কাব্যকথা—বড়োরকমের লেখা মাত্র।" চিঠির এইটুকু পড়লে সন্দেহ হ'তে পারে যে রবীন্দ্রনাথও 'মানসী'র প্রেমের কবিতায় কোনো আধুনিক কবির মতো কবিতার আঙ্গিক নিয়ে, ভাষা নিয়ে, বাক্-প্রতিমা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন, প্রেমানুভূতি যার অবলম্বনমাত্র। তা কিন্তু নয়। একটা বড়োরকমের ভাব তাঁর মনের গভীরে দানা বেঁধেছে, প্রকাশের মাধ্যম খুঁজছে; তার চেয়েও আশ্চর্য কথা, খুঁজছে ভাবের উপযুক্ত পাত্র। সে-পাত্র ঈশ্বর-ভিন্ন আর কী হ'তে পারে। আমি বলতে চাই রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরের সন্ধান পেয়ে তাঁর প্রেমে পড়েননি, প্রেমই তাঁকে ঈশ্বরের সন্ধান দিয়েছে। পিতৃদেব বা ব্রাহ্মসমাজ থেকে পাওয়া ঈশ্বরের কথা বলছি না এখানে, বলছি তাঁর আপন অন্তরের নিভৃত উপলব্ধির মধ্যে, ব্যাকুল বেদনার মধ্যে আবিষ্কৃত ঈশ্বরের কথা। পূর্বোদ্ধৃত পত্রের পরবর্তী অংশে লিখছেন: "একেই বলো ভালোবাসা? আমার ভালোবাসার লোক কই? আমি ভালোবাসি অনেককে। কিন্তু 'মানসী'তে যাকে খাড়া করেছি সে মানসেই আছে, সে আর্টিস্টের হাতে রচিত ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা। ক্রমে সম্পূর্ণ হবে কি?" না হবে না; 'শেষ লেখা'র শেষ কবিতাতেও হয়নি।

গীতাঞ্জলি'তে এসে রবীন্দ্রনাথ কি পেলেন সেই পরম সত্তাকে যিনি স্পিনোজার ভাষায় "the perfect object of a perfect love?" 'অনবদ্য প্রেম' কথাটা এখানে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ 'মানসী'তে রবীন্দ্র-নাথ শুধু প্রেমপাত্রের অপূর্ণতার কথা ভেবে বিষণ্ন বোধ করেননি,

প্রেমের স্বাভাবিক অপূর্ণতার কথাও তাঁর মনে সমানে বিঁধেছে। নারীপ্রেমকে অপবিত্র করে প্রধানত কামনার অপ্রতিরোধ্য আমেজ—এটা রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন মত, আমার মত মোটেই তা নয়। তরুণ কবি কামকে প্রেমের রাহু জ্ঞান করেছিলেন, এমন রাহু যার গ্রাস থেকে প্রেমের কখনো মুক্তি নেই :

বুকের ভিতরে ছুরির মতন
মনের মাঝারে বিষের মতন
রোগের মতন শোকের মতন
রব আমি অনিবার।

প্রেমের মায়াবী স্পর্শে রূপান্তরিত কাম প্রেমকে আরো নিবিড় এবং ঐশ্বর্যবান ক'রে তুলতে পারে, প্রেমের রাহু না-হ'য়ে তার পরিপূর্ণতাও হ'তে পারে (অর্থাৎ রক্তমাংসের মানুষের হৃদয়বৃত্তির পক্ষে যতটা পূর্ণতালাভ সম্ভব) এ-কথা রবীন্দ্রনাথ ভাবেননি, অন্তত যৌবন হারাবার আগে পর্যন্ত ভাবেননি। 'মানসী'র "নিষ্ফল কামনা"তে বলছেন "ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব"; নারীদেহকে কিংবা তার সমগ্র ব্যক্তিস্বরূপকে একটি শতদল পদ্মের সঙ্গে তুলনা ক'রে লিখছেন, "সুতীক্ষ্ণ বাসনার ছুরি দিয়ে/তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে।"

এখানে প্রেমের অন্য-একটি অপূর্ণতার কথা এসে পড়েছে যেটা আমার মতে আরো বাস্তবিক এবং বিনাশক অপূর্ণতা। তাকে প্রেমের possessive বা সর্বগ্রাসী ভাব বলা যেতে পারে। প্রেমিক প্রায়ই চায় প্রেমাস্পদকে আর সকলের কাছ থেকে বিছিন্ন ক'রে, আর সব-কিছু থেকে সরিয়ে নিয়ে নিজের একান্ত এবং সম্পূর্ণ দখলে আনতে, তার ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব ক'রে তার ব্যক্তিস্বরূপের স্বকীয় স্ফুরণের ক্ষেত্রকে অগ্রাহ্য ক'রে শুধু নিজের দিকেই, নিজের উদ্দেশ্যেই তাকে প্রস্ফুটিত করতে। মানতে চায় না যে

বিশ্বজগতের তরে, ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি।

স্বামী চায় স্ত্রীকে সম্পূর্ণ নিজের মনের মতোটি ক'রে গ'ড়ে নিতে; কখনো-কখনো বিপরীত চেষ্টাও দেখা যায়। দু-জনই যদি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন হয়—হবে না-ই বা কেন—তা হ'লে ব্যক্তিত্বের সংঘাত অনিবার্য হ'য়ে ওঠে এবং সংঘাতের আঘাতে-আঘাতে প্রেম ক্ষয় হ'তে থাকে।

কামনা এবং সর্বগ্রাসিতা—এ দুই রাহুর কবল থেকে ঈশ্বরপ্রেম মুক্ত। অনবদ্য প্রেমের অনবদ্য পাত্র ঈশ্বর। প্রেমের পথে পরিপূর্ণতা সন্ধানের এইখানেই পরিসমাপ্তি ঘটা উচিত ছিলো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এখানে পৌঁছেও থামতে পারেননি।

'গীতাঞ্জলি' পর্বে "মধুর তোমার শেষ যে না পাই" গোছের কাব্যানুভূতি সম্ভব হয়েছিলো, কারণ ঐ ক'টি বছর কবি রবীন্দ্রনাথ সত্যি-সত্যি চোখ মেলে জগতের দিকে তাকাননি। রূপসী প্রকৃতি অবশ্য ছিলো তাঁর কল্পনায় উজ্জ্বল, কিন্তু দুঃখভারনত জীবনসংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত সাধারণ মানুষ ছিলো না। (মাত্র চার-পাঁচটি গানে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়।) কবি কি সুদর্শনার মতোই দীর্ঘকাল কাটালেন অন্ধকার ঘরের অদৃশ্য রাজাকে তাঁর স্বরূপে না-জেনে নিজেরই আবিষ্ট কল্পনার চোখে তাঁকে পরম মধুর সুন্দর ও শুভরূপে দেখে? "আলো কই। এ ঘরে কি এক দিনও আলো জ্বলবে না"—'গীতাঞ্জলি'র কবির মনেও কি এমন কোনো আক্ষেপ তীব্র বেদনার মতো বেজেছিলো, না কি তিনি বোধ করছিলেন চারিদিকেই আলোয় আলোকময়—যদিও সে-আলো সত্যের এক পিঠেই পড়েছিলো, অন্য পিঠ ছিলো পক্ষপাতী প্রেমের ছায়ায় ঢাকা? হয়তো বুঝতে পারেননি যে দিনের আলোয় সংসারের মাঝখানে তাঁর হৃদয়ের রাজাকে দেখলে তিনি সহ্য করতে পারবেন না। ঐ-সময়ের গীতিকবি গদ্যনাট্যকার অপেক্ষা যেন

একটু কাঁচা বয়সের, একটু নবযুবতী-স্বভাবের মানুষ; শুধু বাঁশি শুনেই "মন প্রাণ যাহা ছিল" সব দিয়ে ফেলেছেন।

অবশেষে রাজপ্রাসাদের লেলিহান অগ্নিশিখার আলোয় অন্ধকার ঘরের রাজাকে দেখে ফেললেন একদিন। এক বীভৎস আগুন জ্বলে উঠেছিলো পশ্চিম মহাদেশ জুড়ে, তার ঝলসানো তাপে অল্পবিস্তর দগ্ধ হ'লো সারা দুনিয়ার মানুষ। তখন দুঃখের ও পাপের অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ দেখে শিউরে উঠলেন ভক্ত-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ। প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে প্রথম বুঝতে পারলেন যে-পরাণবঁধুর সঙ্গে "আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা," জগৎসংসারে তাঁর আবির্ভাব কত নিষ্ঠুর, কী ভয়ংকর। সইতে না-পেরে পালিয়ে গেলেন 'পলাতকা'য়, 'শিশু ভোলানাথ'-এ, 'পূরবী'তে, 'মহুয়া'য়; আবার মানুষের ছোটোখাটো তিক্ত-মধুর সুখদুঃখের ছবি আঁকলেন আরো পাকা হাতের সূক্ষ্মতর তুলিকায়। কিন্তু কোথায় পালাবেন তিনি? শুধু হৃদয়ের বাসর-শয়নে হৃদয়স্বামীকে পেয়ে তো তৃপ্ত হ'তে পারেন না রবীন্দ্রনাথ, তিনি যে কবি, যেমন রূপদক্ষ তেমনি সত্যদ্রষ্টা। জগৎসংসারের অভ্রভেদী নিষ্ঠুরতা ও ভয়ঙ্করতা ভেদ ক'রে তাঁকে খুঁজতে হবে ভগবানের স্বাক্ষর, শুধু রংরেজিনী প্রকৃতির রূপে নয়, অগুন্‌তি দুঃখী মানুষের বুকেও। সেই খোঁজার বেদনা আছে শেষ পর্বের কবিতায়, ভাবনা সংকলিত হয়েছে আলোচ্য দুটি বক্তৃতামালায়।

ভগবান যেন দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে গেলেন। "মানুষের সত্তায় দ্বৈধ আছে" —এটা সেই মৌল সত্যের উল্‌টো পিঠ। এক পিঠে প্রেমের দেবতা, সত্যশিবসুন্দরের দেবতা—কিন্তু তিনি সর্বশক্তিমান নন, "একটা আন্তরিক আহ্বান, একটা নিগূঢ় নির্দেশ" মাত্র। মানুষকেই তার সীমিত শক্তি প্রয়োগ ক'রে সেই দৈবী আহ্বান জগৎময় বাস্তবায়িত ক'রে তুলতে হবে। প্রকৃতির বাঁধন কাটবে, সে কি এমনি শক্তিমান? অথচ প্রকৃতির দাস হ'য়েও তো মানুষ থাকতে পারে না। অন্যদিকে

"বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে, গ্রহচন্দ্রতারকায়।" অপরিমিত শক্তির ছড়াছড়ি এখানে, অবিরত সৃষ্টির লীলাক্ষেত্র এই পরম জাগতিক সত্তা। কিন্তু তাঁকে ভালো কিংবা মন্দ, দয়ালু কিংবা নির্দয় কিছুই বলা যায় না।

পরম মানবিক সত্তা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলছেন: "হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান ···এই মনের মানুষ, এই সবমানুষের জীবনদেবতার কথা বলতে চেষ্টা করেছি *Religion of Man* বক্তৃতাগুলিতে।" শেষের কথাটা ("সর্বমানুষের জীবনদেবতা") আমাব কাছে খুব পরিষ্কার ঠেকছে না। বলেছি 'চিত্রা'র কবির মতে প্রত্যেক মানুষের জীবনদেবতা স্বতন্ত্র—তারই বিশিষ্ট ব্যক্তিসত্তার আধারে পরিপূর্ণতার যে-আদর্শ বিধৃত ও সক্রিয়। সর্বজনীন জীবনদেবতা কি তবে এইসব অসংখ্য ব্যক্তিগত জীবনদেবতার সংযোজনা কিংবা সমন্বয়? কখনো মনে হয় ববীন্দ্রনাথ "পরম মানবিক সত্তা" বলতে বুঝেছিলেন এমন এক পরম পুরুষ যিনি একাধারে পরম ধ্যানী-জ্ঞানী, পরম শিল্পী, পরম প্রেমিক, পরম কল্যাণস্বরূপ। মনে রাখা দরকার যে ভগবান—যে-ভগবানের কথা উক্ত দুটি বক্তৃতামালায় বলা হয়েছে—কেবলমাত্র ভক্তের ভাব, দার্শনিকের তত্ত্ব বা কবির কল্পনা নন; তিনি খুবই গভীর অর্থে সত্য। তিনি সত্য কোটি-কোটি মানুষের ফলপ্রসূ প্রেরণার মধ্যে, তন্নিষ্ঠ সাধনার মধ্যে, উদ্দীপ্ত কর্মের মধ্যে। অথচ 'সর্বমানুষের জীবন-দেবতা' বা সর্বপ্রকার মানবিক সৎগুণের পরাকাষ্ঠা তো সত্য নন কোনো সাধারণ মানুষের, এমন-কি কোনো অসাধারণ মহাপুরুষের সাধনায়। পনেরো-ষোলো ব অস্থিরমনা তরুণ-কিশোর এমন বিবাট সর্বময় আদর্শের কথা লালন করতেও পারে তার অনভিজ্ঞ চিত্তে; কিন্তু একটু মানসিক পরিণতি লাভ করলেই সে কিঞ্চিৎ হতাশার সঙ্গে উপলব্ধি করে যে একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন, গান্ধী ও লেনিন হওয়ার সাধনা হাস্যকর। মানবিক পরোৎকর্ষের আদর্শ বহুবিচিত্র,

বহুধাবিভক্ত; সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে তাকে নিজের ব্যক্তিসত্তার এবং সামাজিক আবেষ্টনের পরিধিতে সীমিত পরোৎকর্ষের ভাবচিত্রটি বেছে নিতেই হবে। অর্থাৎ তাকে সর্বজনীন জীবনদেবতার বায়বীয় স্তর থেকে নেমে আসতে হবে কঠিন মাটির উপর, তার একান্ত ব্যক্তিগত জীবন-দেবতার প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে; তবেই তার বাস্তবনিষ্ঠ সাধনা অর্থবান হবে, সার্থকতার দিকে এগুতে পারবে।

নাকি রবীন্দ্রনাথ কঁৎ-এর সঙ্গে একমত হ'য়ে ভক্তি ও পূজার পাত্র ঠাউরেছিলেন সেই মহান সত্তাকে যাঁর বর্ণনায় বলেছেন: "সব মানুষকে নিয়ে, সব মানুষকে অতিক্রম করে, সীমাবদ্ধ কালকে পার হয়ে একা মানুষ বিরাজিত।" কঁৎ বলেছিলেন "sum-total of all dead, living or future human beings"-এর কথা। অর্থাৎ শুধু অতীত ও বর্তমানকালের বাস্তব মনুষ্যগোষ্ঠী পূজনীয় নয় কঁৎ কিংবা রবীন্দ্র-নাথের দৃষ্টিতে। দেখা যাচ্ছে যে অজাত মানুষ, কোটি-কোটি বৎসর পরের পূর্ণতাপ্রাপ্ত মানুষ খুব বড়ো অংশ অধিকার ক'রে আছে রবীন্দ্র-নাথের 'মানুষের ধর্ম'-এ, কঁৎ-এর 'religion of humanity'-তে। কঁৎ বিজ্ঞানের উপর সরল অপরিমেয় বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, এবং বিজ্ঞান তখনো মনুষ্যজাতি ও সৌরজগৎ বিষয়ে হতাশার বাণী ঘোষণা করেনি। কঁৎ-এর ভাবনায় হিউম্যানিটির ঊর্ধ্বমুখী অনন্ত যাত্রার পথে কোনো বিঘ্ন ছিলো না; তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে বিজ্ঞানের অবাধ উন্নতির ফলে মানুষের শক্তি দেবতুল্য হবে, প্রকৃতি হবে তার দাসী। রবীন্দ্রনাথও অনুরূপ সরল আশাবাদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ১৯১৬-১৭ সালে; *Personality* শীর্ষক বক্তৃতা সংগ্রহে বলছেন: 'The spiritual world which is being built of men's life and that of God, will pass its infancy of helpless falls and bruises, and one day will stand firm in its vigour of

youth glad in its own beauty and, freedom of movement.'

দীর্ঘ-দীর্ঘ কাল অতিবাহিত হ'লে পর এমন এক যুগ আসবে এই পৃথিবীরই বক্ষের উপর যখন সব ভুল ভ্রান্তি মূঢ়তা ইতরতা ও হিংস্রতা ধুয়ে মুছে যাবে, সব মানুষের বুদ্ধি আলোকোজ্জ্বল, হৃদয় পবিত্র, এবং কর্ম নিষ্কলুষ হবে—এমন আশা করা যায়, করাই ভালো। 'শিশুতীর্থ'-এর শেষ ক'টি পংক্তিতে এই নবজাতক হিউম্যানিটির জয়গান করা হয়েছে। শুধু একজন যীশুখ্রীষ্ট বা একজন গৌতম বুদ্ধ নয়, ঘরে-ঘরে তাঁদের মতো মানুষ জন্মাবে। কিন্তু সে তো লক্ষ বা কোটি বছর পরের কথা। মানবযাত্রী সেই শিশুতীর্থর দিকে এগিয়ে চলেছে (চলেছে তো ?). এবং ক্রমশই বুঝতে পারছে বড়োই দীর্ঘ কঠিন এ-পথ, ক্ষুরের তীক্ষ্ণীকৃত অগ্রভাগের চেয়েও দুরত্যয়।

ইতিমধ্যে বিজ্ঞান সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছে। আমাদের এই বেহিসাবী খরচে-স্বভাব মার্তণ্ডদেব অপরিমেয় শক্তিকণা নিরন্তর চারিদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নষ্ট করছেন, তার অব্যর্থ পরিণামস্বরূপ এমন একদিন আসবেই যখন সূর্য এতটা নিরুত্তাপ হ'য়ে যাবে যে পৃথিবীতে কোনো প্রাণীর, অন্তত উন্নত স্তরের কোনো প্রাণীর পক্ষে প্রাণধারণ অসম্ভব হ'য়ে উঠবে। তার অবশ্য দেরী আছে, তবু খাঁড়াটি ঝুলছে মনুষ্যজাতির ঘাড়ের উপর, অপ্রতিরোধ্য গতিতে নেমে আসছে খুব ধীরে-ধীরে। তা ছাড়া নাক্ষত্রিক অ্যাক্সিডেণ্ট তো আছেই। নানা আভ্যন্তরীণ শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতে কোনো-কোনো তারকা ফেটে দুখানা কি দশখানা হ'য়ে গেছে। সূর্যেরও সেই দশা হ'তে পারে। তখন মা বসুন্ধরাও সন্তানপালনের যোগ্যতা হারাবেন। উপবৃত্ত-বর্ত্মে ধূমকেতুর গতিবিধির হিসাব আমরা রাখি, কিন্তু প্যারাবোলিক বর্ত্মে ধাবমান কোন্ রহস্যাবৃত কমেট কখন যে সৌরমণ্ডলে প্রবেশ করে বা করবে, তা জ্যোতির্বিজ্ঞানীর গণনার বাইরে। পৃথিবীর খুব কাছে এসে

পড়লে ধাক্কা লাগা সম্ভব। তার আগেই আমরা সার্থকতার তীরে পৌঁছে যাবো কি? যদি-বা যাই, সে ভঙ্গুর সার্থকতার মূল্য কতটুকু?

সর্বমানবিক ধ্বংসের জন্য যে শুধু গ্রহনক্ষত্রই দায়ী হবে এমন কোনো কথা নেই। আমাদের তিন ক্ষমতামদমত্ত সুপারপাওয়ারের হাতে যে-পরিমাণ পারমাণবিক শক্তি তুলে দিয়েছে বিজ্ঞান, তার শতাংশের একাংশ শুভবুদ্ধি দেয়নি। প্রত্যেকের চেষ্টা অপর দুই মহাসুরের মধ্যে কেমন ক'রে যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়া যায়। বাধলে কিন্তু তিন মহাশক্তিই তাতে জড়িয়ে পড়বে। দিনকতক বেপরোয়া হাইড্রোজেন বোমা ছোঁড়াছুঁড়ি চললে কোনো মানুষই বেঁচে থাকবে না এ-পৃথিবীতে; দুর্ভাগ্যক্রমে যারা বেঁচেও থাকবে তারা ইতর প্রাণীতে পরিণত হবে জেনেটিক মিউটেশানের ফলে।

পরম মানবিক সত্তার আহ্বান পৌঁছেছে মানুষের কানে, মানবযাত্রী চলেছে দলে-দলে তারই উদ্দেশে। কিন্তু পথের বাঁকে-বাঁকে বিঘ্ন পর্বত-প্রমাণ। সে-বিঘ্ন সরাবার সাধ্য নেই পূর্ণপুরুষের বা মনের মানুষের। তিনি শক্তির দেবতা নন। শক্তির দেবতা যিনি, সেই পরম জাগতিক সত্তা (যাঁকে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বদেবতা, God of cosmic forces-ও বলেছেন) তিনি শুভাশুভ-বোধরহিত। দুই দেবতার প্রকৃতি এতই ভিন্ন যে কেমন ক'রে তাঁদের মধ্যে পূর্ণ সহযোগ ঘটবে তা আমরা বুঝতে পারি না। পূর্ণ সহযোগ মানেই এখানে ঐক্য। শক্তির দেবতা এবং শুভের দেবতা এক না-হ'লে আমাদের ভক্তি কোথাও দানা বাঁধতে পারে না, অর্থাৎ ভগবান কথাটা তার সম্যক্ অর্থ হারায়। যে-দেবতার "রথ ধাবমান, কিন্তু এখনো এসে পৌঁছয়নি", এবং পৌঁছনো নির্ভর করছে অন্য দেবতার মর্জির উপর (কোনো মর্জি কি আছে তাঁর? তিনি উদাসীন, নির্মম), তাঁকে ভগবান বলি কেমন ক'রে। পক্ষান্তরে, যে-দেবতার অনন্ত সৃষ্টিক্ষেত্রে মঙ্গল-অমঙ্গল বিষয়ে কোনো অঙ্গীকার নেই, যাঁর বিধানে নিষ্পাপ শিশু রোগ-যন্ত্রণায় ছটফট করে

এবং ঘোরতর পাপী সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে দিনযাপন করে, তাঁকেই বা আমরা ভগবান বলবো কোন্ মুখে!

অথচ দুই দেবতা এক হ'লে সৃষ্টি এমন বিকলাঙ্গ, মানুষ, অধিকাংশ মানুষ, এমন জড়-বুদ্ধিসম্পন্ন, এমন সংকীর্ণ স্বার্থান্বেষী এবং ফলত আত্ম-হননকারী হ'লো কেমন ক'রে? চারিদিকে দুঃখ ও পাপের বিরাট স্বরূপ দেখে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' পর্বের ঈশ্বরভাবনায় চিড় ধরলো (যে-ঈশ্বর একাধারে পরম শক্তি ও পরম প্রেম, যাঁর অসীমে কিছুই হারায় না, যিনি দুঃখ দিয়ে দুঃখী সন্তানকে কোলে টেনে নেন); 'মানুষের ধর্ম' ও *The Religion of Man*-এ এমন ঈশ্বরের সন্ধান করলেন যিনি জগৎজোড়া দুঃখ ও পাপের জন্য দায়ী নন। যাঁর সন্ধান পেলেন. তিনি একটি "নিগূঢ় নিদেশ" মাত্র। সে-নির্দেশ মেনে মানুষকে চলতে হবে আপন শক্তির উপরই ভর ক'রে। এই ক্ষীণ শক্তির সঙ্গে মাঝে-মাঝে বিরোধ বাধে বিরাট জাগতিক শক্তির। 'মনের মানুষ'-এর সন্ধান তো পাওয়া গেলো, কিন্তু তিনি এ-সব সংকটমুহূর্তে অসহায়। সংকটাপন্ন মানুষ হৃদয়ের মধ্যে একদিকে শুভ ও সুন্দরের টান অনুভব করে, কিন্তু অন্যদিক থেকে প্রবলতর ঠেলা পেয়ে সে হুম্ড়ি খেয়ে পড়ে মাটিতে। তার অসহায় পতন এবং গুরুতর আঘাতের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, কিন্তু ভরসা দিতে পারছেন না যে এ-সবের অবসান হবেই একদিন। আর যদি-বা হয়, তবে এত লক্ষ বছর ধ'রে যে অগুন্তি মানুষ শুধু প্রাণধারণের উদয়াস্ত খাটুনির মধ্যে, সেই খাটুনির তিক্ত গ্লানির মধ্যে, অত্যাচারীর নিপীড়ন ও অসম্মানের মধ্যে, প্লেগ কলেরা কর্কট বসন্ত রোগে ভুগে-ভুগে মৃত্যুমুখে পতিত হ'লো, তাদের অর্থহীন ব্যর্থ জীবনকে কি আমরা স্রেফ খরচের খাতায় লিখে রাখবো, দূর ভবিষ্যতে যে শুভ সুন্দর সার্থক মনুষ্যগোষ্ঠী জন্মলাভ করবে তাদেরই প্রস্তুতিপর্বে এরা কি কেবল বলিদান, আর কোনোই মূল্য নেই তাদের জন্মমৃত্যুর? স্বভাবতই 'গীতাঞ্জলি'র রাজার রাজা-র চেয়ে 'মানুষের ধর্ম'-

এর মনের মানুষ আরো ক্ষণস্থায়ী হলেন রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরভাবনায়। কেউ একেবারে মুছে গেলেন না তাঁর মানসপট থেকে, কিন্তু চিত্রটি বছরে-বছরে ঝাপ্‌সা হ'য়ে এলো।

আবার ঘনায় অন্ধকার। নিদারুণ পথ আরো কোথায় নিয়ে যাবে আমার পথিক কবিকে, তাঁর "হালভাঙা পালছেঁড়া ব্যথা চলেছে কোন্ নিরুদ্দেশে?" পথের শেষ কোথায় নাই-বা জানলাম, কিন্তু সে-পথে মানবযাত্রীদল চলেছে চরম সার্থকতার তীর্থের দিকে না অন্তিম ব্যর্থতার গহ্বরের মুখে—এ-বিষয়ে ভরসা দেবে কে? রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আশা ছাড়েননি, মানুষে বিশ্বাস হারাননি। কিন্তু "হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার"—এমন চরম শুভসংকল্পময় ও অনন্ত শক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়েছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ। সেই-খানে রয়েছে তাঁর শেষ কাব্য-দশকের ট্র্যাজিক চেতনার উৎস। আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান কবি হলেন পৃথিবীর মহত্তম লিরিক কবি। "সমুখে শান্তি পারাবার" না "সম্মুখে ঘন আঁধার"—জেনে গেলেন কি সাধক রবীন্দ্রনাথ? প্রশ্নটি আমাকে ব্যাকুল করে; তিনি যে আমার মতন শত-শত পান্থজনের সখা। রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব আমি কখনোই বলতে পারিনি, পারবোও না; কিন্তু মনের গভীরে, কখনো-বা অবচেতনে, সর্বদাই একটি সুর বাজে—"চিরসখা, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না"।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যকথা অধিকাংশই উদ্ধৃত 'মানুষের ধর্ম' থেকে, দু-এক জায়গায় *The Religion of Man*, এবং প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-জীবনী' প্রথম খণ্ড থেকে।

শেষ পর্বে যে নতুন ভাব ও অনুভবের পরিচয় পাই আমরা, ট্র্যাজিক চেতনা যার প্রধান বৈশিষ্ট্য, তার প্রকাশ স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে 'পরিশেষ' থেকে ; রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সত্তর ছুঁয়েছে। কিন্তু তার পূর্বাভাস 'পূরবী'তেও দেখতে পাওয়া যায়, এমন-কি 'শিশু ভোলানাথ'-এও। শেষোক্ত কাব্যের সূচনাতেই নাম-কবিতাটি প'ড়ে আমরা আশ্চর্য হ'য়ে যাই, কারণ বইখানি মোটের উপর শিশুপাঠ্য না-হোক্ বালক-ভোগ্য ক'রেই রচিত। ছোটো ছেলেরা নিজেদের দামী খেলনা নিজেরাই ভাঙে, ভাঙা টুকরোগুলি এদিকে সেদিকে ছুঁড়ে ফেলে নিতান্ত খেলাচ্ছলেই। তাদের অবশ্য জানবার কথা নয় কোন্ খেলনার দাম কত। বিশ্বদেবতাও কি তা-ই করছেন তাঁর সবচেয়ে সুন্দর খেলনা মানুষকে নিয়ে, তিনিও কি বোঝেন না এই খেলনার মূল্য-মর্যাদা ?

আপন বিভব
আপনি করিস নষ্ট হেলাভরে ;
প্রলয়ের ঘূর্ণ-চক্র 'পরে
চূর্ণ খেলেনার ধূলি উড়ে দিকে দিকে।
.. ..
অকিঞ্চন, তোর কাছে কিছুরই তো কোনো
মূল্য নাই।

কবিতাটি এমন সহজ হাল্কা চালে লেখা যেন এ নিয়ে ভাবনা বা প্রশ্ন করার কিছু নেই, এই তো স্বাভাবিক। ছেলেরা পুরানো খেলনা ভাঙে, আবার নতুন খেলনা পায় ; বেশ তো মজা। বিশ্বদেবতাও কি তাঁর খেলার পুতুলগুলিকে, অগণিত নরনারী বালক-বালিকা এবং কোলের শিশুগুলিকে অথবা সমস্ত জগৎ সংসারটাকেই ধ্বংস-ভ্রংশ করছেন মজা

দেখবার জন্য, হয়তো-বা আবার নতুন ক'রে নতুন এক জগৎ সৃষ্টি করবার সুখটি ভোগ করবার জন্য :

আপন সৃষ্টিকে
ধ্বংস হতে ধ্বংস মাঝে মুক্তি দিয়ে অনর্গল,
খেলারে করিস রক্ষা ছিন্ন করি খেলেনা-শৃঙ্খল।

এই নিষ্ঠুর ভয়ংকর খেলার কথা শেক্‌স্‌পীয়রও বলেছিলেন তাঁর সবচেয়ে মর্মন্তুদ ট্র্যাজেডিতে—"they kill us for their sport"। কথাটা হয়তো ইস্পাত-কঠিন সত্যই ; তবু মনে প্রশ্ন জাগে 'শিশু ভোলানাথ'-এর মতন একটি ফুটফুটে কবিতা-সংকলনের সূচনাতেই এমন বিপরীত ভাবের কবিতা কেন যোগ করলেন রবীন্দ্রনাথ? নিষ্পাপ অসহায় শিশুদের কথা ভাবতে গেলেই কেন তাঁর মনে আসে মৃত্যুর কথা, ধ্বংসের কথা? আরো অনেক বৎসর পূর্বের লেখা 'শিশু' কাব্যের সূচনাতেও তিনি সম্ভবত শিশুদের পিতামাতাকেই মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন :

ঝঞ্ঝা ফিরে গগনতলে
তরণী ডুবে সুদূর জলে
মরণ-দূত উড়িয়া চলে,
ছেলেরা করে খেলা।

'পূরবী'তে এসে দেখি তাঁর শিশু ভোলানাথকে রবীন্দ্রনাথ ভুলতে পারছেন না। গভীর রাত্রে কবির শয্যা কেঁপে উঠছে "হরিণের থরথর হৃৎপিণ্ড যেমন", কোন্ সে ভয়ঙ্করের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন তিনি অন্ধকার ঘরে : না, ঘরে নয়, আঁধারে প্রচ্ছন্ন ঘন বনে ;

পদধ্বনি, কার পদধ্বনি
অজানার যাত্রী কে গো,
ভয়ে কেঁপে উঠিল ধরণী।
এই কি নির্মম সেই যে আপন চরণের তলে

পদে পদে চিরদিন
উদাসীন
পিছনের পথ মুছে চলে ?
এ কি সেই নিত্যশিশু, কিছু নাহি চাহে—
নিজের খেলনা-চূর্ণ
ভাসাইছে অসম্পূর্ণ
খেলার প্রবাহে ?

'পূরবী'র এই কবিতাটিতে আগাগোড়া রয়েছে ধ্রুপদী গাম্ভীর্য, 'শিশু ভোলানাথ'-এর টপ্পা-ঠুংরির লঘুতা নেই কোথাও। মনে করা যেতে পারে যে পুরানো পথ ছেড়ে নতুন অজানা পথের ডাক শুনতে পাচ্ছেন কবি, নিজেকে বোঝাচ্ছেন যে এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই ; কবির জগতের সঙ্গে-সঙ্গে কবির ভাব, এবং ভাবের সঙ্গে প্রকাশভঙ্গি, সব-কিছু "তিলে তিলে নূতন হোয়", নতুন হওয়াটাই জাগতিক নিয়ম। শিল্পীর পক্ষে এ-নিয়মটা আরো বেশি সত্য। তাঁকে তো বারে-বারে রপ্ত ভঙ্গি, অভ্যস্ত ভাবের জড়িমা কাটিয়ে উঠে নতুনের দিকে পা বাড়াতেই হবে। এ-গতি সব সময় অগ্রগতি না-ও হ'তে পারে ; তবু তাঁর তো ব'সে থাকার জো নেই। কিন্তু কোনো কবি বা চিত্রকরকে যদি বলা হয় নূতনত্ব-সন্ধানের প্রাক্-শর্ত হচ্ছে তাঁর যাবতীয় পুরানো রচনা টুকরো-টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে আক্ষরিক অর্থে একেবারে বিলুপ্ত ক'রে দেওয়া, তবে কি তিনি এমন নির্মম নির্বিচার ধ্বংসের পথে নব-সৃষ্টির আহ্বান শুনে খুশী হবেন, উৎসাহ বোধ করবেন ? অথচ বিশ্বকবি কি তা-ই করছেন না—বিশেষত মানবজীবন নামক তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট রচনাটিকে নিয়ে ? এত যত্নের সাথে এত হেলা-ফেলা কি শিল্পী-সুলভ না বালকোচিত ?

প্রশ্নটি আরো বিষাদগম্ভীর হ'য়ে ওঠে "কংকাল" শীর্ষক কবিতাটিতে। উত্তর আছে শেষে, কিন্তু প্রশ্নের তীব্র আওয়াজের পাশে উত্তরের ক্ষীণ কণ্ঠ প্রায় শোনাই যায় না। পথের একপাশে ঘাসের উপর পড়ে-থাকা

কোনো পশুর কয়েকটি 'পাণ্ডু অস্থিরাশি' দেখে যদি কেউ ভাবেন যে মানুষের শেষও সেইমতো "কালের নীরস অট্টহাসি"-তে, তবে তিনি ভুল করবেন। আসলে এটা ঘোষণা নয়, প্রশ্ন—পাণ্ডু অস্থিরাশিতেই কি মানুষের পরিসমাপ্তি? শেষ দুটি পঙক্তিতে তার উত্তর রয়েছে অবশ্য :

নহি আমি বিধির বৃহৎ পরিহাস,
অসীম ঐশ্বর্য দিয়ে রচিত মহৎ সর্বনাশ।

খুব জোরালো উত্তর। আমার কিন্তু সন্দেহ হয় একটু যেন অতিরিক্ত মাত্রায় জোরালো। বিশ্বাসে যথেষ্ট জোর থাকলে গলা এতটা তুলবার কোনো দরকার হ'তো না। একটা পীড়াদায়ক প্রচ্ছন্ন সংশয় কবির মন থেকে পাঠকের মনে সংক্রামিত হয়—মানুষও কি তবে শেষ পর্যন্ত বিধির বৃহৎ পরিহাসই? শুনেছি, আমি যখন খুব ছোটো ছিলাম তখন নিষ্ঠুর-রসিক গুরুজনেরা মাঝে-মধ্যে ভয় দেখাতেন—ঐ-আমগাছের মগডালে পেত্নী ব'সে আছে, তার এত বড়ো-বড়ো লাল চোখ, ইত্যাদি। আমি অনাবশ্যক উঁচু গলায় বারকয়েক ঘোষণা করতাম—হাম নহীঁ ডরতে, হাম নহীঁ ডরতে—বলতে-বলতেই কেঁদে ফেলতাম।

মানুষের আত্মা অমর, শারীরিক মৃত্যুতে তার ক্ষয় নেই—ধর্ম-শাস্ত্রের এই চলিত উত্তর দিচ্ছেন না রবীন্দ্রনাথ। মানুষ বিধির বৃহৎ পরিহাস নয় কেন বোঝাতে গিয়ে যে কথাগুলি বলছেন তা বেশ-একটু অন্যধরনের, রাবীন্দ্রিক এবং কাব্যিক :

ভেবেছি জেনেছি যাহা,
বলেছি শুনেছি যাহা কানে
সহসা গেঁথেছি যাহা গানে
ধরে নি তা মরণের বেড়াঘেরা প্রাণে
... ...
আমার মনের নৃত্য কতবার জীবন-মৃত্যুরে
লঙ্ঘিয়া চলিয়া গেছে চিরসুন্দরের সুরপুরে।

এ-সবই সত্য, তবু তাতে এইটুকুই প্রতিপন্ন হয় যে মানুষের সত্তা অসীম ঐশ্বর্য দিয়ে গড়া। প্রশ্ন থেকেই যায়—তবু কি মৃত্যুতে তার মহৎ সর্বনাশ ঘটে না? সর্বনাশকে মহৎ জেনে আমরা একপ্রকার ট্র্যাজিক আনন্দ পেতে পারি, যেমন পাই ওথেলো কিংবা কর্ডেলিয়ার সর্বনাশে। কিন্তু সর্বনাশ ঘটবে না এমন ভরসা পাবো কোথা থেকে? মৃত্যুকে আদর ক'রে 'শ্যামসমান' বললেও মৃত্যুতে মৃতের যাবতীয় অমূল্য চিন্তাশক্তি রসবোধ কর্মপ্রেরণা—এক কথায় তার অদ্বিতীয় ('ইউনিক') ব্যক্তিসত্তার অবসান ঘটে।

রবীন্দ্রনাথ কি তবে ইঙ্গিত করছেন যে এই জীবনের পরিধির মধ্যেই এমন কয়েকটি অমূল্য মুহূর্ত আসে—জ্ঞানে, শিল্পে, প্রেমে—যখন আমরা কালের সীমা ছাড়িয়ে যাই; কাজেই শরীরের সঙ্গে-সঙ্গে মনের (বা আত্মার) অবসান ঘটলেও ঐ ক'টি কালাতীত মুহূর্তে আমরা অমৃতের স্বাদ পাই, যদিচ প্রচলিত আক্ষরিক অর্থে মানুষ অমর নয়। মৃত্যু যাঁর ছায়া, অমৃতও যাঁর ছায়া—সেই মহান দেবতার কথা হয়তো স্মরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু অমৃতের সঙ্গে অমরতার ভেদ ঘুচিয়ে ফেলেননি। এই ভাবধারা ক্রমশ স্থিতি লাভ করবে পরবর্তী কাব্য-রচনায়।

'পূরবী' থেকে এগোবার আগে আর একবার পিছন ফিরে তাকানো যাক্ রবীন্দ্রকাব্য-বিবর্তনের স্বরূপটি বোঝবার জন্যে। নানা-প্রকারের দ্বন্দ্ব ও ভাবদ্বৈধ রবীন্দ্রনাথের কাব্যচেতনাকে বার-বার আলোড়িত করেছে। শেষ পর্বের কবিতায় সেটা সবচেয়ে সুস্পষ্ট এবং মর্মস্পর্শী, কিন্তু 'গীতাঞ্জলি'র অব্যবহিত পূর্বে রচিত 'খেয়া'তে তার প্রকাশ বড়ো সুন্দর, বড়ো মধুর। বইখানির নামকরণে আমাদের ধারণা হ'তে পারে যে পাল তুলে নৌকা চলেছে এ-পার থেকে ও-পার পানে, কবি পাড়ি দিয়েছেন এক কাব্যকুল থেকে অন্য কাব্যকুলে। কিন্তু 'খেয়া'র বেশিরভাগ কবিতাই ও-পারে যাবো কি যাবো না সেই

দোটানা ভাবের কবিতা। 'নৈবেদ্য' সাজিয়ে দিয়েছিলেন যে-দেবতার চরণে তাঁকে তিনি পেয়েছিলেন পূজ্যপাদ পিতৃদেবের কাছ থেকে। সে-পাওয়া রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সত্য হয়নি; বাইরে থেকে কোনো পাওয়াই সত্য হ'তে পারে না এত বড়ো স্বকীয় ও সৃষ্টিশীল প্রতিভার ক্ষেত্রে। তাঁর পক্ষে হওয়াটাই সত্য; ততটুকুই তিনি বাইরে থেকে নিতে পারেন যতটুকু তিনি সম্পূর্ণ আত্মসাৎ ক'রে নিজের বিকাশের উপকরণরূপে ব্যবহার করতে পারেন। একটি গোলাপ ফুল সূর্যরশ্মি থেকে, হাওয়া থেকে, মাটি থেকে অনেক-কিছু আহরণ করে, কিন্তু ফুলের মধ্যে সেই উপাদানগুলিকে সনাক্ত করার উপায় থাকে না। রবীন্দ্রনাথের মতো কবিসাধকের অন্তরের তৃষ্ণা মেটাতে পারবে যে-জল তা তাঁর বুকের পাঁজর ছিন্ন ক'রে বুকের ভিতর থেকেই উৎসারিত হবে একদিন। তাই 'নৈবেদ্য'-এর সমাপ্তি অনাবৃষ্টিতে, খরায় শুক্‌নো ফেটে-ফেটে-যাওয়া মাটির উপর দাঁড়িয়ে কবি প্রার্থনা করছেন ইন্দ্র-দেবের কাছে:

দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি, অতি দীর্ঘকাল,
হে ইন্দ্র, হৃদয়ে মম। দিক্‌চক্রবাল
ভয়ংকর শূন্য হেরি, নাই কোনোখানে
সরস সজল রেখা—কেহ নাহি আনে
নববারিবর্ষণের শ্যামল সংবাদ।

'খেয়া'র প্রথম কবিতাতেই পাই নববারিবর্ষণের শ্যামল সংবাদ; রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছেন যে সরস সজল সবুজ কাননভূমিতে গিয়ে তাঁর বুকভরা তৃষ্ণা মিটবে তা নদীর ও-পারে, খেয়া পার হ'তে হবে তাঁকে। আশা নিয়ে, খানিকটা আশঙ্কা নিয়ে, একপ্রকার বিষণ্ণ ব্যাকুলতা নিয়ে ব'সে আছেন নদীর পাড়ে এসে খেয়া-ঘাটের খুব কাছটাতে। তবু মনস্থির করতে পারছেন না।

ওরে আয়,
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিনশেষের শেষ খেয়ায়।

কে আর নিয়ে যাবে; তীরের মায়া, এ-পারের চেনা গ্রামের, চেনা মানুষের, চেনা জগতের মায়া ত্যাগ ক'রে সাহসে বুক বেঁধে নিজেই তাঁকে উঠে বসতে হবে যে-কোনো একটি খেয়া-নৌকায়, পাড়ি জমাতে হবে অজানা কূলের দিকে। কী আছে ও-পারে গোধূলির আবছায়ায় ঠিক দেখা যাচ্ছে না, তবু সেই ছায়াচ্ছন্ন কূলকে মনে হয় 'সোনার কূল', শোনা যায় কি না-যায় এমনি অত্যন্ত ক্ষীণ অশ্রুতপূর্ব কোনো গানের সুরও ভেসে আসছে যেন। গানের সুরে কেউ কি ডাকছে ও-পার থেকে? সেই ডাক শুনে বা শুনতে পেয়েছেন মনে ক'রে আমাদের সাধক কবি, রোম্যান্টিক কবি, বেরিয়ে পড়েছেন ঘর ছেড়ে। কিন্তু ঘাটে এসে দোটানায় পড়েছেন—অচেনার জন্য মন উৎসুক, অথচ চেনার টানে পা সরছে না নৌকার দিকে। "ঘরেও নহে, পারেও নহে, যে জন আছে মাঝখানে," তার দুঃখ কে বুঝবে? এই হ্যামলেটীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের আকুলতা, অস্থিরতা, বেদনা ও বিষাদ বইখানিকে আশ্চর্য কাব্যোৎকর্ষ দান করেছে।

না, রবীন্দ্রনাথ ও-পারে যাবেন না—"আমার নাই বা হল পারে যাওয়া"। এ-পারেই কত বিচিত্র কাজে ও অকাজে জীবন সার্থক হ'তে পারে না কি তাঁর? মানুষকে, চেনা এবং অচেনা মানুষকে, ভালো-বাসতে জানে যে-জন তার সব তৃষ্ণা কি মিটবে না এ-পারেই? ঈশ্বরকে না-পেলেও, না-চাইলেও তার জীবন শূন্য থাকবে না এতটুকুও।

হাতের কাছে, কোলের কাছে
যা আছে সেই অনেক আছে,
আমার সারা দিনের এই কি রে কাজ
ওপার পানে কেঁদে চাওয়া।

কিন্তু দ্বিচারী কবির মন যে মানে না, তাঁকে কাঁদতেই হয়, চাইতেই হয় ও-পার পানে। তিনি যে "পথিক পরাণ" নিয়ে জন্মেছেন, তাঁর কানে যে "চরণতলচুম্বিত পন্থবীণা" করুণ সুরে সদাই বাজছে। উপরের গানে নিজেকে বুঝিয়ে ভুলিয়ে শান্ত ক'রে আবার অস্থির হ'য়ে উঠলেন পরবর্তী একটি কবিতায় ; কবিতাটি বড়ো হৃদয়গ্রাহী, নামই "পথিক"। এই দরিদ্রা ধরণী এবং তার অসহায় মানব-সন্তানেরা মিনতি করছে :

পথিক ওগো পথিক, যাবে তুমি ?
        এখন যে গভীর ঘোর নিশা !
নদীর পারে তমালবনভূমি
        গহন ঘন অন্ধকারে মিশা।
    ...   ..
এ মেলা যদি না লাগে তব ভালো
        শান্তি যদি না মানে তব প্রাণ,
সভার তবে নিবায়ে দিব আলো,
        বাঁশির তবে থামায়ে দিব তান।
স্তব্ধ মোরা আঁধারে রব বসি
        ঝিল্লিরব উঠিবে জেগে বনে,
কৃষ্ণরাতে প্রাচীন ক্ষীণ শশী
        চক্ষে তব চাহিবে বাতায়নে।
        পথপাগল পথিক, রাখো কথা,
        নিশীথে তব কেন এ অধীরতা !

আচ্ছা, আমাদের দ্বৈতবাদী দ্বিচারী কবির পক্ষে কি সম্ভব নয় এ-পারকে ভালোবেসে এ-পারেই থাকা, আবার ও-পারের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে ও-পারেও যাওয়া ? কবিও তো স্কাইলার্ক-ধর্মী ; ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের স্কাইলার্কের পক্ষে যা সম্ভব হয়েছিলো, তাঁর পক্ষেই বা তা সম্ভব হবে না কেন ? এই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থীয় ভাবনা থেকে রচিত হ'লো "নীড় ও আকাশ" কবিতাখানি। কিন্তু কবির ভালোবাসা ও আনন্দ মাটি এবং আকাশে সমমাত্রায় বণ্টিত হয়নি ; শেষের স্তবকে নীড়ের প্রতি পক্ষপাত স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো :

তবু নীড়েই ফিরে আসি
এমনি কাঁদি এমনি হাসি,
তবু এই ভালোবাসি
আলোছায়ার বিচিত্র গান।

এ ব্যর্থ প্রয়াস ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ দিনান্তবেলায় ভাবতে লাগলেন— ও-পারে তাঁকে যেতেই হবে, এ-পারের আলোছায়ার বিচিত্র গান তো অনেক গেয়েছেন, আর কত? "এ-পারে কৃষি হল সারা / যাব ও-পারের ঘাটে।" গানটি সম্ভবত জীবনান্তের গান, কিন্তু আপাতত আমি তাকে লোকান্তর অর্থে, জগৎ ছেড়ে জগদীশ-অভিমুখে যাত্রা করার অর্থেই গ্রহণ করছি। তবু দেখি তাঁর দ্বিধা ঘুচতে চায় না, তাঁরই প্রিয় ফুল ভীরু মাধবীর মতন "আসিবে কি, ফিরিবে কি" করছেন। খেয়ার শেষ কবিতায়ও তিনি প্রথম কবিতার মতোই বিষণ্ণ, ব্যাকুল, কিন্তু ইচ্ছাশক্তি-রহিত। পাড়ি দেওয়া দূরে থাক্, আমাদের বড়ো আদরের কবি আদুরে ছেলের মতোই ঘাট ছেড়ে ঘরেই ফিরে এসেছেন। ঘরের দাওয়ায় ব'সেও কিন্তু নদীর ও-পারে দিনশেষের আবছা আলোয় অদৃশ্যপ্রায় তটরেখার দিকেই চেয়ে আছেন, তখনো ভাবছেন :

ভাঙিলে হাট দলে দলে
সবাই যাবে ঘাটে চলে
আমি তখন মনে করি
আমিও যাই ধেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে।

মনে করতে-করতে তাঁর আরো দু-এক বছর কেটে যাবে।

'খেয়া' বইখানি ছাড়বার আগে আমি তার একটি অত্যাশ্চর্য কবিতার কথা বলতে চাই যার তুলনা নেই কোথাও, রবীন্দ্রকাব্যের বিপুল অমূল্য রত্নভাণ্ডারেও আছে কিনা সন্দেহ। কবিতাটি দুই ভাগে বিভক্ত—"শুভক্ষণ" এবং "ত্যাগ"। সকলের জানা আছে এ-কবিতা :

ওগো মা
রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুখপথে।

ঘরে আসার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, যুবরাজ বিশ্বলোকের বিশ্বকাজে সর্বদা ব্যাপৃত, এই অখ্যাত গ্রামের একটি অতি সাধারণ মেয়ের মনের কথা তিনি ভাববেন কেন, জানবেনই বা কেমন ক'রে। মেয়েটির সীমিত একঘেয়ে জীবনে কিন্তু এটাই মাহেন্দ্রক্ষণ, সে যে জানালায় দাঁড়িয়ে রাজার দুলালকে শুধু একবার এক ঝলক দেখতে পাবে। না, না, রাজা তার দিকে দৃক্‌পাত করবেন না, করতেই পারেন না। তবু তাকে এমন সাজে সাজতে হবে, এমন ছাঁদে খোঁপা বাঁধতে হবে যাতে এই পরমক্ষণের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না হয়।

শুভক্ষণ এলো, রাজার রথ সম্মুখের পথ দিয়ে দ্রুত চ'লে গেলো, প্রভাতের আলোয় তার স্বর্ণশিখর ঝলমল ক'রে উঠলো। সেই মুহূর্তে মেয়েটি তার গলার হার ছিঁড়ে হারের মধ্যমণিটি ফেলে দিয়েছিলো পথের মাঝখানে রথের সামনে। রথ থামিয়ে রাজকুমার ঐ-মণিটি কুড়িয়ে আনবেন, হাতে নিয়ে প্রসন্ন মুখ তুলে এক পলকের জন্যও তাকাবেন তাঁর ভক্ত-প্রেমিকার অশ্রুছলছল চোখের পানে—এমন অসম্ভব আশাও জেগেছিলো অবোধ বালিকার মনে। ঈশ্বরের কাছে আমাদের সব প্রার্থনা, সব আশাই তো অসম্ভবের; অসম্ভব তার পূর্তি; আমরা সবাই সেখানে অবোধ বালক-বালিকা। মণি তো হৃদয়েরই প্রতীক এ-কবিতায়; হার-ছেঁড়া মণি তো নয়, বুক-ছেঁড়া প্রেম। এই প্রেমাঞ্জলি কেমন ক'রে গ্রহণ করলেন রাজাধিরাজ? তাঁর স্বর্ণরথের চাকার তলায় মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে ধুলায় মিশিয়ে দিয়ে। আর সবই বুঝতে পেরেছে এই অবুঝ রাজপ্রেমিকা, শুধু বুঝতে পারে না:

মা গো, কী হল তোমার, অবাক নয়নে
চাহিস কিসের তরে,

মা কি সমস্ত হৃদয় দিয়ে একদিনও ভালোবাসেনি তার হৃদয়ের রাজাকে ?

এমন উদাসীন, নির্মম, নিষ্ঠুর রাজার তুলাল 'গীতাঞ্জলি'র রাজার রাজা নন যিনি সিংহাসন থেকে নেমে আসেন, থেমে দাঁড়ান সামান্য-তম মানুষের দরজার সামনে, গুণহীনের গানখানি যাঁর প্রেমে বাজে। তবে এই সম্পূর্ণ নির্মম দেবতাই অধিকতর সত্য দেবতা। তাঁর সাক্ষাৎ পাবো আমরা শেষ পর্বে ; ভক্তিপর্বে তিনি প্রক্ষিপ্ত। জানি না কেমন ক'রে তাঁর পূর্বাভাস এখানে এসে প'ড়ে 'খেয়া'র এই কবিতাটিকে দেশকালাতীত মহিমা দান করেছে। অন্ধকার ঘরের ভয়ংকর নিষ্ঠুর রাজাকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি ভক্তিপর্বে রচিত 'রাজা' নাটকে, 'ডাকঘর'-এও তাঁর ইঙ্গিত রয়েছে। তবু গীতাখ্য তিনখানি বইতে ('গীতাঞ্জলি', 'গীতালি', 'গীতিমাল্য') তাঁর দেখা মেলে না।

'গীতাঞ্জলি'তে দেখি রবীন্দ্রনাথ সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ত্যাগ ক'রে খেয়া পার হ'য়ে পৌঁছেছেন সেই ঘোমটা-পরা ছায়ায় ঢাকা তীরে যার সোনালী তটরেখার দিকে তিনি বেশ কিছুকাল ধ'রে তাকিয়ে ছিলেন দোতুল্যমান চিত্তে। তাঁর নিজেরই মনের কুয়াসায় ঢাকা ছিল এ-দেশ। খেয়া নৌকা থেকে নেমে দেখেন ছায়ার ঘোমটা স'রে গেছে, চারিদিক আলোয় আলোকময়, সবই সুন্দর, সবই মধুর, সবই আনন্দে ভরপুর। এমন ক'রে তো কখনও ভালোবাসেননি তিনি, এমন ভালোবাসার লোক তো খুঁজে পাননি আগে।

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোক-ভূলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।

প্রেমের শত দুঃখের কথা তিনি শতবার গেয়েছেন, এই প্রথম দুঃখ তাঁর অসীম পাথার পার হ'য়ে এসে মিলিয়ে গেলো আকাশ থেকে আকাশে ধ্বনিত আনন্দের কলগানে ; এই প্রথম তিনি বুঝতে পারলেন

অশ্রুজলে ধোয়া নির্মল আনন্দ কাকে বলে। দুঃখ যে নেই তা নয়, কিন্তু দুঃখ এ-পারের আনন্দকে মলিন করা দূরে থাক্, আরো উজ্জ্বল ক'রে তোলে। দুঃখও যে এত ভালো লাগবে তা কি তিনি আগে জানতেন :

চারিদিকে সুধাভরা
ব্যাকুল শ্যামল ধরা
কাঁদায় রে অনুরাগে।
দেখা না পাই
ব্যথা পাই
সেও মনে ভালো লাগে।

দেখা না-পাওয়া কি কাঁদাতে পারে না, এমন কান্না কাঁদাতে পারে না যার কোনো সান্ত্বনা নেই কোথাও ? পারে হয়তো, কিন্তু 'গীতাঞ্জলি'র কবিকে নয়। বিরহিনী যেমন গভীর রাতে একলা পথে ঝড়ের হাওয়ায় নিবে-যাওয়া প্রদীপ হাতে চলেছেন অভিসারে, ও-দিক থেকে তাঁর প্রিয়তম তেমনি আসছেন দৃঢ় পদক্ষেপে, পদধ্বনি ক্রমশ স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে ; রাজার রাজাকে ঠেকাতে পারে এত বড়ো শক্তি কার ?

আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে,
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায়
রাখবে কোথায় ঢেকে।

চন্দ্রসূর্য তো আর ত্রিভুবনেশ্বরকে ঢেকে রাখতে পারে না, মানুষই পারে। কিন্তু সেইসব আলোহারা অসহায় সামান্য মানুষ কিংবা আলো-হরণকারী দানবিক শক্তিমত্ত মানুষের কথাকে রবীন্দ্রনাথ মনের মধ্যে স্থান দিচ্ছেন না এখন। মোটের উপর 'গীতাঞ্জলি' পর্বের মূলসুরটি হচ্ছে "তোমার প্রেমে আঘাত আছে নাইকো অবহেলা", আর শেষ পর্বের মূল সুর "উদাসীন জগতের ভীষণ স্তব্ধতা"।

'গীতালি'র বড়ো সুন্দর একটি গানের ব্যঞ্জনা আমার মনে জেগে

ওঠে ঐ-সময়কার সব মধুর রসকে ছাপিয়ে। এ-গানটি "শুভক্ষণ"-"ত্যাগ"-এর মতো ট্র্যাজিক মুডে রচিত নয়, তবু কোনো অশুভ লগ্নের দূরাগত গম্ভীর নিনাদে যেন পশ্চাৎপটখানি কেঁপে-কেঁপে উঠছে ভয়ে অথবা বেদনায় :

সরিয়ে দিয়ে আমার ঘুমের
পর্দাখানি
ডেকে গেল নিশীথরাতে
কে না জানি—

কে, কে সে ? প্রকৃতি ?

কোন্ গগনের দিশাহারা
তন্দ্রাবিহীন একটি তারা—

প্রকৃতিই বোধহয়। না কিন্তু :

কোন্ রজনীর দুঃস্বপনের
আর্তবাণী,—

আর্তবাণী কি রজনীর হ'তে পারে, রজনী কি দুঃস্বপ্ন দেখতে পারে ? ঘরের অন্ধকারে দুঃস্বপ্ন-পীড়িত মানুষই কঁকিয়ে উঠছে, বনের অন্ধকারে দিশাহারা, ঠোকর-খাওয়া মানুষের বুক থেকেই আসছে এ আর্ত কান্না।

আঁধার রাতে ভয় এসেছে
কোন্ সে নীড়ে।

কোনো দরিদ্র দম্পতি কি গভীর রাতে তাঁদের একমাত্র শিশুসন্তানের চিকিৎসাবিহীন রোগশয্যার পাশে ব'সে আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে শিউরে উঠছেন ?

বোঝাই তরী ডুবল কোথায়
পাষাণ-তীরে।

কত লক্ষ মানুষের বোঝাই তরী নিত্যই ডুবছে তীরের কাছে এসে পাষাণে ঠেকে। হ্যাঁ, লক্ষ-লক্ষ মানুষের কথাই ভাবছেন রবীন্দ্রনাথ ঐ-সময়কার এই ব্যতিক্রমী গানে :

এই ধরণীর বক্ষ টুটে
এ কী রোদন এল ছুটে
...   .
ডেকে গেল নিশীথরাতে
কে না জানি।

নীড়-ভাঙা তরী-ডোবা সব ভাগ্যহত মানুষের ভয়ার্ত চীৎকারে তিনি কার ডাক শুনতে পাচ্ছেন—ঈশ্বরের, না অনীশ্বরের? তবে কি এই আশ্চর্য সুন্দর কিন্তু অপ্রত্যাশিত কঠোর গানে 'গীতাঞ্জলি'র কবি শেষ ক'রে দিচ্ছেন ঈশ্বরপ্রেমের অধরা মাধুরীকে ছন্দে বাঁধবার পালা? এখনই কি গলা সাধবেন রৌদ্রী রাগিণীর প্রথম আলাপে? না তার দেরি আছে।

শান্তিনিকেতন মন্দিরে প্রদত্ত ভাষণগুলি এবং ঐ-সময়কার কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলিত হ'য়ে 'শান্তিনিকেতন' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। বইখানিকে 'গীতাঞ্জলি' পর্বের মোটের উপর শান্ত সমাহিত ভক্তি-রসাত্মক গান ও কবিতার ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা মনে করা যেতে পারে। "কর্মযোগ" প্রবন্ধে লিখছেন: "ইতিহাসের সুদূরপ্রসারিত ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের প্রশস্ত রাজপথে মানবাত্মা চলেছে মেঘমন্দ্রগর্জনে আপনার কর্মের বিজয়রথে, চলেছে বিশ্বের মধ্যে আপনার অধিকার বিস্তীর্ণ করতে।···তুমি কি অসাড় হয়ে চোখ বুজে বলতে চাও মানবাত্মার এই বিজয়রথের কোনো সারথী নেই।" শেষ পর্বে দেখা যায় বিজয়রথের রথী হয়েছে বিক্ষতচরণ পদাতিক, রাজপথ নিশ্চিহ্ন-প্রায়, সারথি গর-ঠিকানা। সারথির ঠিকানা যাঁর জানা আছে, এমন-কি সারথি কোনো অজ্ঞাত লোক থেকে মানবাত্মার রথ পরিচালনা করছেন এ হেন প্রত্যয় স্থির আছে যাঁর মনে, তিনি কি লিখতে পারেন :

ধর্মরাজ দিল যবে ধ্বংসের আদেশ
আপন হত্যার ভার আপনিই নিল মানুষেরা।
ভেবেছি পীড়িত মনে, পথভ্রষ্ট পথিক গ্রহের
অকস্মাৎ অপঘাতে একটি বিপুল চিতানলে
আগুন জ্বলে না কেন মহা এক সহমরণের।
তার পরে ভাবি মনে,
দুঃখে দুঃখে পাপ যদি নাহি পায় ক্ষয়
প্রলয়ের ভস্মক্ষেত্রে বীজ তার রবে সুপ্ত হয়ে,
নূতন সৃষ্টির বক্ষে
কণ্টকিয়া উঠিবে আবার।

(১৮, 'রোগশয্যায়')

সৃষ্টিকর্তার প্রতি অভিমান—যে-অভিমান তাঁকে অবিশ্বাসের প্রান্ত-ভূমিতে নিয়ে গেছে—এবং সৃষ্টির প্রতি, বিশেষত মানবিক জগতের প্রতি হতাশাজনিত বিক্ষোভ শেষ পর্বের একাধিক কবিতায় আবেগ-পূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। আর-একটি উদাহরণ দিই।

দেবতা যেথা পাতিবে আসনখানি
যদি তার ঠাঁই কোনোখানে নাই,
তবে, হে বজ্রপাণি,
এ ইতিহাসের শেষ অধ্যায়তলে
রুদ্রের বাণী দিক দাঁড়ি টানি
প্রলয়ের রোষানলে।
("পক্ষিমানব", 'নবজাতক')

শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথের মতন কবির মনের গভীরে হতাশা ও নৈরাশ্য কতখানি তীব্র হ'লে তিনি মনুষ্যজাতির এবং মাতা বসুন্ধরার সমূহ প্রলয় কামনা করতে পারেন তা ভাবতে গেলে আমার মতন অভক্ত পাঠকের মনেও ব্যথা লাগে। আরো ব্যথা লাগে যখন দেখি তিনি আঘাতের পর আঘাতে প্রায় ভেঙে-পড়া বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কী ব্যাকুল চেষ্টাই ক'রে যাচ্ছেন কবিতার পর কবিতায়। তার শেষ নিদর্শন বোধকরি মৃত্যুর ঠিক দু-মাস আগে লেখা 'শেষ লেখা'র ২-সংখ্যক কবিতা :

মৃত্যু দেখা দেয় এসে একান্তই অপরিবর্তনে,
এ বিশ্বে তাই সে সত্য নহে,
একথা নিশ্চিত মনে জানি।

এখানে যুক্তি এবং ভক্তি দুই-ই নিস্তেজ, করুণ ; "নিশ্চিত মনে জানি" অনিশ্চিত মনের আকুলতাই প্রকাশ করছে, নিশ্চিত জ্ঞান নয়। অন্তিম পর্বের একাধিক কাব্যসংকলনে দেখি হতাশার অন্ধকারের কবিতার পাশেই রয়েছে ম্রিয়মাণ অথচ জিজীবিষু আশার ক্ষীণ কম্পমান দীপশিখা। রবীন্দ্রনাথ যদি সত্যই শুনে থাকেন "মানুষ-জন্তুর

হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি", তবে কেমন ক'রে ভাবতে পারলেন এটা "প্রহসন", কেমন ক'রে বলতে পারলেন "এ প্রহসনের মধ্য অংকে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের" ? দুঃসহ নিষ্ঠুর বাস্তবকে "দুষ্ট স্বপন" ব'লে কি নিজেকে ভোলাতে চাইছেন আজও আটাত্তর বৎসর বয়সে লেখা "জন্মদিন" শীর্ষক কবিতাটিতে ? কয়েকটি দুষ্ট স্বপনের (যথা নাৎসি শক্তির) লোপ হ'তে আমরা দেখেছি অবশ্য ; সেই সঙ্গে দেখেছি কিছু সুষ্ঠু স্বপনের (যথা মার্কস্-কল্পিত সর্বপ্রকার শোষণমুক্ত স্বাধীন সমাজের) উবে যাওয়াও। ঐ-কবিতার শেষের দিকে সবিস্ময়ে পড়ি :

মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে-অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব,

কবিতায় বর্ণিত এমন নিদারুণ পরিস্থিতির সম্মুখীন যিনি, তাঁর মুখে বা মনে কি কোনো প্রকারের হাসি ফুটতে পারে ? "ধিক্কার হেনে যাব" বললে হংতো আরো সহজ শোনাতো। হয়তো তা-ই বলতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। "হাসি দিয়ে মারি যারে" তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করি ; অথচ পৃথিবীময় দুঃখ ও পাপের যে অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ রবীন্দ্রনাথকে শেষ বয়সে গভীরভাবে বিচলিত করেছিলো তাকে আর যা-ই ভাবি তুচ্ছ এবং উপহাসযোগ্য ভাবা যায় না। 'নবজাতক'-এর "জয়ধ্বনি" শীর্ষক কবিতাটিতে যখন বললেন :

অপূর্ণ শক্তির এই বিকৃতির লক্ষণ
দেখিয়াছি চারিদিকে সারাক্ষণ,
চিরন্তন মানবের মহিমারে তবু
উপহাস করি নাই কভু—

তখন অনেক বড়ো কথা বললেন তিনি। কিন্তু চিরন্তন মানবের মহিমা তো এখনো আদর্শরূপেই রয়েছে আমাদের সামনে, বাস্তবরূপ ধারণ

করেনি। ইতিমধ্যে এবং এখনো "নাগিনীরা ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস"। বিষাক্ত বায়ু সহ্য করতে না-পেরে কি মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ (চিরমানব) মারা যাবে, না-কি বলিষ্ঠ শুভবুদ্ধির সাহায্যে নাগিনীদের বধ ক'রে বাতাবরণ শুদ্ধ ক'রে মানুষ যাত্রা করবে "বহ্নিশয্যা মাড়াইয়া দলে দলে / দুঃখের সীমান্ত খুঁজিবারে" ? নিশ্চিত ক'রে কে দেবে তার উত্তর।

অমঙ্গলবোধে এমন যন্ত্রণাদগ্ধ কবির মনে শান্তি থাকতে পারে কি ? "শান্তিরে ঝড় যখন হানে / শান্তি তবু চায় সে প্রাণে"—এর চেয়ে আরো নিষ্ঠুর, আরো ধ্বংস-বিলাসী ঝড় নষ্ট করেছে ভগ্নস্বাস্থ্য জরাক্লিষ্ট কবির শান্তি। বলা প্রয়োজন যে ঐ-সময়ে রবীন্দ্রনাথকে নিজের দৈহিক ব্যাধি ও জরার চেয়ে অনেক বেশি বিচলিত ক'রে তুলেছিলো আধুনিক সভ্যতার ব্যাধি ও জরা। তাই এমন আকুলতা, এমন নিরাশ্রয়তা, এমন একাকীত্ব। একটি প্রিয়মুখ শয্যার পাশে দেখতে না-পেলে সন্ত্রস্ত হৃদয়ে বোধ করেন "পৃথিবী পায়ের নীচে চুপি-চুপি করিছে মন্ত্রণা / সরে যাবে বলে" ; উৎকণ্ঠায় দুই বাহু তুলে "শূন্য আকাশেরে" ধরতে চান। 'শূন্য' বিশেষণটা লক্ষণীয় ; নিশ্চয়ই তার মানে মেঘশূন্য বা তারকাশূন্য নয় ; দেবতাশূন্য অর্থ করলেই অর্থসঙ্গতি রক্ষা হয়। সন্ত্রাস অবশ্য কেটে যায়, শান্তি ফিরে আসে। কিন্তু আশ্চর্য সে-শান্তি ; যেন আতঙ্ক আর হতাশার উপাদান দিয়েই গড়া।

> চমকিয়া স্বপ্ন যায় ভেঙে ;
> দেখি. তুমি নতশিরে বুনিছ পশম
> বসি মোর পাশে
> সৃষ্টির অমোঘ শান্তি সমর্থন করি।

প্রবন্ধের গোড়ার দিকে এই পঙক্তিগুলির সঙ্গে য়েট্সের কয়েকটি পঙক্তির তুলনা করেছিলাম, এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি প্রতিতুলনার দিকে। রবীন্দ্রনাথের এই ক্ষুদ্র কবিতাটির ব্যঞ্জনা বিরাট। জাগতিক

শান্তি ও মঙ্গল পশম-বোনা দুটি ক্ষীণ অসহায় ক্ষণভঙ্গুর বাহুস্তম্ভের উপর ভর ক'রে আছে, এর চেয়ে দৃঢ়তর স্থায়ীতর কোনো ভিত্তি কি নেই তার? 'অমোঘ' শব্দটি মনে হয় কোনো পূর্ব পর্ব থেকে ছিটকে এসে পড়েছে, রবাহুত অতিথির জন্য আসন পাতা নেই এখানে।

আগেই বলেছি শেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথের প্রধান ভাব ট্র্যাজিক চেতনা। অল্পসংখ্যক কবিতায় ব্যক্ত হ'লেও প্রধান, 'পরিশেষ' থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত কাব্যগুলির উপর চোখ বুলিয়ে গেলে এই ভাবটাই সবচেয়ে গভীর রেখাপাত করে আমাদের মনে, অন্তত আমার মনে। তার অত্যুৎকৃষ্ট প্রকাশ 'সেঁজুতি'র "তীর্থযাত্রিণী" কবিতাটি। এক বৃদ্ধা, হাতে নামজপ-ঝুলি আর পাশে পুঁটুলি নিয়ে "জীবনের পথে শেষ আধক্রোশটুকু" পার হবার জন্য সারাদিন ধ'রে ব'সে আছে মফস্বলের কোনো ছোটো ইস্টেশনে তীর্থগামী ট্রেন ধরবে ব'লে। এই অখ্যাত গ্রামের অজ্ঞাত মেয়ে একদিন যৌবনের পাত্র ভ'রে পেয়েছিলো কিছু, দিয়েছিলো কিছু "মধু মদিরার রসে বেদনার নেশা।" কিন্তু সে-পাত্র এখন শূন্য, সে-কাহিনী আজ দূরস্মৃত। তবু কোনো পূর্ণ কুম্ভের দুর্মর আশায় ভোরবেলা থেকে সে ব'সে আছে অন্য-এক বহুদূরের জন্য।

পরিত্যক্ত একা বসি ভাবিতেছে, পাবে বুঝি দূরে
সংসারের গ্লানি ফেলে স্বর্গঘেঁষা দুর্মূল্য কিছুরে।
হায়, সেই কিছু
যাবে ওর আগে আগে প্রেতসম, ও চলিবে পিছু
ক্ষীণালোকে; প্রতিদিন ধরি-ধরি করি তারে
অবশেষে মিলাবে আঁধারে।

'দূর' শব্দটি রবীন্দ্রনাথের (এবং প্রায় সব রোম্যান্টিক কবির) বড়ো প্রিয়, এই সে-দিন পর্যন্ত কত রঙীন স্বপ্ন, কত রক্তিম ভাবাবেগ জাগিয়ে তাঁর 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে 'মহুয়া' পর্যন্ত কাব্যে মাধুরী এনেছে,

গানকে অধরা করেছে। "আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী," "দূরে কোথায় দূরে দূরে / আমার মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে", "দূরদেশী সেই রাখালছেলে", "দূরের বন্ধু সুরের দূতীরে" ; আরো কত। কখনো-বা ক্লান্তি এসেছে দেহে, প্রশ্ন ও আশঙ্কা জেগেছে মনে, যেমন 'সোনার তরী'র শ্রেষ্ঠ কবিতায় : "আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে / হে সুন্দরী ?" "আশার স্বপন" যদি না-ও ফলে সেই দূর দেশে, তবু "স্নিগ্ধ মরণ আছে কি হোথায় ?" যে-দেশে রয়েছি আমরা সে-দেশের মরণ অবশ্য কুৎসিত যন্ত্রণাময়, তবে দূর পারে যেখানে নিয়ে যাচ্ছে সোনার তরী বেয়ে তাঁর মানসসুন্দরী, সেখানে মরণ নিশ্চয়ই সুন্দর, স্নিগ্ধ ("স্নিগ্ধ মরণ" কি কীট্‌স্‌-এর "easeful death"-এর ভাষান্তর ?)। কিন্তু চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে ব্যবধান বড়ো বেশি রেখেছেন ভগবান ; যিনি চেয়েছিলেন "To cease upon the midnight with no pain", তাঁকে বৎসরাধিক কাল কঠোর যন্ত্রণা পেতে হয়েছিলো ; রবীন্দ্রনাথও শেষ দু-তিন বছর রোগযন্ত্রণায় ভুগেছিলেন। তবু যন্ত্রণা সহ্য করার মধ্যে একটা মহিমা থাকে, যদি যন্ত্রণা নিরর্থক না হয়, কোনো সার্থকতার তীর্থে পৌঁছবার পাথেয় হিসাবে গণ্য হ'তে পারে। কিন্তু পরিত্যক্তা তীর্থযাত্রিণীর মৃত্যু ঘটবে কেবল রিক্ততার মধ্যে শূন্যের পিছনে ছুটতে-ছুটতে ; তার অবসন্ন জীবনের ক্ষীণালোক ক্ষীণতর হবে, "অবশেষে মিলাবে আঁধারে"।

রবীন্দ্রনাথ কি বলতে চাইছেন : মানুষের, সাধারণ সব মানুষের, তীর্থযাত্রা গোড়া থেকেই ব্যর্থতার অভিশাপ বহন ক'রে চলেছে, তার সব অন্বেষণই মরীচিকা-অন্বেষণ ? "স্বর্গঘেঁষা দুর্মূল্য কিছু" কোথাও নেই, তার উপচ্ছায়া শুধু দেখা যায় সামনে, অথচ বেশ খানিকটা দূরে। এ-দূরত্ব কখনোই হ্রাস পাবে না, আমরা যত এগিয়ে যাই না কেন, প্রেতচ্ছায়াটি স'রে যাবে তত দূরেই।

হমকো মালুম হৈ জিন্নৎ কী হকীকৎ লেকিন
দিলকে বহ্‌লানেকো গালিব য়হ খয়াল আচ্ছা হৈ।

(স্বর্গের সত্য-মিথ্যা আমার বেশ জানা আছে, তবে / মনকে ভোলাবার জন্য, গালিব, কল্পনাটা মন্দ নয়।)

অথবা সাত্র্‌-এর ভাষায় বলতে পারি—man is a useless passion। শুধু দুঃসাধ্য নয়, অসাধ্যের পিছনে ছুটে-ছুটে আয়ুক্ষয় করবে—এই তো মানব-জন্ম। সব পথ এসে মিলে গেছে সেই পথে যার কোনো শেষ নেই, উদ্দেশ্য নেই; তাই তো "হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া ব্যথা চলেছে নিরুদ্দেশে"।

তীর্থযাত্রিণীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় ইস্টেশনে, ইস্টেশনেই সে ব'সে আছে ঘণ্টাব পর ঘণ্টা অপেক্ষা ক'রে। জানে না কখন আসবে ট্রেন, তবু ভাবে আসবে নিশ্চয়ই এক সময়ে; আর ভাবে :

ভোর হতে ধৈর্য ধরি বসি ইস্টেশনে
অস্পষ্ট ভাবনা আসে মনে,
আর কোনো ইস্টেশনে আছে যেন আব কোনো ঠাঁই,
যেথা সব ব্যর্থতাই
আপনায়
হারানো অর্ঘ্যেরে ফিরে পায়,

কিন্তু সে-ইস্টেশনে পৌঁছানো তীর্থযাত্রিণীর ভাগ্যে নেই, তার বহু পূর্বেই বৃদ্ধার অবশিষ্ট সব ধ্যান জ্ঞান জীবন "মিলাবে আঁধারে"।

কবি কি পৌঁছতে পেরেছিলেন সেই ইস্টেশনে? সম্ভবত। বছর সাতেক পরে লেখা 'নবজাতক'-এর একটি কবিতার শিরোনাম "ইস্টেশন"। প্রথম পঙক্তিতেই শুনি—"সকাল বিকাল ইস্টেশনে আসি।" এত ঘন-ঘন? ইস্টেশন কি এত কাছে, পথ কি এত সুগম? হয়তো উক্তিতে লেগেছে কাব্যের রঙ, সংক্ষেপে যাকে আমরা অতিরঞ্জন বলি। তবু বিশ্বাস করা শক্ত নয় যে মাঝে-মাঝে কবি সেই মায়াবী

ইস্টেশনের সন্ধান পান যার সান্নিধ্যে তাঁর হৃদয়মন এক স্তর থেকে আর-এক স্তরে উঠে যায়। যাত্রীদের ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে ট্রেনে ওঠা-নামার বর্ণনায় ট্র্যাজেডির আভাস রয়েছে সর্বত্রই, বিশেষত উপান্ত স্তবকে :

'গেল গেল' বলে যারা
ফুকরে কেঁদে ওঠে
ক্ষণেক পরে কান্না-সমেত
তারাই পিছে ছোটে।

বর্ণনার শেষে অন্তিম স্তবকে কবিতাটি হ'য়ে ওঠে চিন্তাগর্ভ, বহন করে, কবির ভাষায়, কিছু "মননজাত অভিজ্ঞতা"।

চিত্রকরের বিশ্বভুবনখানি—
এই কথাটাই নিলেম মনে মানি।
কর্মকারের নয় এ গড়া পেটা—
আঁকড়ে ধরার জিনিষ এ নয়,
দেখার জিনিষ এটা।

আমরা তো এতদিন জানতাম যে গড়া-পেটাই চলছে বিশ্বভুবনময়, বিশেষত আমাদের এই "মহাবীর্যবতী" পৃথিবীতে। চারিদিকে একবার চাইলে দেখতে পাবো কত দুঃখ, কত ব্যর্থতা, কত নির্যাতন, কত কলুষিত মনন ও আচরণ; দেখবো পাপী অনেক ক্ষেত্রে সুখেই দিন কাটাচ্ছে, আর পুণ্যাত্মাদের মধ্যে অনেকের দুঃখ-যন্ত্রণার শেষ নেই। এত দুঃখের কারণ কী? ১৩১৪ সালে লেখা "দুঃখ" শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিশদ ক'রে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে সৃষ্টিকর্তা তো একটি ফুৎকারে জগৎ সৃষ্টি ক'রে হাত গুটিয়ে ব'সে নেই। অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত সৃষ্টিকর্ম চলছে, চলবে। এইখানে সাধারণ শিল্পীর সঙ্গে তাঁর তফাৎ। দুঃখের মূল কারণ এই যে সৃষ্টি অপূর্ণ, আজো পর্যন্ত খুবই অপূর্ণ, নানা দোষ ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে ভুবনজোড়া। কিন্তু জাগতিক অবিরাম পরিবর্তনের একটা ডিরেক্শন আছে, একটা

উদ্দেশ্য আছে। কালস্রোতে ভেসে উঠছে কত নক্ষত্রলোক, কত সৌরমণ্ডল, কত পৃথিবী। সবই চলেছে অপূর্ণ থেকে পূর্ণের দিকে। অবাধ নয়, তবু অমোঘ সে-গতি। "অপূর্ণের মধ্য দিয়া নহিলে পূর্ণের প্রকাশ হইবে কেমন করিয়া?" উপরন্তু, সৃষ্টি "কার্যকারণে আবদ্ধ"। কোথাও প্রবল বন্যায় নগর গ্রাম ক্ষেত খামার সব জলে ডুবে যাচ্ছে, হাজার-হাজার লোক মরছে, লক্ষ-লক্ষ লোকের সর্বনাশ হচ্ছে; এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে করুণাময় ভগবান তক্ষুনি বন্যার জল সরিয়ে দিয়ে সব আগের মতো বা আরো ভালো ক'রে দেবেন—সেটি হবার জো নেই। প্রকৃতি সর্বদা ও সর্বত্র নিয়মমতো চলে, নিয়মমতো বাঁচায় ও মারে। প্রাকৃতিক বিধানে ব্যাঘাত ও ব্যতিক্রম ঘটানো বিধাতার স্বভাব নয়। মানুষ যত দুঃখই পাক, তার কোনো দৈবী তাৎক্ষণিক প্রতিকার নেই। শেষ অবধি প্রতিকার আছে অবশ্য, কিন্তু আমাদের ধৈর্য ধ'রে প্রতীক্ষা করতে হবে তার জন্য। মানুষের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি এবং শুভ-বুদ্ধিই প্রতিকারের ব্যবস্থা করবে, তবে এ দুই বুদ্ধির উন্মেষ বড়োই মন্থর। তবু নিজের উপর এবং ভগবানের উপর ভরসা হারালে চলবে না।

রবীন্দ্রনাথের মনে সে-সময়ে এবং তার পরে আরো দুই দশক সন্দেহ ছিলো না যে সৃষ্টি চলেছে মন্থর কিন্তু দুর্নিবার গতিতে অপূর্ণ থেকে পূর্ণের দিকে। এই বিশ্বাসকে ভগবৎবিশ্বাস বললে কিছু ভুল বলা হয় না। মোদ্দা কথা এই যে সৃষ্টিময় গড়া-পেটা চলছে ইম্‌পর্ফেক্টকে পর্ফেক্ট করার জন্য। সেই গড়া-পেটার হাতুড়ি যখন আমাদের গায়ের উপর পড়ে, তখন আমাদের বুক থেকে হাহাকার রব ওঠে। উঠুক। এইভাবে তো সৃষ্টি সম্পূর্ণ হবে, জগৎ ঈশাবাস্যম্ হবে, মর্তে প্রতিষ্ঠিত হবে স্বর্গরাজ্য। নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে।

এই অনাদ্যন্ত সৃষ্টির প্রতি, তার ঈশ্বর-নির্দিষ্ট অমোঘ প্রগতির প্রতি, আস্থা হারিয়ে আজ বলছেন—না, ঈশ্বর কর্মকারের মতো গ'ড়ে-

পিটে জড় থেকে জীব, জীব থেকে মানুষ, মানুষ থেকে মহামানব তৈরী করছেন না। তৈরী হচ্ছে কিছু, কিন্তু তার পিছনে কোনো ঐক্যবদ্ধ একনিষ্ঠ সংকল্প নেই। পরম চিত্রকর মনের খেয়ালে, মনের আনন্দে ছবির পর ছবি এঁকে যাচ্ছেন, একদিকে মুছে ফেলছেন, অন্যদিকে নতুন রঙ লাগাচ্ছেন, অরূপকে রূপ দিচ্ছেন, বিরূপকে যে সর্বদা বর্জন করছেন তা নয়। কবির চোখে আমরা দেখি "রূপ-বিরূপের নৃত্য একসঙ্গে নিত্যকাল চলে"; দেখি কোথাও কোনো দায়িত্ব নেই, কোনো অঙ্গীকার নেই, দেশকালব্যাপী কোনো মহাপরিকল্পনা নেই; আছে শুধু খেয়াল, শুধু খুশী। পরম শিল্পীর মনে কোনো মমতা পর্যন্ত নেই নিজের সৃষ্টির প্রতি; তাঁর দক্ষিণ হাতের কাজ শেষ হ'তে-না-হ'তেই বাঁ হাত মুহূর্তমাত্র দ্বিধা না-ক'রে সেটা মুছে ফেলে :

এক তুলি ছবিখানা এঁকে দেয়,
আর তুলি কালি তাহে মেখে দেয়।

শেষ পর্বে সোজাসুজি ভগবানকে সম্বোধন ক'রে লেখা কবিতার সংখ্যা খুবই কম। সেই অত্যল্প সংখ্যক কবিতার মধ্যে একটি হচ্ছে 'বীথিকা'র "নমস্কার" :

প্রভু, সৃষ্টিতে তব আনন্দ আছে
মমত্ব নাই তবু
ভাঙায় গড়ায় সমান তোমার লীলা।
… … …
দুঃখ লজ্জা ভয়
ব্যাপিয়া চলেছে উগ্র যাতনা
মানববিশ্বময়,
সেই বেদনায় লভিছে জন্ম
বীরের বিপুল জয়।

বীরের বীরত্ব দেখে জয়ধ্বনি অবশ্যই করবো আমরা, কিন্তু যে বিপুল-সংখ্যক মানুষ উগ্র যাতনায় হাহাকার করছে, তাদের যাতনা কি তাতে

উপশমিত হবে? আর কি কোনো সান্ত্বনা নেই তাদের জন্য? 'নবজাতক'-এরই অন্য-একটি কবিতা "রোম্যান্টিক"-এ বলেছেন বটে :

> যেথা ঐ বাস্তব জগৎ···
> দৈন্য সেথা, ব্যাধি সেথা, সেথায় কুশ্রীতা,
> সেথায় রমণী দস্যুভীতা—
> সেথায় উত্তরী ফেলি পরি বর্ম ;
> সেথায় নির্মম কর্ম।

কিন্তু নির্মম কর্মের অধিকারী কর্মপ্রিয় রবীন্দ্রনাথ হ'তে পারলেন না। অনধিকারের বেদনাই ব্যক্ত ক'রে গেলেন কয়েকটি সুন্দর কবিতায়।

সে যা-ই হোক্, রবীন্দ্রনাথ শেষ অবধি (গোড়া থেকেই সে-চেষ্টা ছিলো) সান্ত্বনা খুঁজে পেলেন—সান্ত্বনা নয়, সুখদুঃখবর্জিত নির্লিপ্ত প্রশান্তি—বিশ্বচিত্রকরের চিত্র দেখে, বলতে পারলেন : "ভালো লেগেছে, ভালোবেসেছি।" বৈদিক ঋষিদের ভাষায় বললেন : ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি। ভূমাতেই সুখ, ব্যক্তিতে সুখ নেই। নিজের ব্যক্তিসীমা ছাড়িয়ে উঠতে হবে, অপরকেও দেখতে হবে তার বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিরূপে নয়, ভূমার অঙ্গরূপে। ঋষিদের কথা জানি না, কিন্তু মানতে বাধা নেই যে এমন সীমাহীন দেশকালে সম্প্রসারিত দৃষ্টি ও তজ্জনিত প্রশান্তি—যাকে নান্দনিক দৃষ্টি ও আনন্দ বলা যায়—মহাকবির আয়ত্তগম্য হ'তে পারে। কেপলর-নিউটনের সময় থেকে বৈজ্ঞানিকরা ব'লে এসেছেন জাগতিক পরোৎকর্ষের কথা, পিথাগোরাসের music of the spheres এখনো তাঁরা শোনেন কান পেতে, বরঞ্চ সে-সঙ্গীত আজ বেটোফেন-সিম্ফনির ধ্বনি-ঐশ্বর্য লাভ করেছে। সম্প্রতিকালের এক শীর্ষস্থানীয় পদার্থবিজ্ঞানী ওয়াইৎসেকর বলেন—বিশ্বব্যাপারের অশেষ জটিলতা এমন সরল কয়েকটি নিয়মের সূত্রে গ্রথিত যে ভাবতে গেলে বিস্ময়ে অবাক হ'তে হয় : "Such a world possesses the greatest intellectual beauty"। কবিরা যখন জগৎকে সুন্দর

বলেন তখন 'সুন্দর' শব্দটা স্বভাবতই আরো বিস্তার লাভ করে, বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের ও ইন্দ্রিয়েরও সন্তোষ প্রকাশ করে।

আকাশে-আকাশে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত রাগিনীর অশ্রুত মাধুরী পিথাগোরাস একাই ভোগ করেননি, আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষি-কবিরাও ব'লে গেছেন মহাবিশ্বের গগনপটে লেখা কাব্যের কথা, বলেছেন—"দেবস্য পশ্য কাব্যম্"। রবীন্দ্রনাথের মতন কবি যে হৃৎ-পিণ্ডের স্পন্দনে অনুভব করবেন না এই বিশ্বজোড়া কবিতার ছন্দ, তা আমরা ভাবতেই পারি না। বিশ্বজগতে সুন্দরের প্রকাশ কখনো সঙ্গীত হ'য়ে কবির কর্ণে ও মর্মে বাজে, কখনো-বা চিত্রধর্ম ধারণ ক'রে তাঁর নয়নমনকে উদ্ভাসিত করে :

> ঐ তো আকাশে দেখি স্তরে স্তরে পাপড়ি মেলিয়া
> জ্যোতির্ময় বিরাট গোলাপ।

'বিরাট গোলাপ'-এর চেয়ে আরো লাগসই, আরো সার্থক উপমা পাই 'নবজাতক'-এ, "জয়ধ্বনি" কবিতাটিতে :

> প্রত্যক্ষ দেখেছি যথা
> দৃষ্টির সম্মুখে হিমাদ্রিরাজের সমগ্রতা,
> গুহাগহ্বরের যত ভাঙাচোরা রেখাগুলো তারে
> পারে নি বিদ্রূপ করিবারে।

হয়তো এরই কৈফিয়ৎস্বরূপ ১৩৪৭ সালে একটি প্রবন্ধে লিখলেন : "বস্তু যা পেয়েছি তার চেয়ে রস পেয়েছি অনেক বেশি। আজ বুঝতে পারি এই জন্যই আমার আসা। আমি সাধু নই, সাধক নই, বিশ্বরচনার অমৃত-স্বাদের আমি যাচনদার। বারবার বলতে এসেছি—ভালো লাগল আমার। ···জগতে কাজ করবার লোকের ডাক পড়ে, চেয়ে দেখার লোকেরও আহ্বান আছে। আমার মধ্যে এই চেয়ে দেখার ঔৎসুক্যকে নিত্য পূর্ণ করবার আবেগ আমি অনুভব করি।"

সেই আহ্বান অনুভব করেছিলেন তাঁর সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ উর্দু কবি ইকবালও। একটি সুন্দর গজলের প্রথম দুটি পঙক্তি এই :

গুলজারে হস্ত্ ও বূদ ন তু বেগানাওয়ার দেখ্
দেখনে কী চীজ হৈ ইসে তু বারবার দেখ্।

(আছে এবং ছিল-র বাগানকে উদাসীন চোখে দেখো না ; / দেখবার জিনিষ এটা, বারবার চেয়ে দেখো।)

একই আহ্বান অনুভব করেছিলেন জর্মান ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি গ্যোটেও ;

To see I was born,
To look is my call
To the tower sworn,
I delight in all.
... ...
You blessed eyes,
What you saw everywhere,
It be as it may,
It was, oh, so fair!
(Walter Kauffman's translation from *Faust*)

ঐ উপান্ত পঙক্তিটিতে (It be as it may) উহ্য রয়েছে যাবতীয় মানবিক যন্ত্রণা অক্ষমতা ও ব্যর্থতাবোধ।

গ্যোটে-বর্ণিত মীনার চূড়া থেকে যখন রবীন্দ্রনাথ নেমে আসেন—নামতেই হয় তাঁকে—"জন্মমৃত্যুর সংকীর্ণ সংগমস্থলে" ভাসমান ব্যক্তি-জগতে, তখন দেখেন "সেখানে নিবিড় নিগূঢ় কালিমা অপেক্ষা করছে মৃত্যুর হাতের মার্জনা।" অথচ প্রত্যেকটি ব্যক্তির স্বতন্ত্র ব্যক্তিস্বরূপের মূল্য অন্তত কবির চোখে অন্য যে-কোনো মূল্য অপেক্ষা হেয় হ'তেই পারে না। নগণ্যতম মানুষও বিপুল (অসীম বললেও ভুল বলা হয় না) সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে ; অনেক-কিছু করবে সে, হবে সে, দেবে সে—কী তা সে নিজেই ঠিক জানে না, শুধু একটা অবিরাম

অজর দুরন্ত তাগিদ অনুভব করে নিজের মনের গভীর তলে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

অথচ সেই অপার সম্ভাবনার কত ক্ষুদ্র ভগ্নাংশই বাস্তবায়িত হয় তার অক্ষম সাধনায় এবং অবন্ধু প্রাকৃতিক ও মানবিক পরিবেশে। যাঁরা দেহে-মনে সক্ষম, ভাগ্য দেবতার বরপুত্র, লোকচক্ষে কীর্তিমান, তাঁরা কি বার্ধক্যে পৌঁছে ভাবতে পেরেছেন আমার যা হবার তা হয়েছি, যা করবার তা করেছি, এবার যেন সবক'টি পাপড়ি মেলে-ধরা ফুলের মতো ঝ'রে যাই। গালিব একটি অবিস্মরণীয় বয়েতে ব'লে গেছেন :

বস্ হুজুমে না-উমীদী খাকমেঁ মিল জায়েগী
য়হ্ জো এক লজ্জৎ হমারী স'য়ী-এ বেহাসিল মেঁ হৈ।

(হতাশার ভিড় আর যেন না বাড়ে, ছাই হ'য়ে যাবে / যে-স্বাদুতা আমার বিফল প্রয়াসে এখনো রয়েছে।)

গান্ধীজী নিহত হলেন উনআশী বছর বয়সে ; কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড়ো একটি কাজ—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ ও হরিজনদের নিয়ে পরস্পর প্রীতিপূর্ণ একজাতি গঠন করবার কাজ—তখন সবে শুরু হয়েছিলো। অন্য বড়ো কাজ দেশের প্রত্যেকটি বঞ্চিত নরনারীর চোখের জল মুছে ফেলা—তখনো শুরুই হয়নি। রবীন্দ্রনাথ কি "আশি বছরের আয়ুঃ ক্ষেত্রে" পদার্পণ ক'রে ভাবতে পেরেছিলেন তাঁর বিকাশ, তাঁর প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়েছে ? রোগশয্যায় তিনি দেখতে পেয়েছিলেন আকাশময় এক বিরাট গোলাপ ; নিজের মনের ভিতরের কুঁড়িটিকে কি গোলাপ হ'য়ে ফুটে উঠতে দেখে গেলেন ? তবে কি লিখতে পারতেন :

আছ আর নাই মিলে অসম্পূর্ণ তব সত্তাখানি
আপন গদগদ বাণী
পারে না করিতে ব্যক্ত, অশক্তির নিষ্ঠুর বিদ্রোহে
বাধা পায় প্রকাশ-আগ্রহে
মাঝখানে থেমে যায় মৃত্যুর শাসনে।

তোমার যে-সম্ভাষণে
জানাইতে চেয়েছিলে নিখিলেরে নিজ পরিচয়
হঠাৎ কি তাহার বিলয়,
কোথাও কি নাই তার শেষ সার্থকতা।
তবে কেন পঙ্গু সৃষ্টি, খণ্ডিত এ অস্তিত্বের ব্যথা।
অপূর্ণতা আপনার বেদনায়
পূর্ণের আশ্বাস যদি নাহি পায়,
তবে রাত্রিদিন হেন
আপনার সাথে তার এত দ্বন্দ্ব কেন।
ক্ষুদ্র বীজ মৃত্তিকার সাথে যুঝি
অঙ্কুরি উঠিতে চাহে আলোকের মাঝে মুক্তি খুঁজি।
সে মুক্তি না যদি সত্য হয়
অন্ধ মূক দুঃখে তার হবে কি অনন্ত পরাজয়।
("অপূর্ণ", 'পরিশেষ')

কবিতার শেষ প্রশ্নটি একটু যেন আলংকারিক, প্রশ্নের ভঙ্গিমায় উহ্য রয়েছে ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারিত একটি আশানুরূপ উত্তর—মৃত্তিকার সঙ্গে যুঝে আমার অন্তরের বীজ অঙ্কুরিত হ'য়ে উঠবে একদিন, অন্ধ মূক দুঃখে তার অনন্ত পরাজয় হবে না। এই আশা বছরে-বছরে ক্ষীণ হ'তে লাগলো। 'পরিশেষ'-এ এর অব্যবহিত পরবর্তী কবিতা "আমি"-তে নিজেকে বোঝাচ্ছেন : এই খণ্ড-খণ্ড কোটি-কোটি আমি তো স্বতন্ত্ররূপে সত্য নয়, "ভূত ভবিষ্যৎ লয়ে যে বিরাট অখণ্ড বিরাজে / সে মানব মাঝে"ই সত্য, আর সে অখণ্ড মানবসত্তার তো ক্ষয় নেই, মৃত্যু নেই। আপাতত আধুনিক বিজ্ঞানের বিরুদ্ধ সাক্ষ্য অগ্রাহ্য ক'রে আমরা ধ'রেই নিচ্ছি কঁৎ-এর মতন যে মানবসত্তা অমর এবং অনন্ত উন্নতির পথে চলেছে। কিন্তু ব্যক্তির সত্যতা, ব্যক্তির পূর্ণতা নিজ ব্যক্তিত্বের সীমানাকে সম্পূর্ণ বিলোপ ক'রে দিয়ে অনন্ত মানবসত্তায় এক হ'য়ে যাওয়াতেই—এ-কথা খুশী মনে নিঃশেষে মেনে নেওয়া কি শারীরিক ও মানসিক অনন্ত তৃষ্ণায় ভরপুর মানুষের পক্ষে সম্ভব? সর্বমানুষের প্রতি মৈত্রীভাবনা এবং সাধ্যমতো হিতৈষণাকে প্রত্যেক ব্যক্তির পুরুষার্থ

ভাবাই সঙ্গত। কিন্তু সবাইকে ভালোবাসতে শেখা মানে সকলের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলা নয়, স্বার্থত্যাগ মানে আত্মবিলোপ নয়। মুনি-ঋষিরা সাধুসন্ন্যাসীরা যতই কেন বলুন না ব্যক্তির সঙ্গে ভূমার সম্পর্ক বিন্দুর সঙ্গে সিন্ধু-বৎ, কবি তো সে-কথা সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারেন না। ব্যক্তিস্বরূপ বলতে যা বোঝায় তা সত্য এবং অমূল্য; বিন্দুর কোনো স্বরূপ নেই, গুণগত স্বাতন্ত্র্য নেই।

চার বছর পরে লেখা 'শেষ সপ্তক'-এর একাধিক কবিতায় প্রত্যাশার রেশটুকু আর পাওয়া যায় না, "অপূর্ণ" কবিতাটির ক্ষীণাশা এখন নৈরাশ্যে নিমজ্জিতপ্রায়, প্রশ্ন রূপান্তরিত হয়েছে একটি চ্যালেঞ্জে। রবীন্দ্রনাথ যেন আহতস্পর্ধাপূর্বক বিহ্বল কিন্তু অবিজড়িত কণ্ঠে জানতে চাইছেন—ভগবান, তোমার সৃষ্টিতে এমন নিষ্ফলতা, নিষ্ফলতার এমন যন্ত্রণা কি সম্ভব?

এই অপরিণত অপ্রকাশিত আমি—
এ কার জন্যে, এ কিসের জন্যে।
যা নিয়ে এল কত সূচনা, কত ব্যঞ্জনা,
বহু বেদনায় বাঁধা হতে চলল যার ভাষা,
পৌঁছল না যা বাণীতে,
তার ধ্বংস হবে অকস্মাৎ নিরর্থকতার অতলে—
সইবে না সৃষ্টির এই ছেলেমানুষি।

সৃষ্টির ছেলেমানুষি মানে তো স্রষ্টারই ছেলেমানুষি। মর্ত্যের মানুষকে তো সইতেই হবে এ-ছেলেমানুষি; কে বলতে পারে স্বর্গের দেবতার কী সইবে আর কী সইবে না। তিনি কি সেই আদিকালের শিশু ভোলানাথ নন? মানুষের ভাগ্য নিয়ে পুতুল খেলা বা ছিনিমিনি খেলা যদি তাঁর ভালো লাগে, তবে তাঁর কাছ থেকে জবাবদিহি কে তলব করবে? অথচ কোনো এক অভাবনীয় দুঃসাহসে ভর ক'রে কৈফিয়ৎ আমরা চেয়ে বসি; রবীন্দ্রনাথ নিজে :। প্রশ্ন ৲. .ছন—'কিন্তু কেন'। সব চেয়ে মর্মান্তিক কথা এই যে কৈফিয়ৎ না-পেলে

আমাদের বিশ্বাসে ভক্তিতে চিড় ধরে। চিড় ধরেছিলো রবীন্দ্রনাথের মনেও।

আরো কয়েক বছর পরের বই 'নবজাতক'-এর "প্রশ্ন" কবিতাটিতে তিনি আকাশের দিকে চেয়ে দেখেছেন সেখানে বহ্নিবাষ্প চতুর্দিকে ধাবমান, "কেন্দ্রে তার তারাপুঞ্জ মহাকাল-চক্রপথে ঘুরে।" তার উপরে কিছু নেই। তবে নিম্নে রয়েছে মানুষের দেহ এবং মন। এই অত্যাশ্চর্য যুগ্মসত্তা যেন কোনো দৃশ্যাতীত জ্যোতি, কতটুকুই-বা জানি তার।

এ অজ্ঞেয় সৃষ্টি 'আমি' অজ্ঞেয় অদৃশ্যে যাবে নামি।
অসীম রহস্য নিয়ে মুহূর্তের নিরর্থকতায়
লুপ্ত হবে নানারঙা জলবিম্বপ্রায়,
অসমাপ্ত রেখে যাবে তার শেষ কথা
আত্মার বারতা।

আগের বিনম্র বিষণ্ণ প্রশ্ন এখন "সুতীব্র আর্তস্বর"-এ পরিণত হয়েছে, যার কোনো উত্তর নেই চারিদিককার ভীষণ স্তব্ধতায়। 'নবজাতক'-এর আধুনিক বিজ্ঞান-সচেতন কবিতাগুলিতেই সবচেয়ে প্রকট হয়েছে অন্তিম পর্বের ট্র্যাজিক সুর।

তবু আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ শেষ অবধি এই বিশ্বাসটিকে বহু কষ্টে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন যে নানা স্খলন, পতন, বিভ্রান্তি এমন-কি মাঝে-মাঝে পশ্চাৎগতি সত্ত্বেও বিরাট মানবসত্তা চলেছে কোনো-এক পরিপূর্ণ সার্থকতার তীর্থের অভিমুখে—যার কল্পচিত্র আমাদের মানসপটে এখনো অস্পষ্ট তবু তার আকর্ষণী শক্তি কম নয়। সে-যাত্রাকে সফল ক'রে তুলবার জন্য প্রাকৃত জগতের প্রয়োজনীয় আনুকূল্য থেকে মোটের উপর আমরা বঞ্চিত হইনি এ-যাবৎ। তবে ভাবীকালে তা ক্রমশ প্রত্যাহৃত হবে ব'লে আধুনিক বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যৎবাণী উচ্চারণ করেছেন। সে-বিষয়ে উত্তীর্ণ-সত্তর রবীন্দ্রনাথ

অবগত হ'য়েও যেন কিঞ্চিৎ সন্দিহান। ফলত ক্লান্ত হ'লেও তাঁর কল্পনা ও এষণা পাখা বন্ধ করেনি, যদিও :

বিশ্বজগৎ নিঃশ্বাস বায়ু সম্বরি
স্তব্ধ আসনে প্রহর গণিছে বিরলে।

ওয়াইৎসেকর প্রশ্ন তুলেছেন যে অতি-অতি দূর দেশকালে কী হয়েছিলো, হচ্ছে বা হবে সে-বিষয়ে নিশ্চিত ক'রে কিছু ঘোষণা করা বিজ্ঞানের পক্ষে অনধিকার চর্চা। হাজার কোটি বৎসর পূর্বের বা পরের প্রাকৃতিক অবস্থা ঠিক বিজ্ঞানগম্য নয়। এ-সব বৈজ্ঞানিক বিতর্ক উঠেছে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে। তাই তার দ্বারা রবীন্দ্রনাথের কল্পনা উৎসাহিত হয়েছিলো বলা যায় না। নিজের অন্তরের তাগিদেই এবং বিজ্ঞানের প্রতি কবির পক্ষে অপ্রত্যাশিত মাত্রায় শ্রদ্ধাবান' হ'য়েও তিনি বিশ্বজগতের প্রলয়যাত্রার কথাটা সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারেননি। রোগশয্যায় শুয়ে "অসুস্থ দেহের মাঝে ক্লিষ্ট রচনার যে প্রয়াস" তা-ই দেখছেন অনাদি আকাশে, দেখছেন :

আদি মহার্ণব-গর্ভ হতে
অকস্মাৎ ফুলে ফুলে উঠিতেছে
প্রকাণ্ড স্বপ্নের পিণ্ড,
বিকলাঙ্গ, অসম্পূর্ণ।

তবু রোগশয্যার যন্ত্রণার মধ্যেই ভাবছেন এমন একদিন আসবে যেদিন :

মৃত্তিকার দিবে আসি মন্ত্র পড়ি,
ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিবে বিধাতার
অন্তর্গূঢ় সংকল্পের ধারা।

অনাদিকাল থেকে অদ্যাবধি যার প্রকাশ ক্লিষ্ট, ব্যাহত, বিকলাঙ্গ, তা মন্ত্রবলে একদিন উদ্ঘাটন করবে পরম সুন্দর ও শুভের সংকল্প—একটু অসঙ্গতি আছে এ-ভাবনায়। তবু রবীন্দ্রনাথ ভাবছেন তা-ই, না-ভাবলে

তাঁর চোখে সমস্ত বিশ্বজগৎ অন্ধকার হ'য়ে যাবে ব'লেই হয়তো ভাবছেন; যুক্তি যেখানে পরাভূত সেখানে হৃদয় পরাভব মানছে না। তবে যে-বিশ্বাস না-থাকলে আমরা বাঁচতে পারি না (শুধু পশুধর্ম নয়, মনুষ্যধর্ম রক্ষা ক'রে বাঁচতে পারি না) তা কেবল বাসনার অভিক্ষেপ—এ-কথা শ্রদ্ধেয় নয়। বৈজ্ঞানিক সত্যের বিচার হয় পরীক্ষাগারে এবং শেষ পর্যন্ত প্রযুক্তিবিদ্যার সাফল্যে অর্থাৎ প্রকৃতির উপর ক্ষমতা-বিস্তারে। সে-সত্যকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না, তার বিরুদ্ধাচরণ করতে গেলে জড়প্রকৃতির মার খেতে হবে। কিন্তু বিজ্ঞান যেখানে নীরব বা স্বাধিকারপ্রমত্ত হ'য়ে অমিতভাষী, সেখানেও বিজ্ঞানের তাঁবেদারী করতেই হবে এমন দাসখৎ অন্তত কবি লিখতে বাধ্য নন। শত কোটি বৎসর পরে কী হবে আর কী হবে না তার আনুমানিক হিসাব মেলাতে গিয়ে আমরা আজকের জীবনের আধ্যাত্মিক তহবিল শূন্য ক'রে দিতে রাজী নই।

মানবসত্তার (হিউম্যানিটির) অন্তিম বিনাশ আর রাম শ্যাম যত্নর মৃত্যু একই পর্যায়ের সত্য নয়। প্রথমটি অতি সূক্ষ্ম গণনার ব্যাপার, অধুনা যার ফলাফল কিঞ্চিৎ বিতর্কিত। দ্বিতীয়টি আমাদের চোখের সামনে দিবারাত্রি ঘটছে। যাঁরা বলেন জড়দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হ'লেও প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-সংবলিত (তা না-হ'লে কর্মফলের কথা ওঠে কেমন ক'রে?) বিদেহী আত্মা অবিনশ্বর, তাঁরা কি জানেন না অথবা ধামাচাপা দিয়ে রাখছেন সেই ভূরি-ভূরি প্রমাণ যা আধুনিক শরীর-বিজ্ঞান এবং মনস্তত্ত্ব সংগ্রহ করেছে দেহ-মনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও পরস্পর-নির্ভরতা বিষয়ে? * উঁকি-ঝুঁকি মারলেও রবীন্দ্র-

* মন দেহেরই ব্যাপারমাত্র—জড়বাদীদের এ-মত আমি সমর্থন করতে পারি না। আমি শুধু বলতে চাই যে দেহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন মন ধারণা করা যায় না, বিরুদ্ধ সাক্ষ্যের পরিমাণ বড়ো বেশি। যদি কেউ বলেন: মন না-হয় দেহের সঙ্গে বিলীন হ'য়ে গেলোই, আত্মা তো অমর হ'তে পারে, তা হ'লে উত্তরে বলবো: আত্মাকে মন থেকে বিচ্ছিন্ন করা আরো অসম্ভব। মনেরই

নাথের মনে এ-ধারণা কখনো বাসা বাঁধতে পারেনি যে মানুষের জাতিসত্তার মতন তার ব্যক্তিসত্তাও অজর, অমর, এবং অনন্তকালের পথে – জন্মপরম্পরায় বা লোকান্তরবাসী বিদেহী আত্মারূপে – চলেছে পরিপূর্ণতার দিকে আপন ব্যক্তিস্বরূপের মূল্য রক্ষা ক'রে। ব্যক্তিমানুষ "ধ্বংস হবে অকস্মাৎ নিরর্থকতার তলে" – এ-ভাবনা তাঁর কবি-হৃদয়কে যতই ব্যথা দিক, তাকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় তিনি খুঁজে পাননি। জাজ্বল্যমান সত্যকে তো আর স্বপ্নের রঙীন বালাপোষ দিয়ে ঢাকা যায় না, সে-স্বপ্ন শাস্ত্র বা জনমত সংবলিত হ'লেও না। পক্ষান্তরে, জীবাত্মাকে মায়ার সৃষ্টি ব'লে বরখাস্ত ক'রে দেওয়ার বিরুদ্ধে রবীন্দ্র-নাথের সমগ্র জীবন ও সাহিত্য এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ।

হৃদয়ের যুক্তি তাঁকে মহামানবের চিরন্তনতার আশ্বাস দিয়েছে, সেই চিরমানবের অনন্ত যাত্রার মধ্যে নিজের স্বল্পায়ু আমি-কে অর্থবান ক'রে তুলবার কথা বারবার বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। তবু মন মানে না। ব্যক্তি-সত্তার অমোঘ ক্ষণিকতা, নিজের জরায় তার গ্লানিকর সাক্ষ্য এবং প্রিয়জনের মৃত্যুতে তার ভয়াবহ ঘোষণা – এ যে ব্যক্তিজীবনের নিদারুণতম সত্য। "কেন হারাবার লাগি এতখানি পাওয়া" – প্রশ্নটি স্তব্ধ হবে না কোনোদিন কোনো বুকে।

তবে কি ব্যক্তির জন্য কোনোই সান্ত্বনা নেই? রবীন্দ্রনাথ stoic resignation-এর কথা বলছেন না, বলছেন না imperturbability বা নির্বেদের কথা। কচিৎ-কখনো বলেছেনও যখন, ভাব ভঙ্গি ও ভাষা তখন এমন হাল্‌কা যে মনে হয় সমস্ত ব্যাপারটা দৈবী বা কস্‌মিক রসিকতা :

কোনো-কোনো সমুন্নীত বৃত্তিকে আমরা আধ্যাত্মিক ব'লে থাকি। যদি-বা মনের অতীত আত্মা ব'লে কোনো রহস্যময় সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করি, তবু প্রশ্ন ওঠে – একজনের আত্মার সঙ্গে আর-একজনের আত্মার ভেদ থাকবে কোথায়? ভেদ তো দেহে এবং মনেই।

বিধাতা আপন ক্ষতি করে যদি ধার্য
নিজেরই তবিল-ভাঙা হয় তার কার্য,
নিমেষেই নিঃশেষ করি ভরা পাত্র
বেদনা না যদি তার লাগে কিছুমাত্র,
আমারি কী লোকসান যদি হই শূন্য—
শেষ ক্ষয় হলে কারে কে করিবে ক্ষুণ্ন।

("মংপু পাহাড়ে", 'নবজাতক')

কিন্তু ব্যক্তিজীবনের ট্র্যাজিক পরিণামকে এমন ফুরফুরে স্তোকবাক্যে উড়িয়ে দেওয়া যায় না ; সে-চেষ্টা সফল হয়নি 'ক্ষণিকা'র "বোঝা-পড়া" কবিতাটিতেও, যদিও তখন অনুত্তীর্ণ যৌবন রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিলো "তেমন করে হাত বাড়ালে / সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি।"

সমস্ত দৈবী ও প্রাকৃতিক প্রতিকূল শক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ বলছেন অন্য-একটি কথা, যে-কথা রবীন্দ্রনাথের মতো কবিই বলতে পারতেন, কোনো স্টোয়িক দার্শনিক বা বৈদান্তিক ঋষি নয় ; বলছেন এমন ভাষায় ও ভঙ্গিতে যাতে কবির অন্তরের সত্য স্বকীয় মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত, সমুজ্জ্বল। আমাদের সন্দেহ থাকে না যে এই সত্যকে খণ্ডাতে পারে এমন কোনো শক্তি ইহলোকে বা পরলোকে নেই। ব্যক্তিমানবসত্তার শেষ সম্বল এই পরম মূল্যবান কথাটা আমি নিজের ভাষায় লিখতে পারতাম, তবে তাতে কথার সার থাকলেও সুর যেতো হারিয়ে। অথচ সুরটাই এখানে অনেকখানি, কারণ মর্ম-গ্রহণের চেয়ে বড়ো কথা এখানে মর্মে গ্রহণ। অনেক কবিতার অনেক জায়গায় সংক্ষেপে বা স্বল্পবিস্তারে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এ-কথা, তবে যে-কবিতার আদ্যোপান্ত এই একটি কথাই বলা হয়েছে, তা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হ'লেও প্রায় সমস্তটা উদ্ধৃত করতে চাই। অন্যান্য গদ্য কবিতার মতো বিস্তৃত হ'লেও কবিতাটি সুন্দর, এবং হৃদয়ের সুষ্ঠু যুক্তিতে সপ্রমাণিত।

কালো অন্ধকারের তলায়
পাখির শেষ গান গিয়েছে ডুবে।
বাতাস থমথমে,
গাছের পাতা নড়ে না,
স্বচ্ছ রাত্রের তারাগুলি
যেন নেমে আসছে
পুরাতন মহানিম গাছের
ঝিল্লিঝংকৃত স্তব্ধ রহস্যের কাছাকাছি।

এমন সময়ে হঠাৎ আবেগে
আমার হাত ধরলে চেপে
বললে, "তোমাকে ভুলব না কোনোদিনই।"
দীপহীন বাতায়নে
আমার মূর্তি ছিল অস্পষ্ট,
সেই ছায়ার আবরণে
তোমার অন্তরতম আবেদনের
সংকোচ গিয়েছিল কেটে।
সেই মুহূর্তে তোমার প্রেমের অমরাবতী
ব্যাপ্ত হল অনন্ত স্মৃতির ভূমিকায়।
সেই মুহূর্তের আনন্দ বেদনা
বেজে উঠল কালের বীণায়,
প্রসারিত হল আগামী জন্মজন্মান্তরে।
সেই মুহূর্তে আমার আমি,
তোমার নিবিড় অনুভবের মধ্যে
পেল নিঃসীমতা।

এই নিমেষটুকুর বাইরে আর যা-কিছু
সে গৌণ।
এর বাইরে আছে মরণ,
একদিন রূপের আলো-জ্বালা রঙ্গমঞ্চ থেকে
সরে যাব নেপথ্যে।

প্রত্যক্ষ সুখদুঃখের জগতে
মূর্তিমান অসংখ্যতার কাছে
আমার স্মরণচ্ছায়া মানবে পরাভব।
তোমার দ্বারের কাছে আছে যে কৃষ্ণচূড়া
যার তলায় দু'বেলা জল দাও আপন হাতে
সেও-প্রধান হয়ে উঠে
তার ডাল-পালার বাইরে
সরিয়ে রাখবে আমাকে
বিশ্বের বিরাট অগোচরে।
তা হোক,
এও গৌণ।

("চোদ্দো", 'শেষ সপ্তক')

অনুরূপ ভাব প্রকাশ করেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর প্রথম পর্বের শ্রেষ্ঠ কবিতা "শাশ্বতী"তে, আরো সংক্ষেপে ঘন-সন্নিবদ্ধ চারটি পঙক্তিতে :

একটি কথার দ্বিধা-থরথর চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী,
একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে
থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি।

মনে প'ড়ে যায় 'চৈতালি'র সনেট "প্রথম চুম্বন"। এখানে শুধু প্রথম এবং শেষ পঙক্তিদ্বয় উদ্ধৃত করছি :

স্তব্ধ হল দশ দিক নত করি আঁখি
বন্ধ করি দিল গান যত ছিল পাখি।
... ...
অনন্ত নক্ষত্রলোক উঠিল শিহরি,
আমাদের চক্ষে এলো অশ্রুজল ভরি।

এলিয়ট লিখেছেন :

"I will show you fear in a handful of dust."

লিখতে পারতেন কিন্তু লেখেননি (পাছে তাঁকে কেউ রোম্যান্টিক ব'লে বসে): "I will show you eternity in a kiss."

প্রেমকে এই মহোচ্চ স্তরে, যেখানে তার প্রত্যেকটি প্রকাশে প্রচ্ছন্ন থাকে স্বর্গের মূল্য, বেশিদিন রাখা সম্ভব নয়, মর্ত্যের সব জিনিসের মতো প্রেমও ক্ষয়িষ্ণু, মরণশীল। পরবর্তী সনেট "শেষ চুম্বন"-এ বড়ো সুন্দর ক'রে এই কথাটা বলা হয়েছে। তবু যখন পূর্ণ বৈভবে ও মহিমায় তার প্রকাশ ঘটে (যত স্বল্পদিনের জন্যে হোক্ সে-প্রকাশ) তখন আমাদের তুচ্ছ, একঘেয়ে, গ্লানিকর, মৃত্যুর দিকে ধাবমান জীবন ধন্য হ'য়ে যায় চিরকালের মতো।

শুধু প্রেমের দীপ্তিতেই যে ক্ষণকাল অসীমকালের ও অনন্ত লোকের মর্যাদা লাভ করে তা নয়, মহৎ শিল্পসাহিত্যের রসাস্বাদনেও তা ঘটতে পারে, ঘটতে পারে দুর্লভ বন্ধুত্বডোরে বাঁধা দুই বন্ধুর বহুকাল পরে দূর দেশে হঠাৎ দেখায়, হিমালয় বা সমুদ্রের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারে, জ্ঞানান্বেষীর পক্ষে কোনো-কোনো দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের এমন আলোকসম্পাতে যাতে সমস্ত বিশ্বচরাচরকে সম্বোধন ক'রে মন ব'লে ওঠে—"বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে"।

ঘুরে-ফিরে আবার আমরা পৌঁছলাম সেই পরম বিস্ময়ে যা একমাত্র মানুষের পক্ষেই বোধ করা সম্ভব, অথচ যার উপলব্ধি মানুষকে নিয়ে যায় তার জীবনসীমার বাইরে। এ তো অসীমের মধ্যে নিজেকে হারানো নয়, অসীমকেই কোনো-এক চূড়ান্ত মুহূর্তের অণুতম পরিধির মধ্যে ধ'রে আনা। অমৃতভরা মুহূর্তগুলি অমৃত পায় কোথা থেকে? নারীপ্রেম, মানবপ্রেম, বন্ধুত্ব, শিল্পসম্ভোগ—যে-কোনো অমূল্য অভিজ্ঞতাই আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়। মনে হয় যেন পর্দার পর পর্দা স'রে যাচ্ছে, দিগন্তের পর দিগন্ত পেরিয়ে যাচ্ছি আমরা। সাহিত্য চিত্রাদি শিল্পসামগ্রী বিষয়ে এ-কথা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানী-গুণীরা বহুবার বলেছেন। প্রেমের বেলাও যে এই

নিঃসীমতা কম সত্য নয় তা বোধহয় শুধু কবিরাই বলেছেন প্রেমিকদের কানে-কানে। জ্ঞানে শিল্পসাহিত্যে কিংবা লোকহিতৈষণায় জীবনের অর্থ খুঁজে পাওয়া সব মানুষের সহজাত বা পরিশীলিত শক্তিতে কুলিয়ে না-ও উঠতে পারে ; কিন্তু প্রেম সামান্যতম মানুষের, হরিপদ কেরাণীরও, হৃদয়কে অসামান্য মূল্যের আধার ক'রে তোলে কিছু-কালের জন্য।

শুধু ধূলি, শুধু ছাই মূল্য যার কিছু নাই,
মূল্য তারে করো সমর্পণ
স্পর্শে তব, পরশ রতন।

এ-অভিজ্ঞতা ঈশ্বরপ্রেমের বেলা যেমন নারীপ্রেমের বেলায়ও তেমনি সত্য। এবং অন্তত এই একটি সাধনমার্গে অধিকারীভেদের প্রশ্ন একেবারেই গৌণ।

সূচিপত্র

গ্রন্থরচনা ও প্রকাশনায় যে-ক'জনের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি তাঁদের মধ্যে গৌরী আইয়ুবের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। সবচেয়ে ক্লান্তিকর ও বিরক্তিকর যে-কাজ তাতেও তাঁর ক্লান্তি বা বিরক্তি ছিলো না। লেখার অনেক অংশ আমি একাধিকবার সংশোধন করেছি, একাধিকবার তাঁকে কপি করতে হয়েছে। তদুপরি প্রুফ দেখা। আমার দু-একটি বক্তব্যে তাঁর আপত্তি ছিলো (বিশেষত শ্যামার চরিত্র-বিশ্লেষণে); তার উত্তর নিবন্ধেই দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আপত্তি তবু খণ্ডিত হয়নি বোধ হয়। স্বপন মজুমদার প্রকাশনার প্রায় সব দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে তাঁর অনেক মূল্যবান সময় আমাকে দান করেছেন। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

"সূচনা" ব্যতীত এ-বইয়ের সব অধ্যায়ই 'দেশ' পত্রিকার সাপ্তাহিক বা বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিলো গেলো চার বছরের মধ্যে। বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে গিয়ে সংশোধনের প্রয়োজন বোধ করেছি অনেক জায়গায়, বেশ-খানিকটা যোগ-বিয়োগও করতে হয়েছে কোথাও-কোথাও।

কয়েকটি উর্দু বয়েৎ উদ্ধৃত করেছি বাংলা হরফে। স্বরবর্ণের উচ্চারণ হিন্দির মতন হবে; যথা, 'হৈ' শোনাবে বাংলা 'হায়'-এর মতন—'হায়'-এর আকারটি অবশ্য হ্রস্বভাবে উচ্চারিত হবে। অ-কার সর্বত্র ইংরেজি **Cut**-এর **u**-এর মতো; যথা, 'জিন্নৎ'=**jinnut, jinnot** নয়। 'স'=**s**, 'শ'=**sh**। উর্দু ভাষার কণ্ঠধ্বনি (**gutteral sound**) বাঙালি কণ্ঠে সহজে আসে না। গালিব এবং ইক্‌বাল—সবচেয়ে বিখ্যাত দু-জন উর্দু কবির নামের প্রথম ব্যঞ্জনবর্ণ দুটি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রায় সব বাঙালিকে "গলদ্‌ঘর্ম ঘামায়"।

সূচনা

"পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে"

এই গানে এবং আরো কয়েকটি গানে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে "পান্থজন", "পথিকজন", "পথিকপরান" বা শুধু "পথিক" বলেছেন। খুব নতুন কথা নয় এটা। সাধুসন্তরা, আউল-বাউলরা, সুফী-দরবেশরা, মরমিয়া কবিরা নিজেদেরকে চরম প্রেমের করুণ-রঙিন অথচ প্রাণান্ত-কঠিন পথের পথিক ব'লে জেনেছেন বহুকাল যাবৎ। "পথের শেষ কোথায়, কী আছে শেষে"—ভেবে না-পেয়ে মাঝে-মাঝে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য আকুল হয়েছেন, এমন মর্মান্তিক সংশয়ও মনে জেগেছে যে তাঁর ঈশ্বর-তৃষ্ণা বুঝি মিটবে না কোনোদিন, মরুপারে দূর দিগন্তে যার আভাস দেখে তিনি পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন তা মরীচিকা ছাড়া আর-কিছু নয়। কিন্তু এমন অন্তিম নৈরাশ্য ক্বচিৎই তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করেছে। 'গীতাঞ্জলি' পর্বে তিনি প্রশান্তই ছিলেন, পথশেষের কথা না-ভেবে পথকেই ভালোবেসেছেন, গান গেয়েছেন—"পথে চলা, সেই তো তোমায় পাওয়া"। এই গানের প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তিতে হাফিজের দুটি পঙ্‌ক্তির অনুরণন শুনতে পাই আমি—"পথিকদের পথক্লান্তি নেই। / প্রেম পথও বটে, গন্তব্যও (মন্‌জিলও) বটে।"

আমাদের পরিচিত মরমিয়া-সাধকরা কিন্তু প্রায় সবাই একই সাধনমার্গ ধ'রে ঈশ্বরের দিকে এগুতে প্রয়াসী হয়েছেন সমস্ত জীবনভরে। পক্ষান্তরে, রবীন্দ্র-নাথের ঈশ্বর-ভাবনা ও তৎ-সংশ্লিষ্ট ধ্যানধারণা মার্গ থেকে মার্গান্তরে চ'লে গেছে একাধিকবার—এক ধর্মসমাজ থেকে আর-এক ধর্মসমাজে, তারপর একলা পথে কখনো মগ্ন হ'তে চেয়েছেন ব্যক্তিস্বরূপ জীবনস্বামীতে, কখনো নৈর্ব্যক্তিক বিশ্ব-জাগতিক সত্তা অর্থাৎ ভূমাতে, কখনো দীক্ষা নিতে চেয়েছেন নটরাজ শিবের কাছে, কখনো চিরমানবের বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য সাজিয়ে দিয়েছেন, কখনো অমৃতভরা মুহূর্তে ধরতে চেয়েছেন শাশ্বতকালের মহিমা। এমন বৈচিত্র্যময় অথচ প্রত্যেকটি সাধনায় নিবিষ্টপ্রাণ সাধকের দৃষ্টান্ত সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই তিনি যখন নিজেকে পান্থজন বলেন তখন পূর্ব-সাধকের সঙ্গে তাঁর তুলনা খানিকটা বিভ্রান্তিকর। কাব্যে গানে নাটকে ব্যক্ত বা আভাসিত আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান এই পথিক-হৃদয়ের কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি বইয়ের নামপ্রবন্ধে এবং অন্যান্য প্রবন্ধেও।

স্বভাবতই কবি রবীন্দ্রনাথের যাত্রারম্ভ নারীপ্রেম থেকে। যতোই তিনি এ-প্রেমকে সুন্দরতর পূর্ণতর করতে প্রয়াসী হলেন, ততোই উপলব্ধি করলেন রোম্যান্টিক প্রেমের অন্তর্নিহিত অপূর্ণতা—প্রেমানুভূতির অপূর্ণতা এবং প্রেমাস্পদের

অপূর্ণতা। 'গীতাঞ্জলি'তে কি তিনি পেলেন পূর্ণ প্রেমের পূর্ণ পাত্র ("**perfect object of perfect love**") ? কিছুকাল (ন্যূনাধিক এক দশক কাল) তা-ই ভেবেছিলেন তিনি, কিন্তু বেশিদিন ধরে রাখতে পারেননি এই প্রশান্ত মধুর ভাবাবেশ। ভাবান্তর ঘটালো প্রথম মহাযুদ্ধ ; "বন্দরের কাল হল শেষ।" নোঙর তুলতে হ'লো, পাড়ি জমাতে হ'লো অজানা সমুদ্রে ঝড় ঝঞ্ঝার মাঝখানে। পৌছলেন তিনি মানব দেবতার মন্দিরে : "হে মানব, তোমার মন্দিরে দিনান্তে এসেছি আমি" ; জানালেন এখানেই যাত্রাশেষ। কিন্তু শেষ কোথায় ? 'পরিশেষ'-এর পরে আছে 'পুনশ্চ'। তার পরেও বিরাম নেই দুঃসাহসিক নাবিকের সামুদ্রিক অভিযানের। আরো কতো নতুন দেশের, নতুন কালের সৈকতে লাগতো তাঁর তরী, কে বলতে পারে। মৃত্যু এসে যাত্রা থামিয়ে দিলো যেন মাঝপথেই। আকাশের দিকে চেয়ে বলতে ইচ্ছা হ'লো—অমৃতপাত্র কি এমনি ক'রে ভাঙতে হয় ? "বিধাতা আপন ক্ষতি করে যদি ধার্য"—কিন্তু কেন ? জড়প্রকৃতির নিয়মশৃঙ্খলা কি এতোই ইস্পাতকঠিন যে বিধাতাও তা ভাঙতে পারেন না ?

অথচ এই মৃত্যুগ্রাসিত অফুরন্ত-যৌবন কবির ষাট বছর ধ'রে কাটা ফসলের এক বিপুল অংশ তুলে নিয়ে সোনার তরী ব'য়ে চলেছে কালপ্রবাহে। তাই, কী পাইনি তার হিসাব না-মিলিয়ে, কী পেলাম তারই পুনঃপুনঃ বিচার করতে হবে আমাদের। কোনো-কোনো দিক থেকে রবীন্দ্র-সাহিত্য পূর্বতন মূল্য হারিয়েছে ; আবার অন্যদিক থেকে নবযুগোচিত মূল্য সঞ্চয় করেছে ততোধিক। এ অনিত্য জগৎ ও জীবনে কাব্যবিচারের মাপকাঠিও স্বভাবতই পরিবর্তনশীল। তবে জামা-কাপড় গয়নাগাঁটি দাড়িগোঁফের ফ্যাশানের মতো বছরে-বছরে সাহিত্যের মূল্যায়ণ বদলালে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে সর্বনাশ ঘটবে। মহত্তম মূল্যের পুনর্বিচারে, **revaluation**-এ, আমাদের ধৈর্য রাখতে হবে, স্থবিরতা বর্জন করতে হবে ধাবমান সাহিত্যিক ফ্যাশানের পিছনে না ছুটে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে সেই দুরূহ 'মঝ্-ঝিম পন্থা' ধ'রে হাঁটতে চেষ্টা করেছি।

নিজেকে "পান্থজন" বলাতে নতুনত্ব না-থাকলেও পরমেশ্বরকে "পান্থ" বলাতে নূতনত্ব আছে কিছু। পরমেশ্বর পথের কষ্ট স্বীকার করেছেন কিসের জন্য, কিসের সন্ধানে ? তাঁর তো কোনো অভাব বা অপূর্ণতা নেই, তিনি তো অনবদ্য, পরাকাষ্ঠা, **perfect being**। উপনিষদ যখন তাঁকে সত্যম্ বলেন তখন পূর্ণ ও পরোৎকৃষ্ট সত্তা অর্থেই বলেন, নইলে একটি তৃণখণ্ডও তো আপন অকিঞ্চিৎকরতা নিয়ে সত্য। তাই প্রশ্ন জাগে—শাস্ত্রমতে এবং প্রচলিত বিশ্বাসানুযায়ী যিনি সবদিক দিয়ে পরিপূর্ণ, তিনি আবার পান্থ কেন ?

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝিয়েছিলেন : "ত্রিভুবনে আমার করণীয় কিছু নাই, প্রাপ্য বা অপ্রাপ্তব্য কিছু নাই, তথাপি আমি কর্মেই ব্যাপৃত আছি লোকসংগ্রহার্থে এবং মানবসকলের দৃষ্টান্তস্থল হইবার জন্য।" রবীন্দ্রনাথও কি সেই রকম কিছু বোঝাতে

চেয়েছেন "পান্থ তুমি" ব'লে ? রাধাকৃষ্ণন্ "লোকসংগ্রহ"-এর অনুবাদ করেছেন "maintenance of the world", জগদীশচন্দ্র ঘোষের অনুবাদ "লোকরক্ষা"। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনে যে-ছবিটি সর্বদা উজ্জ্বল ছিলো তা বিশ্বজগতের স্থিতিশীলতার নয়, গতিশীলতা ও বিবর্তনোন্মুখতার। তাই তাঁর ভাবপ্রকাশের জন্য ঈশ্বরের বিশেষণ হিসাবে 'কর্মব্যাপৃত' অপেক্ষা 'পান্থ' শব্দটা অধিকতর উপযুক্ত।

আর-একটি বৈশিষ্ট্য—রবীন্দ্রনাথের চোখে জগৎ এবং জগদীশ্বরের মধ্যে দূরত্ব বা পার্থক্য তেমন স্পষ্ট নয় যেমন ছিলো গীতাকারের চোখে। না-থাকারই কথা। কারণ রবীন্দ্র-মানসে গীতার চেয়ে উপনিষদের স্থান অনেক বেশি প্রশস্ত। ঈশোপনিষদের প্রারম্ভেই বলা হয়েছে যে সমস্ত জগৎ-চরাচর ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত। ঈশ্বরের দ্বারা 'সৃষ্ট', 'শাসিত', বা 'নিয়ন্ত্রিত' না-ব'লে 'আচ্ছাদিত' (কিংবা 'আচ্ছাদনীয়'—'বাস্যম্') বলাতে অত্যন্ত নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতা বোঝায়। তবু 'আচ্ছাদন' ও 'আচ্ছাদিত'-এর মধ্যে যেটুকু দ্বিত্ব রয়েছে তার দিকে নিশ্চয় ঈশোপনিষদ ইঙ্গিত করছেন না; বক্তব্য এই নয় যে ঈশ্বর স'রে গেলেও জগৎ থাকবে, যেমন ঢাকা তুলে নিলেও ফলভরা থালা থাকে; অথবা জগৎ না-থাকলেও ঈশ্বর থাকবেন। বাংলা অনুবাদে 'ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট' বললে সম্ভবত আরো সঠিক অর্থ পাওয়া যাবে। কিংবা যদি বলি জগৎ-চরাচর ঈশ্বরময়, এবং সেই বিচারে ঐশ্বর্যবান (charged with value)।

পরম পান্থকে "পান্থজনের সখা" বলায় অন্যতম ইঙ্গিত কি এই নয় যে রবীন্দ্রনাথের মতো যাঁরা মনে-প্রাণে পান্থজন তাঁদেরই সখা তিনি, যাঁরা চিরাচরিত কোনো ধর্মানুষ্ঠানের পায়ে নিজের স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি প্রত্যর্পণ ক'রে প্রাচীনযুগের খুঁটিতে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে জড়ভরত হ'য়ে ব'সে আছেন, তিনি তাঁদের সখা নন ?

আমি অবশ্য বর্তমান গ্রন্থের নামকরণে ঐ বিশেষণ-পদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথকেই বোঝাতে চেয়েছি, নিজেকে অন্যতম পান্থজন জ্ঞান ক'রে। যে-ধর্মসমাজ ও ধর্মবিশ্বাসের আশ্রয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলাম তাতে একপ্রকার শান্তি, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ছিলো। সে আরামের ভিটেবাড়ি ছেড়ে বনজঙ্গলের মাঝখান দিয়ে খানাখন্দ পার হ'য়ে পাহাড়-পর্বতের উপর দিয়ে, কখনো-বা উপত্যকার গুমোট অন্ধকারের ভিতর দিয়ে অজানা আকাটা পথে বেরিয়ে পড়ার ক্লেশ, ভয়, বিপদ, ক্ষীণায়মান আশা এবং ঘনায়মান নৈরাশ্যের কথা ভুক্তভোগীই জানেন। তবে রবীন্দ্রনাথের মতন অতো নিবিড়ভাবে অমন সর্বান্তঃকরণ দিয়ে আর কেউ জেনেছেন ব'লে তো মনে হয় না। কীর্কেগার্ডের হৃদয়-যন্ত্রণা অবশ্য আরো দুঃসহ ছিলো। কিন্তু সে তীব্র যন্ত্রণার কশাঘাতে তাঁর মানসিক স্বাস্থ্য ভেঙে গেলো। ধর্মভাবনায় বুদ্ধি ও যুক্তির সমূহ প্রত্যাখ্যান এবং উদ্ভটের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ তাঁর মনোরোগেরই উপসর্গ। বর্তমানকালের অযৌক্তিকতাবাদের মন্ত্রদাতা তিনি। টি. এস. এলিয়ট্

ভয়াবহ চিত্র আঁকলেন খরাগ্রস্ত আধুনিক জীবন ও জগতের। তারপরে নিজেই ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলেন এই "ওয়েস্ট্ ল্যাণ্ড্" থেকে, আশ্রয় খুঁজলেন মধ্যযুগের চার্চতন্ত্রে ও রাজতন্ত্রে। তাঁর ধর্মজিজ্ঞাসা ছিলো সাহিত্য-সৌখিন এবং আত্মনির্ভরতাশূন্য। রবীন্দ্র-মানস থেকে এ দু-জন মনীষীর আধ্যাত্মিক দূরত্ব অনেকখানি—শুধু দেশগত নয়, কালগতও বটে। রবীন্দ্রনাথ এ-যুগেরই মানুষ, এই পৃথিবীরই কবি।

'গীতাঞ্জলি'র অনেক গানে আমরা শুনেছি তিনি আসছেন—"আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে"; যুগে যুগে পলে পলে দিনরজনী / সে যে আসে, আসে"; ইত্যাদি। কিন্তু আলোচ্য গানে "পান্থ তুমি" এই অর্থে বলা হয়নি। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে ভক্ত যে-দিকে চলেছে ভগবানও সেই দিকে চলেছেন। এই গানে তিনি প্রেমিক নন, সহযাত্রী; উদ্দেশ্য মিলন নয়, সাধন। কী তাঁর সাধনা?

"সৃষ্টি যে অপূর্ণ"—রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ১৩১৪ সালে লেখা "দুঃখ" শীর্ষক প্রবন্ধে; কিন্তু কী বিরাট ভয়ঙ্করভাবে অপূর্ণতা উপলব্ধি করলেন আরো সাত বছর পরে, প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমিকায়। তারপর থেকে অঙ্কুরিত হ'তে দেখা যায় আর-একটি উপলব্ধি—এই অপূর্ণ সৃষ্টিকে পূর্ণ ক'রে তোলার দায়িত্ব মানুষেরই। সৃষ্টির অপূর্ণতা স্রষ্টাতেও বর্তায়। আগেই বলেছি রবীন্দ্রনাথের চোখে স্রষ্টা ও সৃষ্টি একই পরম সত্তার দুই ভিন্ন রূপ। অর্থাৎ পূর্ণতার পথে মানুষ যেমন পান্থ, ভগবানও তেমনি। মানুষের কর্মক্ষেত্র মানব-সমাজে সীমিত, ভগবানের কর্ম অনন্ত দেশ-কালে পরিব্যাপ্ত। অন্যদিক দিয়ে অবশ্য তিনি পূর্ণ হ'য়েই আছেন মহাকালে, সাক্ষী-চৈতন্যরূপে। তার কথা "শুধু ধূলি, শুধু ছাই" অধ্যায়ে বলেছি।

"ধর্ম ও সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে টি. এস. এলিয়ট্ যে-ধর্মবোধকে সাহিত্যের পক্ষে অপরিহার্য ব'লে ঘোষণা করেছেন তার মোদ্দা কথা হচ্ছে প্রাকৃত ও অতি-প্রাকৃতের মধ্যে স্পষ্ট ভেদরেখা টেনে অতিপ্রাকৃতকে মৌলিক ও চরম জ্ঞান করা (**"primacy of the supernatural over the natural"**)। এ হেন বিশ্বাসের অবক্ষয়ের মধ্যেই সেকুলারিজমের সংজ্ঞা খুঁজে পেয়েছেন তিনি, এবং বলেছেন আধুনিক সাহিত্য প্রায় সবটাই সেকুলার, কাজেকাজেই নষ্ট ও ভ্রষ্ট। এই এলিয়ট্-নিন্দিত অর্থে রবীন্দ্রনাথ 'সেকুলারিস্ট' কবি। মোটের উপর যে-মত ও ভাবাবেগ তাঁর সৃষ্টিকর্মকে অনুপ্রাণিত করেছে তা বিশ্বাতিগ ঈশ্বরে বিশ্বাস নয়; মোটের উপর রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরকে দেখেছেন এবং ভালোবেসেছেন মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যেই। সেখানে যখন তাঁর পরানসখাকে দেখতে পাননি তখন উষা-দিশা-হারা বোধ করেছেন তিনি, চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার দেখেছেন; নিজের অন্তরের গোপন কবিপুরুষকে মিনতি ক'রে বলেছেন: "তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, / এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা"। কখনো, ক্বচিৎ কখনো, এমনও হয়েছে যে

মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ বিলুপ্ত বোধ ক'রে, দুঃখ ও পাপের বিরাট বিকট চেহারা সহ্য করতে না-পেরে, প্রকৃতির রঙে-রূপেই ঈশ্বরের স্বাক্ষর খুঁজেছেন আমাদের প্রকৃতি-প্রেমিক ঈশ্বর-ভক্ত কবি। কিন্তু মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে কী রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ থাকতে পারেন, কোনো কবি কবি থাকতে পারেন? বেশিদিন পারেন না।

বিশ্বস্রষ্টার কথা ভুলে গিয়ে যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা ভাবি তাহ'লে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে যাই আমরা। আকাশে-আকাশে যে কোটি-কোটি নীহারিকা নক্ষত্র নিয়ে আতশবাজির খেলা চলছে কয়েক শত কোটি বৎসর ধ'রে, তারই মাঝখানে অন্তত একটি নক্ষত্রের একটি গ্রহে জন্মলাভ করেছে প্রাণ, প্রাণ থেকে মন, মন থেকে আত্মা—এটা কেমন ক'রে সম্ভব হ'লো? এ-সবই কি সৃষ্টির প্রথম দিনে (আজ-কাল জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আদি সৃষ্টির কথা বলেন, সময় নির্দেশ করা হয় পাঁচ শ' কোটি থেকে হাজার কোটি বৎসর পূর্বে) আকাশময় সমানভাবে ছড়ানো জ্যোতির্কণা ও জড়কণার মধ্যে নিহিত ছিলো সম্ভাবনারূপে, ভ্রূণরূপে—যেমন জরায়ুর একটি নিষিক্ত ডিম্বাণুর মধ্যে ক্রমজোম-বিন্যাসের সাংকেতিক ভাষায় লেখা থাকে পরিণত-বয়স মানুষের দেহের অনেক-কিছু, মনেরও অল্প-কিছু? না-কি বিশ্বের বিরাট নিরর্থক ঘটনাপ্রবাহে মানুষের জন্ম ও বিকাশ ঘ'টে গেলো নিতান্তই অকস্মাৎ, বাই চান্স্? যেমন এক প্যাকেট তাস নিয়ে সারাদিন লক্ষ-লক্ষ বছর ধ'রে ফেটাতে থাকলে একবার এমন বিন্যস্ত প্যাক পাওয়া খুবই সম্ভব, নিশ্চিতও বলা যেতে পারে, যাতে চারটি রঙ আলাদা হ'য়ে গেছে এবং প্রত্যেকটি রঙ টেক্কা-দুরি-তিরি ক'রে সাজানো। অথবা যেমন ঘটতে পারে কোনো বাঁদরের ফুৎকারে একটি উত্তম রাগিণীর স্বরসংযোগ:

> **There was once a brainy baboon**
> **Who always piped down a bassoon.**
> **For he said: it appears**
> **That in billions of years**
> **I shall certainly hit on a tune,**

বেবুন না ভগবান, দৈবাৎ না দৈবী? 'ভগবান'-এর চলতি অর্থ মনে রাখলে ঐ-শব্দটা ব্যবহার করতে কুণ্ঠা বোধ করি আমি; কিন্তু সমগ্র বিশ্বজগতের, বিশেষত প্রাণীজগতের, অপ্রতিরোধ্য ক্রমবিবর্তনের কথা ভাবলে যে অপার রহস্যবোধে ভ'রে ওঠে আমার মন, তার কী নাম দেবো? শেষ অবধি ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা নই; সব প্রতিকূল শক্তিকে ঠেলে, সব সাময়িক অধঃপতন সত্ত্বেও "মানব-যাত্রী" এগিয়ে চলেছে মঙ্গলের দিকে, সুন্দরের দিকে অতি ধীরমন্থর গতিতে—রবীন্দ্রনাথের এ-বিশ্বাস আমাদের অনেককেই (মার্কস্ কিংবা জওয়াহরলালের মতো বিঘোষিত নাস্তিককেও) অনুপ্রাণিত করে। ঈশ্বরে বিশ্বাস একে বলবো না,

তবে ঈশ্বরবাদ থেকে যতোটা দূরে এর মানসিক স্থিতি, জড়বাদ থেকে তার চেয়ে বেশি দূরে।

পরম পান্থ চলেছেন যে-পথে সেটা নিশ্চয়ই সকল রাজপথের সেরা রাজপথ, সকল মানুষের অনুসন্ধেয়,সকল আনুষ্ঠানিক ধর্মে প্রার্থনার অঙ্গীভূত। যতো পবিত্র ও মহান হোক্ সে-পথ, তবু তা অতিশয় বিঘ্ন-সংকুল। জড়প্রকৃতির, এবং জীব-প্রকৃতিরও, অব্যতিক্রম নিয়মশৃঙ্খলাই ভগবানের সম্মুখে বিঘ্নরূপে উপস্থিত। তিনি এমনই সব ব্যাধির নিরাময়, সব দুঃখ ও পাপের অবসান ঘটাতে পারেন না। বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম অকাট্য, নির্মম। বিশ্বরাজার পতাকায় পদ্মফুলের মাঝখানে বজ্র চিহ্নিত রয়েছে। পদ্ম সাধু-সজ্জনের জন্য এবং বজ্র কেবল অসৎ লোকের জন্য—এমন কোনো অঙ্গীকার নেই তাতে। 'রাজা' নাটকের ঠাকুরদার মতো নিষ্কলুষ সাধুপুরুষের মাথার উপরও বাজ পড়ে ; পর-পর তাঁর পাঁচটি ছেলে মারা যায়।

প্রকৃতির সব নিয়ম জেনে এবং দরকারমতো কাজে লাগিয়ে মানুষকেই ধীরে-ধীরে লক্ষ-লক্ষ বৎসরের অক্লান্ত অপরাজেয় তপস্যায় আপন জৈবপ্রবৃত্তিগুলিকে বশীভূত ক'রে আপন পাপক্ষয় ও দুঃখলাঘব করতে হবে। সুন্দর ফুল পাখি জ্যোৎস্নাস্নিগ্ধ সমুদ্রসৈকত বিধাতাই সৃষ্টি করেছেন, প্রাকৃতিক নিয়মতন্ত্রের অমোঘ পরিণাম তারা। কিন্তু সুন্দর সমাজের কাঠামোয় সুন্দর ব্যক্তিজীবনের বিকাশ মানুষেরই স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও সৃষ্টিশক্তির যথোপযুক্ত পরিণতির উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতির নিয়মের জালে মানুষ একদিক দিয়ে বাঁধা, অন্যদিক দিয়ে স্বাধীন, অন্তত অংশত স্বাধীন, ইচ্ছাশক্তির অধিকারী ; নইলে শ্রেয়োনৈতিক দায়িত্ব (moral responsibility) কথাটা অর্থহীন হ'য়ে যায়। এ এক বহু প্রাচীন, বহু জটিল দার্শনিক সমস্যা ; এখানে তার অবতারণা সম্ভব নয়।

যকৃতে কর্কট রোগ হয়েছে ছোট্ট ছেলের, যন্ত্রণায় ছটফট করছে সে, মৃত্যু তার আসন্ন। দুঃখে দিশেহারা মা মন্দির, মসজিদ বা গির্জার চৌকাঠে সমস্ত রাত মাথা খুঁড়লেও ঈশ্বরের করুণা হবে না! করুণা হবে সেইদিন যেদিন কর্কটরোগের মোক্ষম ঔষধ আবিষ্কৃত এবং সকলের অধিগম্য হবে। ভল্‌তেরকে জনৈক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিলেন : "প্রতিবেশীর ছাগল এসে আমার বাগান নষ্ট ক'রে দিয়ে যায় রোজ; আমি যদি চার্চে গিয়ে নতজানু হ'য়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি ঐ-ছাগলটাকে মেরে ফেলতে, তা হ'লে কি তিনি আমার প্রার্থনা শুনবেন ?" ভল্‌তের বললেন : "প্রার্থনার জোর আছে বৈ-কি, তবে সেই সঙ্গে ছাগলটাকে একটু সেঁকো বিষ খাইয়ে দিতে ভুলে যেও না যেন।" ঈশ্বরের দয়া ও নির্দয়তা দুই-ই প্রকৃতির নিয়মের মধ্যেই প্রকাশ পায়। তার বাইরে, তাকে লঙ্ঘন ক'রে আমার ব্যক্তিগত দুঃখকষ্ট দূর করার জন্য ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা করার মধ্যে এক-প্রকার শিশুসুলভ আবদেরেপনা আছে যেটা বয়স্কের মুখে নির্বোধ আত্মম্ভরিতার মতো শোনায় : "এই বিধানের অবিচ্ছিন্ন সূত্রে এই পৃথিবীর ধূলি থেকে নক্ষত্রলোক-

পর্যন্ত এক সঙ্গে গাঁথা রয়েছে। আমার সুখসুবিধার জন্য যদি বলি 'তোমার বিধানের সূত্র এক জায়গায় ছিন্ন ক'রে দাও, এক জায়গায় অন্য সকলের সঙ্গে আমার নিয়মের বিশেষ পার্থক্য ক'রে দাও', তা হ'লে বস্তুত বলা হয় যে, 'এই কাদাটুকু পার হ'তে আমার কাপড়ে দাগ লাগছে, অতএব এই ব্রহ্মাণ্ডের মণিহারের ঐক্যসূত্রটিকে ছিঁড়ে সমস্ত সূর্যতারাকে রাস্তায় ছড়িয়ে ফেলে দাও'।"* মায়ের একমাত্র শিশুসন্তানকে দুঃসহ যন্ত্রণা ও অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যও ব্রহ্মাণ্ডের মণিহারের ঐক্যসূত্রটিকে ছিঁড়ে ফেলতে পারেন না বিধাতা। বিশ্ব-বিধাতাকে বিশ্ববিধান থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে স্বতন্ত্র ক'রে দেখার চেষ্টা পদে-পদেই বিড়ম্বিত হবে।

ভগবান নিজে পান্থ হ'য়ে পান্থজনের সখা হ'তে পারেন, কিন্তু সখাতে-সখাতে খেলা মোটেই "মধুর" নয়: "বারে বারে বাঁধ ভাঙিয়া বন্যা ছুটেছে / দারুণ দিনে দিকে দিকে কান্না উঠেছে।" খ্রীষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রে ঈশ্বরকে সহপথিক বলা হয়নি বোধকরি, কিন্তু সহদুঃখী বলা হয়েছে একাধিকবার। তিনি ধরাতলে অবতীর্ণ হয়েছেন মানুষকে পথ দেখাবার জন্য শুধু নয়, পথের নিদারুণতম কষ্ট ভাগ ক'রে নেওয়ার জন্যও। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা ও ঈশ্বরসাধনা অভিন্ন না-হ'লেও পরস্পর-অন্তরঙ্গ, বক্ষলগ্ন। দ্বিবিধ সাধনার মর্মকথা এই গানে ("নয় এ মধুর খেলা") নিহিত রয়েছে ব'লে আমার মনে হয়। অন্য-একটি গানে ("পথে চলে যেতে যেতে কোথা কোন্‌খানে") এই কথাটাই একটু ভিন্নভাবে বলা হয়েছে। আরো কতো গানে কবিতায় ও নাটকে।

পূর্বোক্ত দুটি গানের দুটি পঙ্‌ক্তি ("কত বার যে নিবল বাতি, গর্জে এল ঝড়ের রাতি / সংসারের এই দোলায় দিলে সংশয়েরই ঠেলা" এবং "সহসা দারুণ দুঃখতাপে সকল ভুবন যবে কাঁপে সকল পথের ঘোচে চিহ্ন, সকল বাঁধন যবে ছিন্ন") রবীন্দ্র-মানসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অথচ অবহেলিত দিক উদ্‌ঘাটন করে। এই দিকটাকে চোখের সামনে রাখলে রবীন্দ্র-কাব্যসাহিত্যের যে-চিত্রটি ফুটে ওঠে, বর্তমান গ্রন্থে তার দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়েছি। অবশ্য কাব্যভাষার আভাসে-ইঙ্গিতে যা ছিলো কুণ্ঠায় অবগুণ্ঠিত, গদ্যের অকুণ্ঠ নির্লজ্জ ভাষায় তার ঘোম্‌টা খুলতে গেলে সন্দেহ হ'তে পারে—সেই মুখ দেখছি তো! এতোখানি ভিন্ন দুই ভাষায় ঠিক একই কথা বলা যায় না। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ভাষান্তর নয়, ব্যাখ্যান বা বিস্তার নয়। উদ্দেশ্য ছিলো রবীন্দ্রনাথের গান কবিতা ও নাটকের পিছনে যে-জগৎনিরীক্ষা এবং ঈশ্বরভাবনার পটভূমিকা কখনো স্পষ্ট-গোচর কখনো আবছা রয়েছে, তারই স্বরূপ-সন্ধান।

স্বীকার করাই ভালো এবং বলা হয়তো বাহুল্য, যে-রবীন্দ্রনাথকে আমি মর্মে-

* "বিধান", 'শান্তিনিকেতন' ১

মর্মে পরম আত্মীয় ব'লে জেনেছি, "চিরসখা" ব'লে ভালোবেসেছি, তাঁরই কথা বলতে উৎসাহ বোধ করেছি এখানে। জানি আমার রসবোধ ও মূল্যবিচারের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের সবখানি ধরা দেয়নি। যাঁরা 'কড়ি ও কোমল'-এর প্রথম চতুর্দশপদীতে ("মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই"), বা 'নৈবেদ্য'-এর প্রথম গানে ("প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী / দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে"), বা 'আরোগ্য'-এর দশ-সংখ্যক কবিতাতে ("শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-'পরে' / ওরা কাজ করে") রবীন্দ্র-কাব্যের মূল সুরটি শুনতে পান, তাঁদের হৃদয়-মনের তন্তুজালে ভিন্ন রবীন্দ্রনাথ ধরা দেবেন। আমি রবীন্দ্রনাথের যতোটুকু পেয়েছি আমার ভাবনায় ও বেদনায় তাতেই আমি ধন্য হয়েছি। সে-ধন্যতা যদি আরো পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ ক'রে নিতে পারি তবে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে। এই অনেকান্ত কবির অন্যান্য অন্ত (**aspect**) ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে, পরেও হবে। সেইখানে তাঁর ঐশ্বর্য, আমাদের সৌভাগ্য। সব অন্ত হয়তো কোথাও গিয়ে মিলেছে তাঁর বহুবর্ণাঢ্য কবি-স্বরূপের গভীরে ; কিন্তু ঐক্য খুঁজতে গিয়ে আমরা যেন বৈচিত্র্য না-হারাই ! রবীন্দ্রনাথ শিল্পী, দার্শনিক নন। উপরন্তু, জৈন দার্শনিকরাও ছিলেন অনেকান্তবাদী ! সত্য (**reality**) যদি অনেকান্ত হয়, তবে কবি তাঁর অনুভূতি ও নিরীক্ষা সত্যের একটি মাত্র অন্তের উপর সন্নিবদ্ধ রাখলে চলবে কেন। সে-কবিকে আমরা অসম্পূর্ণ তথা গৌণ কবি বলবো না কি ?

পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থ 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ'-এ দু-তিন জন প্রতিভাবান এবং পাশ্চাত্য কাব্যে আধুনিকতার পথিকৃৎ কবির দৃষ্টির একান্তিকতা বিষয়ে আমার মনোক্ষোভ ব্যক্ত করেছিলাম। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে তাঁরা কেবল বীভৎসতা ও একঘেয়েমিই দেখতে পেলেন ; আর-কিছু দেখবো না—এই ছিলো তাঁদের তপস্যা। লেখক এবং পাঠক উভয়ের পক্ষে দুঃখজনক সে-তপস্যা। আর-কিছু নেই কোথাও, সবই ধূসর, সবই ন্যক্কারজনক—এই ছিলো তাঁদের দাবি। একজন তরুণ কবি বললেন তাঁর গুরুস্থানীয় প্রবীণ কবি সম্পর্কে—তিনিই কবিদের রাজা, তিনি সত্যদ্রষ্টা। একদেশদর্শিতাকে সত্যদর্শন বলা শুধু বিভ্রান্তিকর নয়, হানিকরও বটে। আমি নৈতিক ক্ষতির কথা এখানে তুলছি না, যদিও শেষ পর্যন্ত তার সম্ভাবনাও কম নয়। নীতিশিক্ষা-দান কবির পক্ষে পরধর্ম, তবু সাহিত্যের আলো বা ছায়া অলক্ষ্যে পড়ে পাঠকের নীতিবোধের উপর। আমি বলছি নান্দনিক ক্ষতির কথা। আমরা মহৎ কবির কাছ থেকে প্রত্যাশা করি অনুভূতির সূক্ষ্মতা, প্রশস্ততা, উদারতা ; যদি পাই অনুভূতির সংকীর্ণতা ও তিক্ততাই তবে ক্ষোভ করবো বৈ-কি। কী আশ্চর্য সে-অনুভূতির প্রকাশ—অবশ্যই যোগ করবো শ্রদ্ধার সঙ্গে। কিন্তু শুধু রূপের পরোৎকর্ষে কোনো কবির রচনা মহত্ত্বের শিরোপা লাভ করতে পারে না। যেমন কোনো-কোনো অপরূপ সুন্দরীকে দেখে আমাদের

মনে ক্ষোভ জাগে—এমন অপরিমেয় যার দেহের রূপ তার ব্যক্তিত্বের স্বরূপ এতো ছোটো মাপের কেন?

এই অনুষঙ্গে এবং এরই প্রতিতুলনায় রবীন্দ্র-কাব্যালোচনার অবতারণা করেছিলাম। রবীন্দ্রনাথ কেবল শুভ ও সুন্দরকেই দেখেননি, কেবল "আনন্দ, মঙ্গল ও ঔপনিষদিক মোহ" বিস্তার করেননি তাঁর ষাট বছরের কাব্যরচনায়, আরো অনেক-কিছু দেখেছিলেন এবং দেখিয়েছেন আমাদের।

'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ'-এ এই কথাটা সবিস্তারে বলতে হয়েছিলো আমাকে সাক্ষীসাবুদ উপস্থিত ক'রে। তার কতকটা এ-বইতেও উপ্‌চে এসে পড়েছে দু-চার জায়গায়—কোথাও ইচ্ছায়, কোথাও অনিবার্যত। ইচ্ছায় কারণ যেখানে আগের বইতে সে-কথার আলোচনা বড়ো সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ ঠেকলো, এ-বইতে তা আরো-একটু বিস্তৃতভাবে বলবার চেষ্টা করেছি। কোথাও-বা পূর্বালোচিত প্রসঙ্গ এখানেও এতো প্রাসঙ্গিক ছিলো যে সেটাকে বাদ দিতে গেলে যুক্তিতে ফাঁক থেকে যেতো। দুটি বইয়ের কোনো-কোনো অংশ পরস্পর-সম্পূরক। তবু আশা করি বক্তব্যের খুব একটা পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। কারণ প্রথমত, অনুষঙ্গ ও উদ্দেশ্য এখানে ভিন্ন, এবং বিতর্কমূলক নয়। দ্বিতীয়ত, চার-পাঁচ বছরে নতুন-কিছু শিখবার বুঝবার ভাববার ও অনুভব করবার অবকাশ পেয়েছি আমি। এ-বয়সে আবার নতুন ক'রে শেখা! হ্যাঁ, এ-বয়সেও। ভাঙা শরীর নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে আমাকে তো এগিয়ে চলতেই হবে। স্তূপীকৃত বিঘ্ন অগ্রাহ্য ক'রে যে-কোনো আধ্যাত্মিক সাধনার পথে—বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পসাহিত্য, সমাজসংস্কার, ধর্মবোধ—মানুষকে এগিয়ে চলতেই হয়। থামা (সাময়িক বিরামের কথা বলছি না, বলছি ব্যক্তি বা জাতির জীবনে দীর্ঘদিন গতিরহিত অবস্থার কথা) মনে প'ড়ে যাওয়া, পতন মানে মৃত্যু, জীবনে মৃত্যু। এমন জীবন্মৃতকে লক্ষ্য ক'রেই কি কবি গান বেঁধেছিলেন "হায় পথবাসী, হায় গতিহীন, হায় গৃহহারা" ?

রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান

(কল্যাণীয়া নীলিমা সেনের শ্রদ্ধাঞ্জলি)

কোনো দূর দেশের এবং দূরতর কালের এক তরুণ কবি—অধুনা "অর্বাচীন" ব'লে ঈষৎ অবহেলিত—বলেছিলেন : "আমাদের মধুরতম গান তা-ই যাতে ব্যক্ত হয় বিষণ্ণতম ভাব।" রবীন্দ্রনাথকে অবশ্য বিশেষভাবে দুঃখের কবি বলা যায় না, যদিও তাঁর অপরিণত বয়সে প্রকাশিত প্রথম কাব্যসংকলন 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' দুঃখবিলাসী, প্রথম প্রতিভাদীপ্ত কাব্য 'মানসী'র সুর মোটের উপর বিষণ্ণই, 'সোনার তরী' আর 'কল্পনা'র প্রথম ও সম্ভবত শ্রেষ্ঠ কবিতাদ্বয় নৈরাশ্যের নিবিড় ছায়ায় ঢাকা। শেষ দশকের কবিতায় দুঃখের ভাব গভীরতায় ও ব্যাপ্তিতে অন্য-সব ভাবকে ছাড়িয়ে গেছে। তবে তাঁর সবচেয়ে বিশ্ববিশ্রুত কাব্যপর্বটি শান্ত, সৌম্য, দুঃখের অনুভূতিও তখন মধুররসে ডোবা। রবীন্দ্রনাথ নিজেও নিজেকে আনন্দের কবি ব'লে ভাবতে ও বলতে ভালোবাসতেন ; তাঁর প্রিয়তম উপনিষদের শ্লোক বোধকরি "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি ; তাঁর ভক্তিগীতির পৌনঃপুনিক বাণী :

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে
দিনরজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গগনে

কিংবা :

জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।
ধন্য হল, ধন্য হল মানবজীবন।

রবীন্দ্রনাথের এই ভাবচ্ছবিটি সাধারণ পাঠক ও সমালোচকের চিত্তে বেশ উজ্জ্বল রেখায় আঁকা রয়েছে। অযথার্থ নয় এ-ছবি, বিশেষত গানের ক্ষেত্রে, এবং এই প্রবন্ধের বিষয় রবীন্দ্রনাথের গান-ই। তাঁর আনন্দের গান বৈচিত্র্যে ও সংখ্যায় দুঃখের গানকে ছাড়িয়ে গেছে, তথ্য হিসাবে এটা মানতেই হবে। কিন্তু আর্টের বিচারে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব সামান্যই। সংখ্যায় কম হ'লেও গুণের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গানই অগ্রগণ্য—অন্তত আমার মূল্যায়নে। কেন দুঃখের গান আমার মনকে, খুব সম্ভব আরো অনেক শ্রোতার মনকে, নিবিড়ভাবে স্পর্শ করে—সে-প্রশ্নটি আপাতত এড়িয়ে গেলাম। একটি সহজ উত্তর—দুঃখ দিয়েই যে আমাদের জীবন গড়া এবং জীবনের প্রতিবিম্বই তো আর্ট—আমার মনঃপুত নয়। কে হিসাব ক'রে বলতে পারে কার জীবনে দুঃখের পরিমাণ সুখের চেয়ে বেশি না কম। সমস্যাটা ভিন্ন। জানি না কেন দুঃখের প্রতি আমাদের মর্যাদাবোধ গভীর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দুর্ভাগিনী কন্যার চূড়ান্ত দুঃখের মুহূর্তে বলেছিলেন :

তোমার সম্মুখে এসে, দুর্ভাগিনী, দাঁড়াই যখন
নত হয় মন।

এমন কথা কি তিনি বলতে পারতেন কোনো সৌভাগ্যবতীর চরম সুখের মুহূর্তে? দুঃখের শ্রদ্ধেয়তার কারণ কি তবে এই যে দুঃখের হাতুড়ি দিয়ে পিটে-পিটে মানব-চরিত্র গঠন করা হয় এই মর্ত্যধামে, গঠন করেন বাউলদের সেই "নিঠুর দরদী"? অথচ কোনো-কোনো দুঃখ (যথা অ্যাসিডে পোড়া মুখ বা অনারোগ্য সংক্রামক কুষ্ঠ), এবং সব দুঃখই একটা মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে, দুঃখীর চরিত্রকে পাথরে খোদাই-করা দেবপ্রতিমার মতন সুন্দর তো করেই না, বরঞ্চ আরো দুর্বল ও কুশ্রী ক'রে ফেলে। এটি মানব-জীবনের একটি গভীর জিজ্ঞাসা। তাই বলছিলাম আপাতত থাক্ সে-প্রশ্নপরম্পরা।

রবীন্দ্রনাথের বেলায় শেলীর উদ্‌ধৃত পঙ্‌ক্তিটি মোটের উপর যদিও সত্য তবু এইসব অবিস্মরণীয় দুঃখের গানের রচয়িতা যেহেতু রবীন্দ্রনাথ, তাই দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অনুভূতির কালিমা কোথাও নিরেট নয়, অন্ধকার ঘন হ'লেও অভেদ্য নয়, কোনো-কোনো গানে দুঃখের পার দেখা না-গেলেও তার স্নিগ্ধ পবিত্রতা অনুভব করা যায় কোনো গানই বিশ্ববিধানের প্রতি ক্রোধ, ঘৃণা, তিক্ততা বা বিদ্রোহের ভাব জাগায় না আমাদের মনে। মানব-বিধানের কথা আলাদা। কিন্তু যে-সব গানে বা কবিতায় কবি মানবিক—বিশেষত সামাজিক বা রাষ্ট্রজাতিক—অন্যায় অত্যাচারের প্রতি অবিমিশ্র ধিক্কার বর্ষণ করেছেন, সেগুলি স্বভাবতই নান্দনিক স্তর থেকে স'রে গেছে নৈতিক স্তরে—যথা 'নৈবেদ্য'-এর "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে / তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে," এবং 'প্রান্তিক'-এর ১৭-সংখ্যক কবিতা।

গোড়াতেই ব'লে রাখা ভালো যে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ভাবের গানের মধ্যে যেমন দুঃখের গানই আমাকে সবচেয়ে বেশি টানে, তেমনি তাঁর বহুবিচিত্র সৃষ্টিক্ষেত্রের মধ্যে গানের ফসলকেই আমি সবচেয়ে মূল্যবান এবং কালজয়ী জ্ঞান করি। অবশ্য আমি ভুলে যাচ্ছি না যে রবীন্দ্রনাথের গান কথাপ্রধান, সুরপ্রধান নয়। তার একটি কারণ স্পষ্টত এই যে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুরকার পৃথিবীর মহত্তম কবিদের অন্যতম। অতুলপ্রসাদও উঁচুদরের সুরস্রষ্টা এবং রবীন্দ্রনাথের সুরশৈলীর খুব কাছে এসেও আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। কিন্তু তাঁর গানের কাব্যশক্তি এতোই সীমিত যে কথার দিকে মনোনিবেশ ঘটলে খানিকটা রসভঙ্গ হয়। প্রায় সব মার্গসঙ্গীতে কথা এমন সোচ্চারভাবে অকিঞ্চিৎকর যে সেদিকে মনোযোগ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, মনে হয় যেন কথা ছেঁড়া কাঁথা প'রে ভিখারী সেজেছে নিজেকে আড়ালে রেখে রাগরাগিণীর রাজকীয় ঐশ্বর্য প্রকাশ করবার জন্য। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে সুরের শিল্পোৎকর্ষ ও ব্যঞ্জনাশক্তি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই, তবু বলবো সুর সেখানে, রথ, সারথি নয়, কথার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা ও আদিগন্ত বিস্তার হৃদয়ের গভীরে

পৌঁছিয়ে দেওয়া তার কাজ। অবশ্য এমন কিছুসংখ্যক গানও রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন যাতে কথা ও সুর পরস্পরস্পর্ধী; আমাদের মুগ্ধ মনোযোগ গোড়ার দিকে দোল খেতে থাকে কথা থেকে সুরে, সুর থেকে কথায়, এবং রসানুভূতি চরমে পৌঁছয় তখনই যখন গীতশিল্পের দুই অঙ্গে আমরা আর ভেদ দেখতে পাই না, উপলব্ধি করি একই দেবতার মহিমা, যিনি একাধারে হরি এবং হর। সম্ভবত এগুলিই তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট গান। উদাহরণ দিতে গিয়ে মনে জাগে "চিরসখা হে, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না","আছ অন্তরে চিরদিন","এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ", "কী রাগিণী বাজালে হৃদয়ে"। আবার এমন গানও তিনি রচনা করেছেন যাতে সুরের শক্তি অসাধারণ হ'লেও কথার প্রাধান্য অনস্বীকার্য। উদাহরণ: "শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু, হে প্রিয়", "সকল জনম ভ'রে ও মোর দরদিয়া", "আরো আঘাত সইবে আমার", "চিনিলে না আমারে কি", "আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা" ইত্যাদি। আমার ব্যক্তিগত পক্ষপাত এদের দিকেই, হয়তো এই-জন্যেই যে আমি সুরের চেয়ে কথা অনেক বেশি বুঝি এবং একটু বেশি ভালোবাসি।

রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে তাঁর গান গাইবার সময়ে কণ্ঠশিল্পীরা যেন সুরের খাতিরে কথার অমর্যাদা না-করেন। যাঁরা প্রধানত সুরের রসিক ও সাধক, কথার প্রেমে পড়তে শেখেননি, তাঁরা গায়কই হ'ন আর শ্রোতাই হ'ন, রবীন্দ্র-সঙ্গীত তাঁদের জন্য নয়। "আকাশে বিদ্যুৎবহ্নি / অভিশাপ গেল লেখি", "হায় মম পথ-চাওয়া বাতি / ব্যাকুলিছে শূন্যেরে কোন্ প্রশ্নে","আমার না বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে/তোমার ভাবনা তারার মতন রাজে", "প্রভাত আলোরে মোর কাঁদায়ে গেলে", "রজনী মূর্ছাগত বিদ্যুৎঘাতে", "আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান", "আজি এ প্রাণের রুদ্ধ দ্বারে / ব্যাকুল কর হানি বারে বারে", "প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চরণে", "দিনগুলি মোর এমনি ভাবে / তোমার হাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে হারিয়ে যাবে", "হাল-ভাঙা, পাল-ছেঁড়া ব্যথা চলেছে নিরুদ্দেশে"—এমন শত-শত পঙ্‌ক্তি রবীন্দ্রনাথের গানে ছড়ানো রয়েছে। যাঁরা তার অলৌকিক শক্তি রক্তের শিরায়-শিরায় অনুভব করেন না, এবং সেই অনুভূতিকে কণ্ঠস্বরের দরদে ও শব্দের মমতাপূর্ণ উচ্চারণে ফুটিয়ে তুলতে পারেন না, পারার আবশ্যকতা পর্যন্ত বোধ করেন না, তাঁদের গলা যতোই পরিশীলিত হোক্ এবং সুরজ্ঞান প্রশ্নাতীত, রবীন্দ্রনাথের গানে তাঁরা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন না। শুনেছি রুপালী পর্দার কিংবা আধুনিক গানের এইসব নামজাদা গায়করা নাকি রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে জনপ্রিয় ক'রে দিয়েছেন। জনপ্রিয়তা অর্জন করবার জন্য যদি আপন সত্যমূল্য ও বৈশিষ্ট্য হারাতে হয় তবে রবীন্দ্রনাথের গান অতোখানি জনপ্রিয় নাই-বা হ'লো।

প্রতিভাবান শিল্পী এবং সাধারণ শিল্পরসিক ভিন্নতলের বাসিন্দা—এটা অস্বীকার করবার জো নেই। শিল্পী যদি কয়েক ধাপ নেমে আসেন তবে তিনি তাঁর সামাজি-

কতারই পরিচয় দেবেন। শিল্পকর্মকে খামখেয়ালী বা কালোয়াতি (craft-fetishist) দুর্বোধ্যতার শিখরে তুলে নিয়ে যাওয়াতে শিল্পীর গৌরব বাড়ে না। রসগ্রাহীকেও কিন্তু কয়েক ধাপ উপরে উঠবার পরিশ্রম স্বীকার করতে হবে। সুরুচি ও সহৃদয়তা জন্মসূত্রে কেউ লাভ করে না; কৃষিক্ষেত্রে যেমন, কৃষ্টিক্ষেত্রেও তেমনি কঠিন নিয়মিত ভূমিকর্ষণ অত্যাবশ্যক। একপক্ষের অভিযান একটু কম এবং অন্যপক্ষের সাধনা একটু বেশি হোক্, এই আমার আবেদন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এতোই উত্তুঙ্গ ছিলো যে কয়েক ধাপ নেমে আসতে তাঁর আত্মমর্যাদায় বাধেনি, সৃষ্টিকর্মেরও তাতে কোনো ক্ষতি হয়নি। তাঁকে একেবারে ফিল্মী বা আধুনিক গানের সমতলে নামিয়ে আনার চেষ্টা সকলের পক্ষে ক্ষতিকর। নিন্দিত-হোক্ এ অপচেষ্টা।

দুঃখের গান রবীন্দ্রনাথ কম রচনা করেননি। সর্বপ্রথমে সেই গানের কথা বলি যাতে দুঃখের অনুভূতি শুধু ব্যক্তিগত নয়, সর্বজাগতিক; যাতে কবির অথবা যে-কোনো বিরহীর অন্তর্বেদনা একাকার হ'য়ে মিলেছে বিশ্ববেদনার সঙ্গে এবং সারা জগতের বেদনা একটি ব্যক্তির হৃদয়ে জমাট বেঁধে অসাধারণ তীব্রতা লাভ করেছে:

অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে।
আজি শ্যামল মেঘের মাঝে বাজে কার কামনা॥
চলিছে ছুটিয়া অশান্ত বায়,
ক্রন্দন কার তার গানে ধ্বনিছে—
করে কে সে বিরহী বিফল সাধনা॥

আমাদের মনে ছবি জাগে এমন এক ভাগ্যহতের যার বিরহ কোনোকালে শেষ হবার নয়: সে-বিরহের কারণ প্রিয়ার মৃত্যুও হ'তে পারে, অথবা প্রাকৃতিক বা সামাজিক বাধা-ঘটিত এমন বিচ্ছেদ যা মৃত্যুর চেয়ে কম দুঃসহ নয়। সঙ্গে-সঙ্গে আর একটি ছবিও জেগে ওঠে। ঠিক ছবি নয়, কারণ এই দ্বিতীয় ভাবটি চিত্রগ্রাহ্য নয়। বরঞ্চ মনে হয় প্রথম চিত্রটি প্রতীকমাত্র। পারমার্থিক পূর্ণতা এবং পার্থিব অপূর্ণতার মধ্যে অপার বিচ্ছেদ। মিলন প্রত্যাসন্ন নয়, সহজসাধ্য নয়, আদৌ সম্ভব কিনা তা নিয়েও সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাই কামনা এমন ব্যথাতুর, ব্যথা এমন মর্মন্তুদ এবং দিগন্তব্যাপী। এ-যন্ত্রণা জগৎ-সৃষ্টিরই প্রসব-যন্ত্রণা। "দুঃখ" শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "দুঃখের যত-প্রকার ব্যাখ্যাই করি-না কেন, দুঃখ তো দুঃখই থাকিয়া যায়। না থাকিয়া যে জো নাই। দুঃখের তত্ত্ব আর সৃষ্টির তত্ত্ব যে একেবারে এক সঙ্গে বাঁধা। কারণ অপূর্ণতাই তো দুঃখ এবং সৃষ্টিই যে অপূর্ণ।"

জগতের মধ্যে যে নানা দোষ-ত্রুটি কুশ্রীতা-কদর্যতা-কর্কশতা রয়েছে তা রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেন না। বিশ্বের ঐকতান সঙ্গীত রচিত হয়নি এখনো; সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সমস্ত বেসুরকে বুকে টেনে নিয়ে সঙ্গীত-রচনার মহড়া চলছে জগৎ জুড়ে, ইতিহাস জুড়ে। মাঝে-মাঝেই তার ছিঁড়ে যায়, তাল কেটে

যায়। স্বাধীন মানুষ এবং সুস্থ মানব-সমাজ গ'ড়ে তুলবার পথে এমন পর্বতপ্রমাণ বিঘ্ন এসে উপস্থিত হয় যে আমরা শিউরে উঠে ভাবি এতোকালের সব সাধনাই বুঝি বিফল হয়েছে, সব পথই হারিয়ে গেছে চির অন্ধকারে।

উপনিষদ বলেন, ব্রহ্ম তপস্যার দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করলেন। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, সে-সৃষ্টি কোনো ধারাবাহিক মহৎ উপন্যাসের মতো এখনো ক্রমশ প্রকাশ্য, বরঞ্চ বলা উচিত ক্রমশ লেখ্য। ক্লিষ্ট রচনার পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি কেটে দেওয়া পাতাগুলি, একটার পর একটা বাতিল-করা খসড়াগুলি বিশেষভাবে দেখা যায় মানুষের মধ্যে, মানব-সমাজের মধ্যে। তাই তপস্যাও চলছে এবং তপস্যা-নিঃসৃত বেদনারও শেষ নেই। সেই বেদনা "চঞ্চল বেগে বিশ্বে দিল দোলা"। তবে কি তপস্যা ক্রমশ শিথিল হ'য়ে আসছে এবং বেদনা বদ্ধমূল ও সর্বব্যাপী? না, অতোখানি নৈরাশ্যবাদী নন রবীন্দ্রনাথ। "অশ্রুভরা বেদনা" ও "বেদনা কী ভাষায় রে" গানদুটিতে ভাগবত ঐক্য আছে, দুটির বেদনাই জগৎ-জোড়া। কিন্তু প্রথমটি অশ্রুভরা বেদনাতে শুরু এবং শেষ। দ্বিতীয় গানের শেষে শুনি :

মনোমোহন বন্ধু—
আকুল প্রাণে
পারিজাতমালা সুগন্ধ হানে ॥

কিছুই দেখা যায় না, কিছুই বোঝা যায় না, তবু আকুল প্রাণে কোথা থেকে যেন সুগন্ধ আসে, জাগিয়ে তোলে আমাদের ভাবয়িত্রী ও কারয়িত্রী শক্তিগুলিকে, বাঁচিয়ে রাখে বেঁচে থাকার—মানুষ হ'য়ে বেঁচে থাকার—ইচ্ছাটাকে! একে বলা যায় রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্থায়ী ভাব। এরই অন্যতম এবং উৎকৃষ্টতর উদাহরণ :

সহসা দারুণ দুখতাপে সকল ভুবন যবে কাঁপে,
সকল পথের ঘোচে চিহ্ন সকল বাঁধন যবে ছিন্ন
মৃত্যু-আঘাত লাগে প্রাণে—
তোমার পরশ আসে কখন কে জানে।

ক্বচিৎ-কখনো অন্ধকার আরো ঘন হয়েছে, নৈরাশ্য আরো দুরভিভব, আরো দুর্বিষহ। অনেক বেশিসংখ্যক গানে অবশ্য আনন্দধারা ব'য়ে চলেছে—প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যে আনন্দ, মানুষের অপরাজেয় শক্তিতে আনন্দ, ঈশ্বরের অনন্ত মঙ্গলবিধানে আনন্দ। কিন্তু সংখ্যাগণনার দ্বারা তো কবির মনের সত্য পরিচয় পাওয়া যায় না। তাই আমি বলতে সাহস পাই যে গীতিরচয়িতা রবীন্দ্রনাথের হৃদয়-মন যে দুই প্রত্যন্ত রেখার মধ্যে দোদুল্যমান ছিলো, তাদের মধ্যবর্তী সুস্থিতি-বিন্দু অধিকার ক'রে আছে উপরে অংশত উদ্‌ধৃত হৃদয়গ্রাহী গানটি ("পথে চলে যেতে যেতে কোথা কোন্‌খানে")।

বিপরীত নাটকীয় পরিস্থিতি এবং অনুভূতির রূপকল্প (pattern) দেখি "তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়" গানটিতে। দুঃসহ দুঃখ-আঘাতে নৈরাশ্যের অন্ধকার যখন

এতো ঘন যে, "সকল পথের ঘোচে চিহ্ন" তখন যেমন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সান্ত্বনা ও শান্তি নেমে আসে তেমনি যখন সবই শুভ্র সুন্দর মধুর, কোনোদিক থেকে বিপদপাতের লেশমাত্র সম্ভাবনা নেই, সমস্ত আকাশ নির্মল নীল, জল অগভীর, নিস্তরঙ্গ—ঠিক তখনই :

তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়
কোন্‌খানে রে কোন্ পাষাণের ঘায় ॥
নবীন তরী নতুন চলে, দিই নি পাড়ি অগাধ জলে—
বাহি তারে খেলার ছলে কিনার-কিনারায় ॥
ভেসেছিল স্রোতের ভরে, একা ছিলেম কর্ণ ধ'রে—
লেগেছিল পালের 'পরে মধুর মৃদু বায় ।
সুখে ছিলেম আপন মনে, মেঘ ছিল না গগণকোণে—
লাগবে তরী কুসুমবনে ছিলেম সেই আশায় ॥

যে-পাষাণের ঘায়েই হোক্ তরী হঠাৎ ডুবে যাচ্ছে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগিয়ে—এ কোন্ তরী, কিসের প্রতীক এ-তরী ? মনে তো হয় না এ কোনো ব্যক্তিগত ছোটোখাটো আশা-আকাঙ্ক্ষার তরী। গানের ইঙ্গিত আরো অতল, গভীর, নিমেষে জীবনের কোনো প্রান্তিক পরিস্থিতির উদ্বেগ জাগিয়ে তোলে শ্রোতার হৃদয়-মনে। মানব-জীবনের সবচেয়ে বড়ো আশার তরী ডুবে যাওয়ার ট্র্যাজিক চিত্রই ফুটে উঠেছে এই গানে। কোনো কঠোর অভিজ্ঞতার আঘাতে জগৎ-পিতার যে পিতৃপুরুষাগত স্নেহ-করুণা-কল্যাণময় মূর্তিতে আশৈশব আস্থা রবীন্দ্রনাথের মনে এতোদিন সহজ মধুর নিরুদ্বেগ ছিলো, সেই জাগতিক মঙ্গল-বিধানের প্রতি ভরসার তরীখানাই কি আজ হঠাৎ ডুবে যাচ্ছে ? সে-তরী ডুবে যাওয়ার অর্থ যে কী মর্মবিদারক, যাঁরা কীর্কেগার্ডের লেখার সঙ্গে পরিচিত তাঁরা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। রবীন্দ্রনাথ কীর্কেগার্ডের লেখার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কিনা জানি না, সম্ভবত ছিলেন না। তবে কীর্কেগার্ডীয় আধ্যাত্মিক যন্ত্রণা তাঁর অজানা ছিলো না—এই কথাটাই বলতে চাচ্ছি।

"If God does not exist, then everything is permitted." না কিন্তু। ঈশ্বর-বিশ্বাস চ'লে গেলেও আমাদের হৃদয়কক্ষে বহুযত্নে লালিত মূল্য-বিচারের একটি প্রতিমান থেকে যায়, তার নির্দেশ আমরা এড়াতে পারি না। ঠিক সময়ে সে-ই ব'লে দেয় জীবনে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিল্প-সাহিত্য কোনটা হেয় কোনটা শ্রদ্ধেয়। সর্বজনীনতার দাবি সে রাখে না, তবু আমার পক্ষে আমার অন্তরতম মূল্যবিচারই চরম। কিন্তু কোনো নিদারুণ পরিস্থিতিতে এই মাপকাঠিও যদি ভেঙে টুক্‌রো-টুক্‌রো হ'য়ে যায়, ভালো-মন্দ সব একাকার হ'য়ে যায় ? সত্য শ্রেয় ও সুন্দরের প্রতি যে-অনুরাগ ও শ্রদ্ধা মানুষের জীবনকে নিছক জৈবিকতার গ্লানি থেকে বাঁচিয়ে রাখে, তার সাময়িক কিন্তু সম্পূর্ণ বিলয়—সেই অনির্বচনীয় ভয়ঙ্কর সম্ভাব্যতার মুখোমুখি দাঁড়ানোটাকেই বলে "encounter with nothingness"।

নাস্তিকতার চেয়েও নিদারুণতর যে চূড়ান্ত নাস্তি, তার সঙ্গে ভীম পরিচয় ভক্ত ও প্রেমিক রবীন্দ্রনাথের, শুভ্র ও সুন্দরের বেদীতে আত্মনিবেদিত রবীন্দ্রনাথের, যে কখনোই ঘটেনি তা নয়। না-ঘটলে তিনি এতো বড়ো কবি হ'তে পারতেন না, তাঁর অভিজ্ঞতা-বিস্তার থাকতো ভাববর্ণালির সংকীর্ণতর সীমার মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে। তাঁর দীর্ঘ কবিজীবন তিনি একই শ্যাম-ছায়াঘন তীরে ব'সে কাটাননি, বারে-বারে তাঁর অন্তর্যামীর কাছ থেকে নোঙর তুলে নেওয়ার নির্দেশ পেয়েছেন, পাড়ি দিয়েছেন অজানা দুর্নাব সমুদ্রে ; কখনো-বা 'বীথিকা'র দুর্ভাগিনীর মতন খুঁজেছেন "কাছের বিশ্ব মুহূর্তে যা চলে গেল দূরে"—এতো দূরে যে ভয় হয়েছে বুঝি-বা ডুবে যাবে অতল অন্ধকারে।

অনুভূতির বিশ্বব্যাপ্তি এবং কস্‌মিক তাৎপর্য আরো সুস্পষ্ট অন্য-একটি গানে। রবীন্দ্রনাথ অভয় বা নির্ভয়ের গান অনেক বেঁধেছেন, ভয়ের গান বিরল। আমি অবশ্য "জয় ক'রে তবু ভয় কেন তোর যায় না" বা "আজি বিজন ঘরে নিশীরাতে আসবে যদি শূন্য হাতে/আমি তাইতে কি ভয় মানি" গোছের মধুর-কোমল ভয়ের কথা ভাবছি না, যা প্রেমিক-হৃদয়কে সর্বদাই অল্পবিস্তর আন্দোলিত করে ; ভাবছি সেই দুর্বার অনুভূতির কথা যা প্রবল বন্যার মতো সকল বাঁধ ভেঙে দিগন্ত থেকে দিগন্ত প্লাবিত ক'রে ফেলে :

পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে।
পিছিয়ে পড়েছি আমি, যাব যে কী করে।
এসেছে নিবিড় নিশি, পথরেখা গেছে মিশি—
সাড়া দাও, সাড়া দাও আঁধারের ঘোরে॥
ভয় হয়, পাছে ঘুরে ঘুরে যত আমি যাই তত যাই চলে দূরে—
মনে করি আছ কাছে, তবু ভয় হয়, পাছে
আমি আছি তুমি নাই কালি নিশিভোরে॥

"সাড়া দাও, সাড়া দাও আঁধারের ঘোরে"—এই আর্ত প্রার্থনার মধ্যে আশার প্রকাশ যতো করুণ, "আমি আছি তুমি নাই"তে ভয়ের ব্যঞ্জনা তার চেয়ে তীব্র। আর কী নিদারুণ সে-ভয়—মনকে যতোই ভোলাই যে ঘুরে-ঘুরে তোমার কাছে যাচ্ছি ততোই দূরত্ব বেড়ে যায়, অন্ধকার হয় ঘন ; শুধু দৃষ্টির নয়, ধ্যানেরও বাইরে স'রে যাচ্ছ তুমি। এই অতল আদিগন্ত অন্ধকারে আমি যদি-বা বাঁচি, আমার প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখবো কেমন ক'রে।

সঁভলনে দে মুঝে, অয় না-উম্মীদী, কেয়া কয়ামৎ হৈ,
কেহ্‌ দামানে খয়ালে যার ছুটা জায়ে হৈ মুঝসে।
(হে নৈরাশ্য, এ কী প্রলয় কাণ্ড। একটু সামলে নিতে দাও, বন্ধুর ধ্যানের আঁচলের যে শেষ প্রান্তটুকু আমার হাতের মুঠোয় ছিলো তা-ও ফস্‌কে যাচ্ছে। —গালিব)

নৈরাশ্য আরো নগ্ন, আরো অন্তিম রূপ ধারণ করেছে সেই গানে—'চণ্ডালিকা'র শেষে যার উপযোগিতা তর্কসাপেক্ষ। কেবলমাত্র চণ্ডালিনীর ঝি-র অনুতপ্ত বিক্ষোভ

প্রকাশ করতে হ'লে এই গানের ব্যঞ্জনাকে অনেকখানি ছোটো ক'রে নিতে হয়। "মা ভয় হচ্ছে। তাঁর পথ আসছে শেষ হ'য়ে—তার পরে? তার পরে কী। শুধু এই আমি, আর কিছুই না! এতোদিনের নিষ্ঠুর দুঃখ কি এতেই ভরবে? শুধু আমি? কিসের জন্যে এতো দীর্ঘ, এতো দুর্গম পথ! শেষ কোথায় এর! শুধু এই আমাতে?" অথচ গানের প্রতিটি পঙ্‌ক্তি জানিয়ে দেয় যে তার অনুভূতি এর চেয়ে অনেক বড়ো, অনেক গভীর। সেইজন্যে বোধহয় আরো কয়েক বছর পরে রচিত 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা' থেকে গানটিকে বাদ দেওয়া হয়েছিলো:

পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়, কী আছে শেষে!
এত কামনা, এত সাধনা কোথায় মেশে।
ঢেউ ওঠে-পড়ে কাঁদার সম্মুখে ঘন আঁধার—
পার আছে কোন্ দেশে।
আজ ভাবি মনে মনে, মরীচিকা-অন্বেষণে
বুঝি তৃষ্ণার শেষ নেই—মনে ভয় লাগে সেই,
হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া ব্যথা চলেছে নিরুদ্দেশে॥

এ-পথ জীবনেরই পথ, কিন্তু জীবনমাত্রের নয়, উদ্দেশ্যবিহীন, ক্ষণবিলাসী, প্রাত্যহিকতার স্রোতে ভেসে-যাওয়া জীবনের পথ নয়। যে-পথের শেষ কোথাও নেই ব'লে রবীন্দ্রনাথের মনে ব্যাকুলতা ও নৈরাশ্যের উদয় হয়েছে এ-গানে, তা নিশ্চয়ই পরমের দিকে এগুবার পথ, পরমেশ্বরকে পাওয়ার পথ। এই পথে চলাকে মরীচিকা-অন্বেষণের সঙ্গে তুলনা করার অর্থ কি এই যে রবীন্দ্রনাথের মনে ব্যথিত ব্যাকুল সন্দেহ জেগেছে হয়তো ঈশ্বরকে ভুল পথে সন্ধান করেছেন এতোদিন; নাকি ভয়ের কারণ আরো গভীর? ভুল পথে চলেছে বুঝতে পারলে মানুষ ঠিক পথের সন্ধান পেতেও পারে একদিন। কিন্তু সে যদি ক্রমশ উপলব্ধি করে যে সব পথই ভুল পথ, তখন তার কী দশা হবে? সে কি গতিশক্তি হারিয়ে ব'সে পড়বে পথের মাঝখানে, আর দেখবে তার হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া ব্যথা চলেছে নিরুদ্দেশে, তাকে পিছনে ফেলে?

"সম্মুখে ঘন আঁধার"; তাই কাতর প্রার্থনা—হয়তো-বা বৈদিক প্রার্থনারই অনুরণন:

আর রেখো না আঁধারে, আমায় দেখতে দাও।
... ...
স্বপ্নভারে জমল বোঝা, চির জীবন শূন্য খোঁজা—
যে মোর আলো লুকিয়ে আছে রাতের পারে
আমায় দেখতে দাও।

যে-আলোর ক্ষীণতম আভাসটুকুও দেখা যাচ্ছে না, তারই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা স্থাপন ক'রে বলেছেন, "যে মোর আলো"। কিন্তু সে-আলো লুকিয়ে আছে তো রাতের পারে? খোঁজা কি কোনোদিন শেষ হবে, রাত্রি কি কখনো

প্রভাত হবে ? "শূন্য খোঁজা"—কী ভয়ানক তার দ্যোতনা। হতাশা কতোদূর মর্মঘাতী হ'লে মানুষ বলতে পারে—খুঁজবার উপযুক্ত কোনো লক্ষ্যই খুঁজে পেলাম না, তাই শূন্যকেই খুঁজছি। এ-খোঁজার শেষ হবে না শুধু তাই নয়, শেষ হবে এমন চিন্তাই আত্মবিখণ্ডিত !

এই ট্র্যাজিক উপলব্ধির সুন্দরতর প্রকাশ বর্ষার একটি গানে। গোড়াতেই আমরা অনুভব করি সেই আতঙ্ক, যার বিষয় কোনো ঘটনা বা বস্তুবিশেষ নয়, বিষয় শূন্যতা, nothingness :

যায় দিন, শ্রাবণদিন যায়।
আঁধারিল মন মোর আশঙ্কায়,
মিলনের বৃথা প্রত্যাশায় মায়াবিনী এই সন্ধ্যা ছলিছে ॥
আসন্ন নির্জন রাতি, হায়, মম পথ-চাওয়া বাতি
ব্যাকুলিছে শূন্যেরে কোন্ প্রশ্নে ॥

রাত্রি এখনো আসেনি, কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে সন্ধ্যার প্রদোষান্ধকার ইতিমধ্যে গাঢ় হ'য়ে গেছে মেঘে-বৃষ্টিতে। মিলনের কাল অবশ্য রাত্রি, কিন্তু সন্ধ্যার লগ্নেই বিরহিণী বুঝতে পেরেছে যে তার প্রত্যাশা বৃথা, মায়াবিনী সন্ধ্যার ছলনামাত্র। কেমন ক'রে বুঝলো সে ? সে কি সন্দেহ করছে যার সঙ্গে মিলনের জন্য সে আকুল, সে শুধু অনুপস্থিত নয়, অবাস্তব, সে-ও সন্ধ্যারই ছলনা, অথবা তারই প্রেম-বিহ্বল মনের অভিক্ষেপ (projection) ? "ব্যাকুলিছে" ক্রিয়ার প্রয়োগ এখানে অভিনব, অপ্রত্যাশিত, এবং সেই কারণে এতো মর্মস্পর্শী। রেডিওতে শুনেছি কোনো-কোনো কণ্ঠশিল্পী সম্ভবত ব্যাপারটাকে সহজবোধ্য ক'রে নেওয়ার জন্য গান করেন "মম পথ-চাওয়া বাতি ব্যাকুলিছে শূন্যের কোন্ প্রশ্নে।" "শূন্যেরে"-কে "শূন্যের" বললে অর্থ যায় উলটে এবং রসের বারো আনাই মাটি হয়। নির্জন ঘরে প্রতীক্ষমাণা হতভাগিনীর হ'য়ে প্রদীপের কম্পমান শিখা প্রশ্ন করছে—সে কি আসবেনা, সে কি বুঝবে না আমার ব্যথা ? কিন্তু বাতিও জানে, প্রশ্নটি কতো অর্থহীন ; এমন কেউ কোথাও নেই যার কাছে প্রশ্ন পৌঁছতে পারে, সাড়া পাওয়া তো অনেক দূরের কথা। প্রশ্ন শূন্যেই হারিয়ে যাবে। শূন্যকে ব্যাকুল করার চেষ্টার চেয়ে বৃথা এবং নিষ্করুণ আর কোন চেষ্টা হ'তে পারে।

নাকি কবির মনে এমন অবাস্তব শিশু-সুলভ আশা জাগে যে প্রশ্নের ব্যাকুলতা—যে ব্যাকুলতা বৃষ্টি-মুখরিত শ্রাবণ-সন্ধ্যার পর থেকে তীব্রতর হ'তে থাকবে রাত্রির গভীরতার সঙ্গে-সঙ্গে—শূন্যের মধ্যে জাগিয়ে তুলবে অনন্ত প্রাণ-মন-হৃদয়, যে-হৃদয়ে হয়তো-বা এই ব্যাকুলতার সামান্যতম সংক্রাম লাগবে ? অসম্ভব, এ অসম্ভব। তবে অসম্ভবের কাছে হার মানেননি এক বিশ্ববিশ্রুত সেনানায়ক, বিশ্ববিশ্রুত কবিই-বা পিছিয়ে থাকবেন কেন ?

এই গানটি 'গীতবিতান'-এ "প্রকৃতি" পর্যায়ের গানের অন্তর্ভুক্ত ; প্রেমের গান

বললে পরিচয়টা আরো সঠিক হ'তো। আমার কিন্তু ভাবতে ভালো লাগে গানটিকে ভক্তিরসের গানরূপে। বলা বাহুল্য, যে-রবীন্দ্রনাথকে আমি নিবিড়ভাবে চিনি, তাঁর মনের ভক্তি সাধুসন্তদের ভক্তির মতো বিশুদ্ধ বিমূর্ত অনির্বাচ্য ভক্তি নয়, অত্যাশ্চর্য বচনে প্রকাশ পেয়েছে রসরূপে—যদিও ভক্তিরস নবরসের তালিকাভুক্ত নয়। ভক্তির শ্বাসরোধ ক'রে মাঝে-মাঝে নেমে আসে যে ঘনান্ধকার রাত্রি—**dark night of the soul**—তারই কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ এ-গানে। তখন ভক্তের অন্তরের অন্ধকার আর বাইরের অন্ধকার একাকার হ'য়ে যায়:

নিবিড়-তমিস্র-বিলুপ্ত-আশা ব্যথিতা যামিনী খোঁজে ভাষা—

মনে হয় মেঘ নয়, ঘন নৈরাশ্যই ঢেকে দিয়েছে আকাশের সব তারা; নিরালোক যামিনী হারিয়েছে তার সব ভাষা।

দিকে দিকে কোথাও নাহি সাড়া,
ফিরে খ্যাপা হাওয়া গৃহছাড়া।

ভক্ত প্রেমিকার খ্যাপামি ঘরের শান্ত হাওয়াকে খেপিয়ে গৃহছাড়া করেছে, কিন্তু ভক্তির ব্যাকুলতা কি দিগন্তব্যাপী শূন্যে কোনো সাড়া জাগাতে পারবে?

ভক্ত-ভগবানের সম্পর্ক এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার। প্রেমময় ভগবান খোঁজেন তাঁর মনের মতো ভক্তকে; পিপাসিত ভক্তি খোঁজে তার মনের মতো পাত্রকে। খোঁজার শেষ নেই, তবে পথে চলতে-চলতে কিছু তো পায় পান্থজনেরা, নইলে অন্ধকার রাত্রিতে উপলবন্ধুর কণ্টক-সমাকীর্ণ পথে ক্ষতবিক্ষত পায়ে চলবার শক্তি সে পাবে কোথা থেকে। যদি বলি এই কুড়িয়ে বা খুঁজে পাওয়ার মধ্যে আবিষ্কারের চেয়ে সৃষ্টির ভাগ কিছু কম নয়, তবে খুব ভুল বলা হয় না। প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রেমাস্পদকে বলেছিলেন—"অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা"। ভক্ত কি ভগবানকে বলতে পারেন না—অর্ধেক সত্য তুমি, অর্ধেক আমারই রচনা? এই রচনার উৎস কিন্তু শিশুমন্য মানুষের বাসনাপূরণ নয়, অন্তত রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষের ক্ষেত্রে নয়। দশ হাজার বছর আগেকার মানুষের বা দশ বছর বয়সের বালকের মনের উপাদান দিয়ে আজকের দিনের সংস্কৃতির সর্বোচ্চ শিখরে যাঁরা আরোহণ করেছেন, তাঁদের মন বোঝার চেষ্টায় কতকটা বৈজ্ঞানিক গোঁড়ামি, কতকটা বিদ্বানী ছেলেমানুষী রয়েছে। পূর্বোক্ত "অর্ধেক আমারই রচনা"র উৎস খুঁজতে হবে কবি-মনের গভীর জ্বালাময় ব্যাকুলতায়। প্রেমের বেলা যেমন অর্ধেক সত্যের উপরই প্রেমিকের কল্পনা রঙ বোলাতে পারে, শূন্য ক্যানভাসের উপর নয়, ভক্তির বেলায়ও তেমনি মানবিক ও প্রাকৃতিক জগতের অভিজ্ঞতায় ঐশী গুণের আভাস না-পেলে ভক্তের ব্যাকুলতা কিছুই রচনা করতে পারবে না। কিছু যদি উদ্‌ঘাটিত না-হয়, সবই মনগড়া হয়, তবে তেমন রচনার সঙ্গে আফিমখোরের দিবা-স্বপ্নের তফাৎ থাকবে না।

এ-সব সত্য হ'লেও—যদি সত্য হয়—আলোচ্য গানের অনুভূতি "নিবিড়-তমিস্র-বিলুপ্ত-আশা"রই অনুভূতি। মনের ভিতরের ও ঘরের বাইরের অন্ধকার এমনই ঘন যে পথের শেষ কোথায় জানা তো দূরের কথা, পথের কোনো চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না কোনো দিকে; সন্ধ্যা মায়াবিনী, রাত্রি মমতাহীন, আকাশ "উষা-দিশা-হারা"।

"যায় দিন, শ্রাবণদিন যায়" এবং "পথের শেষ কোথায়" গান-দুটিতে যে অন্তিম নৈরাশ্য-বিষাদের ভাব ব্যক্ত হয়েছে তা রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গানের ভাবর্বণালির প্রান্তবর্তী, প্রায় প্রান্ত-বহির্ভূত। গীতাঞ্জলি পর্বের যতোগুলি দুঃখের গান আমরা পাই তার একটি-দুটি বাদে সবগুলিই স্পেক্‌ট্রামের অন্য প্রান্তে অবস্থিত। সে-দুঃখ অসীম পাথার পার হয়, সে-দুঃখের তিমিরেই জ্বলে মঙ্গল-আলোক, সে-দুঃখের বেশ ধারণ ক'রেই পরমপ্রিয় নেমে আসেন ঊর্ধ্বলোক থেকে, দাঁড়ান দুঃখিনীর পাশে, সমস্ত ভয়-ডর ভুলে গিয়ে এগিয়ে আসে প্রতীক্ষায় অধীরা প্রণয়িনী, তাঁকে এই লৌহকঠিন বেশেই বুকে চেপে ধরে। ক্ষতবিক্ষত হয় তার কোমল বুক, কিন্তু সে কী প্রচণ্ড পুলক। আরো কঠিন আঘাত সইবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে তার জীবনের কম্পিত তারগুলি। এই প্রাণান্তিক যন্ত্রণা দিয়েই প্রাণোজ্জীবনী প্রেমসুধা পান করানো—এ-ও সেই নিঠুর দরদীর এক খেয়াল, একপ্রকার আধ্যাত্মিক রতি-রঙ্গ; যদিও দাম্পত্য মিলনের মধুর খেলার সাথে এ-খেলা কোনোমতে তুলনীয় নয়।

নয় এ মধুর খেলা—
তোমায় আমায় সারাজীবন সকাল-সন্ধ্যাবেলা
নয় এ মধুর খেলা॥
কতবার যে নিবল বাতি,
গর্জে এল ঝড়ের রাতি,
সংসারের এই দোলায় দিলে সংশয়েরই ঠেলা॥
বারে বারে বাঁধ ভাঙিয়া বন্যা ছুটেছে।
দারুণ দিনে দিকে দিকে কান্না উঠেছে।
ওগো রুদ্র, দুঃখে সুখে
এই কথাটি বাজল বুকে—
তোমার প্রেমে আঘাত আছে, নাইকো অবহেলা॥

"তোমার প্রেমে আঘাত আছে, নাইকো অবহেলা"—এই শেষের পঙ্‌ক্তিটি প্রণিধান-যোগ্য। হালের অভিজাত সাহিত্যিক পরিভাষায় যাকে বলে alienation, বিচ্ছিন্নতাবোধ—এ তার বিপরীত বোধ। শেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথ "উদাসীন জগতের (তার মানেই জগদীশ্বরের, কারণ জগৎকে জগদীশ্বর থেকে ভিন্ন ক'রে দেখা রবীন্দ্র-মানস-বিরুদ্ধ) ভীষণ স্তব্ধতা"-র কথা বলবেন, বলেছিলেন কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর বছর সাতেকের মধ্যে প্রকাশিত 'মানসী' কাব্যেও। কিন্তু মধ্য পর্বে আঘাত যতোই নিদারুণ হোক্, তা অবহেলা নয়, অবহেলার চেয়ে অনেক বেশি বরণীয় ও সহনীয়।

এমন আঘাতের মধ্যে জগদীশ্বরের বিশেষ একটি উদ্দেশ্য লুকানো রয়েছে, সে-উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রেম নাতিপ্রচ্ছন্ন।

যদিও রবীন্দ্রনাথ বললেন এ-খেলা মধুর নয়, তবু গানের পর গানে আমরা বুঝতে পারি যে দুঃখ দেওয়া-নেওয়ার খেলা সুখের খেলার চেয়ে কম মনোহর নয়। "কুড়িয়ে আনা, ছড়িয়ে ফেলা, এই কি তোমার একই খেলা"—এ-ভাবখানা রবীন্দ্র-সঙ্গীতে যেমন, তাঁর পূর্বসূরী, মরমিয়াদের গানেও তেমনি সুন্দর ফুটেছে। কিন্তু ভগবানের এই লীলায় ভক্ত নিজেও সমান তালে যোগ দিয়েছে, পাল্টা জবাব দিচ্ছে প্রথাসম্মত লীলার ভাষাতেই, কিছুমাত্র কুণ্ঠা বা সন্ত্রাসের বিহ্বলতা বোধ না-ক'রে, তার আশ্চর্য প্রকাশ আমার সেই প্রিয় গানে:

সকল জনম ভ'রে ও মোর দরদিয়া,
কাঁদি কাঁদাই তোরে ও মোর দরদিয়া॥
আজ হৃদয়-মাঝে
সেথা কতই ব্যথা বাজে,
ওগো এ কি তোমায় সাজে
ও মোর দরদিয়া।
এই দুয়ার-দেওয়া ঘরে
কভু আঁধার নাহি সরে,
তবু আছ তারি 'পরে
ও মোর দরদিয়া।
সেথা আসন হয় নি পাতা,
সেথা মালা হয় নি গাঁথা,
আমার লজ্জাতে হেঁট মাথা
ও মোর দরদিয়া॥

গানটি—বিশেষ ক'রে গানের প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তি—শুনলে মনে হয় দাম্পত্যপ্রেমের গান। সে-প্রেমের গভীরতা ও মাধুর্য যতোই থাক্, দিনানুদৈনিক সংসারযাত্রার বিচিত্র ঘটনার মধ্যে দুটি-একটি অভিঘাতে দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার স্বাতন্ত্র্য অনিবার্যত অল্পস্বল্প ক্ষুণ্ণ হওয়ার দরুন মাঝে-মাঝে তিক্ততা এসেই পড়ে। মানসপ্রিয়া বিয়াত্রিচের বেলা কাঁদাবার কোনো প্রশ্ন ওঠে না; বহুদূরে তার অবস্থান, হয়তো-বা মৃত্যুর সীমানা ছাড়িয়ে। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টার সম্বৎসরের সঙ্গিনীর বেলা এমন সম্ভাবনা এড়িয়ে যাওয়া শক্ত। সে যাই হোক্, গানটি কিন্তু 'গীতবিতান'-এর ভক্তি-পর্বে সন্নিবেশিত, ভক্তিগীতিরূপেই সাধারণত এবং সঙ্গতভাবেই গাওয়া হয়। অথচ ভক্তের মুখে কি ভগবানকে বলা সাজে—কাঁদাই তোরে? ভক্ত নিজে কাঁদতে পারে প্রেম-ভক্তির পাত্র যিনি তাঁর অভাবনীয় পূর্ণতা ও অনুত্তরণীয় দূরত্বের কথা ভেবে, নিজের অকথনীয় অকিঞ্চিৎকরতার কথা ভেবে। কিন্তু ভগবানকে যে কাঁদাবে—তার এতো বড়ো শক্তি বা মর্যাদা ঠিক ধারণা করতে পারি না।

ভক্ত মানুষের যাবতীয় মানবিক দুর্বলতা, তাঁর নৈতিক দুর্গতি, পদে-পদে-স্খলন এমন-কি প্রেমধর্মেও অধর্মাচরণ পরমপ্রিয়ের দুঃখের কারণ হ'তে পারে অবশ্য; অন্তত এ-কথা আমরা ভাবতে পারি। এটাই গানের প্রথম স্তবকের সহজ অর্থ। কিন্তু শেষ অর্থও কি তাই? অন্তত আমার মনে এবং বেদনায় আর একটি অর্থ জাগে।

অর্থাৎ আমি তোমার মনের মতনটি হ'তে পারিনি ব'লে তোমাকে দুঃখ দিই, কাঁদাই। অনুরূপ কারণে আমিও তো কাঁদতে পারি। ভগবান, তুমি যতো বড়োই হও, যতোই ভালোই হও ঠিক আমার মনের মতনটি তো নও এ-দুঃখ আমার জীবনের সবচেয়ে গভীর দুঃখ হ'তে পারে। তোমার সৃষ্টিতে ইতিহাসময় এতো জ্বালাযন্ত্রণা, এতো অনাচার, অবিচার, অত্যাচার কেন? তুমি কি পরমমঙ্গলবিধাতা নও? নাকি তোমার ক্রমসর্জমান জগৎচরাচরে মঙ্গলবিধান সুপ্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প আছে, পরিকল্পনা আছে, কিন্তু কারয়িত্রীশক্তি সীমিত। তাই কি পদে পদে ছন্দ-পতন ঘটে, অশ্রুধারার বন্যা ছোটে? অর্থাৎ ভগবান যদি মঙ্গলময় প্রেমময় হন তবে তিনি সর্বশক্তিমান নন, আর যদি তাঁর শক্তি কোনোদিক থেকে সীমিত বা বিঘ্নিত না-হয়, তবে তিনি মানব-ভাগ্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন; তাঁর পতাকা'য় রয়েছে পদ্মের মাঝখানে বজ্র, সে-বজ্র কখন কার মাথায় পড়ে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। প্রকৃতি চলে বিজ্ঞানগম্য নিয়মমতো, কিন্তু মানুষের সুখ-দুঃখ ঘটে মানব-ভাগ্য-বিধাতার একান্ত খেয়ালখুশিমতো, কোনোই অর্থ বা তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায় না তার। 'কাঁদি' বলতে যদি এই বোঝায় তবে কাঁদি-কাঁদাই শব্দদুটির ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা গানটিকে অন্য-এক স্তরে নিয়ে যায়। এমনতরো ব্যঙ্গ্যার্থ রবীন্দ্রনাথের মনে ছিলো কিনা জোর ক'রে বলতে পারি না। আমার তো মনে হয় ছিলো, কিন্তু স্পষ্ট হ'য়ে ওঠেনি গানটি রচনাকালে। "কাঁদি কাঁদাই তোরে"—এমন বা এর কাছাকাছি স্পর্ধাই রবীন্দ্রনাথের ভক্তিগীতিকে অতুলনীয় উৎকর্ষ দান করেছে। কতো বিচিত্র ও কী অপরূপ এই স্পর্ধার প্রকাশ তাঁর গানে। প্রধানত এই কারণেই তাঁর ভক্তিপর্বের ও প্রেমপর্বের শ্রেষ্ঠ গানগুলির মাঝখানে কোনো সীমারেখা টানা যায় না। প্রেম অলক্ষ্যে উঠে গিয়ে মিলেছে ভক্তির সঙ্গে, ভক্তি অলক্ষ্যে নেমে এসে ঘর করেছে প্রেমের সঙ্গে।

"সকল জনম ভ'রে" গানের গোড়াটা যেমন আমাদের ভাবিয়ে তোলে, ভক্তি-পর্বের আর-একটি গানের শেষে পৌঁছে আমরা তেমনি চমকে উঠি:

> হৃদয় আমার প্রকাশ হল অনন্ত আকাশে।
> বেদন-বাঁশি উঠল বেজে বাতাসে বাতাসে॥
> এই-যে আলোর আকুলতা, আমারি এ আপন কথা—
> উদাস হয়ে প্রাণে আমার আবার ফিরে আসে॥
> বাইরে তুমি নানা বেশে ফের নানান ছলে;
> জানি নে তো আমার মালা দিয়েছি কার গলে।

আজ কী দেখি পরান-মাঝে, তোমার গলায় সব মালা-যে,
সব নিয়ে শেষ ধরা দিলে গভীর সর্বনাশে।
সেই কথা আজ প্রকাশ হল অনন্ত আকাশে॥

শুরুতেই শুনি বেদনার বাঁশি, হৃদয়ের কথা উদাস হ'য়ে হৃদয়েই ফিরে আসছে। কিন্তু গানের অব্যর্থ গতি পূর্ণতম সার্থকতম মিলনের অভিমুখে। ঈশ্বরের প্রকাশ জগতে নানা বেশে, নানা ছলে—এটা খুবই পরিচিত কথা, রবীন্দ্র-সাহিত্যপাঠকের কাছে তো বটেই। রবীন্দ্রনাথ আজীবন প্রকৃতিকে এবং মানুষকে ভালোবেসেছেন, গল্পে গানে কাব্যে চিত্রে এমন-কি প্রবন্ধেও তাদের গলায় মালা পরিয়েছেন, এটাও আমাদের অজানা নেই। সেই সব মালা শেষ অবধি ঈশ্বরের গলায় পৌঁচেছে—এতো বড়ো সুখবর আর কী হ'তে পারে? কেবল খবর নয়, পরোক্ষ জ্ঞান নয়, এ এক প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। এই চরম সার্থকতার মুহূর্তে কবি-প্রেমিক আমাদের স্তম্ভিত ক'রে দিয়ে বলছেন—ঈশ্বরকে সম্বোধন ক'রেই বলছেন—আমার দেওয়া সব মালা গলায় ধারণ ক'রে তুমি "শেষ ধরা দিলে গভীর সর্বনাশে।" কী বলতে চাইছেন রবীন্দ্রনাথ? কোনো রক্তমাংসের প্রিয়াকে বলা যায় বটে আমার সব ভালোবাসা বুকে ধারণ ক'রে তুমি আমার সর্বনাশ করেছো। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ"; কিন্তু মানবীকেই বলেছেন, দেবতাকে নয়। ভগবান যদি ভক্তের সব প্রেম ভক্তি আত্মনিবেদন গ্রহণ করেন এবং সে-কথা প্রকাশ করেন অনন্ত আকাশে—তবে সেটা তো ভক্তের জীবনের পরিপূর্ণতা, সর্বনাশ হ'তে যাবে কেন?

অবশ্য মধ্যযুগীয় খ্রীষ্টান পাদ্রীদের মতো যাঁরা মনে করেন ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে অসেতুবন্ধ্য ব্যবধান, যাঁরা পরিবার-সংসার ছেড়ে প্রকৃতি ও সমাজের দিকে পিঠ ফিরিয়ে ঈশ্বর-সাধনা করেন, বহিরিন্দ্রিয় ও বাহ্যজ্ঞান এবং রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বিশ্বপ্রেম প্রত্যাহৃত ক'রে একান্তভাবে অন্তর্মুখিন করেন তাঁদের যাবতীয় বোধ চিন্তা ও অনুভূতিকে, তাঁদের বেলা হয়তো ভাবা যায় যে সাধনা সফল হ'লেও অন্যদিক থেকে তাঁদের সর্বনাশ ঘটেছে; ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য "এ সুন্দর ভুবন"-কে হারাতে হয়েছে তাঁদের; তাঁরা ঈশ্বরকে সর্বনেশে এবং ঈশ্বর-প্রেমকে নেশা বললে বলতেও পারেন। অমিয় চক্রবর্তী প্রিয়াবিচ্ছেদের একটি অপূর্ব কবিতায় "তার বদলে" কী-কী পাওয়া যায় তার সুন্দর ফিরিস্তি দিয়েছেন, বলেছেন, "একলা বুকে সবই মেলে"। কিন্তু যে-বুকে ঈশ্বরের বাস তাকে শূন্য করতে হয় না সেখানে জাগতিক সৌন্দর্যের স্থান সংকুলান করবার জন্য। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর-প্রেমের সঙ্গে বিশ্ব-প্রেমের ভেদ নেই কোথাও, বিরোধের তো প্রশ্নই ওঠে না; তিনি "হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট" মেলে জগৎকেও পান করেন, জগদীশ্বরকেও। তাঁর হাতে পরানো সব মালা যদি ঈশ্বরের গলায় পৌঁছে থাকে, তবে তাতে ক'রে এই অভূতপূর্ব সাধনায় সিদ্ধকাম ভক্তের সর্বনাশ ঘটবে আমরা এমন কথা ভাবতে পারি না।

অথবা একদিক থেকে পারি হয়তো। ঐ যে উপান্ত পঙ্‌ক্তিতে বলা হয়েছে—"সব নিয়ে শেষ ধরা দিলে গভীর সর্বনাশে"—এখানে "সব" শব্দটার উপর একটু স্বরাঘাত আছে যেন। 'সব' মানে আক্ষরিক অর্থে সব, মায় আমাকে সুদ্ধ। আমার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, আমার ব্যক্তিস্বরূপ, সবই নিঃশেষে মিলিয়ে যাবে তোমাতে যদি আমার এ-প্রেম পৌঁছয় সার্থকতার মোহানায়। তখন বিন্দু যেমন সিন্ধুতে সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়, কিছুই তার বাকি থাকে না, তেমনি ক'রে আমার আমিত্বের সবটুকুই কেড়ে নেবে তুমি? এই সম্ভাবনা কবির চোখে সর্বনাশ ব'লে গণ্য হ'তেই পারে। প্রথমত, পূর্ব-সাধকরা, যাঁরা পুরোপুরি মরমিয়া সাধক বা মিস্টিক ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের মতো কাব্য-সাধনা ও ঈশ্বর-সাধনাকে পরস্পর-অবিচ্ছিন্ন ক'রে তোলেননি, তাঁরা অনেকেই ঠিক এই পরিণতির কথাই ব'লে গেছেন; উপরন্তু সিন্ধুর মধ্যে বিন্দুবৎ আত্মবিলোপকেই তাঁদের একনিষ্ঠ সাধনার চরম লক্ষ্য ব'লে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু কবির কাছে তাঁর স্বকীয়তার এবং অনন্য ব্যক্তিত্বের মূল্য অন্য-কোনো মূল্য অপেক্ষা হেয় হ'তে পারে না। তিনি যে ঈশ্বর-প্রেমে নিমজ্জিত হ'তে চান তার মধ্যে রয়েছে "সারা জনম ভ'রে কাঁদি কাঁদাই তোরে"র দ্বৈতসাধনা, রয়েছে সকাল-সন্ধ্যাবেলা সেই খেলা যা মধুর নয়, তবু তীব্র তার বেদনাবিদ্ধ সুখ। কবি অনেক দিতে পারেন কিন্তু সব দিতে পারেন না। "আমার যে সব দিতে হবে" যখন বলেন তখনও 'সব'-এর মধ্যে 'আমি' পড়ে না; বরঞ্চ কী-কী দিতে হবে তার তালিকা শেষ ক'রে গানের শেষে বলছেন:

> **আমার ব'লে যা পেয়েছি শুভক্ষণে যবে**
> **তোমার ক'রে দেব তখন তারা আমার হবে।**

স্পষ্টই বোঝা যায় যে এইসব দেওয়াতে 'আমি' নিজেকে রিক্ত ক'রে বিলীন ক'রে দিচ্ছে না, বরঞ্চ তার পরিণাম 'আমি'র পূর্ণতাই।

একটি সুপরিচিত সুন্দর গান আছে:

> **তোমার অভিসারে যাব অগম পারে**
> **চলিতে পথে পথে বাজুক ব্যথা পায়।**

অভিসারে যাওয়ার জন্য পথের যাবতীয় কষ্ট অগ্রাহ্য ক'রে এগিয়ে চলার সংকল্প দ্বিধাহীন, তার আন্তরিকতায় সন্দেহ করবার কোনোই কারণ নেই। একটা 'কিন্তু' আছে তবু:

> **সকলি নিবে কেড়ে, দিবে না তবু ছেড়ে**
> **মন সরে না যেতে, ফেলিলে এ কি দায়ে।**

সকলি—খ্যাতি কীর্তি ধনমান—নেবার পরও নিস্তার নেই, আমার আমিত্বও চাই তার। এই চূড়ান্ত আত্মদানের জন্য কোনো নারী-প্রেমিক প্রস্তুত নয়; রবীন্দ্রনাথের মতো ঈশ্বর-প্রেমিকও দ্বিধাগ্রস্ত, মন সরে না অতোদূর যেতে। শ্রীরামকৃষ্ণের মতো এমন বিশুদ্ধ ভক্তের কথাও শুনেছি যিনি নিজের ভক্তিরসের দ্বৈতভাব বোঝাবার

জন্য বলেছিলেন, "আমি চিনি খেতে চাই, চিনি হ'তে চাই না।" বিশুদ্ধ ভক্তের মুখে এ-কথা একটু চমকপ্রদ, কিন্তু কবিভক্তের মুখে এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, এটাই প্রত্যাশিত।

প্রেমের ব্যর্থতার বেদনা, বিরহ-বিচ্ছেদের বেদনা, প্রিয়তমার মৃত্যু-শোক ইত্যাদি পরম্পরাগত ভাব রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানে খুব বেশি জায়গা জোড়েনি। হয়তো-বা এ জাতীয় অত্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক দুঃখ-প্রকাশ সম্বন্ধে তাঁর স্বভাবের মধ্যেই কিছু প্রতিরোধ ছিলো। তবু এমন গানের সংখ্যাও খুব কম নয় এবং কয়েকটি তার অসাধারণ রসোত্তীর্ণ। কিন্তু সে-সব গান বিষয়ে "তুমি কেমন করে গান করো যে গুণী/আমি অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি" ছাড়া আর-কিছু বলার নেই আমার। তবে দুঃখ একটু নতুন রূপ ধারণ করেছে যে দু-একটি প্রেমের গানে, তারই কথা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমটি হ'লো :

কিছুই তো হল না।
সেই সব—সেই সব—সেই হাহাকার-রব,
সেই অশ্রুবারিধারা, হৃদয়বেদনা॥
কিছুতে মনের মাঝে শান্তি নাহি পাই,
কিছুই না পাইলাম যাহা কিছু চাই।
ভালো তো গো বাসিলাম, ভালোবাসা পাইলাম,
এখনো তো ভালোবাসি—তবুও কী নাই॥

যাকে ভালোবাসলাম তার কাছ থেকে ভালোবাসা পেলাম—দুর্লভ অভিজ্ঞতা; আরো দুর্ঘট যে সে-ভালোবাসার কোথাও ঘাটতি পড়েনি, চিড় ধরেনি, বছরের পর বছর (গানের ভাষা থেকে তো তা-ই মনে হয়) তা অক্ষয় অম্লান রয়েছে। এর চেয়ে অধিক পরিতৃপ্তি মানুষের তৃষিত জীবনে আর কী হ'তে পারে? তবু প্রেমিক-কবি বলছেন—কথার উপর বেশ-একটু জোর দিয়েই বলেছেন—"কিছুই তো হল না"; শোনাতে চাইছেন তাঁর হৃদয়ের সাহানা রাগিণী নয়, "হাহাকার-রব"। কোনো-এক পারস্য কবি দুঃখ করেছিলেন :

সুখের সব সরঞ্জামই মজুত কিন্তু
বন্ধু কোথায়, বন্ধু বিনা আবার সুখ কী।

রবীন্দ্রনাথের গানে বন্ধু অত্যন্ত উপস্থিত, সম্ভবত বক্ষলগ্নই। এমন পরিপূর্ণ সুখের অবস্থায় এতো তীব্র বিষাদ এবং ব্যর্থতার অনুভূতি একটু আশ্চর্য।

তবু আশ্চর্য নয়। প্রেমের পরিমিত অভিজ্ঞতায় প্রেমিক খুঁজছে অপরিমিত কিছু, অপার্থিব কিছু। যাঁর মাধুরী জীবনের পাত্রে ধরা যাবে না, যাকে ধ্যানের ধন বললেও একটু বাড়িয়ে বলা হয়, কারণ তা সম্পূর্ণ ধ্যেয় নয়, তাকেই সে খুঁজছে একটি সীমিত, সামান্য, রক্ত-মাংসের ক্ষুদ্র মানবিক বেষ্টনীতে। পুকুরের চৌহদ্দির মধ্যে অকূল সমুদ্র খোঁজা কেন? তবু মানুষ খোঁজে, অন্তত রোম্যান্টিক কবিরা খোঁজেন। কিছু যে পান না তা নয়, নয় পুষ্করিণীও রত্নগর্ভা হ'তে পারে। কিন্তু

চাওয়া-পাওয়ার মাঝখানে ধূ-ধূ করছে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ, তাই অনিবার্যত তাঁরা ভাবেন "কিছুই না পাইলাম", ভাবেন "তৃষ্ণার শেষ নেই" কোথাও। একেই বলে রোম্যান্টিক অ্যাগনি। শিল্পীকে তো বটেই, সব সুকুমার-হৃদয়, এবং কল্পনাপ্রবণ মানুষকে এ-ব্যর্থতাবোধ অল্পবিস্তর পীড়া দেয়। রবীন্দ্রনাথ এই দুনিবার হতাশার বেদনাকে আরো তীব্র ক'রে তুলেছেন ঘরোয়া দাম্পত্যপ্রেমের পটভূমিকার উপর তাকে চিত্রাপিত ক'রে। সকল প্রেমের মধ্যেও এই রোম্যান্টিক অতৃপ্তির বেদনা ব্যক্ত হয়েছিলো 'মানসীর' সুপরিচিত "নিষ্ফল কামনা" শীর্ষক কবিতাটিতে। গানের ক্ষুদ্র পরিসরে সুরের সাহায্যে তার প্রকাশ আরো রসঘন, ছড়িয়ে-বাড়িয়ে বলার অবকাশ এখানে ছিলো না।

অন্য যে প্রেমের গানের কথা বলতে যাচ্ছি, তার দুঃখও প্রথম গানের মতোই ভালোবাসা না-পাওয়ার দুঃখ নয়, পাওয়ারই দুঃখ ; এবং পাওয়ার পর এতো তীব্র ঝংকারে বুকে বেজে ওঠে সে-দুঃখ, যে মৃত্যুকে ডাকতে হয় সকল পরাজয়ের গ্লানি ঘুচিয়ে দেবার জন্য।

তুমি মোর পাও নাই পরিচয়।
তুমি যারে জান সে যে কেহ নয়, কেহ নয়॥
মালা দাও তারি গলে, শুকায় তা পলে পলে,
আলো তার ভয়ে ভয়ে রয়—
বায়ু-পরশন নাহি সয়॥
এসো এসো দুঃখ, জ্বালো শিখা,
দাও ভালে অগ্নিময়ী টিকা।
মরণ আসুক চুপে পরমপ্রকাশরূপে,
সব আবরণ হোক লয়—
ঘুচুক সকল পরাজয়॥

এই গানটিকে পূর্ববর্তী গানের গীতিনাটকীয় প্রত্যুত্তর ভাবা যেতে পারে। নায়কের দুঃখ—"কিছুই না পাইলাম"। নায়িকার বিক্ষোভ—"তুমি স্বর্গের পারিজাত চেয়েছিলে ; তোমার বাড়ির আঙিনায় যে ভুঁই-চাঁপা ফুটেছে তার দিকে ফিরেও তাকাওনি।" "ঘুচুক সকল পরাজয়"—কিন্তু কিসের পরাজয়? কারো অকৃপণ করে জীবন পূরণ না-হবার গ্লানি নয় ; পরিত্যক্ত, অবহেলিত, অবমানিত হবার আত্মধিক্কার নয়। আক্ষেপ এই নয় যে রূপে গুণে ব্যক্তিত্বে কৃতিত্বে তুমি আমাকে ছোটো ক'রে দেখেছো, আমার সব মূল্য তোমার চোখে ধরা দেয়নি। বরঞ্চ ঠিক তার উলটো। দুঃখ এই, পরাজয় এই, যে তুমি আমাকে রক্তমাংসের মানুষ, সামান্য মানুষ, ছোট-বড়ো নানা দোষে-ত্রুটিতে-ভরা মানুষরূপে দেখে ভালোবাসোনি। আমি সত্যিই যা তার পরিচয় পাওনি, তাকে দেখতে চাওনি। আমি যা নই তাকেই দেখেছো স্বপ্নের ঘোরে, তোমার আপন মনের মোহ ও মাধুর্য মিশিয়ে গড়েছো এক প্রতিমা, তারই গলায় মালা দিয়েছো। সে-মালা বৃথাই

শুকায়, আমার গলায় পৌঁছায় না। পৌঁছালেও মানাতো না। "আলো তার ভয়ে ভয়ে রয়"—কবিতার ভাষা। খুব সম্ভব উল্‌টো ক'রে বলা হয়েছে, অর্থাৎ সে-মালাই আলোর ভয়ে দোদুল্যমান। যদি আলো পড়তো আমার মুখের উপর, উদ্‌ঘাটিত হ'তো আমার সত্য রূপ, আমার সত্য 'আমি', তবে কি সে-মালা লজ্জা পেতো না আমার গলায়? যে সত্যিকার "কেহ নহে", মানসীপ্রতিমামাত্র, তার কাছেই আমি পরাজিত; এ-পরাজয়ের দুঃখ আমি কাউকে বোঝাতে পারবো না।

গানের নায়িকার দুঃখ 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের নায়িকার দুঃখের সঙ্গে প্রতিতুলনীয়। অর্জুন-বিজয় অভিযানের প্রাথমিক সাফল্যের পর চিত্রাঙ্গদার বুকও পরাজয়ের তীব্র বেদনায় বেজে উঠেছিলো, কিন্তু বিপরীত সে-পরাজয়ের রূপ। অর্জুন প্রেমে পড়লেন তার অপরূপ দেহের; তার মনের অধিকতর ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের কোনো পরিচয় পাননি, পাওয়ার কোনো প্রয়োজনও বোধ করেননি। "তুমি মোর পাও নাই পরিচয়" না-ব'লে চিত্রাঙ্গদা যা বললো তাতে নৈরাশ্য অন্তিম ছিলো না, কিন্তু অভিমান আরো প্রখর ছিলো এবং তিরস্কার মিশ্রিত:

> সে আমি যে আমি নই, আমি নই—
> হায় পার্থ, হায়,
> ... ...
> শৌর্য বীর্য মহত্ত্ব তোমার
> দিয়ো না মিথ্যার পায়।

পূর্বোক্ত গানের ভগ্নহৃদয় নায়িকা ভাবছে আমার প্রাপ্য মালা পরিয়েছো তোমার মনগড়া প্রতিমার গলায়; চিত্রাঙ্গদার মনঃপীড়া এই যে তার প্রাপ্য "প্রেম সঙ্গম" কেড়ে নিয়েছে তার "সতীন", তারই মনোমোহিনী দেহলাবণ্য। দুই বল্লভ-বিজয়িনী প্রেমিকাই সতীনের কাছে পরাজিত; সতীন নির্বস্তুক হ'লেও (একজনের সতীন একেবারেই অশরীরী, প্রেমিকের খেয়ালী মনের উপাদান দিয়ে গড়া; অন্যজনের সতীন নিজেরই অনিন্দ্যসুন্দর শরীরমাত্র, প্রেমিকের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাইরে সে মনোবিচ্ছিন্ন শরীরের অস্তিগৌরব যৎসামান্য।) পরাজয়টা দু-জনের বুকেই নিদারুণরূপে বাস্তবিক।

এ-গানের ব্যঞ্জনার প্রচ্ছন্ন স্তরে অন্য-এক আবছা ব্যাপক ইঙ্গিত জেগে ওঠে আমার মনে, অনুভূতিকে জিজ্ঞাসু ক'রে তোলে। স্বপ্নময় রোম্যান্টিক কি কঠোর রিয়ালিস্ট হ'তে চাইছেন, তরুণ রোম্যান্টিকতার রঙিন আদেশ কি পীড়া দিচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে? শুধু অপরিচিতা প্রিয়া নয়, সমগ্র বিশ্বচরাচর তো একদিন তাঁকে বলবেই: "তুমি মোর পাও নাই পরিচয়", যত শুভ্র, শুভ ও সুন্দর তুমি আমাকে ভাবছো তোমার নিজেরই ভাবের ঘোরে, আমি সত্যি তো তা নই। সেইদিনের পূর্বাভাস কি এই গানে? কঠিন দুঃখ যে-আলো বিকিরণ করবে তাতেই বিশ্ব-প্রেমিক বিশ্বের সত্য পরিচয় পাবেন, তার সব আবরণ তখনই লয় হবে। জগতের

কঠিন কালো বাস্তব রূপ স্পষ্ট ক'রে দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ দশকে, শেষ পর্বের কাব্যে। কিন্তু জগতের এই বজ্র-পরিচয় তাঁকে অত্যন্ত বিচলিত ও বিষণ্ণ করলেও জগৎ-বিমুখ করেনি কোনো অর্থেই।

"তুমি মোর পাও নাই পরিচয়" এবং "চিনিলে না আমারে কি"—দুটি গানের শুধু প্রথম পঙ্‌ক্তি পড়লে মনে হ'তে পারে গানদুটির ভাব ও বিষয়বস্তু একই। কিন্তু মোটেই তা নয়। প্রথমটি মানবিক স্কেলে রচিত, দ্বিতীয়টির স্কেল শেষ পর্যন্ত হ'য়ে দাঁড়ায় বিশ্বজাগতিক।

চিনিলে না আমারে কি।
দীপহারা কোণে ছিনু অন্যমনে,
ফিরে গেলে কারেও না দেখি॥
দ্বারে এসে গেলে ভুলে পরশনে দ্বার যেত খুলে—
মোর ভাগ্যতরী এটুকু বাধায় গেল ঠেকি॥
ঝড়ের রাতে ছিনু প্রহর গণি'
হায়, শুনি নাই, শুনি নাই রথের ধ্বনি তব রথের ধ্বনি।
গুরুগুরু গরজনে কাঁপি বক্ষ ধরিয়াছিনু চাপি,
আকাশে বিদ্যুৎ-বহ্নি অভিশাপ গেল লেখি॥

এই গানের সঙ্গে বরঞ্চ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা আছে 'কল্পনা'র "ভ্রষ্ট লগ্ন" কবিতার। অধীর প্রেমিক যাকে পৃথিবীময় খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে কাছে পেয়েও চিনতে পারলো না, তাকেই জিজ্ঞাসা করলো, "সে কোথায়, সে কোথায়?" এই না-চেনার লজ্জায় প্রতীক্ষমাণা প্রেয়সীর হৃদয়ে যে-কথা তোলপাড় করছিলো সে-কথা কিছুতেই মুখে এলো না—"শ্রান্ত পথিক, সে যে আমি, সেই আমি।" চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে ব্যবধান অনেক, তার বেদনা রবীন্দ্রনাথ অনেক গানে ও কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু ব্যবধান যখন প্রায় কিছুই নেই, ব্যাকুল পথিক যখন পৌঁচেছে তার গন্তব্যে, প্রেমিক যখন প্রিয়ার দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন শেষ মুহূর্তে সামান্যতম বাধাটা কেন যে পর্বত-প্রমাণ হ'য়ে ওঠে ("মোর ভাগ্যতরী এটুকু বাধায় গেল ঠেকি" (কিছুই বোঝা যায় না। উমর খৈয়াম একটি রুবাই-তে বলেছেন—"মদের পাত্র যখন ঠোঁটের কাছে তুলে ধরেছি ঠিক সেই মুহূর্তে পাত্রটি কেড়ে নিয়ে মাটিতে ফেলে চুরমার ক'রে দিলে। হে ঈশ্বর, বলতে নেই, তুমিও কিন্তু আমারই মতন মাতাল।" 'রোগশয্যায়'-এর ৫-সংখ্যক কবিতায় রবীন্দ্রনাথও "বিধাতার প্রচণ্ড মত্ততা"র কথা বললেন—যে-মত্ততা যোগ দিয়েছে "বিশ্বের ভৈরবীচক্রে"। কিন্তু কেন? বঞ্চিত মানুষের যন্ত্রণাকে আরো তীব্র, আরো অসহনীয় ক'রে তুলবার জন্যই কি দেবতাদের মধ্যে চক্রান্ত চলছে আকাশে-আকাশে, বিদ্যুৎ-লেখায় কি সেই নির্মম চক্রান্তের কথা নির্ঘোষিত?

মানুষের সাধনার পথে দ্যাবাপৃথিবীর কখনো উদাসীন কখনো সক্রিয় প্রতিকূলতার ইঙ্গিত আরো ট্র্যাজিক আয়তন লাভ করেছে যে-গানে তারই আলোচনাতে

দুঃখের গানের প্রসঙ্গটা শেষ করবো। এই গানটিও রবীন্দ্রনাথের দুঃখকে ভাব-বর্ণালির সেই প্রান্তরেখায় নিয়ে যায়, যার অভিব্যক্তি আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছি "যায় দিন, শ্রাবণদিন যায়" এবং "পথের শেষ কোথায়"-তে।

ঝর ঝর বরষে বারিধারা।
হায় পথবাসী, হায় গতিহীন, হায় গৃহহারা॥
ফিরে বায়ু হাহাস্বরে,
ডাকে কারে জনহীন অসীম প্রান্তরে—
রজনী আঁধারা॥
অধীরা যমুনা তরঙ্গ-আকুলা অকূলা রে,
তিমির-দুকূলা রে।
নিবিড় নীরদ গগনে
গরগর গরজে সঘনে
চঞ্চল চপলা চমকে, নাহি শশীতারা॥

ঝরঝর বৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি গানের পটভূমিকা রচনা করে। প্রায় সবক'টিতে দেখা যায় গানগুলি মধুররসের; বিষাদের ছায়া পড়লেও সে-ছায়া অঘন এবং ঈষৎ রঙিন—"আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদরদিনে", "আজ আকাশের মনের কথা ঝরো ঝরো বাজে", "বাদল-বাউল বাজায় রে একতারা—/ সারা বেলা ধ'রে ঝরো ঝরো ঝরো ধারা" ইত্যাদি। আলোচ্য গানে কিন্তু "ঝরঝর বারিধারা"র ভূমিকা সম্পূর্ণ বিপরীত। নিশ্চয়ই কোনো কঠিন দুর্মদ সাধনা গীতি-রচয়িতাকে কিংবা গীতির নায়ককে ঘরে থাকতে দেয়নি, পথে টেনে এনেছে; ঘরে ফেরা আর নয়, 'পথবাসী' শব্দটা জানিয়ে দেয় যে তার বাকি জীবন পথে-পথেই কাটবে। পথ মানেই তো চলার পথ, চলতেই হবে তাকে, পথ যতো দুর্গম হোক্, গন্তব্য যতো দূরে থাক্। এমন পথসর্বস্ব মানুষের গতিশক্তি যদি হারিয়ে যায় তবে তার চেয়ে দুর্ভাগা আর কে? প্রথম পঙ্‌ক্তিটি পূর্ব অভ্যাসমতো মধুররসের খানিকটা প্রত্যাশা জাগায় আমাদের মনে, তাই দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে অকস্মাৎ ট্র্যাজিক সুর শুনে আমরা একটু চমকে উঠি। ক্রমশঃ বুঝতে পারি মুষলধার বৃষ্টির সঙ্গে যোগ দিয়েছে উন্মত্ত বাতাস, উত্তাল নদী, বজ্রের গরগর হুংকার এবং পূর্ববর্তী গানের বিদ্যুৎবহ্নি। পঞ্চভূতের শক্তি-মদমত্ত দেবতারা কি একজোট হ'য়ে কোনো হতভাগাকে ঘরছাড়া ক'রে তার গতিশক্তি কেড়ে নিয়েছেন? মনে হয় বিশেষ কোনো বা কতিপয় মানুষের ভাগ্য নয়, সকল মানুষের এই নিদারুণ পরিস্থিতির কথা ভেবেই কবি ব্যাকুল হয়েছেন।

প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তির অনভ্যস্ত বিন্যাস শ্রোতার মনকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। কিন্তু এর পর থেকে একটু যেন শক্তিমান্দ্য ঘটেছে গানের ভাষায়। বিশেষত "অধীরা যমুনা তরঙ্গ-আকুলা অকূলা রে, তিমির-দুকূলা রে"—এই পঙ্‌ক্তিটির লঘু চাল সমস্ত গানের গভীর গম্ভীর ব্যঞ্জনার সহযোগী নয়; অন্য কয়েকটি শব্দ এবং

বাক্যাংশও দুর্বল। আমার এই ধারণা সমর্থন লাভ করে ইংরেজি অনুবাদের সঙ্গে তুলনা করলে। "ফিরে বায়ু হাহাস্বরে / ডাকে কারে জনহীন অসীম প্রান্তরে"র ব্যঞ্জনাশক্তি কম নয়, তবু সে-ব্যঞ্জনায় ক্ষীণ আশা অবশিষ্ট রয়েছে—হয়তো একদিন ডাক শুনবে সে আজ যে আছে দর্শন-শ্রবণাতীত। কিন্তু—"The shrieks of the wind die away in sobs and sighs"-এর ঘন নৈরাশ্যে মৃত্যুশোকের ছায়া দেখা যায়। কে মারা গেলো যার জন্য পৃথিবীময় এমন হাহাকার—কোনো মহাপুরুষ, নাকি কোনো মহৎ আদর্শ? "রজনী আঁধারা"র অনুবাদ করেছেন: "The night is hopeless like the eyes of the blind." অসাধারণ লক্ষ্যভেদী এই উপমা। যতো ঘুটঘুটে অন্ধকারই কল্পনা করি-না কেন, তা চক্ষুষ্মানের অভিজ্ঞতা-পরিধির কাছাকাছিই থাকবে। জন্মান্ধের চোখের অন্ধকার তার চেয়ে অনেক গুণে ভয়ংকর, এবং কোনোদিন সে-অন্ধকার ঘুচবে বা কমবে, তার ক্ষীণতম সম্ভাবনা নেই। গানের শেষ বাক্যটি "নাহি শশীতারা" খুব বেশি কিছু বলে না; বর্ষার ঘন মেঘ আকাশের সব আলো ঢেকে দিয়েছে—এর চেয়ে পরিব্যাপ্ত অর্থ অনেকের মনে না-ও জাগতে পারে। কিন্তু "The lights of the stars are dead" পঙ্‌ক্তির মধ্যে জাগতিক প্রলয়ের ইঙ্গিত রয়েছে।

অনুবাদ কবি-কৃত, তাই স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে—ইংরেজি অনুবাদটি মূল বাংলার চেয়ে জোরদার হ'লো কেমন ক'রে? এটা তো সন্দেহাতীত যে বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথের প্রকাশশক্তি একেবারে ঐন্দ্রজালিক। এমন অতুলনীয় অপ্রতিদ্বন্দ্বিত ক্ষমতার অধিপতিকে কবিসম্রাট বলা যায় বৈ-কি। পক্ষান্তরে, ইংরেজি ভাষার উপর রবীন্দ্রনাথের দখল সামান্যই ছিলো, প্রতিভাবান কবি ব'লে সেই স্বল্পায়ত্ত ভাষাতেও তিনি বেশ-কয়েকটি রসোত্তীর্ণ অনুবাদ-কবিতা লিখে গেছেন। কিন্তু প্রকাশ-শক্তিতে ইংরেজি অনুবাদ মূল বাংলাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে—এই আশ্চর্য কৃতিত্বের দৃষ্টান্ত আরো দুটো-চারটে খুঁজে বার করা যায়। সমস্যাটি ছোটো হ'লেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কৌতূহল জাগায়।

আসলে আলোচ্য গান ও তার অনুবাদে তফাৎ এই নয় যে একই ভাবের প্রকাশ ইংরেজিতে জোরালো হয়েছে এবং বাংলায় মৃদু; তফাৎ ভাব এবং তার অনুভূতিমণ্ডলেই। বাংলা গানের ভাষায় রবীন্দ্রনাথ যে-ভাবাবেগটি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সম্পূর্ণ প্রকাশ করেননি তা খুবসম্ভব তাঁর মনের আনাচে-কানাচে আত্মগোপন করেছিলো এতোদিন; অনুবাদ করবার সময়ে চৈতন্যের তলা থেকে ভেসে-উঠে-আসা আশ্চর্য নয়। সেই ঈষৎ অনভ্যস্ত ভাবের তীব্রতাকে তিনি ইংরেজির গদ্যছন্দে যথাযথ রূপ দিতে পেরেছেন। কিন্তু বাংলায় ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে গান হয়ে। সুরের খাতিরে ভাবকে খানিকটা করুণ-কোমল ক'রে নিতে হয়েছে, তার আগ্নেয় প্রচণ্ডতা খানিকটা উপশমিত করতে হয়েছে। 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে আমি দেখিয়েছিলাম 'সানাই'-

এর "ব্যথিতা" কবিতাখানি গানে রূপান্তরিত হবার পথে তার রুদ্রতা হারিয়েছিলো ; "ক্রূর বিধাতা", "ইতর বঞ্চনা" জাতীয় শব্দগুলি গানে বর্জিত। প্রথম যৌবনে লেখা "তবু মনে রেখো" কবিতাটিরও গীতিরূপ ভাষার দিক থেকে অপেক্ষাকৃত গতানুগতিক। বলতে পারেন, সুরের বিশেষত রবীন্দ্রনাথের সুরের, চাহিদা এবং তাগিদ এই মৃদুভাষিতা।

আমার মনে কিন্তু সন্দেহ থেকে যায় যে কবি রবীন্দ্রনাথ এবং গীতি-রচয়িতা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিস্বরূপ, বিশেষত অনুভূতির স্বরূপ, খাপে খাপে মেলে না। অনেকটা মেলে অবশ্য এবং অনিবার্যতই (দুই রবীন্দ্রনাথ যখন মোটামুটি একই ব্যক্তি), তবু লক্ষ করবার মতো গরমিল পাওয়া যায় সমগ্রভাবে তাঁর গানের সঙ্গে কবিতার তুলনা করলে। রবীন্দ্রনাথ যখন ছবি আঁকতে শুরু করেন তখন তাঁর বয়স সত্তর পার হয়েছে। ঐ-সময়কার কবিতায় তিনি রৌদ্রী রাগিণীতে দীক্ষা নিয়েছিলেন, তবে সহজ হয়নি সে-দীক্ষা ; তপস্যা করতে হয়েছিলো এই নতুন রাগিণী আয়ত্ত করবার জন্য, এবং তপস্যা সত্ত্বেও সে-রাগিণী খুব বেশি শোনা যায় না তাঁর কণ্ঠে। শরৎকালের মাঠে যেমন আলো-ছায়ার খেলা, তেমনি রুদ্র-মধুরের পালাবদল দেখি রবীন্দ্রনাথের শেষ দশকের কাব্যে। চিত্রে দেখা যায় রুদ্রের প্রকাশ আরো বলিষ্ঠ, এবং অক্লেশে বেরিয়ে আসছে তাঁর তুলির মুখে ; মনে হয় চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ স্বভাবগুণেই রুদ্রের মন্ত্রশিষ্য।

আরো একটু সাহস সঞ্চয় ক'রে বলতে চাই যে আমার মতে সংগীতকার রবীন্দ্রনাথ, কবি রবীন্দ্রনাথ, নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ, কথাসাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ, চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ, প্রবন্ধলেখক ও ভাষণকার রবীন্দ্রনাথের ভাবনা-বেদনা ঠিক একই ছাঁচে ঢালাই করা নয়। এইসব ভিন্ন-ভিন্ন মাধ্যমের ভিতর দিয়ে ন্যূনাধিক ভিন্ন-ভিন্ন রবীন্দ্রনাথকে আমরা পাই ; তাঁদের মধ্যে আত্মীয়তা আছে, কিন্তু তাদাত্ম্য (identity) নেই। শিল্পী বেছে নেন প্রকাশের মাধ্যম, আবার মাধ্যমের স্বধর্মও কতকটা নির্ধারিত করে প্রকাশোন্মুখ ব্যক্তিত্বের স্বরূপ। বাছাই-ঢালাই-পেটাই দু-দিক থেকে চলে। হয়তো অনেক রবীন্দ্র-প্রেমিকই আমার এ মতে সায় দেবেন। তবে দুঃখের বিষয় যে শিল্পমাধ্যমভেদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতো বহু-শিল্পদক্ষ ব্যক্তির ব্যক্তিস্বরূপভেদের যথাযোগ্য আলোচনা হয়নি এ-পর্যন্ত। কে এত বড়ো কাজের দায়িত্ব নিতে পারেন জানি না। সঙ্গীত সাহিত্য ও চিত্র—তিনটি শিল্পে তাঁর অল্পবিস্তর শিক্ষা, সমঝদারিতা ও সংবেদনশীলতা থাকা চাই।*

* নাস্তিগহ্বরের মুখোমুখি দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতা (encounter with nothingness) রবীন্দ্রনাথের হয়েছিলো বলাতে কোনো-এক শ্রদ্ধেয় লেখক বিস্মিত হয়েছেন, প্রতিবাদ করেছেন। অথচ এই অভিজ্ঞতার dramatized রূপ এমন সুন্দর সরল ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ 'বীথিকা'র "দুর্ভাগিনী" কবিতাটিতে যে যেখানে ভুল বুঝবার কোনো অবকাশই নেই :

সব সান্ত্বনার শেষে সব পথ একেবারে
মিলেছে শূন্যের অন্ধকারে ;
...   .
সর্বশূন্যতার ধারে
জীবনের পোড়ো ঘরে অবরুদ্ধ দ্বারে
দাও নাড়া
ভিতরে কে দিবে সাড়া
মূর্ছাতুর আঁধারের উঠিছে নিশ্বাস,
ভাঙা বিশ্বে পড়ে আছে ভেঙে-পড়া বিপুল বিশ্বাস ।

'রোগশয্যায়'-এর ৭ এবং ৩৯-সংখ্যক কবিতায় দেখি এই নিদারুণ উপলব্ধির লিরিক আভাস। শেষ পর্বের আরো বেশ-কয়েকটি কবিতায় তার কথা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে বলা আছে ; এবং মধ্য পর্বে 'কল্পনা'র প্রথম কবিতায়, 'উৎসর্গ'-এর ৩১-সংখ্যক কবিতায় ("আজিকে গহন কালিমা লেগেছে গগনে")। গদ্যের ভাষা আরো স্পষ্ট স্বভাবতই। চব্বিশ বছর বয়সে যে-মৃত্যু-শোকের বর্ণনা দিয়েছেন 'জীবনস্মৃতি'তে তা ভুলতে পারে না কোনো রবীন্দ্র-প্রেমিক। দীর্ঘ বর্ণনার এক জায়গায় পড়ি : "মৃত্যু যখন মনের চারিদিকে হঠাৎ একটা 'নাই'-অন্ধকারের বেড়া গাড়িয়া দিল, তখন সমস্ত মনপ্রাণ অহোরাত্র দুঃসাধ্য চেষ্টায় তাহারই ভিতর দিয়া কেবলই 'আছে'-আলোকের মধ্যে বাহির হইতে চাহিল। কিন্তু, সেই অন্ধকারকে অতিক্রম করিবার পথ অন্ধকারের মধ্যে যখন দেখা যায় না তখন তাহার মতো দুঃখ আর কী আছে।" এ প্রচণ্ড সাক্ষাৎকার তত্ত্বকথা নয়, অভিজ্ঞতার ব্যাপার। বলা বাহুল্য, এই " 'নাই'-অন্ধকারের" উপলব্ধি রবীন্দ্র-সাহিত্যের শেষ কথা নয়, একমাত্র কথা তো নয়-ই। পার আছে তার, কিন্তু ও-পারে পৌঁছবার জন্য এই গহ্বর পার হ'তে হয়েছে রবীন্দ্রনাথকে একাধিক বার।

প দ্মে র মা ঝ খা নে ব জ্র

এক

'অরূপরতন'-এর ছোটো একটি ভূমিকা লিখে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন "এ নাটকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।" হয়েছে কিনা সে-বিষয়ে মতভেদের অবকাশ তবু থেকে যায়। কোনো দুষ্পাঠ্য লিপির পাঠোদ্ধারে যদি মতভেদ ঘটে তবে লিপিকার ঘটনাক্রমে সেখানে এসে পড়লে আর সমস্যা থাকে না। কী লেখা আছে সে-বিষয়ে তাঁর কথাই শেষ কথা। কিন্তু দুষ্পাঠ্য হস্তলিপির সঙ্গে দুরধিগম্য শিল্পকর্ম তুলনীয় নয়। নাট্যরচনা যখন সমাপ্ত তখন নাট্যকারও তার একজন পাঠক বা দর্শক-মাত্র। নিঃসন্দেহে সহৃদয় পাঠক, কিন্তু সেই পর্যন্ত। অথবা সে-পর্যন্তও নয়। স্বরচিত নাটকের ব্যাখ্যায় স্বয়ং রচয়িতার ভুল করবার সম্ভাবনা অন্য সহৃদয় পাঠকের চেয়ে একটু যেন বেশিই। "যদিও নিজের রচনা সম্বন্ধে লেখকের মনে অনেক সময় অসন্দিগ্ধ মত থাকে তথাপি তাহা যে ভ্রান্ত হইতে পারে ইতিহাসে এমন অনেক প্রমাণ আছে"—রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'পঞ্চভূত'-এ। ইতিহাস না-ঘেঁটেও সে-কথা বলা যায়। রচনার পূর্বে নাট্যকারের মনে নিশ্চয়ই অস্পষ্ট একটা ভাব প্রকাশের পথ খুঁজছিলো ভাষার প্রণালী বেয়ে—উপাখ্যান চরিত্র ও সংলাপের মাধ্যমে। কিন্তু মাধ্যমমাত্রেরই স্বভাবে বেশ-কিছু দুর্বিনয় ও দুর্নম্যতা আছে। শিল্পী চেষ্টা করেন তাকে বশে আনতে কিন্তু সম্পূর্ণ পেরে ওঠেন না; **"between the conception and the reality / Falls the shadow"**। এই কালো ছায়াটির অস্তিত্ব শিল্পীর আত্মবিশ্বাসের পক্ষে হানিকর ব'লে তাঁর চোখে প'ড়েও পড়ে না। ফলে স্বরচিত নাটকের ব্যাখ্যাকালে কলমের দুই পারের সত্যের মধ্যে গোলযোগ বেধে যাওয়ার সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। অথচ পাঠক হিসাবে আমাদের বিচার্য এ-পারের সত্যই। সেটাই নাটক। ও-পারের সত্য (নাট্যরচনার পূর্ববর্তী প্রকাশব্যাকুল ভাবপুঞ্জ) জীবনীকারের এলাকায় পড়ে; সমালোচকের কাছে তার গুরুত্ব খুবই পরিমিত।

কিন্তু এত কথায় কাজ কী। ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন, 'অরূপরতন'-এ "তাহাই বর্ণিত হইয়াছে" মেনে নিলেও আমরা মানতে বাধ্য নই যে 'রাজা'-তেও তা-ই বর্ণিত হয়েছে। এ-কথা বলতে হচ্ছে এই কারণে যে একাধিক প্রখ্যাত সমালোচক 'অরূপরতন'-এর ভূমিকাকে 'রাজা' নাটকের মর্মোদ্ঘাটনের চাবি-

কাঠিরূপে ব্যবহার করেছেন। কৈফিয়ৎ অবশ্য আছে। উক্ত ভূমিকার শেষে রবীন্দ্রনাথ যোগ করেছেন: "এ নাট্য-রূপকটি 'রাজা' নাটকের অভিনয়-যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ—নূতন করিয়া পুনর্লিখিত।" নয় বছর পরে পুরানো নাটককে নতুন ক'রে এবং সংক্ষিপ্ত আকারে লিখতে গেলে বেশ-একটা নতুন নাটক লেখা হয়ে যেতে পারে প্রায় অজ্ঞাতসারেই—এ-সম্ভাবনাটি রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনে স্পষ্ট ছিলো না। অথচ হয়েছে তা-ই।

সুদর্শনা যে দুই নাটকের শুধু নায়িকা তা-ই নয়, বলতে গেলে একমাত্র চরিত্র। অন্য-সব চরিত্র তুলনায় ঝাপসা, পার্শ্বচরিত্র বললেও হয়। কিন্তু দুই নাটকের সুদর্শনা নামে এক হ'লেও চরিত্রে এক নয়। 'অরূপরতন'-এর সুদর্শনা সম্বন্ধে রাজার উক্তি: "আমার নাম নিয়ে সে সকলের চেয়ে বড়ো হবে, এই অহংকারে সে আমাকে চায়"—'রাজা'র সুদর্শনা সম্বন্ধে আদৌ সত্য নয়, সম্ভবই নয়। প্রথম নাটকের প্রথম দৃশ্যে সুদর্শনা রানী হ'তে অভিলাষী; দ্বিতীয় নাটকের শুরুতেই সুদর্শনা রানী। সে রাজ-সম্মান পেয়েছে, এখন সে চায় তার চেয়ে অনেক বড়ো কিছু। বাসরঘরের অন্ধকারে যাকে চিনেছে, বাইরের আলোতে তাকে আরো সম্যক্‌রূপে চিনতে চায় সে। এই চেনার দ্বারা সে নিজেকেও চিনবে অবশ্য, কিন্তু তার দ্বারা সে নিজেকে চেনাবে, রাজ্যের সকল লোকের চোখে সে রাজ-মহিষীর গৌরবে বিভূষিত হবে—এমন কামনা তার মুখে প্রকাশ পায়নি, অন্তরেও স্থান পায়নি। "ধনের বাটে মানের বাটে" 'অরূপরতন'-এর সুদর্শনার চোখ ছুটে চলেছিলো, 'রাজা'র সুদর্শনার নয়। রূপের নেশা অবশ্য লেগেছিলো তার চোখে কিন্তু তার চেয়ে ইতর কোনো নেশা নয়। তুলনায় অনেকটা উঁচুদরের মানুষ সে, অনেকখানি গভীর ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন তার ব্যক্তিত্ব।

চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো—
ধনের বাটে মানের বাটে রূপের হাটে
দলে দলে গো।
দেখবে বলে করেছে পণ,
দেখবে কারে জানে না মন,
প্রেমের দেখা দেখে যখন
চোখ ভেসে যায় চোখের জলে গো।

'অরূপরতন'-এর এই প্রস্তাবনা-গীতিটি 'রাজা' নাটকে দেওয়া হয়নি, দেওয়া সম্ভব ছিলো না। দ্বিতীয় নাটকের সুদর্শনা প্রথম দৃশ্য থেকে প্রেমের দেখাই দেখেছে। যাকে ভালোবাসে তাকে চোখে দেখতে চাওয়াতে দোষ নেই, তাতে প্রেমের অভাব সূচিত হয় না। 'গীতাঞ্জলি' পর্বের প্রেম-ভক্তিরসে ভরা যে-গানগুলি আমাদের এত প্রিয় তার মধ্যেও এই দেখা পাওয়ার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে: "তুমি যদি না দেখা দাও / করো আমায় হেলা", "প্রভু তোমা লাগি আঁখি জাগে / দেখা নাই পাই, ব্যথা পাই", ইত্যাদি। এখানে অবশ্য বলা হবে

যে 'গীতাঞ্জলি'র গানে 'দেখা' বা 'আঁখি' আলংকারিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, আক্ষরিক অর্থে নয়। রবীন্দ্রনাথ চাইছেন তাঁর হৃদয়স্বামীর প্রেম আরো সুস্পষ্ট-রূপে অনুভব করতে—অন্তরে ও বাইরে, অন্ধকার কক্ষে ও জগতের মাঝখানে। সুদর্শনাও তা-ই চেয়েছিলো।

"আলো, আলো কই! এ ঘরে কি একদিনও আলো জ্বলবে না" মানবাত্মার চিরন্তন আর্ত প্রশ্ন ও প্রার্থনায় নাটকের শুরু—বললে ভালো শোনায় কিন্তু একটু ভুল ধারণার সৃষ্টি করে। লক্ষণীয় যে অন্ধকার ঘরের অন্ধকার খুব ঘন নয়, দুর্ভেদ্য নয়। সেই অন্ধকার ভেদ ক'রে রাজার বীণার ধ্বনি শুনতে পায় সুদর্শনা, ঘরে প্রবেশ করলে তাঁর উত্তরীয়ের সুগন্ধ আঘ্রাণ করে, তাঁর প্রেমালাপ শ্রবণে বঞ্চিত হয় না, প্রতি রাত্রে "সেই দীপ-নেবানো বাসরঘরে" দাম্পত্যমিলন যে সুনিবিড় নয় এমন কোনো ইঙ্গিত নেই নাটকে। সুদর্শনা প্রেমিকা, প্রেমে তার ভেজাল নেই। কিন্তু একটা অভাব ছিলো, এবং সেই অভাবমোচনের ইতিবৃত্তই 'রাজা' নাটকে বর্ণিত হয়েছে।

সুদর্শনা অন্ধকার ঘরে মিলন-সুখের মধ্যে রাজার একটি বিশেষ রূপমাত্র চিনেছিলো। তারই উপর নির্ভর ক'রে সে কল্পনা ক'রে নিয়েছিলো যে রাজা সত্যিই ও সর্বতই তা-ই; জগতের আলোতেও তিনি অবিমিশ্র মধুর, অতুলনীয় সুন্দর। তার আসল কামনা ঘরে প্রদীপ জেলে রাজাকে চোখে দেখা নয়, বাইরের আলোয়, প্রকৃতি ও মানুষের মাঝখানে তাঁকে দেখতে পাওয়া। এখানে মনে রাখা ভালো যে রবীন্দ্রনাথের কিংবা সুদর্শনার রাজা রূপাতীত, বিশ্বাতিগ, নিরুপাধিক, নিষ্প্রপঞ্চক সত্তা নন। অন্তরের হাজারো ভাবনায় বেদনায় ও বাইরের হাজারো রূপের মধ্যে অরূপের প্রকাশ যদি তিনি না-দেখতেন, তবে রবীন্দ্রনাথ হতেন সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের কবি, হয়তো-বা মালার্মের মতো শূন্যবাদী কবিদের সমজাতীয়।

এই সূক্ষ্মতর নাটকের নায়িকা রূপের গর্ব, ধনের গর্ব, মানের গর্ব নিয়ে গর্বিনী নয়। কিন্তু অন্য-এক অহংকার তার মনে ছিলো। যদিও সে রাজাকে কেবল দীপ-নেবানো ঘরের মধ্যেই পেয়েছে, তবু সে রাজাকে চেনে, যেখানেই দেখা হোক্ সে চিনে নেবে তাঁকে। অন্তত তার দাসী সুরঙ্গমার চেয়ে সে রাজাকে ভালো চেনে। আর-একটি অহংকার: সে যেমন রাজাকে ভালোবাসে, রাজাও তেমনি তাকে ভালোবাসেন। যদিও রাজা একসময়ে তাকে বলেছেন: "রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসায় ভোলাব", কিন্তু বড়ো বিচিত্র তাঁর ভালোবাসার ধরন। সাধারণ মানুষের কোমল ব্যাকুল ভালোবাসার সঙ্গে ঐ পাথুরে ভালোবাসার কোনো তুলনাই হয় না। সেই কথাটা বুঝতে সুদর্শনার এই জন্মে জন্মান্তর ঘ'টে গেলো। "আমার রাজা নিষ্ঠুর, কঠিন, তাকে কি কেউ কোনোদিন টলাতে পারে"—এ-কথা সুরঙ্গমা আগাগোড়া জানে, কিন্তু নাটকের প্রায় শেষ অবধি সুদর্শনা বিশ্বাস

করতো যে সে রাজাকে টলাতে পারবেই পারবে। "ভারি কঠিন তোমার রাজা, কিছুতেই টলেন না! দেখি, কেমন না টলেন।" মাথা খুঁড়ে হিমালয় পর্বতকে হয়তো টলাতে পারতো সুদর্শনা, কিন্তু রাজা যে আরো কঠিন।

সুরঙ্গমা তার রানীকে বোঝাতে চেয়েছে যে লোকে যাকে সুন্দর বলে রাজা তা নন, বরং তিনি ভয়ংকর দেখতে, এবং "কী নিষ্ঠুর, কী নিষ্ঠুর, কী অবিচলিত নিষ্ঠুরতা!" কিন্তু সুদর্শনা এ-সব কথা হেঁয়ালী ব'লে উড়িয়ে দিয়েছে। সে নিশ্চয়ই রাজাকে আরো ভালো চেনে, কারণ সে যে রাজার প্রণয়িনী, পরিচারিকামাত্র নয়। বুঝতে পারে না যে প্রণয়িনী ব'লেই সে রাজার একটিমাত্র দিক চিনেছে। তাঁর পূর্ণ সত্তার যে ভয়ংকর-নিষ্ঠুর দিক রয়েছে তা তিনি দাসীর কাছে উদ্‌ঘাটিত করেছেন, কিন্তু প্রেয়সীর কাছে করেননি। সুদর্শনা জন্মেছিলো রাজকন্যা হ'য়ে, এখন সে রানী, নিরঙ্কুশ সুখে সে আজীবন অভ্যস্ত; তার সহনশক্তি কম থাকারই কথা। রাজার সেটা অজানা নেই।

রাজকুমার সিদ্ধার্থ যেমন তাঁর সুরক্ষিত সুরম্য প্রমোদভবন থেকে বেরিয়ে নগরপথে ব্যাধি-শোক-জরা-মৃত্যুর ভয়ংকর চিত্র দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, সুদর্শনাও তেমনি অভিভূত হয়ে যাবে যদি সে রাজাকে জগতের আলোয় দেখে। রাজা তাকে বলেছেন: "সহ্য করতে পারবে না—কষ্ট হবে।" সুদর্শনা অনভিজ্ঞ সরল মনে উত্তর দিয়েছে: "সহ্য হবে না, তুমি বলো কী। তুমি যে কত সুন্দর, কত আশ্চর্য,তা এই অন্ধকারেই বুঝতে পারি, আর আলোতে বুঝতে পারব না?" রাজার পরিকল্পনা, তিনি ধীরে-ধীরে পর্যায়ক্রমে তাঁর সমগ্র ভীমকান্ত রূপটা সুদর্শনার চোখে উন্মুক্ত করবেন, পাছে তাঁকে হঠাৎ দিনের আলোয় দেখে ঐ রাজসুখলালিতা স্বপ্নবিলাসিনীর মনে এমন প্রচণ্ড আঘাত লাগে যা তার সহ্যশক্তির বাইরে। "সেই দুঃখ থেকে বাঁচিয়ে ক্রমে ক্রমে তোমার কাছে পরিচয় দিতে চেয়েছিলুম।" শক্ হয়তো কিছুটা এড়ানো যেতো, কিন্তু দুঃখ তো সুদর্শনাকে পেতেই হবে। ললিতমধুর কল্পনার জগতে যে নিজেকে এতদিন ভুলিয়ে রেখেছে তাকে বাস্তব কঠিন নিষ্ঠুর পৃথিবীতে টেনে নিয়ে আসতে হ'লে দুঃসহ দুঃখের পথ ছাড়া তো অন্য কোনো পথ নেই। একছুটে পার হয়ে গেলে সে কম দুঃখ পাবে, নাকি ধীর পদক্ষেপে মন্থর গতিতে রোজ একটু-একটু ক'রে হাঁটলে—সে সূক্ষ্ম বিচারে খুব কি আসে যায়? আসল কথাটা হচ্ছে বাসরঘরের সুখশয্যা ছেড়ে তাকে লোকালয়ে পৌছতে হবে—রাজার রূপ যেখানে বজ্রকঠিন, অবিচলিত নিষ্ঠুর।

রাজানুগ্রহ থেকে কেউ বঞ্চিত নয়, কিন্তু রাজনিগ্রহ থেকেও কারো রক্ষা নেই সেখানে। এ-নিগ্রহ কি সবসময়ে নিগৃহীতের মঙ্গলার্থে? রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতায় প্রবন্ধে অনেকবার সে-কথা বলেছেন,কিন্তু এই নাটকে তিনি রুদ্রের নিরাবরণ বাম মুখটাও দেখতে এবং দেখাতে চেয়েছেন মনে হয়। সুরঙ্গমার প্রতি রাজা নিষ্ঠুর হয়েছিলেন তাকে নষ্ট না হয়ে যাওয়ার পথ থেকে ফেরাবার জন্য। কিন্তু ঠাকুরদা

তো নষ্ট হ'তে যাচ্ছিলেন না ; একে-একে তাঁর পাঁচটি ছেলে কেড়ে নেওয়া তবে কেন ? "ওই আমাদের ভদ্রসেন, রাজা বলতে সে একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে, কিন্তু তার ঘরের এমন দশা যে চামচিকেগুলোরও থাকার কষ্ট হয় ।" কিসের জন্য ? তার কোনো উত্তর নেই । কী হেতু, হয়তো বলা যায় ; কী উদ্দেশ্যে, বলা যায় না । ধর্মোপদেষ্টারা কিছু বলতে চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু বলবার সময়ে কর্মবাদ পরকালবাদ জাতীয় আপ্তবাক্যের আশ্রয় খোঁজেন । ঠাকুরদা অবশ্য অত অবাস্তব কথা বলেন না, জিজ্ঞাসা করেন : "বন্ধুকে কি কেউ পুরস্কার দেয় ?" না, পুরস্কার দেয়না, কিন্তু বন্ধুত্বের বদলে বন্ধুত্ব তো দেয়। বন্ধুর সব-ক'টি ছেলে কেড়ে নেওয়াকে কি তার প্রতি বন্ধুত্বের অব্যর্থ প্রকাশ ভাবা যায় ? রাজাকে ঠাকুরদা তাঁর অকুণ্ঠ অবিচলিত বন্ধুত্ব দান করেছেন । প্রতিদানে রাজা সম্পূর্ণ উদাসীন । প্রাকৃতিক নিয়মের লৌহশৃঙ্খল-পরম্পরায় যা ঘটে—যতো ভয়ংকর হোক্ সে ঘটনা এবং যতো বড়ো ভক্তের উপর তার আঘাতটা পড়ুক—তাতে হস্তক্ষেপ করা রাজার স্বভাব নয়। স্পিনোজার মতো মহান দার্শনিক, কীট্‌স্-এর মতো প্রতিভাবান কবি ক্ষয়রোগে ভুগে-ভুগে অকালে প্রাণত্যাগ করেন ; জীবনানন্দ দাশের পাঁজরের হাড় গুঁড়িয়ে যায় ট্রামের ধাক্কা লেগে ; শ্রীরামকৃষ্ণের মতো দেবতুল্য মানুষও কর্কট রোগের যন্ত্রণা থেকে রেহাই পান না । মানুষের দেহের মধ্যেই ব্যাক্‌টিরিয়ার উত্তম খাদ্য ; প্রচণ্ড ভূমিকম্পে লোকালয়ও ধ্বংস হয়, হাজার-হাজার মানুষের ধনপ্রাণের ক্ষয়ক্ষতি যা ঘটে তাকে "তুচ্ছ হ'তে তুচ্ছ" ভাবা যায় না ; এবং সবই বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম মতোই ঘটে । বিশ্বদেবতার নিয়ম যদি ভিন্নতর-কিছু হয় তবে তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য । ধর্মশাস্ত্র মেনে অবশ্য আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে এই অশ্রুধারার স্রোতের মধ্য দিয়ে কোনো নিগূঢ় মহান ঐশী অভিপ্রায় সাধিত হচ্ছে । কিন্তু তাতে ক'রে বুদ্ধিতে বিশ্বাসে আধা-আধি হ'য়ে আমাদের ব্যক্তিসত্তা দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে যায় । ত্রিভুবনেশ্বর কি আপন নিয়মের জালে আপনি বাঁধা পড়েছেন । তাই তো দেখতে পাচ্ছি ।

ধর্মোপদেষ্টারূপে নয়, কবিরূপে এক উত্তর দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ । সে-উত্তর নাটকের প্রাণকেন্দ্রে যে-গানটি রয়েছে তার মধ্যে সংহত । সুখ-দুঃখ ভালো-মন্দ, জন্ম-মৃত্যুর বর্ণযোজনা এক মহান আশ্চর্য সুষমা-যুক্ত চিত্র রচনা করেছে ঠাকুরদা ও তাঁর স্রষ্টার নান্দনিক দৃষ্টির সম্মুখে । যুগযুগান্তের পটভূমিকায় সেই জাগতিক চিত্র দেখে তাঁরা আনন্দিত। আনন্দিত না-ব'লে বলা উচিত সুখ-দুঃখোত্তীর্ণ প্রশান্তিতে আত্মস্থ ।

হাসি কান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালোমন্দ তালে তালে,
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে,
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ ।

ধর্মোপদেষ্টা ভালোকেই সত্য মনে করেন, মন্দকে দৃষ্টিবিভ্রম ; অথবা মন্দ ভালোর উপায়মাত্র, সুতরাং ভালোই। চোখের ছানি কাটলে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, দিন-দশেক চোখের উপর ব্যাণ্ডেজ বেঁধে শুয়ে থাকতে কষ্ট হয়। তবু সেটাকে কেউ ঈভিল বলে না, কারণ তা চিকিৎসার অঙ্গ, স্বাস্থ্যোদ্ধারের উপায়। কিন্তু এই গানে ভালো ও মন্দকে সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে ; দুটোই সত্য। রাজার যে চোখ-জুড়ানো হৃদয়-ভরানো কান্ত-মধুর রূপ সুদর্শনা অনুভবে জেনেছে, গানে শুনেছে এবং কল্পনার চোখে দেখেছে তা মিথ্যা নয় ; তবে তা-ই একমাত্র সত্য—এ-ধারণাটা অতীব ভ্রান্ত। সে-ভ্রান্তিমোচনের কাহিনী নিয়ে নাটকের প্লট তৈরি হয়েছে। রাজার যে অবিচলিত নিষ্ঠুর রূপ সুরঙ্গমা, ঠাকুরদা, ভদ্রসেন মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করেছে তা-ও কঠিন সত্য।

নাটকের মধ্যে এতবার এই ভয়ানক রূপটির কথা বেশ স্পষ্ট জোরালো ভাষায় বলা হয়েছে যে তা কেমন ক'রে কোনো-কোনো সমালোচক এবং অনেক পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে সেটাই আশ্চর্য। অজিতকুমার চক্রবর্তী শেষ দৃশ্যে রাজার উক্তি ("অন্ধকারের লীলা এবার শেষ হল, এখন বাইরে চলে এসো, আলোয়") উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন, "নাটকের এইখানে সমাপ্তি।" কিন্তু নাটকের সমাপ্তি তো সেখানে নয়। তারপরে রয়েছে সুদর্শনার সেই নিদারুণ স্বীকৃতি যেখানে না-পৌঁছোলে নাটক অত্যন্ত অসমাপ্ত থেকে যেতো : "যাবার আগে আমার অন্ধকারের প্রভুকে, আমার নিষ্ঠুরকে, আমার ভয়ানককে প্রণাম করে নিই।" অজিতকুমারের সহৃদয় রবীন্দ্র-সমালোচনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু সন্দেহ হয় যে তাঁর নিষ্ঠাবান চিত্তে এই নিষ্ঠুরকে, এই ভয়ানককে মেনে নিতে অসংজ্ঞাত প্রতিরোধ র'য়ে গেলো নাটকের শেষ পাতা পর্যন্ত; নইলে উদ্ধৃতিতে এমন জাজ্বল্যমান ত্রুটি কী ক'রে থাকতে পারে।[১]

রাজাকে পেতে হ'লে শুধু সুন্দরের ধ্যান করলে চলবে না, সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার মতো চারিত্রিক বল, মানসিক পরিণতি ও হার্দিক দৃঢ়তা দরকার। হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা যে-সত্যের মুখ ঢাকা আছে তা মনোহর না-ও হ'তে পারে। এই সৎসাহসিক (রচনাকালের পক্ষে অত্যন্ত সাহসিক) নাটকে রবীন্দ্রনাথ বলতে চাইছেন—ভগবানকে মনের মতো ভাবা অন্যায় ; এই অন্যায় আবদার যার মনে যতো প্রবল, তার জীবনে দুঃখ ও দুর্বিপাক ততো বেশি। মনকে কঠিনতম সত্য সহ্য করবার মতো, শুধু সহ্য নয়, ভালোবাসার মতো ক'রে তৈরি ক'রে নিতে হবে। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে পাথরে খোদাই-করা কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ

১ অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'কাব্যপরিক্রমা', পৃ ৪৯

চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায় ;
সত্য যে কঠিন
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম।

স্পিনোজার মতো রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করছেন : "**The truth is cruel but it can be loved, and it makes free those who have loved it.**" (স্পিনোজ-দর্শনের এই অন্যতম মূলসূত্রটি সাণ্টায়ানা উক্ত বাক্যে সন্নিবদ্ধ করেছেন স্পিনোজার *Ethics*-এর ভূমিকায়।) শেষ অবধি গান্ধিও যে-সিদ্ধান্তে পৌচেছিলেন তা এই নয় যে ঈশ্বর কল্যাণময়, করুণাময়, প্রেমময়। তাঁর সমুজ্জ্বল হৃদয়োপলব্ধি ও পরীক্ষিত বুদ্ধি তাঁকে পৌছিয়ে দিলো ভিন্ন এক সংজ্ঞায়—**Truth is God** ; 'ভগবান সত্য'-এর পরিবর্তে "সত্যই ভগবান"—এই সূত্রটিই তাঁর শেষ স্বাক্ষর লাভ করলো। নির্ভীক নিরাসক্ত চিত্তে আমরা যা পরম সত্য ব'লে জানবো, তাকেই ঈশ্বর ব'লে মানবো, তার কাছে, একমাত্র তার কাছেই মাথা নত করবো। এই চূড়ান্ত উপলব্ধির পথ গান্ধির মতে ভালোবাসা, প্রাণীমাত্রকে ভালোবাসা, চরাচরকে ভালোবাসা।

যে-সত্যকে আমরা ভালোবাসি তাকে সুন্দরও বলতে পারি। বিজ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিক, নিরাবেগ, ব্যবহারিক সত্যকে সুন্দর বলতে দ্বিধা হয়, কিন্তু কবিতার সত্য ও সুন্দর অভিন্নার্থ। ভয়ংকরের সঙ্গে তার বিরোধ নেই। 'কিং লীয়র'-এর মতো ট্যাজিডিকেও আমরা সুন্দর বলি, যতো মর্মান্তিক হোক্ তার ঘটনা-পরম্পরা, কালবৈশাখীর বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ কালো আকাশও সুন্দর। ক্ষুদ্র, সীমিত সুসজ্জিত ননীর পুতুলের মতো সুন্দরকে ভালোবেসেছিলো সুদর্শনা, তার উচ্ছল মনের রঙিন কল্পনার দ্বারা বাঁধতে চেয়েছিলো রাজার মহান সত্তাকে। ফলে এই জন্ম-রোম্যাণ্টিকের কোমলহৃদয় তো ক্ষতবিক্ষত হবেই, তার কপালে আঘাত, লাঞ্ছনা, অবহেলা তো থাকবেই। শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠুরকে ভয়ংকরকে সহ্য করতে, প্রণাম করতে শিখলো সে, তবে তার মুক্তি। শেষ পর্যন্ত সুন্দরের সাধনায় সেই স্তরে পৌছোলো সুদর্শনা, যেখানে দাঁড়িয়েও সে ঠাকুরদার ভাষায় বলতে পারে : "চিনে নিয়েছি যে—সুখে দুঃখে তাকে চিনে নিয়েছি—এখন আর সে কাঁদাতে পারে না।" সুন্দরের মধ্যে যে-ভয়ংকর রয়েছে সমগ্র পৃথিবী ও ইতিহাস জুড়ে, তাকে চিনতে হবে, নইলে রাজাকে চেনা সম্পূর্ণ হবে না। শুধু মধুরকে ভালোবাসা ভালোবাসার ভগ্নাংশমাত্র।

নিঃসন্দেহে মানুষের মধ্যে একটা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, একটা প্রেমশক্তি, একটা দৈবী প্রেরণা কাজ করছে; মহামানবে আমরা তার স্পষ্ট রূপ দেখি। সমস্ত জড়প্রকৃতিতেও তা একেবারে অবিদ্যমান নয়, নইলে মানুষের উদ্ভব ও বিবর্তন সম্ভব হ'তো না।

কেমন ক'রে বন্য হিংস্র জন্তুর কোলে বুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন মানুষ জন্ম নিলো—সে এক বিস্ময়কর ইতিহাস। অতি মন্থর গতিতে যুগ-যুগান্তর পাড়ি দিয়ে পশু হ'লো মানুষ, এবং প্রায় এক কোটি বছর পূর্বে যখন আদিম মানুষ ব'লে তাকে প্রথম চিহ্নিত করা যায় তখনও সে পশু থেকে খুব ভিন্ন ছিলো না। তারপরে ধীর পদক্ষেপে অনেক বাধাবিপত্তি ও ব্যর্থতা ডিঙিয়ে তার মধ্যে এলো সমাজবোধ, কল্যাণবোধ, বিশুদ্ধ জ্ঞানের ও রূপের তৃষ্ণা। জন্ম নিলেন সক্রাৎ ও বুদ্ধ, যীশু ও মহম্মদ, শেক্‌স্‌পীয়র ও মাইকেল এন্‌জেলো, মার্কস্‌ ও আইনস্টাইন। কতো অন্ধকার বন্ধুর পথ আলোকিত ও সুগম হয়েছে আমাদের সামনে, কতো অসম্ভবপ্রায় ব্যাপার (যথা দারিদ্র্যের অবসান ও রোগমুক্তি) সুসম্ভব হ'য়ে উঠেছে। মানুষের তথা প্রাণীমাত্রের অস্তিত্বই এক অভাবনীয়রূপে অসম্ভব ব্যাপার। কতো-কিছু উপাদান ও অবস্থার সমাবেশ ঠিক-ঠিক গুণে মাত্রায় স্থানে ও কালে তার পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয়। অথচ সবই মজুদ রয়েছে এই পৃথিবীর মাটি জল বাতাস ও বিদ্যুতে, এই সূর্যের আলো ও তাপে। মানুষকে জন্মদান ও লালন, তার চিত্তের প্রসার ও উন্নতি সাধনই জড়প্রাকৃতিক বিবর্তনের লক্ষ্য—কথাটা ঠিক বৈজ্ঞানিক সত্য না হ'লেও তার খুব কাছ ঘেঁষে যায়, মনে হয় যেন এটাই বৈজ্ঞানিক সত্যের অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত। এই কথাটাই রবীন্দ্রনাথ রাজার মুখে বসিয়েছেন সুদর্শনাকে উদ্দেশ ক'রে : "দেখতে পাই, যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার আমার আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায় রূপ ধ'রে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত ঋতুর উপহার।" কবি যদি উদ্বেল ভাবাবেগে গেয়ে ওঠেন : "আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে"—তবে বিন্দুমাত্র বেমানান ঠেকে না সে-উচ্ছ্বাস।

কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে বলতে হয়, দুই হাতে সুধার সঙ্গে গরলও ঢেলে দিচ্ছেন সেই অতি নিষ্ঠুর ভয়ংকর প্রেমিক, সেই সুদর্শনার আদর্শস্থানীয় কালো রাজা, যাঁর পতাকায় পদ্ম ফুলের মাঝখানে বজ্র আঁকা। তাঁরই আদেশে সমুদ্রে ভীষণ ঝড় ওঠে, তীর্থযাত্রী জাহাজ ডুবে যায়, সাত-আটশো নিরীহ নারী-পুরুষ শিশু-বৃদ্ধ অসহায় যন্ত্রণায় দম আট্‌কে প্রাণ হারায়। সংবাদ পেয়ে তরুণ কবি বিহ্বল হ'য়ে পড়েন, চোখের সামনে ছবি ভাসে জগদ্‌ব্যাপী এক প্রাণহীন মত্ততার : "না-জানে পরের ব্যথা না-জানে আপন।" কতো খরা ও প্লাবন, ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাত, রাষ্ট্রবিপ্লব ও যুদ্ধ ঘটে। সব-কিছুকে ছাপিয়ে ওঠে প্রথম মহাযুদ্ধের ভয়াবহ ঘটনাবলী। মানুষের আর্ত স্বর হারিয়ে যায় "চৌদিকের চিরনীরবতা"য়। এটাই মানবভাগ্য, হিউম্যান কণ্ডিশান। ক্রমশ দুঃখের অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সুপরিচিত হ'য়ে ওঠেন। কিন্তু তাঁর আগেই হয়েছিলেন ঠাকুরদা। অর্থাৎ গীতিকবি রবীন্দ্রনাথের আগেই নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ অমঙ্গলের ব্যাপক অস্তিত্ব মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন।

'মানসী'র "সিন্ধুতরঙ্গ" লিখবার সময়ে রবীন্দ্রনাথ অতো বড়ো দুঃসংবাদ পেয়ে দিশাহারা হ'য়ে পড়েছিলেন, বুঝে উঠতে পারছিলেন না কেমন ক'রে ঈশ্বরের দয়া ও নির্দয়তা পাশাপাশি বাস করতে পারে। কখনো মনে হ'তো ভগবান কোথাও নেই, চারিদিকে শুধু "জড়ের বিলাস"; কখনো সন্দেহ হ'তো মানুষের ভাগ্য নিয়ে বুঝি দুই সমশক্তিমান দেবতা দ্যূতখেলা খেলছেন। 'নৈবেদ্য' এমন-কি 'বলাকা' রচনাকালেও তিনি ভাবতে চেষ্টা করছেন যে, মানুষের দুঃখ মানুষের পাপেরই শাস্তি। কিন্তু একজনের পাপে অন্যজন শাস্তি পায় কেন—প্রশ্ন জেগেছে মনে। যুদ্ধ যারা বাধায়, যুদ্ধের মার তো তারা অনেক ক্ষেত্রেই খায় না, মার খেয়ে মরে লক্ষ-লক্ষ নিরপরাধ নরনারী। উত্তরে ভেবেছেন—মানুষে-মানুষে সবাই এক। সমাজদেহের এক অংশে বিষ সঞ্চার হ'লে অন্য অংশে, হয়তো-বা সারা দেহে, ফোড়া হয়ে বেরুবে, দুঃসহ যন্ত্রণার সৃষ্টি করবে—এমন তো হ'তেই পারে। কিন্তু উত্তর সন্তোষজনক নয়; রবীন্দ্রনাথ নিজেও এতে শেষ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হননি। যতোদূর জানি, রবীন্দ্রনাথ কখনো এ-জন্মের দুঃখ ও অবমাননাকে পূর্বজন্মের পাপের ফল ব'লে উড়িয়ে দেননি, কিংবা সান্ত্বনা খোঁজেননি এই ভুয়ো বিশ্বাসে যে একালের যাবতীয় দুর্ভোগের পাওনা পরকালের প্রচুরতর সুখভোগে সুদসুদ্ধ আদায় হয়ে যাবে। দুঃখ বজ্রকঠিন সত্য কোনো সহজ ধর্মতান্ত্রিক ব্যাখ্যা সাপেক্ষ নয়।

তবু ঠাকুরদার চিত্ত অবিচলিত, প্রশান্ত, এমন-কি প্রফুল্ল। নিজের দুর্ভাগ্যকে তিনি দুর্ভাগ্য ব'লেই গণ্য করেন না; পরের দুর্ভাগ্যকেও নীরবে সহ্য করতে শিখেছেন। তাতে ব্যথা পান না যে তা নয়, কিন্তু নিজের ব্যথার সঙ্গে যেমন, সমব্যথার সঙ্গেও তেমনি আপস ক'রে নিতে মনকে তৈরি করেছেন। নিজের ব্যথাকে ঈশ্বরলাভের বা সত্যোপলব্ধির উপায় ভাবা যেতে পারে। কিন্তু বিধবা প্রতিবেশিনীর একমাত্র ছেলে যখন কর্কট রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করে, তখন তাতে ক'রে ঈশ্বরের প্রেমকরুণাময় বা জগৎকল্যাণকর মূর্তি আমাদের চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে যায়।

সবচেয়ে ভয়ংকর সত্য হচ্ছে পরের ব্যথা, নিজের ব্যথা নয়। 'গীতাঞ্জলি'তে রবীন্দ্রনাথ কেবল নিজের ব্যথার কথাই ভেবেছেন। কিন্তু ঠাকুরদা ভাবেন সব ব্যথাই তো বন্ধুর দেওয়া, এবং বন্ধুকে বন্ধু যদি সহ্য করতে না পারে তবে বন্ধুত্ব কিসের। গীতার প্রার্থনা যেন তাঁর মুখে ঈষৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ ধারণ করেছে—পিতা যেমন পুত্রকে, সখা যেমন সখাকে, প্রেমিক যেমন প্রিয়াকে সহ্য করে, তেমনি হে অদৃশ্য বন্ধু, তুমি আমাকে সহ্য করো, এবং আমিও তোমাকে সহ্য করতে পারি যেন। নাটকে রাজা বারবার সুদর্শনাকে জিজ্ঞাসা করছেন—আমাকে সইতে পারবে তো? অথবা জানাচ্ছেন—সহ্য করতে পারবে না। ভগবানকে সহ্য করতে হবে, এই কথাটা বলছেন ভগবৎ-ভক্ত কবি রবীন্দ্রনাথ। প্রেমভক্তির এ এক আশ্চর্য প্রকাশ। তবে কেউ যেন একে বোদলেয়রীয় ব্লাস্‌ফেমি কিংবা ভলতেরীয়

আইরনির সঙ্গে তুলনা না-করেন। ভক্তিবর্ণালির সব-ক'টি বর্ণ এমন-কি বেগনী-পারের অনুমানে জানা রঙও পাওয়া যাবে রবীন্দ্র-কাব্যে, কিন্তু বিশ্বের প্রতি বিতৃষ্ণা-ঈশ্বরের প্রতি বিদ্রোহ-ঘোষণা বা বিষোদ্‌গার সে-কাব্যকে স্পর্শ করেনি। শারীরিক ও সামাজিক অসুস্থতার অন্তিম যন্ত্রণাও কখনো রবীন্দ্রনাথের মানসিক বৈকল্য ঘটাতে পারেনি। কলাবৈকল্যবাদী না-ব'লে তাঁকে বলবো কলা-অবৈকল্যবাদী।

সুদর্শনার সঙ্গে আমাদের তাদাত্ম্য ঘ'টে যায় প্রথম দর্শনেই, অথবা প্রথম শ্রবণে যখন অন্ধকার ঘরের ভিতর থেকে আমরা তার ব্যাকুল কণ্ঠ শুনি: "আলো কই, আলো, এ ঘরে কি একদিনও আলো জ্বলবে না?" মানুষ চিরকাল আলোর পিয়াসী; অন্ধকারের প্রাণী নয় সে। যাকে আলোয় পেলো না, তাকে কি সত্যি সে পেলো—এ-আশঙ্কা তার মনকে অস্থির করবেই। পরে একদিন রবীন্দ্রনাথ গাইবেন, "আমার জীবনে তোমার আসন / গভীর অন্ধকারে।" কিন্তু সে-গানে তৃপ্তি ও সার্থকতার সুর শোনা যাবে। কারণ তাঁর জীবনে যাঁর আসন তাঁকে ইতি-পূর্বেই তিনি পেয়েছেন প্রকৃতির রূপে বর্ণে গন্ধে গানে; দেখেছেন

যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ,
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ
খাটছে বারো মাস।

সর্বত্রই যিনি হৃদয় হরণ করছেন, সকলের চোখের আড়ালে গভীর অন্ধকারে তাঁকে পাওয়াতে পাওয়া আরো নিবিড়, আরো পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু সুদর্শনা তো তার রাজাকে কখনোই আলোতে দেখেনি, লোকালয়ে দেখেনি। তাই তার আকুলতা আমাদের আকুল করে, তার প্রার্থনায় আমাদের প্রার্থনা মেশে।

অবশেষে মনস্কামনা পূর্ণ হ'লো সুদর্শনার। কিন্তু একেই কি বলে পূর্ণ হওয়া? দুঃখ তার তরুণ ছিলো, চঞ্চল ছিলো, অধীর ছিলো; হ'লো সুপরিণত, সুস্থির এবং চিরস্থায়ী। সুদর্শনা অধীর হয়েছিলো পরম সুন্দরকে দিনের আলোয় দেখতে; দেখলো পরম ভয়ংকরকে। ইতিমধ্যে অবশ্য পাথরের দেওয়ালে মাথা ঠুকে-ঠুকে তার প্রেম কঠিন হয়েছে, সর্বংসহ হয়েছে। সবই সে মেনে নিলো, হাসিমুখে না-হ'লেও খুশি মনে। কিন্তু সেই খুশিতে কি অবসাদ ও বিষণ্ণতার আমেজ ছিলো না? শেষ যবনিকাপাতের অব্যবহিত পূর্বে সুদর্শনা যখন সব অহংকার চূর্ণ হয়ে যাওয়া গলায় ব'লে ওঠে: "আমার অন্ধকারের প্রভুকে, আমার নিষ্ঠুরকে, আমার ভয়ানককে প্রণাম করে নিই।" তখন সে-আত্মনিবেদনের প্রতিধ্বনি জাগে আমাদের মনেও। তবে তার বিষাদগম্ভীর কণ্ঠস্বরে আমরা শুনি হৃদয় দগ্ধ-হয়ে-যাওয়া সেই সুপরিপক্ক-তার সুর যার মহত্তর প্রকাশ অন্য-এক মহাকবির নাটকে বহুপূর্বেই পেয়েছিলাম:

Men must endure
Their going hence even as their coming hither :
Ripeness is all.

কিন্তু যবনিকাপাতের কথা এখনই নয়। রাজাকে চোখে দেখার যে-আগ্রহ সুদর্শনাকে ব্যাকুল করেছিলো তা আমাদের মনে হয়তো-বা জিজ্ঞাসায় পরিণত হয় —এই অন্ধকার ঘরের অদৃশ্য প্রেমিক কি দিনের আলোয় জগৎ-সংসারের মাঝখানেও প্রেমিকরূপেই দেখা দেবেন, নাকি সেখানে তাঁর অন্য পরিচয়? তাঁর প্রেমকল্যাণময় রূপের কথা আমরা সাধুসন্তদের মুখে শুনেছি, ধর্মশাস্ত্রে পড়েছি। সে-কথা কি সত্য?

তোমার প্রণয় যুগে যুগে মোর লাগিয়া
জগতে জগতে ফিরিতেছিল কি জাগিয়া,
এ কি সত্য?

সুদর্শনার সঙ্গে আমরাও অবুঝ হ'য়ে যাই, আত্মাভিমানকে প্রশ্রয় দিই, ভাবি, হ্যাঁ, এ-কথাটাই নিপট সত্য, আর-সব মায়া-মরীচিকা। তৃষ্ণার্ত মরুপথযাত্রী যেমন দূর থেকে ঝলমল বালির উপরে আশপাশের ঢিবিগুলির ছায়া দেখতে পেয়ে ভাবে— ঐ তো জল। তারপর যতোই সে ছোটে, জল ততো দূরে পালায়। অবশেষে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে তপ্ত বালুকারাশির উপর লুটিয়ে প'ড়ে সে বোঝে যে পৃথিবীতে জল আছে, কিন্তু মরীচিকাও আছে; তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে ম'রে যাওয়াও আছে। নিয়মের রাজত্ব চতুর্দিকে: নিয়ম অতি সূক্ষ্ম কিন্তু হৃদয়হীন। সুদর্শনাও সে-কথা বুঝবে, আমরাও তার সঙ্গে-সঙ্গে বুঝবো।

অথবা আগেই বুঝি। নিশ্চয়ই আগে বুঝি, কারণ আমরা তো সুখেসম্ভোগে অপরিমিত ঐশ্বর্যে লালিতা রাজমহিষী নই। যেমন আমরা আগে থেকেই জানি যে, ননীর পুতুলের মতো রূপবান রাজবেশধারী সুবর্ণ আসল রাজা নয়। তবু রূপের নেশায় মাতোয়ারা প্রেমিকার বিভ্রম স্বাভাবিক ঠেকে, পদ্মপাতায় ক'রে ফুল পাঠানো সুন্দর লাগে। তারপরেই প্রচণ্ড দুটি আঘাত এসে পড়লো সুদর্শনার মাথার উপর, অকস্মাৎ, পর-পর। সে জানলো যে, যে সুন্দর সে তার রাজা নয়; আর তার রাজা দেখতে অতি ভয়ানক। সেই ভয়ানক রূপ দেখার জন্য রাজপ্রাসাদ এবং তার চারিপাশে বিরাট লেলিহান অগ্নিশিখার প্রয়োজন ছিলো; তার চেয়ে উপযুক্ত পটভূমিকা আর কী হ'তে পারে। অথবা ভাগ্যের পরিহাস সেটা। আলো চেয়েছিলো সুদর্শনা, ঘরে-বাইরে আগুন জ্ব'লে উঠলো। এমনি ক'রে আমাদের প্রার্থনা ফিরে আসে আঘাত হয়ে।

ভয় পেলো সুদর্শনা, রাজার ভয়ানক রূপ অসহ্য ঠেকলো তার। সেইসঙ্গে সে টের পেলো যে, সুবর্ণকে অকিঞ্চিৎকর জেনেও তার মনোহর রূপ সে ভুলতে পারছে না। অশুচি বোধ করলো নিজেকে, রাজার কাছে শাস্তি চাইলো; কিন্তু রাজা কোনো প্রকাশ্য শাস্তি দেবেন না তাকে। পালিয়ে যেতে চাইলে রাজা উদাসীনভাবে বললেন—যাও যতোদূর পারো। এই উদাসীনতাই দারুণতর শাস্তি। পিতৃগৃহে গিয়েও প্রত্যাশায় প্রহর কাটাতে লাগলো—কখন রাজা আসবেন তাকে

ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু তাঁর ঔদাসীন্য হিমাদ্রিতুল্য। রাজা অবশ্য এলেন, তাকে নতুন এক বিপদ থেকে উদ্ধার করবার জন্য ; কিন্তু ত্রাণকার্য সমাপ্ত হ'লে তার দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না-ক'রে চ'লে গেলেন।

এমন দুঃখের দিনে এক রাত্রে সুদর্শনার মনে হ'লো কোথায় যেন রাজার বীণা বাজছে। "যে নিষ্ঠুর তার কঠিন হাতে কি অমন মিনতির সুর বাজে। বাইরের লোক আমার অসম্মানটাই দেখে গেল, কিন্তু গোপন রাত্রের সেই সুরটা কেবল আমার হৃদয় ছাড়া আর তো কেউ শুনল না। "সে বীণা তুই কি শুনেছিলি সুরঙ্গমা! না, সে আমার স্বপ্ন ?" সুদর্শনার মন সন্দেহে জর্জরিত—এই মিনতির সুর তার ইচ্ছাপূরক স্বপ্নেই শুধু বাজেনি তো? ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে দাসী সুরঙ্গমা যা বললো তা অতিশয় নৈরাশ্যজনক: "সেই বীণা শুনব বলেই তো তোমার কাছে আছি। অভিমান-গলানো সুর বাজবে জেনেই কান পেতে পড়ে ছিলুম।" এতসব ভণিতা ক'রে কিন্তু একবারও বললো না—হ্যাঁ আমিও শুনেছি, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, রাজা সত্যি এসে বীণা বাজিয়েছিলেন। বাস্তবিক যা ঘটলো, যা ঘটে, তা অসম্মান ; সবাই তা দেখে। মিনতির কোমল সুর কেবল স্বপ্নেই বাজে, কাতর হৃদয় ছাড়া আর-কেউ তা শোনে না।

আঘাতে-আঘাতে সুদর্শনার প্রেম পুনরুজ্জীবিত হ'লো, ব'লে উঠলো—আরো কঠিন আঘাত সইবে আমার। কিন্তু প্রতিদানে রাজার প্রেম আর সে পেলো না। শেষ সাক্ষাতে তাকে বলতে হ'লো: "প্রভু, যে আদর কেড়ে নিয়েছ সে আদর আর ফিরিয়ে দিয়ো না। আমি তোমার চরণের দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দাও।" বিশ্বচরাচরের রাজা বিশ্বকে হয়তো ভালোবাসেন, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষকে না। তবু তাঁকে ভালোবাসতে হয় কোনো প্রত্যাশা মনে না-রেখেই। এই হ'লো ভগবৎপ্রেমের রীতি (বিশ্বপ্রেম কি তার থেকে ভিন্ন-কিছু ?)। মনে হয় রবীন্দ্রনাথও স্পিনোজার মতো বলতে চাইছেন, অন্তত 'রাজা' নাটকে বলতে চাইছেন: "He who loves God cannot endeavour to bring it about that God should love him in return" ঠিক এই সুরটি 'গীতাঞ্জলি'তে শোনা যায় না। দুই বিচিত্র বীণা বাজিয়েছেন একই বীনকার, কিন্তু একই রাগিণী বাজিয়েছেন ভাববার কোনো কারণ নেই। তাছাড়া, লিরিকে নাটকে ভেদ শুধু আঙ্গিকের নয়, মনোভঙ্গিরও হ'তে পারে।

দুই

'রাজা' নাটকখানি 'গীতাঞ্জলি' পর্বের প্রায় মধ্যভাগে রচিত, কিন্তু ভাবের দিক থেকে আরো পরিণত ও দূরপ্রসারী-দৃষ্টিসম্পন্ন, পৃথিবীর বাস্তবিক অবস্থা সম্বন্ধে আরো নির্ভীকভাবে সচেতন। ঐ-পর্বের অনেকগুলি গান সুর বাদ দিলেও গীতিকবিতা হিসাবে অতীব সুন্দর ; ঈশ্বরপ্রেমের (নারীপ্রেম এবং প্রকৃতিপ্রেম যার অঙ্গীভূত)

যে কতো গোপন গভীর উৎস থেকে বেরিয়ে আসা অনাস্বাদিতপূর্ব রস রবীন্দ্রনাথ আমাদের হৃদয়গম্য করেছেন তার তুলনা নেই কোথাও। তবু বলবো তিনি ঈশ্বরের দক্ষিণ মুখটাই সে-সব গানে দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন, তাঁর বজ্রকঠিন অটল-নিষ্ঠুর চেহারাটা তখনো গীতি-রচয়িতার চোখে ঝাপসাই রয়েছে। কয়েকটি গানে অবশ্য আমরা 'নিঠুর' শব্দটি পাই, ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্র-বিদ্যুতের কথা শুনি, দরজা-জানলা সজোরে কেঁপে ওঠে, 'আঁধার ঘরের রাজা' আসেন প্রবল প্রতাপে ; কিন্তু এ-সবের মধ্যেও তিনি আসলে প্রেমিক, "নিঠুর চরণ ফেলে" আসছেন জানলেও অপেক্ষমাণা বিরহিণীর বিরহ মধুরই থেকে যায়, কঠোরের জন্য নিজের কোমল হৃদয়কে প্রস্তুত করতে হয় না।

আমার তো মনে হয় 'গীতাঞ্জলি'র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 'রাজা'র সুদর্শনা খুব ভিন্ন-হৃদয় নয়—রাজপ্রাসাদের অগ্নিকাণ্ডের আগে পর্যন্ত। কিন্তু তার পর থেকে শুরু হয় সুদর্শনার কঠিন পরীক্ষা। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সে অবশ্য এগিয়ে চলে দ্রুত যদিও ক্ষতবিক্ষত চরণ ফেলে, পৌঁছায় গীতিকবি রবীন্দ্রনাথের শেষ দশকের উপলব্ধির খুব কাছাকাছি। কাছাকাছি, কিন্তু একেবারে কাছে নয়—কারণ শেষ দশকের অনেক কবিতায় আমরা যে ট্র্যাজিক সুরটি শুনি তা সুদর্শনার মুখে শুনি না, যবনিকাপাতের পূর্বমুহূর্তের চরম আত্মদানেও না। তবু সে শেষ অবধি জানতে পারলো তার রাজা প্রকৃতির নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে, লোকসমাজের নৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে, কতো ভয়ংকর, কী নিষ্ঠুর। ঐ অটল কঠিনের প্রতি তার প্রেম কিন্তু অবিচলিতই রইলো, যদিও তার রঙ গেলো পাল্টে। গীতিকবিও তাঁর 'শেষ লেখা'য় জানতে পেরেছিলেন, "সত্য যে কঠিন", জেনেও বলতে পেরেছিলেন "কঠিনেরে ভালোবাসিলাম"। নাটকের প্রথম ও শেষ দৃশ্যের মধ্যে কালের ব্যবধান বেশি নয়, কিন্তু নায়িকার হৃদয়ের ব্যবধান অনেকখানি। তার চেয়েও বেশি হৃদয়ের ব্যবধান লক্ষ করা যায় 'গীতাঞ্জলি'র গীতিকবি এবং 'নবজাতক' কিংবা 'শেষ লেখা'র গীতিকবির মধ্যে।

রঙ্গমঞ্চে সুদর্শনার আবির্ভাব অসাধারণ নাটকীয় তাৎপর্যপূর্ণ, দর্শকের মনকে প্রথম থেকেই স্বরগ্রামের উঁচু পর্দায় বেঁধে দেয়। "আলো, আলো কই"—ব্যাকুল প্রশ্ন ও প্রার্থনা বৈদিক যুগ থেকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে আসছে, আজও তার বেদনার্ত তীব্রতা অনুপশমিত—বিশেষত রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ও গানে। মনে হয় যেন সুদর্শনার কাতর উক্তি কেড়ে নিয়ে গীতিকবি পদ্য ক'রে সাজিয়ে বলছেন : "আর রেখো না আঁধারে, আমায় দেখতে দাও।" কিন্তু দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটি অন্যদিকে নিয়ে যায় শ্রোতার ব্যাকুলতাকে : "তোমার মাঝে আমার আপনারে দেখতে দাও।" এর দু-রকম অর্থ মনে জাগে। আমার ভালোবাসা যে তুমি বুকে ধারণ করছো, কিংবা, আরো একটু দুঃসাহসিক হ'তে পারে ভক্তের স্পর্ধা—তোমার বুকেও যে আমার জন্য ভালোবাসা রয়েছে সেই কথাটা আমাকে জানতে দাও। অথবা এটা সেই বহুবিখ্যাত বৈদান্তিক মহাবাক্যের—"অহম্ ব্রহ্মাস্মি" কিংবা "যঃ

অসৌ পুরুষঃ সঃ অহম্ অস্মি”—কাব্যিক রূপান্তর হ'তে পারে। দ্বিতীয় অর্থটা অবশ্য সুদর্শনার বিদ্যাবুদ্ধির বাইরে ; আর যা-ই হোক্ সে দার্শনিক কিংবা ঐ-স্তরের মিষ্টিক নয়। অঢেল আর প্রেম এবং গগনচুম্বী তার অভিমান। তার মনে সন্দেহ নেই যে রাজাও তাকে ভালোবাসেন। সে-ভালোবাসা তিনি সর্বসমক্ষে প্রকাশ করুন—এমন বাসনা তার মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারে। কিন্তু তার মূল এবং সবচেয়ে ব্যাকুল প্রার্থনা খুবই সোজাসুজি—“তুমি আমাকে আলোয় দেখা দিচ্ছ না কেন।” সে-আলো তার অন্ধকার ঘরে জ্বলে-ওঠা ঝাড়লণ্ঠনের আলো নয়, সে-আলো নক্ষত্রখচিত আকাশের আলো, দিনান্তদৈনিক কর্মরত মানবসমাজের আলো।

“আর রেখো না আঁধারে” মনে করিয়ে দেয় অন্য-একটি সুন্দর গানের কথা—“এখনো গেল না আঁধার।” কিন্তু প্রথম গানে আছে “তোমার মাঝে আমার আপনারে দেখতে দাও” ; দ্বিতীয় গানে বলছেন প্রায় বিপরীত কথা : “এখনো নিজেরি ছায়া রচিছে কত যে মায়া।” আসলে দুই গানে দুই ভিন্ন ‘আমি’র কথা বলা হয়েছে। যে-‘আমি’কে জগদীশ্বরের বা ব্রহ্মের মাঝে দেখতে চান কবি তা নিশ্চয়ই সাধারণত যাকে আমরা ‘আমি’ বলি তার অন্তরে এবং অন্তরালে অন্য যে-‘আমি’ বাস করে সেই ‘আমি’। আর যে-‘আমি’র ছায়ায় ঈশ্বরের জ্যোতি ঢাকা প'ড়ে যায় তা এই সাংসারিক এবং ব্যবহারিক ‘আমি’, উপনিষৎ যাকে জীবাত্মা ব'লে আখ্যায়িত করেন। অনেক সমালোচক ও পাঠকের ধারণা (স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তেমন ইঙ্গিত করেছেন দু-এক জায়গায়। সুদর্শনা যতোদিন এই ছোটো ‘আমি’র বাসনা-কামনায় নিমজ্জিত ছিলো ততোদিন সে রাজাকে দেখতে পায়নি, রাজপ্রাসাদের অগ্নিদাহে এবং পিতৃগৃহের লাঞ্ছনায় যখন এই ছোটো ‘আমি’ পুড়ে ছাই হ'য়ে গেলো এবং তার ভস্মস্তূপের ভিতর থেকে প্রকাশ পেলো বড়ো ‘আমি’, তখনই তাঁর প্রেম সার্থক হ'লো, সে রাজার সঙ্গে প্রকৃত সাযুজ্য লাভ করলো। কেন এই ঔপনিষদিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে পারিনি আমি (বিশেষত ‘রাজা’র সুদর্শনার ক্ষেত্রে, ‘অরূপরতন’-এর সুদর্শনার ক্ষেত্রে তার উপযোগিতা অনেকটা স্বীকার্য), এবং সুদর্শনার অন্ধকার ঘর থেকে বাইরের আলোয় রাজার হাত ধ'রে বেরিয়ে আসার জন্য ব্যাখ্যা খুঁজেছি—এই প্রবন্ধের প্রথম খণ্ডে তার বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। অবশ্য এই একান্ত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাকে ‘রাজা’র রাজ্য থেকে আমি একেবারে পাত্‌তাড়ি গুটিয়ে দেশান্তরিত করতে চাই না ; বরঞ্চ মনে করি যে তার অস্পষ্ট আভাস নাটকটির অর্থগৌরব আরো বাড়িয়ে তোলে।

রবীন্দ্রনাথের ভক্তিসাধনার একটা রূপ যেমন আমরা দেখতে পাই সুদর্শনার দুঃখদগ্ধ লাঞ্ছনাবিদ্ধ পতিপ্রেমের ক্রমবিকাশে, তেমনি আর-একটা রূপ দেখি ঠাকুরদার অবিক্ষুব্ধ আত্মসমাহিত রাজভক্তিতে। অবশ্য ঠাকুরদাকে নাটকে যখন আমরা পাই তখন তাঁর সাধনা শেষ পর্বে পৌঁছেছে, বলতে গেলে তিনি তখন সিদ্ধপুরুষ, রবীন্দ্র-মানসের আদর্শপুরুষ। একাধারে তিনি প্রেমিক জ্ঞানী এবং

শেষ দৃশ্যে কর্মী। অথচ সর্বক্ষণ পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সাধারণ সব নগর ও গ্রামবাসী মেয়ে-পুরুষের সঙ্গে, ছোটো ছেলেমেয়েদের দলের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টায়, নাচে গানে মশগুল—যেন তিনি কিছুই নন, কেউই নন; কাউকে বুঝতে দেন না জগতের রাজার সঙ্গে তাঁর নিগূঢ় বন্ধুত্বের সম্পর্ক। তাই নাটকের শেষ অঙ্কে যখন সুদর্শনার পিতা তাঁর পতিগৃহ-ছাড়া কন্যার পাণিপ্রার্থী সাতজন রাজার মিলিত সৈন্য-বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে তাঁদের হাতে বন্দী, তখন রাজা স্বয়ং এলেন সুদর্শনা ও তার পিতাকে উদ্ধার করতে, তখন সবাইকে আশ্চর্য ক'রে দিয়ে ঠাকুরদা ঘোষণা করলেন রাজার সেনাপতি তিনি, বিজয়ী রাজাদের যুদ্ধে আহ্বান করতে এসেছেন। আশ্চর্য আমরা দর্শকরা পাঠকরাও কম হই না, কারণ এ-যাবৎ—তার মানে প্রায় সমস্ত নাটক জুড়ে—ঠাকুরদাকে আমরা চিনেছি জ্ঞানীরূপে, কবিরূপে : নাটকের একেবারে শেষে এসে হঠাৎ উপলব্ধি করি তাঁর সম্পূর্ণ ভিন্ন আর-এক রূপ; দেখি তাঁকে শুধু সাধারণ কর্মীরূপে নয়, কর্মের মধ্যে যেটি সবচেয়ে চূড়ান্ত কর্ম—যুদ্ধ—সেই যোদ্ধবেশে।

অমঙ্গল সম্বন্ধে দুই ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় এই দুই ঠাকুরদার মধ্যে। অমঙ্গল যেমন দুঃখের বেশে আসে—সন্তানের মৃত্যু, কঠিন দারিদ্র্য ইত্যাদি ঘটিত দুঃখ—সেখানে ঠাকুরদার প্রতিক্রিয়া প্যাসিভ; প্রশান্ত চিত্তে তিনি বলেন : সবই হাসি মুখে মেনে নিতে হবে কারণ সবই তাঁর বন্ধুর দান, "ছেলে তো গেলই, তাই বলে কি ঝগড়া করে রাজাকেও হারাব। এমনি বোকা!" এ-সব দুঃখকে দৈবকৃত দুঃখ ব'লে ধরা হচ্ছে। অবশ্য আমরা, আজকের দিনের মার্কস্-পড়া পাঠকেরা বলতে শিখেছি যে দারিদ্র্য দৈব-কৃত ব্যাপার নয়; একজন বা একশ্রেণীর মানুষের দারিদ্র্যযন্ত্রণার জন্য অন্য-একজন বা একশ্রেণীর মানুষের স্বার্থপরতা দায়ী, এবং পাপকে হাসিমুখে মেনে নেওয়াও পাপ। কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয়ে ঠাকুরদার গভীর জ্ঞান থাকলেও মার্কসীয় সমাজবাদ বিষয়ে ছিলো না; নাট্যকারেরও বোধহয় 'রাজা'-রচনাকালে সমাজচেতনা মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিপুষ্ট ছিলো না। সে যা-ই হোক, ঠাকুরদা বলতে চাইছেন সেইসব দুঃখের কথা যা অপ্রতিরোধ্য ও অপ্রতিকার্য; বিজ্ঞানের যতোই উন্নতি হোক, সমাজের যতোই বিবর্তন বা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটুক, বেশ-কিছু দুঃখ থেকেই যাবে (যথা জরা ও মৃত্যু, বিশেষত প্রিয়-জনের মৃত্যুশোক) যা মানবিক পরিস্থিতির অপরিহার্য অঙ্গ। এ-সব দুঃখ হাসিমুখে সহ্য করাই ভালো। তা নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে (বাস্তবিক বা কাল্পনিক বিধাতার সঙ্গে) ঝগড়া করতে গেলে এ-দুঃখ বাড়বে বৈ কমবে না। আধুনিক সাহিত্যের বেশ-কিছু অংশ কি এই নিরর্থক ঝগড়ারই সাহিত্য নয়?

ঠাকুরদার এই কথাগুলি রূপকের ভাষায় বলা হ'লেও তার মর্মার্থটা কবি-কল্পনা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া নাস্তিকের পক্ষেও সম্ভব নয়। অন্য যে-কথা তিনি বলেছেন তা আরো জ্ঞানগম্ভীর ও শিল্পগর্ভ। কথাটি সবচেয়ে সুন্দর ক'রে বলা হয়েছে

নাটকের মূল গানে—"মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে।" এই গানে যে-দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বদর্শন ব্যক্ত, ইতিপূর্বেই তার আলোচনা করেছি।

কিন্তু অমঙ্গল (evil) যখন পাপরূপে সামনে আসে তখন তাকে বন্ধুর দান ব'লে প্রফুল্ল চিত্তে মেনে নেওয়া যায় না। অথবা যায় হয়তো, তবে সঙ্গে-সঙ্গে আর-একটি প্রতিক্রিয়াও জাগায় সে—অমঙ্গল। আমাদের কর্মশক্তির সামনে তা একটি চ্যালেঞ্জ। বন্ধুরই আদেশে তখন ঠাকুরদাকে লৌহবর্ম ও ধারালো তরবারি ধারণ করতে হয়, অমঙ্গলের সঙ্গে প্রাণপণ যুদ্ধ করতে হয়। অশুভ শক্তিকে পরাস্ত ক'রে তবেই ঠাকুরদা আবার ধর্ম ফেলে তাঁর বাসন্তী রঙের উড়ানি গায়ে দিয়ে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বসন্তোৎসবে যোগ দিতে পারেন। অর্থাৎ নিজের এবং পরের চরিত্রদোষ-ঘটিত অমঙ্গলের সঙ্গে যে-লড়াই সবে শুরু (খুব সম্প্রতি নয়, জ্ঞাত ইতিহাসমতে গৌতম বুদ্ধ ও জারাথুস্ত্রার আমল থেকে শুরু) এবং যে-লড়াইয়ে দেশে-দেশে কালে-কালে সফলতার মধ্য দিয়ে আমরা ক্রমশ মানুষ, 'মরাল' (নীতিবোধ-বিশিষ্ট) মানুষ হয়ে উঠি; সে-লড়াইয়ের ময়দানে ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ নন, তার সমূহ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন মানুষেরই উপর। যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার এবং ক্রমশ সে-যুদ্ধে জয়লাভ হবার উপযুক্ত জড়প্রাকৃতিক পরিবেশ অবশ্য রয়েছে। তাকে ভগবানের সৃষ্টি বললে বলতেও পারেন। বিশ্বময় প্রাকৃতিক বিধান (law of Nature) ভগবানের সৃষ্টি, কিন্তু মানব-সমাজে মঙ্গল-বিধান (moral order) মানুষকেই রচনা করতে হবে। মঙ্গলবিধাতা ভগবান নন, মানুষ; এবং দেখাই যাচ্ছে এই বিধাতৃ পর্বে মানুষের কৃতিত্ব এখনো পর্যন্ত যৎসামান্যই। মহামানব কয়েকজন "কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে" দিয়ে ধরায় এসেছেন বটে, কিন্তু স্বকীয় মানবমহিমার প্রদীপ বেশি লোকের হাতে জ্বালিয়ে দিয়ে যেতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় পূর্ণমানবের রথ অন্তরীক্ষে ধাবমান, এখনো মানবেতিহাসের পথে এসে পৌঁছোয়নি। পূর্ণমানবের আদর্শ মানুষমাত্রকে চুম্বকের মতো অল্পবিস্তর টানছে বটে, কিন্তু সে টানকে মনে-প্রাণে স্বীকার ক'রে তার দিকে এগিয়ে যাওয়া বা তাকে অগ্রাহ্য ক'রে বিপথগামী হওয়া, অথবা কোনোদিকে চলার বদলে জীবনটাকে স্রেফ শুয়ে ব'সে হেলায় কাটানো—সবই মানুষের ইচ্ছাধীন। কাব্য ক'রে বলা যায়—"এমনি মায়ার ছলনা"; ঈশ্বরের লীলাও বলা যেতে পারে তাকে।

একই ব্যক্তির পক্ষে অমঙ্গলের প্রতি তথা সারা জগৎ-সংসারের প্রতি দুই বিপরীত না-হ'লেও খুবই বিভিন্ন মনোপ্রতিন্যাস সর্বদা ধারণ ক'রে দুই মার্গে—ধ্যানমার্গে (জ্ঞান ও শিল্প যার দুই প্রত্যঙ্গ) এবং কর্মমার্গে—নিজেকে সার্থক ক'রে তোলা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সেই অসম্ভবের সাধক এবং প্রতীক ঠাকুরদা। নাটকের সংলাপে ও ঘটনাপ্রবাহে রানী সুদর্শনা এবং দাসী সুরঙ্গমা যেমন রক্ত-মাংসের মানুষরূপে প্রতিভাত, ঠাকুরদা মোটেই সে-রকম নয়; মানবিক পরোৎ-

কর্মের আদর্শরূপেই তাঁকে আঁকা হয়েছে, বাস্তব জীবন থেকে বেশ খানিকটা ঊর্ধ্বে তাঁর অবস্থান।

রবীন্দ্রনাথ যতো বড়ো ধ্যানযোগী হ'ন না কেন, তিনি কর্মক্ষেত্র থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখেননি। তবে এ-কথা মানতেই হবে যে ধ্যানীরূপে, বিশেষত শিল্পী-রূপেই, তিনি পৃথিবীর মহত্তমদের অন্যতম ; কর্মীরূপে তাঁর শক্তি ও সার্থকতা শ্রদ্ধেয় হ'লেও লেনিন, গান্ধি প্রভৃতি কর্মবীরদের পাশে তাঁর স্থান হ'তেই পারে না। তবু রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বেদনা বোধ করেছেন এই ভেবে যে মানবত্বের একটা দিকেই র'য়ে গেলো তার যতো সাধনা ও সিদ্ধি, অন্যদিকে তাঁর সার্থকতা তুলনায় অকিঞ্চিৎকর :

মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে
সে উদ্ধার করে জীবনকে
সেই রুদ্র মানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি
অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে যাচ্ছি চলে।

('পত্রপুট' ১২)

কিন্তু এতে অসম্মানের কিছু নেই। যে পূর্ণতা তিনি চাইছেন এ-কবিতায় তা দেবতারই সাধ্য, রক্তমাংসের মানুষের শক্তির বাইরে। ঠাকুরদাব চরিত্রে এ-পূর্ণতা তিনি আরোপ করেছেন, এবং প্রধানত এইজন্যেই তাঁকে নাটকে একটু অবাস্তব ঠেকে।

আমার বক্তব্যটা বোধহয় পরিষ্কার হয়নি ; একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। আর-একটি কথাও খানিকটা বিস্তারিত আলোচনা-সাপেক্ষ। কেন জ্ঞানী ও কবিকে আমি 'ধ্যানী' আখ্যা দিয়ে এতটা কাছাকাছি এনে ফেলেছি, এবং কেনই-বা দু-জনের থেকে কর্মী মানুষকে বেশ-খানিকটা দূরবর্তী মনে করি। বিশেষত বুঝিয়ে বলা দরকার এইজন্য যে হালের অনেক কবির ধারণা জ্ঞান এবং কবিতা একেবারে ভিন্ন জাতীয় পদার্থ, জ্ঞানের স্পর্শ লাগলে কবিতা হয়ে যাবে অস্পৃশ্য। পক্ষান্তরে, অনেক জ্ঞানীও ভাবেন কবি সত্যদ্রষ্টা নন, স্বপ্নদ্রষ্টা। বুঝিয়ে বলতে গেলে তত্ত্বকথা কিছু এসে পড়বে। আশা করি পাঠক ধৈর্য হারাবেন না।

তিন

জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদের জীবনধারণ এবং জীবনমানের উন্নতিসাধনের কাজে লাগে। আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বেকনের একটি বাক্য—**knowledge is power**—স্কুলপাঠ্য পুস্তকে স্থান পেয়েও সারবত্তা হারায়নি আজও। প্রাকৃতিক প্রচণ্ড ভয়াবহ শক্তিসমূহের (বজ্রবিদ্যুৎ, ঝড়তুফান, অতিবৃষ্টি ও খরা, অগ্ন্যুৎপাত ও জলপ্লাবন ইত্যাদির) সম্মুখে হাঁটু গেড়ে পুষ্পাঞ্জলি কিংবা পশুবলি দেওয়ার, তুকতাক মন্ত্রতন্ত্র করার যুগ গেছে ; আমরা জানতে পেরেছি যে প্রকৃতির বুকে

খেয়ালখুশি দয়ামায়া নিষ্ঠুর-কঠিন ব'লে কিছু নেই। প্রাকৃতিক শক্তিকে পূজায় তুষ্ট ক'রে ফল পাওয়া যায় না, তাকে জ্ঞানের দ্বারা বশীভূত ক'রে কাজ হাসিল করা যায়। প্রকৃতি সম্পূর্ণ নিয়মমতো চলে, তার একচুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই। সে-নিয়মশৃঙ্খলা বিষয়ে আমাদের জ্ঞান (যার নাম বিজ্ঞান) যতোই সঠিক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ হবে, ততোই প্রকৃতি হবে আমাদের দাসী। বেকনের ভবিষ্যদ্বাণী অনেকাংশে সফল হয়েছে। তিনি অবশ্য তিন শতাব্দী পূর্বে ভাবেননি যে আমরা ইতিমধ্যে পরমাণু বোমাযুক্ত দূর পাল্লার মিসাইল তৈরি ক'রে পৃথিবীর অপরপ্রান্তের লক্ষ-লক্ষ নরনারীকে চোখের পলকে ছাই এবং দেশকে দেশ উজাড় ক'রে দিতে পারবো। আরো দু-চার দশক পরে তো আমাদের ধনকুবেররা চন্দ্রালোকে নৌকাবিহার না-ক'রে মধুযামিনী যাপন করবেন চন্দ্রপৃষ্ঠেই।

এই বিজ্ঞানকে বলি ফলিত বিজ্ঞান। তার মূল্য অনস্বীকার্য। ফলিত-বিজ্ঞান থেকে বঞ্চিত হ'লে আমরা ফিরে যাবো লক্ষ বৎসর পূর্বের গুহাবাসী পুরাপ্রস্তর-ব্যবহারী আদিম মানুষের যুগে, কিংবা তারও পূর্বে। কিন্তু ফলিত-বিজ্ঞান স্বাশ্রয়ী নয়, পরাশ্রয়ী; আশ্রয় ক'রে আছে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের উপর। আমাদের প্রতিবেশকে, শুধু প্রতিবেশকে কেন, দূরতম নক্ষত্র নীহারিকাকে এবং সেইসঙ্গে নিজের অন্তর্নিহিত সত্তাকে জানার স্পৃহাও বহু প্রাচীন। উপনিষৎকারদের বিশেষ সাধনা ছিলো নিজেকে জানা—আত্মানং বিদ্ধি; সক্রেটিসেরও তাই—know thyself। কিন্তু প্রাক্-সক্রেটিস ভাবুকরা—তাঁদের দার্শনিক বলবো কি বৈজ্ঞানিক, ঠাহর করা শক্ত—জগতের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধানী ছিলেন। সে-জানা কেবল জানার আনন্দেই জানা। সমগ্র দ্যাবাপৃথিবীর সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করার আনন্দেই অজ্ঞান-অন্ধকার ভেদ করার জন্য থেলিস থেকে আইনস্টাইন পর্যন্ত কতো মহা-বিজ্ঞানী অক্লান্ত বিনিদ্র তপস্যা ক'রে গেছেন, ক'রে চলেছেন।

জ্ঞানের বেলা যেমন, সাহিত্যের বেলাও তেমন। একদিকে আছে বিশুদ্ধ সাহিত্য, রসানন্দ ছাড়া সে-সাহিত্যের কাছ থেকে আর কিছুই চাই না আমরা। কিসের আনন্দ? জীবিকার অন্বেষণে এবং ক্রমশ কঠিন-হয়ে আসা জীবনসংগ্রামে আমাদের সকলের দিন কাটে, বছর কাটে, মেজাজ হয়ে ওঠে লড়িয়ে, স্বার্থবোধ তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হ'তে থাকে, চিন্তা ভাবনা বেদনা হয় একান্ত আত্মকেন্দ্রিক। আত্মনিমগ্নতার অন্য পিঠ হচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবোধ। এই মানসিক একাকীত্ব আমাদের সুকুমার হৃদয়বৃত্তিকে পীড়া দেয়। শিল্প-সাহিত্যের মধ্যে আছে সে-পীড়ার উপশম। 'সাহিত্য' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—সাহিত্য তা-ই যা জগতের সঙ্গে আমাদের নিবিড় সহিতত্ব বা সংযোগ ঘটায়। গভীর অথচ অনুত্তরঙ্গ তার আনন্দ, তার চেয়ে পরিশুদ্ধ আর-কোনো আনন্দের কথা আমরা জানি না। প্রাচীনেরা ব্রহ্মোপলব্ধির সঙ্গে তুলনা ক'রে কাব্যরসোপলব্ধিকে বলেছিলেন, "ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর"।

সাহিত্যের অন্য পিঠে আছে ফলিত সাহিত্য। থাকবে না-ই বা কেন? প্রাচীনকালে সাহিত্যের মাধ্যমে ধর্মশিক্ষা নীতিশিক্ষা দেওয়া হ'তো, এমন-কি-দার্শনিক তত্ত্বকথাও শেখানো হ'তো, যেমন উপনিষদের শ্লোকে, প্লেটোর ডায়ালগ-এ। ইদানীং রাজনীতিক প্রয়োজনে সাহিত্যের ব্যবহার দেখি। শ্রেণীচেতনা, শ্রেণীসংগ্রাম, সমাজবিপ্লব ইত্যাদির উপযুক্ত মনোভূমি তৈরি করা এবং বিপ্লবের পর শ্রেণীহীন সমাজগঠনে অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা জাগানো—এমনতর সব মহৎ কাজের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সাহিত্যিকরা, কোথাও স্বেচ্ছায়, কোথাও-বা রাষ্ট্রবিধাতাদের আদেশে। জবরদস্তি অবশ্য নিন্দনীয় এবং শেষ পর্যন্ত অফলপ্রসূ। কিন্তু স্বেচ্ছায় ও সোৎসাহে যদি সাহিত্যিকরা তাঁদের বহু যত্নে-গড়া এই শক্তিশালী মাধ্যমকে শ্রেণীযুদ্ধ ও সমাজগঠনের মোক্ষম অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেন তবে তাতে দোষের বা নিন্দার কিছু নেই। মহৎ কাজের মহান অস্ত্র হওয়ায় সাহিত্যের অগৌরব হ'তে যাবে কেন? অগৌরব হয় তখনই যখন এইসব সাহিত্যরথীরা কিংবা তাঁদের সারথী রাজনৈতিক নেতারা ফরমান জারি করেন—শুধু এটাই সৎসাহিত্য, রাষ্ট্রিক যত্নে ও সমাদরে লালনীয় সাহিত্য; বাদবাকী সব লেখাই অসৎ, ঝুটা, বুর্জোয়া, ফ্যাশিস্ট, ইত্যাদি; অতএব শুধু নিন্দনীয় নয়, কঠোর হস্তে দমনীয়।

বিশুদ্ধ বিজ্ঞান, এমন-কি তার বিশুদ্ধতম শাখা বিশুদ্ধ গণিত, কোথাও অবদমিত হয়েছে ব'লে শুনিনি। তার প্রধান কারণ অবশ্য এই যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ ও ফলিত বিজ্ঞানের মধ্যবর্তী সীমান্তরেখা স্থির নয়, সর্বদাই চলনশীল, কখনো-বা ধাবমান। আজ যেটা বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের অন্তর্গত, অর্থাৎ জ্ঞানপিপাসা মেটানো ছাড়া মানুষের অন্য-কোনো কাজে লাগছে না, তা কালই ফলিত হয়ে কোনো ভয়াবহ আয়ুধ, মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ কিংবা নিছক বিলাসদ্রব্য উৎপাদনের কাজে লেগে যাবে কিনা কেউ বলতে পারে না। কাজে কাজেই কী সমাজবাদী কী পুঁজিবাদী, কোনো দেশে বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিকরা নিগৃহীত নন, রাষ্ট্রগুরু বা দলনায়কদের, হুকুমবরদারী করতে হয় না তাঁদের, বরঞ্চ তাঁরা জামাই-আদরই পেয়ে থাকেন। কিন্তু এ-আদরের মধ্যে অপমান প্রচ্ছন্ন। একনিষ্ঠ প্রতিভাদীপ্ত সাধনার যে মহৎ উদ্দেশ্য তাঁদের কাছে প্রতিভাত এবং তাঁদের অনুক্ষণ প্রেরণা জোগায়, সেটি হচ্ছে জগতেরই সত্যরূপকে জানা এবং সেই জানার মধ্যে আনন্দলাভ করা। এ-উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত হয়েও সামাজিক, কারণ জ্ঞানীদের সত্যোপলব্ধি এবং জ্ঞানানন্দ সকলের জন্যই, কোনো বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকদের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। জ্ঞানীর কাজের এই আধ্যাত্মিক মূল্য অস্বীকার বা স্বল্পায়িত ক'রে তাঁকে প্রযুক্তিবিদ্যার জোগানদার ভাবাকেই আমি বলতে চাই জ্ঞানীর অবমাননা।

সে যা-ই হোক্, আপাতত আমার আলোচনার বিষয় বিশুদ্ধ জ্ঞান ও বিশুদ্ধ সাহিত্যই।

জ্ঞানী এবং কবি। 'কবি' শব্দ দ্বারা আমি মহাকাব্য-রচয়িতা ও নাট্যকার

এবং আধুনিককালের কথাসাহিত্যিক সবাইকে বোঝাতে চাই (প্রসঙ্গক্রমে ব'লে রাখি যে আমার বিবেচনায় লিরিক বা গীতিকবিতা সাহিত্যের ক্ষুদ্র এবং গৌণ বিভাগ; জানি-না কেন তা হালের সমালোচনায় এতখানি মান ও স্থান অধিকার ক'রে বসেছে)। জ্ঞানী এবং কবি দু-জনই এক অনেকান্ত জগতের দুই ভিন্ন রূপ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অবলোকন করছেন, স্বকীয় চিত্তের ঈষদাবর্জিত মুকুরে প্রতিবিম্বিত করছেন। একজন বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে চান তার যতোটা বোধগম্য, যতোটা সুশৃঙ্খলিত ও নিয়মানুগ। সে বোধগম্য রূপটাকে আমরা বলি সত্য। অন্যজন হৃদয় দিয়ে অনুভবের মধ্যে বিশ্বভুবনকে পেতে চান। এই অনুভূত রূপটাকে আমরা বলি সুন্দর। ব'লে রাখা ভালো যে বুদ্ধির কাজ অর্থাৎ জ্ঞানান্বেষণ কখনোই একেবারে অনুভূতি-বর্জিত নয়; এবং অনুভূতির প্রকাশ অর্থাৎ বিশুদ্ধ কাব্যও কখনো বুদ্ধি ও বুদ্ধিগ্রাহ্য জ্ঞানের স্পর্শ এড়াতে পারে না। মাত্রার তারতম্য নিয়ে কথা; সে-তারতম্য বেশি হ'লে মাত্রাভেদ গুণভেদে পরিণত হয়, অন্তত প্রতিভাত হয়। দ্বিতীয়ত 'সুন্দর' কথাটা এখানে খুব বড়ো অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে, তার মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অনেক সীমিত কুৎসিতের স্থান আছে। সব খণ্ড-খণ্ড সুন্দরের মধ্যে এই পরম সুন্দরের ইঙ্গিত থাকে, সব খণ্ড সত্যের মধ্যে এই পরম সত্যের আভাস। প্রথমটা প্রতিফলিত হয় আমাদের শিল্পে-সাহিত্যে, দ্বিতীয়টা দর্শনে-বিজ্ঞানে।

বরঞ্চ আত্মীয়তা আরো নিকট। এ-কথা কি অস্বীকার করা যায় যে আইনস্টাইনের বিশেষ ও সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ, শ্রোডিঙর হাইসেনবের্গ প্রভৃতির পরমাণুবাদ, জড়জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-তত্ত্ব, এমিবার মতো এককোষী জীব কিংবা আরো পেছিয়ে গেলে ভাইরাসকণা (যাকে জীবপদার্থ বলবো কি জড়পদার্থ, ঠাহর করা শক্ত) থেকে মানুষ পর্যন্ত প্রাণধারার ক্রমবিবর্তনবাদ—এ-সবও 'মোনালিসা' কিংবা 'শ্যামা' থেকে ঈষৎ ভিন্ন অর্থে কিন্তু সদর্থে সুন্দর, বোধগম্যতার স্বাদে মেশায় অগম্যের মাধুরী, পরিতৃপ্ত করে শুধু বুদ্ধিকে নয়, রহস্যবোধকেও, একটু ব্যাপকভাবে বলতে গেলে, রসবোধকেও। আবার কোনো সাহিত্যসৃষ্টিতে যদি সত্যের কতকটা তির্যক কিন্তু অন্তর্গূঢ় উদ্ভাস না-থাকে তবে তা মহৎ সাহিত্যের মর্যাদা পায় না, সৌখিন বা ডেকরেটিভ আর্টের কোঠায় পড়ে, জড়োয়া গয়নার মতন নয়নাভিরাম হয়েও জড়োয়া গয়নার মতনই অকিঞ্চিৎকর থেকে যায়। উদাহরণত, সত্যেন দত্তের কিছু কবিতার উল্লেখ করা যায় এখানে। ছন্দের টুং-টাং শুনতে বেশ লাগে, কিন্তু প্রায়শই তার চেয়ে নিবিড় কোনো অনুভূতি জাগায় না আমাদের মনে। "জাগিয়ে দিয়ে সকল আকাশ পূর্ণতা বিস্তারো"—রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তাঁর হৃদয়েশ্বরকে সম্বোধন ক'রে; তাঁরই হৃদয়ের প্রকাশ যে-সব মহৎ কাব্যে ও গানে, তাকে সম্বোধন ক'রেও বলতে পারতেন। বললে আমাদের মনের কথাটা বলতেন। কিন্তু "ইলসে গুঁড়ি! ইলশে

শুঁড়ি। ইলিশ মাছের ডিম" কিম্বা "ঝর্ণা, ঝর্ণা, সুন্দরী ঝর্ণা"-র লেখককে সম্বোধন ক'রে আমরা সে-কথা বলতে পারি না, ভাবতেও পারি না।

কবিতার সত্য অবশ্য বিজ্ঞানের সত্য থেকে ভিন্ন; সরেজমিন তদন্ত ক'রে অঙ্ক ক'ষে বা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে তা সাব্যস্ত করা যায় না। পাঠকের পরিণত পরিশীলিত হৃদয়ের গভীরে যদি সাড়া জাগে তবে সেই হৃদয়ের স্বাক্ষরেই কবির উপলব্ধি সত্যের মর্যাদা লাভ করে। ডেকরেটিভ আর্ট—যার একমাত্র কাজ চোখ বা কানকে খুশি করা—কোনো প্রকার সত্যের দাবি করতে পারে না। তার সৌন্দর্যও উপরিতলের সৌন্দর্য, গভীরতা নেই তাতে।

আগেই জানিয়েছি জগতের সৌন্দর্য আমরা সম্ভোগ করি তার কুশ্রীতা-কদর্যতাকে বাদ দিয়ে নয়। এফ. আর. লীভিস্ যদি ব'লে থাকেন যে কীট্স-এর সুন্দরের ধ্যান ছিলো অসুন্দরকে বেখাপকে বেসুরকে আড়ালে রেখে, তবে তিনি কীট্সকে ছোটো ক'রে দেখেছেন। আমার বিচারে এই ভাগ্যহত ক্ষয়রোগগ্রস্ত যুবা আরো উঁচুদরের কবি। তিনি জীবনের "**The weariness,the fever,and the fret**" মর্মে-মর্মে বোধ করেছিলেন, চোখের সামনে দেখেছিলেন নিজের ছোটো ভাইকে অসহায় যন্ত্রণায় তিলে-তিলে ক্ষয় হ'তে—"**Where youth grows pale and spectre-thin and dies**"। তাঁর কবিতায় অমঙ্গলবোধ ঈষৎ প্রচ্ছন্ন থাকলেও গভীর, সমগ্র মানবজাতির যন্ত্রণায় তাঁর হৃদয় ছিলো অনুকম্পিত। রবীন্দ্রনাথের, বিশেষত শেষ পর্বের রবীন্দ্রনাথের, বেলা এ-কথা আরো সত্য, এবং সে-সত্যের প্রকাশ আরো ব্যাপক ও বিচিত্র। 'রোগশয্যায়'-এর ২১ সংখ্যক কবিতাটির মর্মার্থ সংহত হয়েছে দুটি পঙ্ক্তিতে:

> **লক্ষ কোটি গ্রহতারা আকাশে আকাশে**
> **বহন করিয়া চলে প্রকাণ্ড সুষমা।**

"প্রকাণ্ড সুষমা" ইংরেজি সাব্লিমিটির অনুরণন জাগায় মনে—যার উপাদানে **awe** এবং **majesty** দুই-ই বিধৃত। সত্যের মুখের উপর থেকে একটার পর একটা হিরণ্ময় আবরণ উন্মোচন ক'রে সব-কিছুকে স্বীকার ক'রে, একপ্রকার বৈরাগ্য-মিশ্রিত অনুরাগের গেরুয়া রঙে রাঙিয়ে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পৌঁছেছিলেন তাঁর কাব্য-সাধনার শেষ পর্যায়ের ট্র্যাজিক আনন্দে।

আমি বিশ্বাস করি যে সত্যান্বেষী এবং কবি উভয়ের লক্ষ্য মানবিক ও প্রাকৃতিক জগতের সব-কিছুকে তার সমগ্র স্বরূপে দেখা। সমগ্রকে দেখতে হ'লে একটু দূর থেকেই দেখতে হয়; খুব কাছ থেকে খণ্ড-বিশেষকেই দেখা যায় এবং বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখা যায়। গাছ থেকে আপেল ফল পড়লো মাটিতে, এটা সত্য কথা কিন্তু তুচ্ছ সত্য। শুধু একটি আপেল নয়, সব-কিছুই মাটির দিকে পতনশীল। চন্দ্রও পৃথিবীর দিকে পড়ছে এবং পৃথিবী সূর্যের দিকে। সূর্যের দিকে এই টান এবং একটি প্রাথমিক ট্যান্জেন্শাল গতিবেগের যোগফল হচ্ছে সৌরমণ্ডলের ন-টি গ্রহের উপ-

বৃত্তাকার কক্ষপথ। গাছ থেকে একটি পাকা ফল প'ড়ে যাওয়া সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষগোচর দৈনন্দিন ঘটনা। এই ক্ষুদ্র ঘটনাকে মহাজাগতিক মাধ্যাকর্ষণতত্ত্বের প্রেক্ষিতে দেখা হচ্ছে আরো বড় সত্য, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে দেখা সত্য। বিজ্ঞানীর চিরন্তন চেষ্টা এমনি বড়ো ক'রে দেখা, প্রত্যেকটি ঘটনাকে একটি বৃহৎ নিয়মের দৃষ্টান্তরূপে দেখা, এবং সেই নিয়মকে আরো বৃহত্তর নিয়ম বা তত্ত্বের অঙ্গীভূত করা। এমনিভাবে যখন তিনি যে-কোনো বিচ্ছিন্ন তথ্যকে সমগ্র জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্যযুক্ত ক'রে এবং সেই তথ্যের সীমিত রূপ-রেখার মধ্যে যেন সমগ্র বিশ্বজগতের স্বরূপটিকে প্রতিফলিত ক'রে দেখেন তখনই তাঁর দেখা সার্থক, তিনি সত্যদ্রষ্টা। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবশ্য সমন্বয়ের উপলব্ধি বুদ্ধি-নির্ভর।

কবির দৃষ্টি বিশেষকে নিয়েই পুলকিত বা বেদনার্ত। তিনি বিশেষের মধ্যে তার অন্তর্নিহিত অনন্য সত্যের রূপটি ঈষৎ উদ্ঘাটন করতে চান, গান বাঁধতে চান তারই ছন্দে; সাধারণ নিয়ম বা তত্ত্বের খোঁজ করেন না; বিমূর্ততার (abstraction-এর) সঙ্গে তার জন্মের মতো আড়ি। কিন্তু বিশেষ—হোক্ তা কোনো-এক বিকেলের শারদাকাশে দেখা রামধনু, কোনো বিজন সন্ধ্যার ঘনায়মান প্রদোষান্ধকারে শোনা বুলবুলির গান, মেঠো পথের একপাশে প'ড়ে-থাকা পশুর কঙ্কাল, কিংবা গভীর রাত্রে রোগীর শয্যাপাশে একজন স্নেহব্যাকুলা শুশ্রূষাকারিণীর জাগ্রত আবির্ভাব—তার বিশেষত্ব ক্ষুদ্র চতুঃসীমানার মধ্যে আবদ্ধ নয়, তা কাব্যিক বিশেষ, অর্থাৎ তা স্বধর্মত ইঙ্গিতময়, ব্যঞ্জনাঘন। কিসের ব্যঞ্জনা? প্রথম স্তরে অবশ্য সেই অভিজ্ঞতার অভিঘাতে কবির মনে জেগে-ওঠা সূক্ষ্ম ও জটিল আবেগ পুঞ্জেরই ব্যঞ্জনা। কিন্তু আবেগ অন্তরে অবস্থান করলেও বহিরাশ্রয়ী ব্যাপার, এবং তার আশ্রয় কাব্যোক্ত ঐ ছোটো সীমিত অনেকাংশে কাল্পনিক বস্তু বা ঘটনামাত্র নয়। কী তবে? এটুকু বলা সহজ যে ঐ বিবৃত নির্দিষ্ট বিশেষকে ছাড়িয়ে সে-ইঙ্গিত বহুদূরে প্রসারিত, বহুদূরে সংবাদবহ। "The poet speaks to us of one thing, but in this one thing there seem to lurk the secret of all." কবিও চান জাগতিক সমন্বয় উপলব্ধি করতে, গ্রীশান ভস্মাধারের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডকে দেখতে। কিন্তু দূরবীক্ষণের ভিতর দিয়ে নয়; হৃদয় দিয়ে, কল্পনার কম্পমান প্রদীপশিখার আবছা আলোয়।

দূরে কোথায় দূরে দূরে
মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে—

শুধু কবির মন নয়, জ্ঞানান্বেষীর মনও। এইখানে আমি সত্যের সঙ্গে সৌন্দর্যের সাধর্ম্য লক্ষ্য করি।

ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য নিয়ে কর্মী-রাষ্ট্রবিপ্লবী, সমাজহিতব্রতী বা কুষ্ঠরোগীর শুশ্রূষাকারী ব্যতিব্যস্ত নন। তাঁর কাজের জন্য, উপস্থিত প্রয়োজন সাধনের জন্য, যতোটুকু দেখা দরকার তার বাইরে তিনি তাকাতে নারাজ। মিথ্যাকে আঁকড়ে

ধরলে তাঁর কাজ চলে না অবশ্য, কিন্তু ছোটো সত্যকে নিয়ে তাঁর কাজ চলে, তাতেই কাজ বেশি ভালো চলে। বড়ো সত্যের কথা ভাবা তাঁর পক্ষে সময় ও শক্তির অপব্যয়। মঙ্গলসাধন যাঁর ব্রত তিনি মিথ্যাশ্রয়ী নন, তবে ছোটো সত্যের ক্ষুদ্র আয়তনের উপরই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। তাঁর পক্ষে দৃষ্টির সংকোচটাই প্রয়োজনীয়; খুব বেশি প্রসার কর্মজীবনে বিঘ্ন ঘটাবে। কর্মীর মনও যদি দূরে-দূরে সকল দেশ পেরিয়ে ঘুরে বেড়াতে শুরু করে তবে কাজ এগোয় না। ধ্যানী থাকুন আপন খেয়াল ধ'রে। এমন 'খ্যাপা'র সংখ্যা অল্পই হবে সমাজে।

সত্য ও সুন্দরের সঙ্গে শিবের নামটিও যুক্ত, কিন্তু শিব ভিন্ন মন্দিরের দেবতা, ভিন্ন উপচার দিয়ে তাঁর পূজা সম্পন্ন হয়। সত্য এবং সুন্দরের সাধক, অর্থাৎ জ্ঞানী এবং শিল্পী, উভয়ই ধ্যানী (contemplative) মানুষ; শিবের পূজারী সামাজিক কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ, মঙ্গলকর্মই তাঁর ব্রত, কর্ম-মার্গই তাঁর পন্থা। বলা বাহুল্য, এই অনুষঙ্গে শিবকে আমি কেবলমাত্র মঙ্গলের দেবতারূপেই কল্পনা করছি। বিরোধ বললে অতিশয়োক্তি হবে, কিন্তু বিভেদটা মৌলিক। মার্কসের ক্লাসিক ভাষাতেই তা ব্যক্ত করি—"দার্শনিকেরা এ-যাবৎ জগৎকে বুঝতেই চেয়েছেন, আসল কথা হচ্ছে জগৎটাকে ঢেলে সাজানো (the point is to change it)।" দার্শনিকরা যেমন, কবিরাও তেমনি; তবে "বুঝতে চেয়েছেন" না-ব'লে বলবো "সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন"। ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, দলভুক্ত ও দলবহির্ভূত নির্বিশেষে সকল মানুষের স্থায়ী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এই পোড়া জগৎটাকে, অন্তত তার সমাজ-ব্যবস্থাটাকে ভেঙে নতুন ক'রে গড়ার অত্যন্ত প্রয়োজন আছে এ-কথা কে অস্বীকার করবে। এই প্রয়োজনের ডাক আমাদের অন্তর্নিহিত কর্মীসত্তাকে উদ্বুদ্ধ করে। বাইরের জীবনে যদি তার প্রকাশ না ঘটে তবে আমরা অসম্পূর্ণ থেকে যাই এবং অসম্পূর্ণতাবোধে কষ্ট পাই—যেমন পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কীট্‌স্‌, য়েট্‌স্‌।

কিন্তু আমাদের অন্তঃকরণে অন্য-একটি মৌল সত্তা রয়েছে তাকে বলবো ধ্যানী-সত্তা। 'আমি'র এই ধ্যানী ব্যক্তিস্বরূপের সাধনা ও সার্থকতা ঐ শুভাশুভে মিথুনী-কৃত জগৎকে বুদ্ধির দ্বারা বা অনুভবের দ্বারা (কল্পনার যথোপযুক্ত ব্যবহার উভয় ক্ষেত্রেই রয়েছে) সম্যক্‌রূপে এবং সমগ্ররূপে উপলব্ধি করাতেই। ধ্যানের সুদূরপ্রসারী সর্ব-গ্রাহী ও সর্বংসহ দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখবো, এই অনন্ত জগৎচরাচর সত্যি-সত্যি আদ্যোপান্ত বীভৎস বা ন্যক্কারজনক নয়; ঈশাবাস্যং কি না সে-তর্ক না-তুলে বলা যায় তা একটি বিরাট গোলাপের মতো সুন্দর—শত-শত পোকামাকড় ঝরা-পাতা মরা-পাপড়ি সত্ত্বেও। "বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে/দেখিস নে কি শুকনো পাতা ঝরা ফুলের খেলা রে"। এ-দেখা নান্দনিক, দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক দেখার সঙ্গে তার মিল না-হ'লেও মিতালি রয়েছে। কিন্তু শ্রেয়োনীতিক বিচারে বালক অমলের মতো আধফোটা ফুলের শুকিয়ে ঝ'রে যাওয়াকে 'খেলা' ব'লে অত সহজে মেনে নেওয়া যায় না।

জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় (unity of theory and practice) ভালো কথা ; আরো ভালো কথা জ্ঞান ও কর্মের সদ্ভাব, সহবাস, এবং সমমূল্যায়ন। কিন্তু কর্মের জন্যই জ্ঞান, প্র্যাক্‌টিসের জন্যই থিয়োরি—এ-কথা কারো-কারো কাছে প্রামাণিক ঠেকলেও স্বতঃপ্রামাণ্য (self-evident নয়। প্র্যাক্‌টিসের উদ্দেশ্য তো সর্বহারাদের বঞ্চিত জীবনকে সচ্ছল ক'রে তোলা। কিন্তু শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে কী হবে যদি মন উপবাসী থাকে, যদি আমাদের কবিরা দার্শনিকেরা মনে-প্রাণে রাজনীতিক হয়ে পড়েন, অথবা রাজনীতিকের আজ্ঞাবহ। তাঁদের দৃষ্টি যেন কেবল উপস্থিত প্রয়োজন এবং স্বল্পকালীন দাবি-দাওয়ার উপর নিবদ্ধ না-হয়, যেন থাকে মহাকালে ও বিশ্বলোকে সম্প্রসারিত।

শ্রেয়োনীতিক দৃষ্টি তৎসাময়িক এবং বিশেষরূপে অমঙ্গলের উপর সংহত, অমঙ্গলের পরিব্যাপ্তিতে নিরতিশয় পীড়িত ও বিক্ষুব্ধ, ন্যায়-বিচারোত্থত উষ্মায় অস্থির, ঈশ্বরকে পর্যন্ত ক্ষমা করতে অনিচ্ছুক। প্রতিতুলনায়, নান্দনিক তথা দার্শনিক দৃষ্টি দেশকালের কোনো ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ নয়, বিশ্বজাগতিক পটভূমিকায় সাদা ও কালোর বর্ণ-যোজনা যে প্রকাণ্ড সুষমা ফুটিয়ে তোলে তা আবিষ্কার ক'রে বিস্মিত আনন্দে, হয়তো-বা বিষাদেও, স্নিগ্ধ, সর্বদাই উষ্মা ও বিক্ষোভ-রহিত। শান্তোঽয়মাত্মা—অর্থাৎ কবির আত্মা ; কর্মীর আত্মা অশান্ত থাকাই ভালো। প্রশান্তি বা ট্রাংকুইলিটি কবির স্থায়ী ভাববিন্যাস (enduring mood)। আলংকারিকরা শান্তরসকে বলেছেন সব রসের মূল রস। রাগ, ব্যস্তসমস্ততা, অধৈর্য, এমন-কি ঘৃণাও, কর্মীকে মানায় ; কবির পক্ষে একান্ত বেমানান। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি লড়াই-ঝগড়া গাল-মন্দ করুন, তাতে আমাদের বলবার কিছু নেই। কবিতার মধ্যে তিনি যেন মুদ্গর না-ঘোরান, সহিষ্ণুতা না-হারান।

নান্দনিক দৃষ্টি যতোদুর পর্যন্ত ক্ষমাশীল, যতো বিচিত্র বিসদৃশ উপাদান গ্রহণে ও আত্মীকরণে সক্ষম, শ্রেয়োনীতিক দৃষ্টি ততোটা নয়। 'বিকৃতি না ঘটায় স্খলন'—বিচারটা নান্দনিক, শ্রেয়োনীতিক নয়। "প্রশ্ন" কবিতাটি শ্রেয়োনীতিমূলক ব'লেই ক্ষমাহীন ; অক্ষমাই সেখানে সমুচিত ভাব :

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো।

'শ্যামা' নাটকটি নান্দনিক পরিপ্রেক্ষিতে রচিত, তাই ক্ষমায় এমন ভরপুর, ক্ষমাই তার আদি এবং অন্ত্য সুর :

জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের ভারে
চরণে তব বিনতা।
ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা,
পাপীজনশরণ প্রভু।

ঈশ্বর যাকে ক্ষমা করবেন ব'লে বজ্রসেন বিশ্বাস করে তাকে সে নিজে ক্ষমা করতে পারলো না; এই ক্ষমাহীনতার আঘাতে এমন দুর্লভ প্রেম ভেঙে-চুরে ধুলায় লুটিয়ে পড়লো। অথচ বজ্রসেনের ক্ষমাহীনতা আমরা ক্ষমা করি, তার নীতিবোধের প্রখরতা এবং কঠোরতা আমাদের প্রশংসাই অর্জন করে—বিশেষত যখন দেখি পাপিষ্ঠা প্রণয়িনীকে শাস্তি দিতে গিয়ে সে নিজেও কী নিদারুণ শাস্তি বহন করলো। ঈশ্বরও শেষ পর্যন্ত পাপিষ্ঠা এবং পাপিষ্ঠার প্রাণদণ্ডদাতা দু-জনকেই ক্ষমা করবেন, নইলে 'পাপীজনশরণ প্রভু' এই গীতিনাট্যের অন্তিম বচন (এবং অন্তিম বিচার ?) হ'তো না।

খণ্ডকে অনন্ত দেশকাল পরিব্যাপ্ত ক'রে সমগ্রের পটভূমিকায় ন্যস্ত ক'রে দেখাকে বলেছি নান্দনিক দৃষ্টি। সাধনাসাপেক্ষ সে-দৃষ্টি। পক্ষান্তরে, যে-সব কুশ্রীতা ও বিকৃতি উপস্থিত মুহূর্তে আমাদের আশপাশের সমাজচিত্রকে তথা জগৎচিত্রকে ধেবড়ে দিয়েছে, শ্রেয়োনীতিক দৃষ্টিতে সেগুলিই খুব বড়ো আকারে ম্যাগনিফাইড হয়ে দেখা দেয়। তা-ই সঙ্গত। নইলে এ-সবের প্রতিবিধান হবে কেমন ক'রে, আমরা সংগ্রামের শক্তি ও প্রেরণা পাবো কোথা থেকে? বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থাটাকে ঢেলে সাজাবার কাজে যিনি আপন সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছেন, তাঁর সময় কোথায় এ-বিশ্বকে তার সমগ্ররূপে দেখবার ? সে-প্রবৃত্তিও তাঁর নেই।

ধ্যানীসত্তা ও কর্মীসত্তা সব মানুষের মধ্যেই আছে, তবে শুধু প্রবণতারূপে অঙ্কুররূপে। উভয় পথে কিছুদূর এগুনো অনেকের পক্ষে অসাধ্য নয়। কিছুদূর এগুনো সকলের সাধনীয়ও বটে। কতকগুলি পারিবারিক ও সামাজিক কর্মভার প্রত্যেক ব্যক্তিকে গ্রহণ করতেই হয়, নইলে সে সজ্জন ব'লে গণ্য হ'তে পারে না। স্ত্রী-পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা না-ক'রে কেউ যদি অহর্নিশি সাহিত্যচর্চায় মেতে থাকে তবে সে সকলের নিন্দাভাজন হবে। কতকগুলি নৈতিক নিষেধাজ্ঞা সকলকেই পালন করতে হয়—যথা কাউকে প্রতারণা না-করা স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরার্থে হস্তক্ষেপ না-করা, নিজের বা নিজের দলের সুবিধার জন্য কারো চরিত্রহনন না-করা ইত্যাদি।

অবশ্যকর্তব্য কর্মের পরিধি ছাড়িয়ে আরো বড়ো সামাজিক কর্মের দায়িত্ব যিনি ঘাড় পেতে নেন, এবং সেটা সুসম্পন্ন করার জন্য অশেষ ত্যাগ ও দুঃখবরণ করেন—গান্ধিজীর মতন, শোয়াইৎসারের মতন, মাদার টেরেসার মতন, জয়প্রকাশের মতন, পান্নালাল দাশগুপ্তের মতন—তিনি নিশ্চয়ই আমাদের সকলের প্রণম্য, তাঁর কাছে আমরা সবাই ঋণী। কিন্তু যদি কেউ সে-দিকে পা না-বাড়িয়ে কবিতা লেখা, দার্শনিক চিন্তা করা, বা শুধু ভালো ফুটবল খেলার জন্য তাঁর সমস্ত অবসর সময় নিয়োগ করেন তবে তিনি কোনোমতেই নিন্দার্হ নন। নৈতিক কর্তব্য অবশ্য-পালনীয়, কিন্তু নৈতিক বীর্য-শৌর্য আবশ্যিক নয়, ঐচ্ছিক। কোনো নির্জনস্থানে একজন নিরীহ পদাতিককে ঘেরাও ক'রে পাঁচজন সশস্ত্র গুণ্ডা মারছে তার মাইনের টাকাটা ছিনতাই করার জন্য—এ-দৃশ্য দেখে কেউ যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে বিপন্ন

লোকটির প্রাণ ও বিত্ত রক্ষা করার উদ্দেশ্যে, এবং তা করতে নিশ্চিত মৃত্যু বরণ করে তবে সে moral hero, বীরের সম্মান তার প্রাপ্য। কিন্তু আর-একজনের বীরত্ব যদি ছোটো মাপের হয় এবং সে এগিয়ে না-যায়, তবে সে শ্রদ্ধা-ভাজন নয়, কিন্তু অবজ্ঞার পাত্রও নয়। পিছিয়ে পড়ার দ্বারা সে প্রমাণ করলো যে সে অতি সাধারণ মানুষ, তার চেয়ে খারাপ কিছু নয়। এবং সে কবি বা বৈজ্ঞানিক হিসাবে অসাধারণ ও স্বক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় হ'তেও পারে।

শিল্প-সাহিত্যের বা দর্শন-বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ চর্চা সবাইকে করতে হবে এমন কথা কাউকে বলতে শুনিনি। কিন্তু গ্রামোন্নয়ন বা শ্রেণীসংগ্রামের ডাকে সবাইকে (বিশেষত বুদ্ধিজীবিগণকে) সাড়া দিতেই হবে এমন কথা মাঝে-মধ্যে শুনি। কথাটা ভ্রান্ত। সাহিত্যরচনা বা জ্ঞানান্বেষণ অবজ্ঞেয় কর্ম নয়। সেটা ছেড়ে চিত্ত-কর্মীকে চাষা-মজুরদের অবস্থার উন্নতিবিধানের কাজে (বৈপ্লবিক বা গণতান্ত্রিক উপায়ে) লাগতেই হবে—এ-দাবি অন্যায়। বিশেষ-কোনো জরুরী অবস্থায়, যথা প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধাবস্থায়, সেটা সঙ্গত হ'তে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় সবাই কলম ছেড়ে বন্দুক বা লাঙল ধরলে কলমের কাজটা বন্ধ হয়ে যায়, পিছিয়েও পড়ে। সেটাও সমূহ ক্ষতি।

গান্ধিজী কর্মীশ্রেষ্ঠ হয়েও ধ্যানস্নিগ্ধ রেখেছিলেন নিজের ব্যক্তিত্বকে। রবীন্দ্রনাথ অতো বড়ো ধ্যানী হয়েও অনেক শুভকর্মের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তবু গান্ধিজীকে কর্মী ব'লে আমরা ভক্তি করি, রবীন্দ্রনাথকে কবি ব'লে। একই ব্যক্তির পক্ষে যদি একেবারে ধ্যানে ও কর্মে নিজেকে সম্যক্ বিকশিত করা সম্ভব হ'তো তবে তিনি হ'তেন পূর্ণ মানুষ, নরোত্তম। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, এমন মানুষের অস্তিত্ব অত্যন্ত বিরল, ইতিহাস থেকে নজীর পাড়া খুবই শক্ত। লেনিন ও বিবেকানন্দের কথা সহজেই মনে আসে। কর্মীরূপে লেনিনের ব্যক্তিত্ব ছিলো অসাধারণ, অতুলনীয় প্রতিভা-সম্পন্ন। কিন্তু তাঁর দার্শনিক চিন্তা তুল্যমূল্য নয়; মৌলিকতার অভাব তো ছিলোই, তা ছাড়া নিজে তাঁর দার্শনিক রচনাকে রাজনৈতিক সংগ্রামের, অর্থাৎ কর্মের, অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছেন; একটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর পূর্ণাঙ্গ বিশ্ব-নিরীক্ষা গ'ড়ে তোলাকে (সেটাই প্রকৃত দর্শন) চরমমূল্য দেননি। বিবেকানন্দ কর্মযোগী হিসাবে আমাদের সকলের প্রণম্য, কিন্তু দার্শনিক পর্যায়ে তাঁর স্থান উত্তুঙ্গ নয় ব'লে আমার বিশ্বাস। বলা বাহুল্য, এঁরা কেউ কবি বা শিল্পী ছিলেন না। আসল কথা, ব্যক্তিত্বের স্বরূপবৈশিষ্ট্য (personality type) অনুযায়ী কেউ বরণ করেন ধ্যানের পথ, কেউ কর্মমার্গ। আবার ধ্যানীর মধ্যে কেউ বেছে নেন চিন্তার কাজ, কেউ সৃষ্টির।

স্থিতি ও গতির মধ্যে, ধ্যান ও কর্মের মধ্যে, সামঞ্জস্য কোথাও আছে নিশ্চয়ই। সে-সামঞ্জস্য সম্ভবত জটিল এবং তার অনেকখানি আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। একদিক দিয়ে সামঞ্জস্য কি এই যে কর্মী চান সামাজিক অবস্থার এমন পরিবর্তন

যাতে সব মানুষের শুধু জৈবস্বাচ্ছন্দ্য ও আর্থিক উন্নতি নয়,স্বক্ষেত্রে নিজের-নিজের ধ্যানী-সত্তারও অবাধ বিকাশ সম্ভবপর হ'তে পারে? কিন্তু তাঁর জানা উচিত যে বাইরের অবস্থাকে কখনোই সম্পূর্ণ মনের মতোটি ক'রে তোলা যাবে না, একটা **coefficient of resistance** থাকবেই, তার সঙ্গে চিরসংগ্রামের মধ্যেই আমরা পূর্ণ হবো, জৈব থেকে আধ্যাত্মিক হবো। নাড্‌হাম যাকে বলেছেন আমাদের ক্রীচার্‌লিনেস্‌ তার দুরপনেয় বাধা মানবিক পরিস্থিতির অবশ্যম্ভাবী উপাদান। তাকে মেনে নিতেই হবে। অর্থাৎ বাইরের পরিবর্তনের যেমন দরকার আছে, অন্তরের পরিবর্তনও তেমনি অত্যাবশ্যক। প্রাচীন ধর্মের পরিভাষায় সে-পরিবর্তনকে বলে আত্মশুদ্ধি, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভাষায় **rectification of human emotions**, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে,
খসে যাবার, ভেসে যাবার
ভাঙবারই আনন্দে রে।

বাইরের জগৎকে মনের মতন ক'রে গ'ড়ে তোলা এবং অন্তর্লোককে বহির্জগতের ছন্দে আন্দোলিত রাখা—এই দুটো বিপরীত প্রেরণাই মানব-জীবনের মৌল প্রেরণা এবং চিরন্তন আদর্শ।

সামঞ্জস্য যদি-বা কোথাও থাকে, তবু ধ্যানী এবং কর্মী চলেন ভিন্ন পথে, ভাবেন ভিন্ন ভাবনা, তাঁদের চোখের সামনে বি-সদৃশ দৃশ্যপট। তাঁরা পরস্পরকে নমস্কার ক'রে চলবেন, এইটুকু কি আশা করা যায় না? ধ্যানব্রতী যাঁরা তাঁরা হিতকর্মীর প্রতি অশ্রদ্ধাবান নন, এবং নিজের কর্মশক্তির অভাবে কিঞ্চিৎ বিবেক-পীড়িত। বলা বাহুল্য, আমি দার্শনিক ও কবির কথাই ভাবছি; সাধু-সন্ন্যাসীদের কথা নয়, তাঁরা আমার কাছে অজ্ঞেয়। দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে তেমন নয়, তবে শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে অবশ্য এমন কারো-কারো কথা আমাদের জানা আছে যাঁদের আত্মম্ভরিতা গগনচুম্বী এবং অন্য সকলের প্রতি অবজ্ঞা অপরিসীম। এটাকে একধরনের নিরীহ খ্যাপামি ছাড়া আর-কিছুই মনে করা যায় না। মনো-বিজ্ঞানে বোধকরি এর নাম নার্সিসিজ্‌ম্‌। বর্তমান শতাব্দীতে আমাদের দেশ দুইজন মহামানবকে পেয়েছে—রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধি। এঁদের মধ্যে কে মহত্তর সে-বিচার যেমন অসম্ভব তেমনি নিরর্থক। এমনতর বিচারের কোনো মাপকাঠিই নেই আমাদের হাতে। তেমনি একজন মাঝারি সাহিত্যিককে একজন মাঝারি দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক বা সমাজকর্মীর চেয়ে বড়ো বা ছোটো বলার কোনো মানে হয় না।

শিল্পী-সাহিত্যিকদের দর্প থাকতে পারে, কিন্তু দাপট নেই। তাঁরা মূলত অহিংস মানুষ। ফিলিস্টাইন, বুর্‌, বেরসিক, রুচিহীন, মূঢ় ইত্যাদি কয়েকটি শব্দের চেয়ে ক্ষুরধার বা বিষধর কোনো বাণ তাঁরা হানতে পারেন না। ভয় হয় যখন

দেশ একনিষ্ঠ সমাজকর্মীদের মধ্যে বিশুদ্ধ জ্ঞানব্রতী ও শিল্প-সাহিত্য-সাধকদের প্রতি শুধু শ্রদ্ধার অভাব নয়, রীতিমতো অসহিষ্ণুতার প্রকোপ—যদি তাঁরা সমাজ ভাঙা বা গড়ার অস্ত্ররূপে নিজের প্রতিভাকে ব্যবহার করতে গররাজী থাকেন। কর্মব্রতীরা কর্মে মহান থাকুন, তাঁরা আমাদের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র, গর্বের বিষয়। কিন্তু তাঁরা ধ্যানব্রতীদের পথনির্দেশ করার যোগ্যতা ও অধিকার অর্জন করেছেন—এ ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হ'লে সামাজিক প্রগতির পথ সুগম হবে। ধ্যানীরা সত্য-সুন্দরের যে-রূপটি যেমন বুঝেছেন বা অনুভব করেছেন তার অনুজ্ঞাই তাঁদের পক্ষে চূড়ান্ত অনুজ্ঞা, আর-কোনো অনুজ্ঞা মেনে চললে তাঁরা অধর্মাচরণ করবেন, স্বধর্ম-চ্যুত হবেন, মূলে বিনষ্ট হবেন।

সৎকর্মমার্গীরা ক্ষমতাশালী মানুষ হয়ে ওঠেন অনুকূল অবস্থায়। এঁরা যদি ভাবেন—কর্মের পথই একমাত্র পথ; "নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়" শুধু নয়, অন্য-সব পথ সুবিধাবাদীর পথ, শাসকশ্রেণীর দালালের পথ, ইত্যাদি; সুতরাং অন্য-সব পথের পথিকরা নিপাত যাক্—তবে ভয় হবারই কথা। পূর্ণতার পথ কোনোটাই নয়: কিন্তু দুটি পথ স্বতন্ত্র (আক্ষরিক অর্থে স্ব-তন্ত্র) হয়েও পরস্পরের সম্পূরক—এই ভাবচ্ছবিটি মনশ্চক্ষের সামনে রাখলেই সমাজের সর্বাঙ্গীণ কুশল নয় কি? কবির আবেদন স্মরণীয়:

> এই কথাটি মনে রেখো, তোমাদের এই হাসিখেলায়
> আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়।

সংস্কার নয়, সর্বোদয় নয়, বিপ্লব নয়, সমাজগঠন নয়, শুধু গান গেয়েই কি কেউ সমাজের মহত্তম উত্তমর্ণদের মধ্যে গণ্য হ'তে পারেন না?*

* কথা থেকে কথা ওঠে; 'রাজা' নাটকের আলোচনাটাকে ঠাকুরদার কবি এবং কর্মী এই উভয়বিধ ভূমিকা অবলম্বন ক'রে আমি অনেক দূর টেনে এনেছি। এইখানে ক্ষান্ত হলাম। নইলে অন্ত দুটি কথা প্রসঙ্গত উঠতেই পারে। প্রথমত, জ্ঞানকে বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানাভাস (ideology) এই দুই ভাগে বিভক্ত ক'রে বলা যায়—প্রাকৃতবিজ্ঞান বহির্জগৎকে প্রতিবিম্বিত করে, বিজ্ঞানাভাস (দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাসাদি) মূলত শ্রেণীস্বার্থেরই প্রতিবিম্ব। দ্বিতীয়ত, বিশুদ্ধ সাহিত্য ব'লে কোথাও কিছু নেই, সব সাহিত্যই হয় ধনিকশ্রেণীর নয় শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের কথাই রসিয়ে বলে। এ-বিতর্ক আমি বহু বৎসর পূর্বে তুলেছিলাম, কিন্তু সে-লেখাগুলি এ-বইতে স্থান পাওয়ার যোগ্য নয়।

সখের সখ্যঃ

(উমা দাশগুপ্ত বন্ধুবরেষু)

পাঁচ-ছয় বছরের ছেলের কথা ভাবতে গেলেই আমাদের মনে ছবি জাগে—প্রাণরসে টৈ-টম্বুর ছোট্ট এক টুকরো দুরন্তপনা হাঁফাতে-হাঁফাতে এসে মায়ের কানে দুটো কথা ব'লে একটি লজেন্স হস্তগত ক'রে ছুট দিলো সঙ্গীদের সন্ধানে—অন্য হাতে বুঝি একটা রঙিন রবারের বল ছিলো, নাকি লাটিম সেটা? যদি শুনি বাপ-মা-মরা পাঁচ বছরের ছেলে জ্বর গায়ে বিছানায় প'ড়ে-প'ড়ে কাশছে, ডাক্তারের নির্দেশে বিছানা থেকে ওঠা বারণ, তার সেরে ওঠার কোনো আশা নেই, তখন না-ব'লে পারি না—বিধাতার এ কী নিষ্ঠুর অবিচার! ঐটুকু ছেলে, সে তো জীবন থেকে কিছুই পেলো না, জগতের কিছুই দেখলো না, হৃদয়-ভরা অতৃপ্ত অস্ফুট বাসনা নিয়ে এখনই শেষ হ'য়ে যাবে—অসম্ভব, এ অসম্ভব। কিন্তু ঠিক তা-ই সম্ভব ক'রে তুললেন রবীন্দ্রনাথ। বিধাতাও তা-ই ক'রে থাকেন মাঝে-মাঝে, মাঝে-মাঝেই।

বিধাতার বিধান নিয়ে প্রশ্ন তোলা বৃথা, সে-প্রশ্নের আর্তস্বর শূন্যেই বাজতে থাকবে। তবে কবিকর্ম নিয়ে জিজ্ঞাসা সঙ্গতভাবেই জাগে মনে। কোন্ রবীন্দ্রনাথ এমন নিষ্করুণ অঘটন ঘটালেন? সেই রবীন্দ্রনাথ, যিনি তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতার প্রথম ছত্রে জগৎবাসীকে এবং দিব্যধামবাসিগণকেও সোল্লাসে জানিয়েছিলেন—শোনো তোমরা সকলে—"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে / মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।" এইটুকু ব'লে তিনি ক্ষান্ত হননি, অনেক বছর পরে সুপরিণত বয়সে ঐ তারুণিক গ্রন্থের ভূমিকায় উক্ত ঘোষণাটিকে লাল কালি দিয়ে দাগ দেবার মতন ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, সে-ঘোষণাটি তাঁর তাৎক্ষণিক হৃদয়োচ্ছ্বাসমাত্র ছিলো না, "প্রথম আমি সেই কথা বলেছি—যা পরবর্তী আমার কাব্যের অন্তরে অন্তরে বার বার প্রবাহিত হয়েছে।" আশি বছর বয়সে বললেন, "আমি পৃথিবীর কবি", বললেন "জীবন পবিত্র জানি", অমলেরই মতন "মুক্তি বাতায়ন-প্রান্তে জনশূন্য ঘরে" ব'সে শুনলেন "ধরণীর প্রাণের আহ্বান", শুনে বললেন "ধন্য আমি"; বার-বার সকৃতজ্ঞ মনে স্মরণ করলেন "জীবনের বিধাতার যে-দাক্ষিণ্য পেয়েছি জীবনে", সেই দাক্ষিণ্য-সম্ভারকে।

জীবনকে ভালোবাসতেন রবীন্দ্রনাথ: কিন্তু জীবনেরই জন্য নয়। শিল্পের জন্য শিল্প যেমন তাঁর শিল্পদর্শন ছিলো না, তেমনি জীবনের জন্য জীবন তাঁর জীবনদর্শন

ছিলো না। তাঁকে ইস্থীট্ ভাবা যেমন ভুল, তাঁকে জীবনরসসম্ভোগী ভাবাও তেমনি অসম্ভব। জীবনকে নিঙড়ে তার শেষ রসবিন্দুটুকু পান করার কোনো অভিলাষ ছিলো না তাঁর মনের চেতন বা অবচেতন স্তরে। জীবনের কবি তাঁকে বলা যায় কিন্তু এই অর্থে নয়। কোন্ অর্থে বলা যায় তা তিনি বেশ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন গদ্যে ও পদ্যে :

> **এক হয়ে গেছে আজ আমার জীবন**
> **আর আমার ভুবন ;**
> **ভালোবাসিয়াছি এই জগতের আলো**
> **জীবনেরে তাই বাসি ভালো।**

মূলত তিনি ভুবনেরই কবি—এই প্রত্যক্ষগোচর ও বস্তুনিষ্ঠ কল্পনাগোচর সুন্দর ভুবনের ; ফলত পবিত্র জীবনের কবি। দর্শনের পরিভাষায় তাঁর নিজের জীবনের মূল্য তাঁর কাছে স্বাশ্রয়ী (intrinsic) ছিলো না, ছিলো পরাশ্রয়ী, বিশ্বাশ্রয়ী।

জগতের আলো এবং সে-আলোয় যা-কিছু দেখা যায় সব-কিছুকে তার ছোট্ট ক্ষীণ প্রাণের সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে বুকে টেনে নিতে চেয়েছিলো অমলও। অসুস্থ দেহে সে বেঁচে আছে কোনোমতে, মৃত্যু তার আসন্ন, জীবনীশক্তি বেশি থাকার কথা নয়, তবু তার আশেপাশে অন্য সবাইকে মনে হয় নির্জীব, বরঞ্চ সে-ই যার সঙ্গে কথা বলে তাকেই সঞ্জীবিত ক'রে তোলে। শরীর রুগ্‌ণ হ'লে কী হবে, মন তার অতুলনীয়ভাবে—একমাত্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই তুলনীয়ভাবে জীবন্ত, জীবনোন্মুখ। প্রথম দৃশ্যেই অমল তার পিসেমশায়কে এবং আমাদের সবাইকে বেশ উল্লাসের সঙ্গে জানিয়ে দিচ্ছে "আমি যা আছে সব দেখব, কেবলি দেখে বেড়াব।" এই একটি বাক্যে অমলের প্রাণভরা ব্যক্তিত্ব আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠলো। অথচ মাঠে-ঘাটে, নদীর ধারে, গ্রামে-গ্রামে, পাহাড়ে-পাহাড়ে, পাহাড়ের ওপারে সব-কিছু দেখে বেড়ানোর তো কথাই ওঠে না, ঘর থেকে বেরুনো পর্যন্ত তার বারণ ; ঘরে ব'সে জানালা দিয়ে যতটুকু দেখতে পাওয়া যায় সেটুকুও না-দেখতে পারার দিন তার ঘনিয়ে আসছে।

অমল কি সত্যিই এত অসুস্থ যে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরুনো তার পক্ষে হানি-কর, নাকি পণ্ডিতমূর্খ কবিরাজ নির্বোধ বিধিনিষেধের বেড়াজালে তাকে মিছেমিছি ঘরে আটকে রেখে দিয়েছে? ক্ষয়রোগের সঙ্গে যদি জ্বর থাকে বা হৃদরোগে আক্রান্ত হয় কেউ, তবে চলাফেরা করার শক্তি থাকলেও রোগীকে শুইয়ে-বসিয়ে রাখা হয় ; ডাক্তারকে অমান্য ক'রে বিদ্রূপ ক'রে যদি সে বেড়িয়ে বেড়ায় তবে তার মৃত্যু-দিনকেই শুধু এগিয়ে নিয়ে আসা হয়। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ কবিরাজকে খুব খানিকটা ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছেন। সে-সব জায়গায় স্পষ্টই বোঝা যায় কবিরাজটি সামাজিক এবং ধর্মশাস্ত্রীয় অর্থহীন বিধিনিষেধের প্রতীক। এ হেন প্রতীকীসত্তাকে বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করলে আমাদের খুশি হবারই কথা : কিন্তু তাতে ক'রে রোগীর

রোগ লঘু বা কাল্পনিক সাব্যস্ত হয় না। তা ছাড়া 'ডাকঘর'-এর মতো নাটকে ব্যঙ্গের আমেজ একটু বেখাপ ঠেকে এবং কমিক রিলিফ হিসেবে নিষ্প্রয়োজন।

কবিরাজ মূর্খের মতো যতোই বুলি কপ্‌চাক, অমল যে সত্যি খুব অসুস্থ, নাটকে অন্যত্র তার সাক্ষ্য রয়েছে। এক সময়ে অমল ঠাকুরদাকে বলে: "আজ সকালবেলা থেকে আমার চোখের উপর থেকে থেকে অন্ধকার হয়ে আসছে,... কথা কইতে আর ইচ্ছে করছে না।" অবশ্য তার অব্যবহিত পরে সে কবিরাজকে অন্য কথা বলে: "আজ খুব ভালো বোধ হচ্ছে—মনে হচ্ছে যেন সব বেদনা চলে গেছে।" (ফুসফুসের ব্যথা, হৃৎপিণ্ডের কষ্ট?) ঠাকুরদার কাছে বানিয়ে বলার বা অতিশয় অসুস্থতার ভান করার তো কোনো কারণ নেই অমলের। কিন্তু অমল ছেলেমানুষ, ভালো বোধ না-করলেও বেশ ভালো বোধ হচ্ছে এ-কথা বানিয়ে বলতেই পারে কবিরাজকে—বাইরে বেরুবার অনুমতি আদায় করার জন্য। অন্যত্র পড়ি, ছেলের দলকে তার জানালার সামনে খানিকক্ষণ খেলা করতে ব'লেও সে ব'সে থেকে খেলা দেখতে পারে না, "জানি নে কেন আমার থেকে থেকে ঘুম পায়। অনেকক্ষণ বসে আছি আমি, আর বসে থাকতে পারছি নে—আমার পিঠ ব্যথা করছে।" কবিরাজ নয়, অমলের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল প্রহরী তাকে দেখে ব'লে ওঠে: "আহা, তাই বটে—তোমার মুখ যেন সাদা হয়ে গেছে। চোখের কোলে কালি পড়েছে। তোমার হাত দু'খানিতে শিরগুলি দেখা যাচ্ছে।" তাছাড়া আমরা তো জানিই অমলের রোগ এতদূর এগিয়েছে যে ক'দিনের মধ্যেই সে মারা যাবে। কবিরাজের মূর্খতাই তাকে ঘরের মধ্যে বন্ধ ক'রে রাখেনি, গুরুতর বাধা তার শরীরের মধ্যেই রয়েছে, অর্থাৎ বিশ্বের বিধানের মধ্যে।

"এ-সব দেখে বিশ্ববিধানের 'পরে ধিক্কার জন্মায়"—এ কথা আমরা রবীন্দ্রনাথের মুখেই শুনেছি। আজ বেঁচে থাকলে বাংলাদেশের উপর পৈশাচিক ধ্বংসলীলা ও অগুনতি নরহত্যা (অমলের মতো কতো শত শিশুর বুকে বেয়নেট বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে তার হিসাব কে রাখে) দেখে এবং চীন ও মার্কিন সরকারের ঐ হত্যাকারী আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত দানব দলকে নির্লজ্জ নির্বিবেক সোল্লাস অস্ত্র-সাহায্যের সংবাদ পেয়ে আবার ঐ একই ধিক্কার তাঁর বেদনাহত বুক থেকে বেরিয়ে আসতো। মূঢ় সমাজপতিরা আর ধর্মবিধান-কর্তারাই অমলের এবং অমলের মতো সহস্র বালকের (সাবালকেরও) জীবনকে পঙ্গু ক'রে রাখেন না, স্বয়ং বিশ্ববিধাতাও রাখেন। পূর্বজন্মকৃত পাপের শাস্তিস্বরূপ? ভগবৎভক্তি অটল থাকে কিনা তারই পরীক্ষা নেবার জন্য? (নবী যোব বা আইয়ুবের কাহিনী স্মরণীয়।) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লে পরকালে পর্যাপ্ত পুরস্কারের আশ্বাস অবশ্য দেওয়া আছে ধর্মশাস্ত্রে। এইসব অবাস্তব জল্পনা-কল্পনার সাহায্য ব্যতিরেকে বিশ্ববিধানকে প্রত্যেকটি ব্যক্তিমানুষের পক্ষে সর্বৈব শুভ ভাবা যায় না। কেন তবে ভাবি আমরা এবং নিজেদের ভোলাই? ঠিক এইসব কথাগুলি কি সজ্ঞান মনে বলতে চেয়ে-

ছিলেন রবীন্দ্রনাথ? খুব সম্ভব চাননি। তবু এ-সব ভাবনা অন্তত একজন পাঠকের মনে জাগালেন তিনি।

পৃথিবীর সবরকমের মানুষ এবং তাদের কাজকর্ম, প্রকৃতির সর্বপ্রকার দৃশ্য এবং হাতছানি বিষয়ে অমলের অফুরন্ত উৎসাহ। সব-কিছু তার ভালো লাগে, সবাই-কে সে ভালোবাসে এবং সবার ভালোবাসা কাড়ে। তার অত্যন্ত সীমিত বদ্ধ জীবনে সে যা দেখে তাতেই তার আনন্দের সীমা নেই। এই কথাটা এতবার এতরকম ক'রে বলা হয়েছে যে মনে হয় এটাই বুঝি নাটকের মূল বক্তব্য, তার থীম্। বরঞ্চ ডাকঘর ও চিঠির ব্যাপারটা আকস্মিকভাবে এসে পড়ে নাটকের মাঝখানে; এমন-কি রাজার চিঠি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বা প্রত্যাশা অমলের মনের ভিতর থেকে জেগে ওঠেনি, বাইরে থেকে জাগিয়ে তোলা হয়েছে। রাস্তার ও-পারের একটা বাড়িতে নিশেন উড়ছে, লোকজন আসছে যাচ্ছে দেখে অমল কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করে—ওখানে কী হয়েছে? প্রহরী উত্তর দেয়—ডাকঘর বসেছে। কার ডাকঘর? কার আবার, রাজারই ডাকঘর হবে। রাজার ডাকঘরে রাজার কাছ থেকে চিঠি আসে বুঝি? আসে বৈ-কি, দেখো একদিন তোমার নামেও চিঠি আসবে। অমলের বিশ্বাস হয় না, সে যে ছেলেমানুষ। প্রহরী তাকে আশ্বাস দিয়ে বলে—ছেলেমানুষকে রাজা এতটুকু ছোট্ট চিঠি লিখবেন। আর তোমার বাড়ির সামনেই যখন ডাকঘর বসেছে তখন তোমার নামে চিঠি আসবে ঠিক। এত কথা শুনবার পর তবে অমলের বিশ্বাস হয় যে রাজা বুঝি সত্যই তাকে চিঠি দেবেন। বিশ্বাস থেকে জন্মায় কামনা, প্রত্যাশা, প্রতীক্ষা।

একটি অক্ষরশূন্য কাগজ দেখিয়ে মোড়ল একদিন অমলকে ঠাট্টা ক'রে বললো—এই যে, রাজার কাছ থেকে তোমার নামে চিঠি এসেছে। অমল খুশি হ'লেও অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই সন্দেহ করলো যে মোড়ল তাকে ঠাট্টা করছে। ঠাকুরদাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন: "হাঁ বাবা, আমি ফকির তোমাকে বলছি এই সত্য তাঁর চিঠি।" কেন এমন কথা বললেন সত্যবাদী ফকির? তিনি তো অনায়াসে বলতে পারতেন—রাজা তো রোজই কতো বিচিত্র অক্ষরে লেখা কতো সুন্দর-সুন্দর চিঠি পাঠাচ্ছেন তোমার কাছে, আর সে-সব চিঠি তুমি এই জানালার ধারে ব'সে ব'সে কতো আগ্রহে সারাদিন পড়ছো, প'ড়ে আনন্দে তোমার বুক ভ'রে উঠছে। এমন ক'রে ক'জন রাজার চিঠি পায় আর এমন সত্য ক'রে ক'জন সে-সব চিঠি পড়তে পারে? আমি ফকির, তোমাকে বলছি তুমি ছোট্ট হলে কী হবে, তুমিই রাজার প্রিয় বন্ধু, রাজা তোমাকে পাহাড়ের গায়ে, নদীর জলে, রাস্তার আঁকা-বাঁকা রেখায়, দইওয়ালার ডাকে, প্রহরীর ঘণ্টায়, বালকদের খেলায়, বালিকার তুলে-আনা ফুলে লিখে কতো শত সুন্দর চিঠি পাঠিয়েছেন, আরো কতো চিঠি পাঠাবেন। ঐ-মোড়লের বাজে ঠাট্টায় তুমি ভুলো না, তুমি যে কবি, আমাদের কবির মতনই কবি; তুমি তো মায়াবাদী বৈদান্তিক সন্ন্যাসী

নও যে তোমার কাছে রাজা সাদা কাগজের ছেঁড়া টুকরোয় অক্ষরশূন্য চিঠি পাঠাবেন।

অথচ ফকির এ-সব কথার কিছুই বলেননি। শুধু আমরা রবীন্দ্র-প্রেমিক পাঠকরা এই কথাগুলি চীৎকার ক'রে অমলকে শুনিয়ে দিতে চাই। নাকি নাটক পড়তে-পড়তে অমলের সঙ্গে একাত্মবোধ করছি আমি, আর এ-সব কথা শোনাচ্ছি অসুস্থ দেহের মধ্যে বন্দী নিজেরই অস্থির মনকে? আমিও অনেককাল যক্ষ্মায় ভুগেছি, অনেক-অনেক সকাল ও বিকাল কাটিয়েছি জানালার ধারে বা ব্যালকনিতে ব'সে রাস্তার লোক চলাচল দেখে। তবে অমলের মতো পাঁচ বছর বয়সে মৃত্যুদূত আসেনি আমার দরজায়, পঁয়ষট্টি বছরের দীর্ঘায়ু লাভ করেছি। এখন এই দিনান্ত-বেলায় মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে ভোলাতে পারি না যে মৃত্যুর দরজা পার হ'লে কোনো রাজাধিরাজ স্নেহ-করুণায় ডেকে নেবেন কাছে। এই দীর্ঘ জীবনে দুঃখ-যন্ত্রণা বঞ্চনা-ব্যর্থতা পেয়েছি অনেক; বেশ-কিছু আনন্দ ও অনেক ক'টি অমৃতভরা মুহূর্তও পেয়েছি—প্রিয়ার বাহুতে, বন্ধুর আলাপে, স্পিনোজার দর্শনে, রবীন্দ্রনাথের গানে। বাকী দু-চার বছর যদি শুধু কষ্টই পাই তবু ব'লে যাবো—"যা দেখেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।" ব'লে যেতে পারি যেন।

আরো বিস্ময় লাগে যখন দেখি যে সেই অক্ষরশূন্য চিঠির সঙ্গে-সঙ্গে রাজা তাঁর অনাবশ্যক রাজদূত আর রাজ-কবিরাজকেও পাঠালেন। রাজদূত ধাক্কা মেরে অথবা কুড়ুলের আঘাতে অমলের ঘরের বন্ধ দরজা ভেঙে ফেলে প্রবেশ করলো; ভিতর থেকেই কেউ খিল খুলে দেবে এতটুকু তর সইলো না তার।

যদি এ আমার হৃদয়-দুয়ার
বন্ধ রহে গো কভু
দ্বার ভেঙে তুমি এসো মোর প্রাণে,
ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু।

কিন্তু অমলের হৃদয়-দুয়ার তো বন্ধ ছিলো না কোনোদিন। রাজদূত দরজা ভেঙে ঢুকলো—এর অর্থ কি? রাজ-কবিরাজ এসে সব দরজা জানলা খুলে দিতে আদেশ করলেন। বৃথাই, আকাশের তারা দেখতে-না-দেখতেই অমলের ঘুম এসে গেলো। এমন ঘুম যে সুধা যখন তার প্রতিশ্রুত ফুল নিয়ে এলো, অর্থাৎ পৃথিবীর সব রূপ-রসবর্ণগন্ধ, তখনো সে-ঘুম ভাঙেনি! সে-ঘুম ভাঙবার নয়।

রবীন্দ্রনাথের ভগবানকে পেতে হ'লে কি কারো ইহলোক ছেড়ে পরলোকের দিকে যাত্রা করবার প্রয়োজন আছে? বোদলেয়রের ভগবান সম্বন্ধে এ-কথা সত্য হ'তে পারে, কারণ ঐ-কবির জগৎ ছিলো আদ্যোপান্ত ঘৃণ্য ও বীভৎস; তাঁর জগতোত্তীর্ণ ভগবানকে পেতে হ'লে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান বা পরিত্যাগ করতে হবে জগৎকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভগবান তো জগৎময় অভিব্যক্ত, এবং জগতের সব মানুষের মধ্যে—সেই অন্ধ খোঁড়া যাকে চাকার গাড়িতে বসিয়ে অমলেরই মতো

একটি বালক রোজ ভিক্ষা করতে ঠেলে নিয়ে যায়,—তার মধ্যেও। নাটকের আকার যেমন অতি ক্ষুদ্র, নায়কের বয়স তেমনি অত্যল্প! এইটুকু ছেলে সে কতো কী দেখতে, জানতে, করতে, হ'তে চায়, কিন্তু কিছু দেখবার, জানবার, করবার, হবার আগেই জগতের জন্য বুকভরা তৃষ্ণা নিয়ে তাকে বিদায় নিতে হ'লো জগৎ থেকে। এই বালক শিশুটি আর-সব ভুলে গিয়ে অনন্তের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়ার জন্য লালায়িত হয়ে উঠবে—এ-কল্পনাও আমার পক্ষে পীড়াদায়ক।

অথচ তা-ই বলছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। "তখন সে জড়ের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অনন্তের মধ্যে বিলীন হয়।"[১] হিন্দুধর্ম-শাস্ত্রসম্মত-আধ্যাত্মিকতার এই সুপরিচিত ভাবটি যদি নাটকের মূল প্রকাশ্য হয়,তবে বলতেই হবে যে'ডাকঘর' রবীন্দ্রনাথের পক্ষে শোচনীয় আত্মখণ্ডন। জড়ের বন্ধনকে অর্থাৎ মর্ত্যজীবনকে তো বন্ধন ব'লে মনে করেননি রবীন্দ্রনাথ: জীবনের মধ্যেই জীবনাতীতকে খুঁজেছেন, পেয়েছেন এবং আমাদের সকলকে সে-পাওয়ার শরিক করেছেন। যে-কবি আজীবন ভুবনকে সুন্দর এবং জীবনকে পবিত্র জেনেছেন সেই "পৃথিবীর কবি" হঠাৎ জড়ের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠবেন কেন?

"সুদূরের জন্য ব্যাকুলতার ভাবটিই ডাকঘরের মূল ভাব"—বলছেন অজিত-কুমার চক্রবর্তী। অথচ সুদূরের জন্য ব্যাকুলতা যেমন আছে অমলের মনে, সন্নিকটের মধ্যে আনন্দও আছে তেমনি, বা তার চেয়েও বেশি। আর সুদূর তো খুব বেশি নয়, ঐ যে ছোটো পাহাড় দেখা যাচ্ছে তার ও পারের গ্রাম নদী মাঠ, কিংবা যেখানে সুধা ফুল তুলতে যাবে সেই বন,যে-গ্রাম থেকে দইওয়ালা দই নিয়ে আসে সেই গ্রামের গোয়ালঘর; আর সব শেষে যে-রাজার কথা প্রহরী বলেছে সেই বন্ধুপ্রতীম চিঠি-লিখিয়েরাজা—তাঁর সুন্দর প্রাসাদটি নিশ্চয়ই জেলার শহরেই হবে। 'সুদূর' মানে কি পারলৌকিক ভগবান যিনি ভক্তকে তলব করেন মৃত্যুদূত পাঠিয়ে? তাঁর কথা বালকের কল্পনায় বা বাসনায় বেখাপ; স্বয়ং রবীন্দ্র-নাথের কল্পনাতেও কদাচিৎ স্থান পেয়েছে, যখন পেয়েছে, তখনো বেশিদিন স্থায়ী হয়নি সে-স্থান। কারণ আমাদের হৃদয়স্থ রবীন্দ্রনাথের কল্পনা রোম্যাণ্টিক হ'লেও ঐহিক; বৈরাগ্যসাধনে নয়, সংসারের বন্ধনছেদনে নয়, প্রকৃতি এবং মানুষের মধ্যেই তাঁর মুক্তি, তাঁর ব্রহ্মবিহার।

তবু কি রবীন্দ্রনাথ কখনো মৃত্যুর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেননি, মৃত্যুকে ডাকেননি নানা প্রিয় সম্বোধনে? অর্বাচীন বয়সে লেখা 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর রবীন্দ্র-মানসে পূর্ববর্তী পাশ্চাত্য কাব্য থেকে হাওয়ায়-হাওয়ায় ভেসে-আসা একপ্রকার টলমল দুঃখবিলাস যেমন ছিলো উদ্বেল, তেমনি সে বয়সে মাঝে-মাঝে জেগে উঠতো কানায়-কানায় রোম্যাণ্টিক এমন-এক ভাবাবেগ যাকে মৃত্যু-সোহাগ ছাড়া

১ 'রবীন্দ্র-জীবনী', দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ ২ ৬

আর কী নাম দেওয়া যায়? "মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান" অবশ্য নকল-নবীশী এবং বালিকাসুলভ তীব্র অভিমানভরা আত্মহনন ইচ্ছা। "চির বিসরল যব নিরদয় মাধব" তখন মরণই আসুক আমার অসহ্য জ্বালা জুড়াতে। নাটকীয় গান, তবে তরুণ রবীন্দ্রনাথের আবেগপ্রবণ মনও নায়িকা রাধিকার সঙ্গে অভেদীকৃত হয়ে থাকতে পারে কতকটা—হয়তো বা সেইরকম কোনো সাময়িক তীব্র অভিমানবশতই ঈষৎ পরিণত বয়সে লেখা :

অত চুপি চুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।
অতি ধীরে এসে কেন চেয়ে রও,
ওগো একি প্রণয়েরি ধরন।

আমার কাছে একটু হাল্‌কা ঠেকে, একটু যেন কবি-কবি ভাব। এবং 'চিত্রা'র অতি দীর্ঘ "মৃত্যুর পরে"-কে শৌখিন মৃত্যুবিলাস বললে কি খুব দোষ হয়? চাঁদ চকোর, ফুল, পাখি, জ্যোৎস্নালোকিত পদ্মা, তুষারাবৃত হিমালয় শুধু নয়, মৃত্যুকে নিয়েও আমি বেশ রসসৃষ্টি করতে পারি—যেন নিজের কাছে এইটে প্রমাণ করাই ছিলো উদ্দেশ্য।

কোনো মনোবিজ্ঞানী বলতেও পারেন যে, রবীন্দ্রনাথের চেতন-অচেতন মনের মধ্যবর্তী স্তরে বাল্যকাল থেকে প্রায় বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত একটা ঈষৎ-অবদমিত, কাজে-কাজেই ঈষৎ পীড়াদায়ক, মৃত্যু-আতঙ্ক বর্তমান ছিলো। তাই তিনি মৃত্যুকে বার-বার নানা মধুর সম্ভাষণে ডেকেছেন, কল্পনায় বেশ-খানিকটা রঙিন রোমাঞ্চকর ও প্রিয়-প্রিয়তম ক'রে নিতে চেয়েছেন আতঙ্ক-অবদমনের চেষ্টাকে সহজে সফল করার জন্যই। শেষ বয়সে যখন মৃত্যু সত্যিই আসন্ন তখন এই ভয় কেটে গেলো। নিজের রোগ জরা ও অন্তিম অবসাদকে জাগতিক অমঙ্গলে রূপান্তরিত ক'রে অথবা সর্ব-মানবের দুঃখযন্ত্রণার সঙ্গে এক ক'রে তীব্র বেদনা বোধ করেছেন, ধূসর হয়ে গেছে তাঁর মানস-দিগন্ত, হৃতবিশ্বাস না-হ'লেও বেশ-খানিকটা হতাশ্বাস ও প্রশ্ন-কণ্টকিত হয়ে উঠেছে তাঁর জাগতিক নিরীক্ষা। কিন্তু আতঙ্ক, বিক্ষোভ এবং সবরকমের পলায়নী মনোবৃত্তি থেকে সর্বদা মুক্ত ছিলো তাঁর মন। পূর্ববর্তী মৃত্যুরাগকে পলায়নী ভাবাবেশ এমন-কি ভাবালুতা বলতে চাই আমি। শেষ বয়সের কাব্যে মৃত্যুর উল্লেখ যথেষ্ট পাওয়া যায়, কিন্তু সুর ভিন্ন, ভাব কতকটা ট্র্যাজিক, কতকটা শৈব; বৈষ্ণব নয় মোটেই। "মৃত্যু-দূত এসেছিল হে প্রলয়ংকর তব সভা হতে"—প্রলয়েরই দূত মৃত্যু, প্রেমের নয়। জাগতিক প্রলয়কেও কখনো-কখনো আসন্ন বোধ করেছেন তিনি ঐ-বয়সে।

'বলাকা'তেই ভিন্ন সুর দেখা যায়। জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর কোনো মধুর মিতালি নেই, আছে মৌলিক বৈরিতা।

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে,
পাকে পাকে ফেরে ফেরে
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে।
...   .
তবুও মরিতে হবে, এও সত্য জানি।...
মোর আঁখি এ আলোকে লুটিবে না,
মোর হিয়া ছুটিবে না
অরুণের উদ্দীপ্ত আহ্বানে।

জগৎকে ভালোবাসার সত্য যেমন আনন্দময়, জগৎকে চিরতরে ছেড়ে যাওয়ার সত্যও কি তেমনি আনন্দময় হ'তে পারে কখনো ? জীবিতের চোখে মৃত্যুর চেয়ে সত্য আর কিছু নেই, কিন্তু সে এক ভয়ংকর সত্য।

তবু প্রত্যেকটি শিশু সেই ভয়ংকর সত্যের বিধিলিপি কপালে নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এ-পৃথিবীতে। বিদেহী আত্মা যদি বেঁচেও থাকে কোনো অতীন্দ্রিয় অপার্থিব লোকে, তাতে মায়াবাদী বৈদান্তিক সাধকের তৃপ্তি হ'তে পারে, কিন্তু প্রেমিক কবির সুখ কোথায় ? সত্যবিরোধে জর্জরিত রবীন্দ্রনাথ তবু এমন একান্ত ক'রে চাওয়া এবং এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়ার মধ্যে "কোনোখানে আছে কোনো মিল" এই বিষণ্ণ বিশ্বাসকে 'গীতাঞ্জলি' পর্বের অবশিষ্ট ভক্তি দিয়ে আঁকড়ে ধ'রে রাখতে চাইছেন। অথচ বিশ্বাসের দৃঢ়তা ফোটেনি কবিতাটিতে ('বলাকা', ১৯), বিষাদের ছায়াই ঘন হয়ে আছে। ক্ষিতিমোহন সেন-অনুলিখিত গদ্যব্যাখ্যায় ঐ-বিশ্বাসের সমর্থনে কিছু যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেছেন কবি। যুক্তিটি দুর্বল। তাছাড়া,কবির উপলব্ধি যেখানে প্রতিহত ও ব্যথিত সেখানে যুক্তির মশাল কি পথ দেখাতে পারবে?

'গীতাঞ্জলি'র ভক্ত রবীন্দ্রনাথ কি কোনো সমাধানে পৌঁছেছিলেন ? তৎপূর্বে যে পৌঁছোননি সেটা কয়েক বছর আগে প্রকাশিত 'নৈবেদ্য'-এর একটি সনেটে বোঝা যায়। ৯০-সংখ্যক সনেটের গোড়াতে আমরা দেখি, কবি মৃত্যুকে রীতিমত ভয় করছেন সাধারণ মানুষের মতনই ("ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ডরে")। কিন্তু পরবর্তী অংশে নিজের ভীত-সন্ত্রস্ত মনকে বোঝাচ্ছেন—যাঁর অপার স্নেহ ও আশীর্বাদ এ-জীবনে পেয়েছি, মৃত্যুর পরও নিশ্চয়ই সেই অচেনার মুখ দেখতে পাবো। অবশেষে মৃত্যুর প্রতি যে-ভালোবাসার চেষ্টাকৃত উদ্ভেদ তা যতোটা নৈয়ায়িকসুলভ ততোটা কবিজনোচিত নয় :

জীবন আমার
এত ভালোবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়
মৃত্যুরে এমনি ভালোবাসিব নিশ্চয়।

প্রথমত, অত্যধিকসংখ্যক মানুষ (সবাই তো আর রবীন্দ্রনাথের ভাগ্য নিয়ে জন্মায় না) জীবনে অপর্যাপ্ত দৈবী স্নেহ ও আশীর্বাদ লাভ করে না ; উদাসীনতা নির্যাতন ও অভিসম্পাতও কুড়ায় তার চেয়ে বেশি বৈ কম নয়। দ্বিতীয়ত, কিন্তু

-কবির সঙ্গে তর্ক ক'রে কী হবে। শুধু এই কবিতাতে নয়, 'নৈবেদ্য'-এর অধিকাংশ চতুর্দশপদীতেই রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা স্তিমিত,ধর্মোপদেষ্টা ও সমাজহিতৈষীই প্রকট।

'গীতাঞ্জলি' পর্বের গানগুলি অবশ্য খাঁটি কবিতা, উঁচুদরের কবিতা—কিছু ব্যতিক্রম সত্ত্বেও। সেখানেও যখন দু-একটি গানে মৃত্যুকে প্রিয় সম্ভাষণে আহ্বান করা হয় তখন খটকা লাগে। কারণ 'গীতাঞ্জলি'তে আর যে-দোষই থাক্ কবি-কর্মজনিত কৃত্রিমতার স্পর্শমাত্র নেই কোথাও ; স্বচ্ছ আন্তরিকতাই এই গানগুলিকে কবিতারূপেও চরমোৎকর্ষ দান করেছে। অথচ :

ভরা আমার পরানখানি
সম্মুখে তার দিব আনি
শূন্য বিদায় করব না তো উহারে
মরণ যেদিন আসবে আমার দুয়ারে।

শ্লেষের সুর বেজে ওঠেনি তো গানটিতে? অনিচ্ছাকৃত অবশ্য। সকল প্রাণীর ভরা প্রাণ এবং জীবনের যাবতীয় সঞ্চয় নিতেই তো আসে মরণ,তাকে শূন্য হাতে বিদায় করার সাধ্য কি কারও আছে?

যা কিছু মোর সঞ্চিত ধন
এতদিনের সব আয়োজন
চরমদিনে সাজিয়ে দিব উহারে—
মরণ যেদিন আসবে আমার দুয়ারে।

এমন কথা তো ব্যঙ্গরসিক ভল্‌তেরও বেশ রসিয়ে বলতে পারতেন। এ যেন ডাকাত যখন বুকের কাছে ছোরা এনে সদ্য-পাওয়া মাইনের টাকাটা তলব করছে তখন তাকে বলা—এ-মাসের মাইনের সবক'টা টাকা তোমার হাতে তুলে দিলাম, তুমি আমার এ-দান গ্রহণ ক'রে আমাকে ধন্য করো।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠিক তা বলছেন না। মৃত্যু জোর ক'রে আমাদের সব-কিছু হরণ করতে পারে, কিন্তু ভালোবাসা কেড়ে নেওয়ার শক্তি তো তার নেই। তা-ও দিতে চান রবীন্দ্রনাথ।

যা পেয়েছি, যা হয়েছি
যা কিছু মোর আশা,
না-জেনে ধায় তোমার পানে
সকল ভালোবাসা।

মৃত্যুকে ভালোবাসা—এ কেমন কথা? মৃত্যুকে কি মানুষ সত্যিই ভালোবাসতে পারে? বছরের পর বছর কর্কটরোগের মতো কোনো যন্ত্রণাদায়ক দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগেছে যে হতভাগ্য সে মৃত্যুকে ভালোবাসতে পারে অবশ্য, কেমনা মৃত্যু ছাড়া তার আর-কোনো পরিত্রাণ নেই। এমন লোক আত্মঘাতী হয়েও মৃত্যুবরণ করতে পারে। এই বরণকে বধূর স্বয়ংবরা হওয়ার সঙ্গে তুলনা করা

যেতেও পারে এক ট্র্যাজিক অর্থে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মোটের উপর ঈর্ষণীয়রূপে স্বাস্থ্যবান ছিলেন প্রায় পঁচাত্তর বছর বয়স পর্যন্ত। মাঝে বছর কয়েক এক পীড়াদায়ক রোগে ভুগেছিলেন বটে, তবে তা দুঃসহ বা নৈরাশ্যপ্রদ কোনো রোগ নয়, এবং সম্পূর্ণ রোগমুক্তও হয়েছিলেন লণ্ডনে অস্ত্রোপচারের পর। প্রিয়তম কোনো বন্ধু বা নিকটতম কোনো আত্মীয়কে হারালে অনেকের এমন দশা হয় যে বেশ-কিছুকাল সমস্ত কর্ম অর্থহীন, সমস্ত সুখ বিস্বাদ, সমস্ত ভবিষ্যৎ অন্ধকার ঠেকে, বেঁচে থাকার স্পৃহা নষ্ট হয়ে যায়। তখন মৃত্যুকামনা স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের জীবনে গভীর শোকের ছায়া একাধিকবার পড়েছে, কিন্তু আশ্চর্য আধ্যাত্মিক বলে কৌশলে তিনি সে-সমস্ত দুর্বিপাক কাটিয়ে উঠেছিলেন। সবচেয়ে গভীর এবং জীবনের শিকড় ছিঁড়ে ফেলার মতো শোক ঘটেছিলো তাঁর চব্বিশ বছর বয়সে। এই শোকে কিছুকাল তিনি নিশ্চয়ই মুহ্যমান ছিলেন, কিন্তু খুব বেশিকাল নয়, বছর না-ঘুরতেই শোকের বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠে তাঁর প্রিয়তমা আত্মীয়ার মৃত্যুকে এবং সমস্ত জগৎচরাচরকে প্রকৃত শিল্পীর চোখে দেখতে সক্ষম হলেন। সম্পূর্ণ ক'রে (রবীন্দ্র-অভিধানে তার মানেই সুন্দর ক'রে) দেখবার জন্য যে ইস্থেটিক্ ডিস্-ট্যান্সের প্রয়োজন, মৃত্যু সে-দূরত্ব স্থাপন করলো দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মধ্যে। এটা তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি।

না, শারীরিক বা মানসিক যন্ত্রণায় পিষ্ট হয়ে কখনো মৃত্যু-কামনা করেননি রবীন্দ্রনাথ। এ হেন মানুষী দুর্বলতার ঊর্ধ্বে ছিলেন তিনি। তবু তিনি দু-একটি সত্যিকার মৃত্যু-প্রেমের কবিতা লিখেছিলেন। ফ্রয়েডীয়রা ডেথ ইন্‌স্টিংক্‌টের কথা বলেন—মোটের উপর তা নির্জ্ঞান মনেরই ব্যাপার! প্রত্যেকটি শিশু জন্ম থেকেই মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে আসে। কোনো পরাবিজ্ঞানী (super scientist) ভূমিষ্ঠ শিশুর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যাবতীয় ব্যাপার সূক্ষ্মতম (অদ্যাবধি অনাবিষ্কৃত) যন্ত্র-পাতির দ্বারা পর্যবেক্ষণ করতে পারলে বলতেন: মৃত্যুর দিকে একটা অব্যর্থ গতি দেখা যাচ্ছে এই নবজাতকের দেহে। যৌবন পার হয়ে গেলে তো সে-গতি সকলের চোখেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফ্রয়েড ভাবেন যে এই শারীরিক মরণাভিমুখী গতির একটি প্রতিফলন মনের আয়নায় হ'তে বাধ্য, চৈতন্যের স্তবকে তা সুগোচর না-হ'লেও! গতি যখন আছে তখন গন্তব্যের দিকে একটা আকর্ষণ অনুমান করা মোটেই অসঙ্গত নয়—যথা আপেল পড়া থেকে মাধ্যাকর্ষণ (যদিও উপাখ্যানটি ভিত্তিহীন)। আজকাল অনেকে কবিতার তথা যাবতীয় শিল্পকলার উৎস খোঁজেন অবচেতন মনে। রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃত গানটি কি তবে ফ্রয়েডীয় ডেথ ইন্‌স্টিংক্‌টের কাব্যিক প্রকাশ? এই গানে মৃত্যু শুধু প্রেমিকরূপে নয়, বররূপেও অঙ্কিত—"বিজন রাতে পতির সাথে / মিলবে পতিব্রতা"। আমি অবশ্য কবিতার মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার পক্ষপাতি নই, মনোবিকলনিক ব্যাখ্যার তো নয়-ই। তাছাড়া, ডেথ ইন্‌স্টিংক্‌ট বিষয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যেই যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে।

ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা
মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমারে কথা।

জীবনের অবসানকে জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা বলার মানে কি? কারো ব্যক্তিসত্তা যখন সৃষ্টিকর্মে, কল্যাণব্রতে বা জ্ঞানের সাধনায় পূর্ণ প্রস্ফুটিত তখনই তার মৃত্যু ঘটলে (যেমন রবীন্দ্রনাথ, গান্ধি বা আইনস্টাইনের বেলা) সে বিশেষ ক্ষেত্রে মৃত্যুকে জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা বলা যেতেও পারে—এই অর্থে যে আরো কয়েক বছর বেঁচে থাকলে, এবং সে মহান ব্যক্তিস্বরূপের ক্রমিক অবক্ষয় ও দৈন্য আমাদের চোখের সামনে ঘটতে থাকলে, অত্যন্ত পীড়িত হ'তো আমাদের মানবগরিমার উপলব্ধি ও তাঁর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধানিবেদন। কিন্তু যাঁদের মৃত্যু ঘটে বহু বৎসরের জরা অর্থাৎ শারীরিক মানসিক ও চারিত্রিক অবক্ষয়ের পর (কারো নাম করতে সংকোচ বোধ করছি) তাঁদের অতি করুণ মৃত্যুও কি জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা? আর যাঁরা মারা যান প্রস্ফুটিত না-হয়েই, আপন অত্যল্প জীবনের পরিধির মধ্যে কোনোপ্রকার পূর্ণতা অর্জন করবার সুযোগ না-পেয়েই (যেমন তরুণ কবি সুকান্ত কিংবা বালক-শিশু অমল) এঁদের ট্র্যাজিক মৃত্যুর মধ্যে কী পরিপূর্ণতা আবিষ্কার করতে পারি আমরা? শেষ পরিপূর্ণতা বলা তো প্রায় নিষ্ঠুর ঠেকে। সত্যি কথা বলতে কি এই কবিতাটির মর্ম আমি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারি না। ভালো লাগে কিন্তু সাড়া জাগে না মনে। সে যা-ই হোক কিঞ্চিৎ বিস্ময় ও হতাশার সঙ্গে লক্ষ করি যে 'ডাকঘর'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে অমলের জীবন ও মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে খুঁজে-পেতে 'গীতাঞ্জলি'র ঠিক এই কবিতাটিই উদ্ধার ক'রে এনেছেন অজিতকুমার চক্রবর্তী।

একটি ফুটফুটে সুন্দর বালক কবির মন নিয়ে সবাইকে সব-কিছুকে দেখে, ভালোবাসে; মনমরা হবার যথেষ্ট কারণ আছে তবু তার মন খুশিতে ভরা, সেই ভরা খুশি সে ছড়িয়ে দেয় চারিদিকে। যেখানে যা আছে সব কেবলই দেখে বেডাবার জন্য সে ব্যাকুল। কিন্তু কঠিন রোগে ভুগে শরীর তার এত দুর্বল যে থেকে-থেকে তার ঘুম আসে, জানালার পাশে ব'সে সে যা দেখতে পারতো তা-ও দেখা হয় না। অল্পদিনের মধ্যে শেষ নিদ্রায় তার চোখ বন্ধ হ'য়ে গেলো। এই তো নাটকের উপাখ্যান। অথচ দর্শকের মন বিষণ্ন হ'লেও কশাহত বা দিশাহারা বোধ করে না, যবনিকাপাতের পর বিশ্ববিধানের প্রতি, সৃষ্টিকর্তার প্রতি তিক্ততায় বা বিদ্রোহে ভ'রে ওঠে না। বরঞ্চ য়েট্‌স্ 'ডাকঘর' সম্বন্ধে যে-মন্তব্য করেছিলেন তা-ই সত্য: **"...conveys to the right audience an atmosphere of gentleness and peace."**

যেখানে বিশ্ববিধানের প্রতি প্রচণ্ড বিক্ষোভ জাগবার কথা সেখানে বিনম্র মধুর প্রশান্তি জাগাতে সক্ষম হলেন রবীন্দ্রনাথ—এটাই তাঁর আশ্চর্য কলাকৌশল। ভাবতে ইচ্ছা করে যে ঘটনাবিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে এমন অপ্রত্যাশিত রসানুভূতি

সঙ্কারের কথাটা মনে রেখেই এডোয়ার্ড টমসন রায় দিয়েছেন : "and within its limits an almost perfect piece of art." এই নাটকীয় কলাসিদ্ধি সম্ভব হয়েছে ব্যঞ্জনার দ্বৈতে, বৈপরীত্যে। নাটকটি একাধারে বিয়োগান্ত ও মিলনান্ত ; অমলের ব্যর্থ রিক্ত জীবনই যেন তার সার্থক সুন্দর স্বপ্ন। তার বিবাগী হৃদয় সুদূরের জন্য ব্যাকুল ছিলো, প্রাণের মূল্যে সে তার কল্পনার রাজাকে পেলো। এই পারত্রিক অর্থদ্যোতনা নাটকের মধ্যে রয়েছে, তাতে ভুল হবার কথা নয়। ভুল হয় যখন আমরা এইখানে থেমে যাই এবং ধ'রে নিই যে এটাই নাটকের মূল ভাব, এমন-কি একমাত্র ভাব। অথচ এটা মূল ভাব হ'তে পারে না, কেননা এর সঙ্গে নাটকের উপাখ্যান ও নায়ক চরিত্রের বেশ-খানিকটা আড়াআড়ি সম্পর্ক রয়েছে। তৎসত্ত্বেও ইঙ্গিতটি আনা হয়েছে নাটকে প্রশান্তি ও নম্র মাধুর্যের ভাব ফুটিয়ে তোলার জন্য। নইলে দর্শকের হৃদয়ের উপর নাটকের অভিঘাত হ'তো ঠিক উল্‌টো। নাটকের মূল ভাব তবে কী? রূপকের ভাষাতেই যা অভিব্যক্ত, তাকে বিশ্লেষণ ক'রে সাদামাটা গদ্যে অনুবাদ করা সম্ভব না-হওয়ারই কথা। তবু রবীন্দ্রনাথ কী বলতে চেয়েছেন, কান পেতে শুনলে তার কতকটা শোনা যায় বৈ-কি।

অমল অনেক-কিছু চেয়েছিলো তার ভাগ্যহত জীবনে ; সবচেয়ে নিবিড়ভাবে চেয়েছিলো সুধা বাগান থেকে ফুল তুলে বাড়ি ফিরবার পথে তার হাতে একটি ফুল দিয়ে যায় যেন। সুধা ফুল নিয়ে এলো ঠিকই, তবে তখন অমল মারা গেছে। উপরন্তু, সুধা এই কথাটা বিশেষ ক'রে অমলকে জানাতে চেয়েছিলো যে সে তাকে ভোলেনি। কিন্তু অমলকে তা জানতে দেননি ভগবান। তার বদ্ধ বঞ্চিত জীবনে এটাই হ'তো তার সবচেয়ে বড়ো সুখ। কিন্তু এটুকুও হ'লো না। যবনিকাপাতের পর আমার কানে যেন বাজতে থাকে—"এমন নিষ্ঠুর করুণ দৃশ্য আমি দেখেছি অনেক, তুমিও দেখে থাকবে; আমার মতন দীর্ঘজীবন লাভ করলে আরো অনেক দেখবে। তবু ভগবানকে অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টিকে প্রত্যাখ্যান কোরো না, ধিক্কার দিয়ো না। সে-ধিক্কার শুধু তোমার মনকেই বিকারগ্রস্ত করবে। হৃদয়কে প্রসারিত ক'রে ভূমাকে গ্রহণ কোরো শ্রদ্ধার সঙ্গে। কিন্তু তার আগে তাকে সহ্য করতে শিখতে হবে—পিতা যেমন পুত্রকে, বন্ধু যেমন বন্ধুকে ('সখেব সখ্যুঃ'), প্রেমিক যেমন প্রিয়াকে সহ্য করে। ভালোবাসে ব'লেই সব সহ্য করে। তেমনি ক'রে তুমিও ভালোবেসো শুভাশুভে বিচিত্র তবুও অপরূপ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে। পূর্ণবয়স্ক হোক্, স্বচ্ছদৃষ্টিসম্পন্ন হোক্, ইস্পাতকঠিন হোক্ সে-ভালোবাসা। তবেই তা অটুট থাকবে। অমলের মৃত্যু আমার খুব কাছের কয়েকজনের নিষ্ঠুর মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয় আমাকে তবু সে-মৃত্যুতে তোমার চিত্ত প্রশান্ত থাক্, পরিস্নিগ্ধ হোক্। অমলের জীবনে যেমন তার মৃত্যুতেও কি তেমনি একটি বিরাট রহস্যময় সৌন্দর্যের রূপরেখা ফুটে ওঠে না তোমার চোখে? ঈশ্বরের সৃষ্টি তোমার সৃষ্টির অপেক্ষায় আছে, তোমার দৃষ্টিরও।

ভূমাতেই সুখ, তবে তা কোনো সহজ সুখ নয়। সে-সুখে বুক ভ'রে ওঠে, ফেটেও যায়। আর ভূমা তো ফুলের বাগান নয়: অথবা সেই বাগান যার অনেক গাছ জল না-পেয়ে শুকিয়ে যায়, অনেক কলি না-ফুটতেই ঝ'রে পড়ে, অনেক ফুলে কীট ধরে।" অন্তত আমার রসগ্রহণে রবীন্দ্র-কাব্যসৃষ্টির শেষ দশ বৎসরের শ্রেষ্ঠ ফসলের মূলভাবও এই; প্রথম যৌবনে রচিত 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এরও।

সাধারণ মানুষের মতো সন্ন্যাসীও ছিলো রাক্ষসী প্রকৃতির কবলে অসহায় দাস। কিন্তু বিদ্রোহ জেগে উঠলো তার অন্তরে, সে প্রতিজ্ঞা করলো—একদিন নেবো প্রতিশোধ। দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যার পর তার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হ'লো, "বিশ্ব ভস্ম হয়ে গেছে জ্ঞানচিতানলে...স্নেহ প্রেম দয়া—শ্মশানে পড়িয়া আছে তাদের কঙ্কাল।" গুহা থেকে বেরিয়ে সে দেখলো ধরা অতি ক্ষুদ্র, প্রকৃতি শ্রীহীন, বিস্বাদ; মানুষ নির্বোধ, অবজ্ঞেয়।

তবু অহংকারে কিছু বাড়াবাড়ি ছিলো। অনাচারী রঘুর পিতৃমাতৃহীন কন্যা যখন গ্রামবাসীদের কাছ থেকে আশ্রয়ের বদলে শুধু ঘৃণাই পেয়ে সন্ন্যাসীর কাছে নিরাশ কণ্ঠে আশ্রয় চাইলো তখন সন্ন্যাসী তাকে কাছে ডেকে নিলো। তার পিতৃ-সম্বোধনে মনের কোনো-এক নিভৃত, এখনো পর্যন্ত না-ছেঁড়া তার সাড়া দিয়ে উঠলো। ধীরে-ধীরে করুণা মমতা স্নেহ সব-ক'টি হৃদয়বৃত্তিই জাগলো সন্ন্যাসীর মনে। বারে-বারে সে চাইলো বন্ধনমুক্ত হ'তে, বালিকাকে ছেড়ে সে চ'লে গেলো দূরে বনের মধ্যে। কিন্তু বালিকা আবার তাকে খুঁজে বার করলো, সন্ন্যাসীর আত্মসমাহিত হওয়ার চেষ্টা আবারো ব্যর্থ হ'লো, বন্ধন আরো দৃঢ় হ'তে লাগলো। অবশেষে বালিকাকে সে তার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবেসে ফেললো, তার সরল প্রাণভরা কথায় হাসিতে গানে খেলায় সন্ন্যাসীর এতই আনন্দ হ'লো যে সে-ভালোবাসা ও আনন্দ ঐ ছোটো মেয়ের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে আর আবদ্ধ রইলো না, উপচে গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত জগৎময়।

বনে পালিয়ে গিয়ে হৃদয়বৃত্তি-নিরোধের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর লোকালয়ের দিকে এগুতে-এগুতে "যাক রসাতলে যাক সন্ন্যাসীর ব্রত" ব'লে সে ছুঁড়ে ফেলে দিলো তার দণ্ড কমণ্ডলু। প্রকৃতি ও মানুষ তার চোখে বড়ো সুন্দর ঠেকলো, বড়ো আনন্দময়। যে-বিশ্বকে "মহা মৃতদেহ" মনে হয়েছিলো নাটকের গোড়াতে, তারই প্রত্যেকটি জিনিস আজ তাকে মুগ্ধ করলো, "জগতের মুখে একি হাস্য হেরি/ আনন্দ তরঙ্গ নাচে সূর্য-চন্দ্র ঘেরি।" নাটক সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন: "শেষ কথাটা এই দাঁড়াল—শূন্যতার মাঝে নির্বিশেষের সন্ধান ব্যর্থ, বিশেষের মধ্যেই সেই অসীম প্রতিক্ষণে রূপ নিয়ে হয়েছে সার্থক, সেইখানে যে তাকে পায় সেই যথার্থ পায়।"

কিন্তু তার পরেও কথা আছে। যে-বালিকার প্রতি উচ্ছল স্নেহ সন্ন্যাসীকে জগতের সব-কিছু ভালোবাসতে শেখালো, গ্রামে ফিরে এসে স্বভাবতই সর্বপ্রথমে

তারই খোঁজ করলো সে। অনেক খোঁজার পর অবশেষে গুহার মুখে তাকে আবিষ্কার করলো—মাটিতে প'ড়ে আছে তার নিশ্চল হিমশীতল দেহ। এ কি প্রকৃতির প্রতিশোধ, না প্রকৃতির চ্যালেঞ্জ? ঈশ্বরের চ্যালেঞ্জ বললাম না, কারণ ঈশ্বরের উল্লেখ নেই এ-নাটকে; সন্ন্যাসীর উপান্ত উপলব্ধিতে ঈশ্বর আনন্দতরঙ্গ-হিল্লোলিত বিশ্বজগৎরূপেই উদ্ভাসিত। জগৎকে সে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করে-ছিলো, শেষে জগৎ তাকে প্রেমের বন্ধনে নিবিড় ক'রে বাঁধলো—এই হ'লো প্রকৃতির প্রতিশোধ।

কী তার চ্যালেঞ্জ? যে মধুর, ক্ষীণ অথচ লৌহ-কঠিন শৃঙ্খলে সন্ন্যাসী বাঁধা পড়েছিলো, সেই শৃঙ্খলটি যদি ছিন্নভিন্ন হয়ে ধুলায় লুটিয়ে পড়ে নাটকের শেষ দৃশ্যে, তবে তাকে কোন্ টানে জগৎ টানবে! সন্ন্যাসীর বিশ্বপ্রেম তো আপনি জাগেনি,প্রথম দৃশ্যে তার যে আত্মস্থ ও আত্মতৃপ্ত ভাব দর্শকের কাছে প্রকট হ'লো তার মধ্যে এর কোনো পূর্বাভাস ছিলো না, কোথা থেকে একটি অনাথ অশুচি বালিকা এসে প্রতিরোধের সমস্ত দেওয়াল ভেঙে ফেলে সন্ন্যাসীর হৃদয়ে প্রবেশ করলো; সেই ছিদ্রপথ দিয়ে যেন পিছনে-পিছনে ঢুকে পড়লো বিশ্বজগৎ। মাঝখান থেকে বালিকাটি যদি জাগতিক নিয়মের অব্যর্থ পরিণামে খসে পড়ে তবে কি জগতের অর্থাৎ ভগবানের আসন সন্ন্যাসীর হৃদয়-মনে অটল থাকবে, নাকি এই প্রচণ্ড ধাক্কায় ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে? যে জগৎকে সে এত ভালোবাসতে শিখলো বালিকার হাত ধরে, সেই জগতের এই অর্থহীন "নিদারুণ প্রতিশোধে" কি বিমূঢ় চিত্তে বিদীর্ণ হৃদয়ে আবার সে ফিরে যাবে তার গুহার নিরেট অন্ধকার একাকীত্বে? নাটক শেষ হয়েও যেন শেষ হয় না, প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগতে থাকে, আর আমাদের আন্দোলিত চিত্ত উত্তর খুঁজে বেড়ায় পরবর্তী অলিখিত অঙ্কে। তার কি কোনো নির্দেশ রেখে গেছেন রবীন্দ্রনাথ? লিখিত অঙ্কে হয়তো রেখে যাননি স্পষ্ট অক্ষরে। কিন্তু সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই ক্ষুদ্র নাটিকাটি বৃহত্তর ইঙ্গিতে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে ওঠে।

সন্ন্যাসীর মনে নাটকের প্রারম্ভে ছিলো কেবল বৈরাগ্য: শেষের অব্যবহিত পূর্বে দেখি কেবল অনুরাগের স্রোতে সে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে, নিজের মনের উত্তরঙ্গ আনন্দে সে ব'লে উঠল—"আমি এ জগৎ হেরি কী আনন্দময়।" কিন্তু জগৎ যে কী দুঃখময় তা-ও তাকে নিজের প্রচণ্ড দুঃখের মধ্যে জানতে হবে। রবীন্দ্রনাথ কেবল রোম্যাণ্টিক প্রেমের কবি নন, বৈরাগ্য-পরিস্রুত অনুরাগের কবি; কেবল সুরক্ষিত আনন্দের কবি নন, তীব্রতম দুঃখে পোড়-খাওয়া সুস্মিত প্রশান্তির কবি। তাঁর সাহিত্যের "কঠিন সত্য" এই। সন্ন্যাসী যখন গুহাশ্রিত বৈরাগ্যসাধনের অসারতা বুঝতে পেরে সন্ন্যাস-ব্রত ভঙ্গ ক'রে সুখী সংসারের স্বপ্ন দেখছে:

> **একটি কুটিরে মোরা রহিব দুজনে,**
> **রামায়ণ হতে তারে শুনাব কাহিনী—**

সন্ধ্যার প্রদীপ জেলে, শাস্ত্রকথা শুনে,
বালিকা কোলেতে মোর পড়িবে ঘুমায়ে।

ঠিক তখনি এলো দারুণতম আঘাত, তার স্বপ্নকে খান-খান ক'রে দিয়ে তার জীবনকে ওলট্-পালট্ ক'রে নতুনতর ছাঁচে ঢেলে দিতে।

সন্ন্যাসী সংসার থেকে পালিয়ে গিয়ে মানুষ ও প্রকৃতিকে অবজ্ঞা ক'রে গুহার অন্ধকারে বসেছিলো ধ্যানে। সেটা কোনো পথ নয়, পথের উৎকট ভেংচানি। সুতরাং আবার তাকে দিবালোকিত লোকালয়াভিমুখী পথে বেরিয়ে আসতে হ'লো কিন্তু সত্যের পথ কোনো সহজ পথ হ'তেই পারে না। সন্ধ্যার প্রদীপ জেলে শাস্ত্রকথা শুনে প্রিয়তমা কন্যা কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়বে—এইখানে মানব-জীবনের সুখসমাপ্তি নয়,প্রাকৃতিক কিংবা ঐশীবিধান তা নয়। বিধান বড়ো কঠোর, 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'লিখবার অল্পকাল পরে নাট্যকারের নিজের জীবনেএমনি এক মর্মঘাতী মৃত্যু এসেছিলো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভেঙে পড়েননি ; বরঞ্চ গ'ড়ে উঠলেন। "জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে-দূরত্বের প্রয়োজন মৃত্যু সে-দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল।" সন্ন্যাসীর বেলায়ও তা-ই ঘটবে, সেইখানে প্রকৃত যবনিকাপাত। বিয়োগান্ত নাটিকার শেষে মিলনান্ত নাটকের ইঙ্গিত রয়েছে।

সহসা দারুণ দুঃখতাপে
সকল ভুবন যবে কাঁপে
সকল পথের ঘোচে চিহ্ন,
সকল বাঁধন যবে ছিন্ন,
মৃত্যু-আঘাত লাগে প্রাণে—
তোমার পরশ আসে কখন কে জানে।

সেই রবীন্দ্রনাথকে আমি অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেছি যিনি দুঃখের কবি, মৃত্যুর কবি হয়েও, আনন্দের কবি, অমৃতের কবি। গানে 'তোমার' বলতে কী বোঝায় সেটা একটু অস্পষ্ট র'য়ে গেছে ; অস্পষ্টই থাক্। নিশ্চয়ই তা ধর্মশাস্ত্রের চিরকরুণাময় পরম শক্তিমান জনগণমঙ্গলদায়ক ভাগ্যবিধাতা নয়। ভীষণের মধ্যে মধুরকে এবং মধুরের মধ্যে ভীষণকে (identity of terror and bliss") দেখতে পাওয়ার মতো দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন রবীন্দ্রনাথ—যেমন সব মহাকবি, মহাশিল্পী ক'রে থাকেন। অসামান্য বালকের রোগক্ষয়, সামান্যা বালিকার নিরাশ্রয় মৃত্যু—এ-সবের মধ্যে "তোমার পরশ" বোধ করেন যিনি তাঁকে দাদূ, কবীর প্রভৃতির তুল্য বিশুদ্ধ ভক্তকবি জ্ঞান করা সম্ভব নয়। য়েট্‌স্-এর মতন এত বড়ো অসাধারণ সংবেদনশীল সহৃদয় পাঠকের পক্ষে তা কেমন ক'রে সম্ভব হয়েছিলো তা-ই ভাবি।

পুনশ্চ : প্রবন্ধের এক জায়গায় "বিশ্ববিধানের 'পরে ধিক্কার জন্মায়" রয়েছে, অন্যত্র বিশ্ব-বিধানকে ধিক্কার না-দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বিরোধ দুই ভিন্ন দৃষ্টিকোণ-জনিত। চারিত্র্য-

নৈতিক ও নান্দনিক। ধিক্কার চারিত্র্যনৈতিক বিচার থেকে আসে এবং প্রকৃতপক্ষে মানবিক বিধানের প্রতিই প্রযোজ্য, প্রাকৃতিক বিধানের প্রতি নয়। বন্যায় হাজার হাজার লোক মারা গেলে বন্যা-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাকে এবং ব্যবস্থাপকদেরকে সঙ্গতভাবে ধিক্কার দেওয়া যায়, কিন্তু বাষ্প-মেঘ-বৃষ্টিকে অথবা তারা যে-বিশ্বনিয়মের শাসনাধীন তাকে ধিক্কার দেওয়া অর্থহীন। অবশ্য কামুর মতো আমরা এক কাল্পনিক কুচক্রী বিশ্ববিধাতাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তাকে দোষী সাব্যস্ত ক'রে মনের সুখে গাল পাড়তে পারি, তার প্রতি "দার্শনিক বিদ্রোহ" ঘোষণা করতে পারি, ইত্যাদি। কিন্তু এ-সব সাহিত্যিক শব্দচ্ছটা মাত্র। আসল কথা হচ্ছে যে, প্রকৃতির সংহার-মূর্তি দেখে আমরা নিত্য সুপরিকল্পনারত পরম কল্যাণময় বিশ্ববিধাতার অস্তিত্ব-বিষয়ে সন্দিহান হয়ে উঠি। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য দেশ-বিদেশের মানসিক বীভৎসতা দেখেই ধিক্কার বোধ করেছিলেন। 'বিশ্ববিধান' শব্দটাকে এখানে আলংকারিক অতিরঞ্জন ভাবা যেতে পারে। ভূমার কথা যখন তিনি বলেন তখন ভূমা থেকে ভূমাধিরাজকে পৃথক ক'রে দেখেন না। ভূমার যে-অনন্তরূপ রবীন্দ্রনাথের নান্দনিক দৃষ্টিকে বিষণ্ণ আনন্দ দিয়েছে তা একাধারে ভয়ংকর এবং মনোহর, তাকে ধিক্কার দেওয়া মূঢ়তা।

এ দুর্লভ প্রেম

"সব বুঝতে পারা মানে সব ক্ষমা করা।" ব্যতিক্রম অনেক পাওয়া যাবে, কোনো-মতেই ক্ষমার যোগ্য নয় এমন মানুষের বা কর্মের নজীর সংবাদপত্র থেকে, ইতিহাস থেকে, উপন্যাস থেকে খুঁজে বার করতে খুব বেশি বেগ পেতে হবে না। তবু ফরাসী প্রবাদবাক্যটি অন্য-সব প্রবাদবাক্যের মতনই আপন নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে সত্য। উল্‌টোটাও কম সত্য নয়; যাদের স্বভাবে ক্ষমা কম, অতো শত বুঝে দেখবার ধৈর্য তাদের থাকে না। সরল বিচারের পর সরল কর্তব্যের বাঁধানো পথ দিয়ে তারা দ্রুত হাঁটে। একটু পরেই হয়তো অনুতাপে দগ্ধ হয়। না, ঠিক অনুতাপে নয় (কারণ তারা তো কর্তব্যই করেছে) দগ্ধ হয় হৃদয়তাপে, কাঁদায় যতো নিজেও তার চেয়ে খুব কম কাঁদে না। কর্তব্য যেখানে বস্তুতই জটিল এবং দ্বিধাবিভক্ত সেখানে সহজ সমাধান ট্র্যাজিক হয়ে পড়ে অনেক সময়। যেমন হয়েছিলো বজ্রসেনের বেলায়।

উত্তীয় যখন শ্যামাকে বলে "ন্যায়-অন্যায় জানি নে, জানি নে, জানি নে, শুধু তোমারে জানি",সে কোনো গভীর জ্ঞানের কথা বলতে চায়নি,বলতে পারার মতো বয়স তার হয়নি ; শ্যামার জন্য সব-কিছু করতে, সব-কিছু হারাতে সে প্রস্তুত— এইটুকু জানাতে চেয়েছিলো তার তরুণ কিন্তু পূর্ণবিকশিত প্রেম। নাটকীয় প্রসঙ্গ-ক্রমে কথিত এই পঙ্‌ক্তিটি কিন্তু তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে কোনো অবিস্মরণীয় লিরিকের মূল সূত্রটির মতো আমাদের নিঃসঙ্গ মুহূর্তের সঙ্গী হয়ে ওঠে, আপন সীমিত অর্থ ছাড়িয়ে দূর-দূরান্তরে টেনে নিয়ে যায় আমাদের জীবন-ভাবনাকে। মনে হয় এই নীতিগর্ভ অথচ নীতিপারের নাটকে মানব-জীবনের অতি দুর্বোধ্য জটিলতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ আটাত্তর বৎসরের বহু বিচিত্র বেদনায় দগ্ধবিদগ্ধ রবীন্দ্রনাথও যেন বলতে চাইছেন : মানুষকে হৃদয় দিয়ে বোঝো, ছককাটা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে চেয়ো না। অথচ পাপপুণ্যের প্রশ্নটা পদে-পদেই কণ্টকিত হয়ে ওঠে নাটকীয় ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে। নাটক শুরু হয় নগর-কোটালের আক্ষরিক অর্থে সাংঘাতিক অন্যায় অপবাদে, চূড়ান্ত পর্বে পৌছোয় নায়িকার আপাত অক্ষমার্হ অপরাধ-স্বীকারে, শেষ হয় নায়কের ক্ষমাহীনতার আত্মগ্লানিতে।

জনৈক যুবক, একটি তরুণ এবং অপেক্ষাকৃত পূর্ণবয়স্কা এক নারী (তাদের বয়ঃক্রম কি পঁচিশ, ষোলো এবং বত্রিশ ?) এই তিনটি প্রেমিক-হৃদয়ের উপাদানে গীতিনাট্য 'শ্যামা' রচিত। নৃত্যনাট্য না-ব'লে গীতিনাট্য কেন বলছি তার কৈফিয়ৎ

শেষ পৃষ্ঠার পাদটীকায় পাওয়া যাবে। তিনজনকে এক নিদারুণ অন্তিম পরিস্থিতির মধ্যে ফেলেছেন নাট্যকার—তাদের নৈতিক প্রতিক্রিয়া কিংবা চারিত্র্য যাচাই করার জন্য নয়, বহিরাচরণের বালুকায় ঢাকা আভ্যন্তরীণ ফল্গুধারার গতিবিধির স্বরূপ খানিকটা উদঘাটন করবার জন্য। হৃদয়মনের এতটা গভীরে জ্ঞানের আলো অবশ্য পৌঁছোয় না। কবির রসদৃষ্টি (যা রসসৃষ্টি থেকে অভিন্ন) তবু হাল ছাড়ে না, অন্ধকারে-প্রদোষান্ধকারে পথ খুঁজে বেড়ায়; তমসার পরপারে অথবা তমসার মধ্যেই কিছু হয়তো দেখতে পায়, নইলে কবিতা কবিতাই হ'তো না। অন্তিম পরিস্থিতি (**extreme situation**) কথাটা চালু করেছেন য়াস্‌পার্স: বলছেন জীবনমৃত্যু একাকার হয়ে যায় এমন দুঃসহ-যন্ত্রণাময়, অপার-সংকটঘন অবস্থায় না-পড়লে আমরা জীবনের তথা জগতের সীমাহীনতা এবং দৈনন্দিনের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করতে পারি না।

জাতকের শ্যামা ছিলো অগ্রগণিকা, সাজবদলের মতো প্রেমিক-বদলও তার হামেশাই ঘটতো। যার প্রতি সে সাময়িকভাবে আসক্ত হ'তো তাকে বশীভূত করা ঐ অপরূপ সুন্দরীর পক্ষে দুঃসাধ্য ছিলো না মোটেই; দরকার হ'লে যে-কোনো অবাঞ্ছিত প্রেমিককে জন্মের মতো সরিয়ে ফেলার ছন্দ-কৌশলও তার অভ্যাসসিদ্ধ ছিলো। বজ্রসেনের রূপ দেখে সে মুগ্ধ হ'লো, কিন্তু ঐ মন-কাড়া যুবকটি তখন নগর-কোটালের হাতে বন্দী; প্রাণনাশ তার আসন্ন। কাজেই "চেটিকে ডাকিয়া রাজপুরুষদের নিকট পাঠাইয়া বলিল—তোমাদের বহু হিরণ্য দান করিব। অন্য এক পুরুষকে পাঠাইতেছি, তাহার পরিবর্তে বজ্রসেনকে ছাড়িয়া দিয়ো। রাজপুরুষেরা স্বীকৃত হইল। শ্যামার গৃহে উত্তীয় নামক এক শ্রেষ্ঠীপুত্র বাস করিত। শ্যামা ছলপূর্বক তাহাকে ভোজন-পাত্রসহ শ্মশানস্থিত বজ্রসেনের নিকট পাঠাইল। রক্ষীগণ শ্যামার ইঙ্গিত অনুসারে উত্তীয়কে হত্যা করিয়া বজ্রসেনকে মুক্তি দিল।"

রবীন্দ্রনাথের শ্যামা ভিন্ন জাতের, শুধু ভিন্ন জাতের নয়, ভিন্ন যুগের মানুষ। রাজনটী সে, নৃতগীতে অসাধারণ গুণবতী, সুন্দরীশ্রেষ্ঠা, আমাদের কালের চিত্রতারকাদের মতোই লক্ষ প্রাণের পুত্তলী। তবু আমোদপ্রমোদে ভোগ-বিলাসে আত্মবিস্মৃতা নয় সে, বরং খুবই আত্মসচেতন। সখীরা তাকে "গরবিনী" বলে কিন্তু তারাও বোঝে যে এ-গর্ব রূপের নয়, ধনের নয়, মানের নয়। কিসের তবে? সখীদের অবশ্য বুঝবার কথা নয় যে এ-গর্ব তার প্রেমিক-হৃদয়ের অভিজাত রুচির। রাজা তার চোখে নগণ্য, নগরশ্রেষ্ঠী ও শ্রেষ্ঠীপুত্ররা তুচ্ছ। যৌবন চ'লে গেলে "কী দিয়ে তখন গাঁথিবে তোমার বরণমালা, হে বিরহিণী"—গায় সখীরা। আন্দাজে বোঝা যায়, যৌবনের প্রান্তে এসেও সে বিরহিণী, কারণ যাকে পেলে তার "পিপাসিত জীবনের ক্ষুব্ধ আশা" মিটতো তাকে সে পায়নি, দেখাই পায়নি তার। কামনার তৃপ্তিতে কোনো তৃপ্তি নেই এই জন্ম-রোম্যান্টিকের গভীরতর তৃষ্ণার। নিজেই সে বলে তার যৌবন অসুন্দর, তার মন বিষাদের কুহেলিকায় ঢাকা।

এই সংরাগরক্ত কিন্তু সূক্ষ্মহৃদয় শ্যামার সঙ্গে একদিকে যেমন জাতকের স্থূলমনা স্বার্থান্ধ শ্যামার আকাশ-পাতাল প্রভেদ চোখে পড়ে, অন্যদিকে তেমনি রবীন্দ্রনাথেরই প্রায় ষাট বছর পূর্বে রচিত অন্য-এক গীতিনাট্যের ('মায়ার খেলা') আত্মনিমগ্না আত্মপ্রসন্না নায়িকার প্রতিতুলনা লক্ষণীয়। দু-জনই নাটকের প্রারম্ভে পুরুষ প্রার্থীদের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনা, দু-জনকেই সখীরা একই ভাষায় পরামর্শ দেয়, "জীবনে পরম লগন কোরো না হেলা, হে গরবিনী"। কিন্তু তাদের মানসিক পটভূমি ও প্রতিক্রিয়া একেবারে বিপরীত। প্রমদার মনে হয় প্রেম ব্যাপারটাই বড়ো বাজে, মিছেমিছি একটা ঝামেলা পাকানো। সে জীবনে অবিমিশ্র সুখ চায় অথচ সে শুনেছে যে প্রেমে অনেক ঝক্কি, অনেক জ্বালাযন্ত্রণা :

পরের মুখের হাসির লাগিয়া
অশ্রুসাগরে ভাসা,
জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া
জীবনের সুখ নাশা —

জেনে-শুনে এই ফাঁদে পা দেবার মতো মেয়ে সে নয়। আর সবচেয়ে গোড়ার কথা হচ্ছে যে সে নিজেরই প্রেমে পড়েছে, তার মনের গড়নটা হচ্ছে আজকালকার ভাষায় যাকে বলে নার্সিসিস্ট্। এবং এটা বুঝবার মতো আত্মবিশ্লেষণী বুদ্ধি তার আছে :

আমি আপনার মাঝে আপনি হারা
আপন সৌরভে সারা
যেন আপনার মন
আপনার প্রাণ আপনারে সঁপিয়াছি।

অনেক যাচনা অনেক সাধ্যসাধনার পর অবশেষে প্রমদা প্রেমে পড়লো। কিন্তু একেই কি বলে প্রেম ? প্রার্থনা মঞ্জুর করা দেবীকে মানায়, মানবীকে নয়। তার হৃদয়মন প্রেমের জন্য এতই অপ্রস্তুত, এতই অনাতিথেয় ছিলো যে সে নিজের প্রেম ঠিক বুঝতেও পারলো না, বোঝাতেও পারলো না। প্রেম বন্যার মতো এসে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো না, কুয়াশার মতো অলক্ষ্যে এসে অলক্ষ্যে মিলিয়ে গেলো। অমরের মনে জেগেছিলো মোহ, কুয়াশার সঙ্গে-সঙ্গে তা কেটে গেলো। প্রমদার মন ছিলো আত্মাভিমানে ভরা, প্রেম চায় আত্মদান ; সুর মিললো না।

পক্ষান্তরে শ্যামার ব্যক্তিত্বের কাঠামো প্রেমের উপাদানে গড়া, এবং সে-প্রেম আত্মপ্রেম মোটেই নয়। তার আত্মমর্যাদা বোধের মধ্যে আত্মকেন্দ্রিকতা খুঁজে পাওয়া যাবে না। নিজেকে দিতেই চায় সে। প্রেমের অশেষ দুঃখ সে বোঝে এবং ঐ তিক্তমধুর দুঃখের জন্য সে শুধু প্রস্তুত নয়, ব্যাকুল। 'পরিশোধ' নামক নাট্যগীতির (এটি 'পরিশোধ' কাহিনী-কাব্য ও 'শ্যামা' গীতিনাট্যের মধ্যপদ) উদ্বোধন-সংগীতে শ্যামা গাইছে :

চরণসেবার সাধনা আনো
সকল দেবার বেদনা আনো

নবীন প্রাণের জাগরণমন্ত্র
কানে কানে বোলো।

প্রথম যৌবন থেকে শ্যামা খুঁজছে সেই উন্নতদর্শন দেবকান্তি পুরুষকে যার হাতে শুধু দেহ নয়, সমস্ত মনপ্রাণ সমর্পণ করা যায়, যার কানে-কানে বলা যায়, "আমার সব সুখদুখমন্থনধন"। সকল দেবার বেদনা নিয়েই সে বেঁচে আছে এতদিন শূন্য পথের দিকে চেয়ে। পথ চাওয়া তার সার্থক হ'লো একদিন আক্ষরিক অর্থে। বাড়ির সামনে পথে যেতেই সে প্রথম দেখেছিলো তার এতদিনের সাধনারধনকে। কিন্তু কী নিদারুণ সে-সার্থকতা। বুঝতে বিলম্ব হয় না যে, জাতক-কাহিনী দু-হাজার বছর পার হয়ে একেবারে আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ রোম্যান্টিক পর্বে এসে পৌঁচেছে অন্তত শ্যামার চরিত্রকল্পনায়।

উদ্ধৃত বিশেষণগুলি লক্ষণীয়। "উন্নতদর্শন" বলতে শুধু রূপবান বোঝায় না, বোঝায় এমন মানুষকে যার মুখশ্রীতে অন্তরের সৌন্দর্য ও চারিত্র্যের আভিজাত্য পরিস্ফুট। শাস্ত্রে বলে শ্রদ্ধয়া দেয়ং; শ্যামা হৃদয়দান করতে চেয়েছিলো শ্রদ্ধার সঙ্গে, শ্রদ্ধার পাত্রকে। সেটাই হ'লো কাল। নিজে যারা শ্রদ্ধেয়, অন্যের কাছে—অন্তত প্রিয়জনের কাছে—তাদের দাবি বড়ো খাটো নয়, ত্রুটিবিচ্যুতি তারা সহজে ক্ষমা করতে পারে না। বজ্রসেন ছিলো যেমন সুন্দর তেমনি শুদ্ধান্তঃকরণ, ন্যায়নীতিপরায়ণ, সদাজাগ্রতবিবেক। প্রথম দর্শনেই শ্যামা বুঝতে পারলো যাকে সে দেখছে সে শুধু সুদর্শন নয়, উন্নতহৃদয়ও। তার মনের তারগুলি ঝংকার দিয়ে ব'লে উঠলো—এই, একমাত্র এই মানুষটিই নবপ্রাণের জাগরণমন্ত্রে আমার শুষ্ক যৌবনকে সুন্দর ক'রে তুলবে। স্বভাবতই তার এতকালের পিপাসাক্লিষ্ট হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা সে এক মুহূর্তে ঢেলে দিলো এই দেবকান্তি পুরুষের চরণে। শ্যামার দেহমনের প্রত্যেকটি অণুপরমাণু বজ্রসেনের প্রেমে হয়ে উঠলো 'মত্ত অধীর'। পরে কী করুণ শোনায় যখন উত্তীয়ের শান্ত ধীর উদাত্ত প্রেমের কথা বলতে গিয়ে সে বলে—"বালক কিশোর উত্তীয় তার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর মত্ত-অধীর।"

তাই ব'লে উত্তীয়ের প্রেমকে একেবারে কামগন্ধহীন ভাবার যথেষ্ট ইঙ্গিত নাটকে আছে যাঁরা মনে করেন, তাঁদের সঙ্গে আমি একমত হ'তে পারি না। উত্তীয় এমন-কিছু বালক নয়—শ্যামা তাকে স্নেহকরুণায় এবং অন্যান্য বয়স্ক প্রার্থীর তুলনায় "বালক কিশোর', ব'লে উল্লেখ করলেও। আহা বেচারী বড়োই ছেলেমানুষ—ভাবটা এইরকম কিছু। গানে আমরা তাকে যতোটা চিনি তাতে তো মনে হয় অন্য দুই নাট্য-চরিত্রের অপেক্ষা উত্তীয় পরিণতবুদ্ধি, স্থিরহৃদয়। সখীরা জানে সে "বিফল বাসনা" বহন করছে, সেই বাসনার অব্যক্তবেদনা "বিরহ প্রদীপে শিখারই মতো নয়নে তোমার উঠেছে জ্বলিয়া"; তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছে—হতাশ হোয়ো না সখা, তোমার তাপস-প্রেমের জয় হবেই। শ্যামা জানে এই তরুণটি তার প্রেমে "মত্ত অধীর"। সে-ধারণা খানিকটা ভ্রান্ত হ'লেও, নিত্যদিনের সাহচর্যে সে

উত্তীয়কে যেমন বুঝেছে তার নারীসুলভ অনুভূতি দিয়ে তা একেবারে ভিত্তিহীন—এ-কথা বিশ্বাস করা শক্ত। আর কামবর্জিত প্রেমকে কোনো অর্থেই "মত্ত অধীর" বলা যায় না। উত্তীয়ের প্রেম কামগন্ধহীন না-হ'লেও তা পারিজাতগন্ধবহ। এই প্রেমের আলোয় আমরা শুধু উত্তীয়কে চিনি না, শ্যামাকেও চিনি। উত্তীয়ের হৃদয়ে এ অপূর্ব, প্রায় অপার্থিব সুন্দর প্রেম তো নিরালম্বভাবে জাগেনি, শ্যামাই জাগিয়েছিলো। এমন প্রেম কোনো নারী শুধু রূপ দিয়ে জাগাতে পারে না, সমগ্র ব্যক্তিস্বরূপ দিয়েই পারে। সে-ব্যক্তিস্বরূপ জাতকের শ্যামার ছিলো না, রবীন্দ্রনাথের শ্যামার ছিলো।

উত্তীয়ের আত্মাহুতির মধ্যে বরঞ্চ বীরোচিত হিতৈষণার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদের কোনো আভাস নেই, নামগন্ধ নেই। সখীরা যখন গায়—"প্রবলের উৎপীড়নে কে বাঁচাবে দুর্বলেরে" তখন তারা ভাবতেই পারে না যে এ-কাজ উত্তীয়ের দ্বারা সম্ভব। শ্যামা যখন নিরুপায় যন্ত্রণায় চারিদিকে ছোটে আর চীৎকার ক'রে গেয়ে ওঠে :

ওগো শোনো, ওগো শোনো, ওগো শোনো
আছে কি বীর কোনো,
দেবে কি ওরে জড়িয়ে মরিতে
অবিচারের ফাঁদে
অন্যায় অপবাদে,

তখন তার কল্পনাতেও ছিলো না যে সে-বীর উত্তীয় হ'তে পারে। বাস্তবেও সে-বীর উত্তীয় নয়।

শ্যামার ডাক শুনে উত্তীয় ছুটে আসে অবশ্য, কিন্তু এসে বলে না যে একজন নির্দোষকে এমন অবিচারের ফাঁদে আমি জড়াতে দেবো না, প্রাণের মূল্যেও তাকে বাঁচাবোই। বলে—"ন্যায় অন্যায় জানি নে, জানি নে, জানি নে, শুধু তোমারে জানি, ওগো সুন্দরী।" তুমি যদি প্রাণ দিতে বলো তবে এখনি দেবো তোমার চরণে; কোন্ ন্যায়সঙ্গত বা অন্যায় উদ্দেশ্যে তুমি আমার প্রাণ চাও তা তুমিই জানো, আমি বিচারক নই, আমি প্রেমিক। উত্তীয়ের একটা প্রেমিক-সুলভ স্বার্থও জড়িত আছে এই আত্মদানে। সে বেশ ভালো ক'রে জানে কোনোদিনই শ্যামার বক্ষলগ্ন হওয়া তার ভবিতব্যে নেই, কারণ ঐ-সুন্দরীশ্রেষ্ঠা তাকে সামান্য প্রশ্রয় দিলেও একটুও ভালোবাসে না। কিন্তু হতাশ অথচ ব্যাকুল কল্পনার চোখে সে একটি মরণোত্তর দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে—তোমার যে প্রাণপ্রিয়কে বাঁচাতে চাও আমার "প্রাণঋণ" নিয়ে :

তাহারি সঙ্গে তোমারি বক্ষে
বাঁধা রব চিরদিন মরণডোরে
কেমনে ছাড়িবে মোরে,
ছাড়িবে মোরে, ওগো সুন্দরী।

নিরাশ প্রার্থনার এত বড়ো উত্তর উত্তীয়ের কাছ থেকে পেয়ে শ্যামা হঠাৎ ছোটো হয়ে গেলো নিজের চোখে। যাকে সে কখনো কিছু দেয়নি, যে কিছুই চায়নি মুখ ফুটে ("এতদিন তুমি, সখা, চাহ নি কিছু, / নীরবে ছিলে করি নয়ন নীচু") আজ সে তাকে দিতে এসেছে মানুষের পক্ষে সবচেয়ে মহৎ, সবচেয়ে চূড়ান্ত দান যা সম্ভব! প্রতিদানে শ্যামা তো প্রেম দিতে পারে না। তবু জীবনের অন্তিম মুহূর্তে উত্তীয় পেলো তার মানস-সুন্দরীর কাছ থেকে অন্তরের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ; যে তাকে এতদিন শুধু করুণামিশ্রিত হাস্যপরিহাসই ক'রে এসেছে, আজ সে তার চরণে প্রণাম জানালো। এই অপ্রেমযুক্ত প্রণতি পেয়ে উত্তীয় যে শেষ গান গেয়ে গেলো ("আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান") তা অবিস্মরণীয়, তবু তার শেষ পঙ্‌ক্তিটি উদ্ধৃত করতে চাই ; "যারে জানো নাই তার গোপন ব্যথার নীরব রাত্রি হোক আজি অবসান" এই লাজুক কিন্তু উচ্চাভিলাষী প্রেমিকের আত্মদানে কি ব্যর্থ হতাশ প্রেমিকের আত্মহত্যার আমেজ ছিলো না স্বল্প পরিমাণেও?

ওগো আমার এই জীবনের
শেষ পরিপূর্ণতা,
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।

প্রেমে পরিপূর্ণতা যদি না-পায় তার জীবন, তবে মরণেই পাক। 'ডাকঘর'-এর অমলের কাছে কিংবা রবীন্দ্রনাথের কাছে মৃত্যু আর ভগবানে ভেদ ছিলো না— এমন কথা কোনো-কোনো সমালোচক বলেছেন ; আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। কিন্তু উত্তীয়ের চোখে মৃত্যু আর শ্যামা একাকার হ'য়ে গিয়েছিলো : মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।

উত্তীয়ের নিরাশ প্রেমের দুর্নিবার পরিণাম তার আত্মাহুতি। একে চূড়ান্ত ব্যর্থতাও বলা যেতে পারে, আবার চূড়ান্ত সার্থকতাও ভাবা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ দুই দিক থেকে দেখাতে চেয়েছেন এই মর্মান্তিক ঘটনাটিকে। দুই দিক প্রায় বিপরীত অথচ পরস্পরকে নাকচ ক'রে দেয় না, নইলে সেই একই সখীদের গানে দুটো রূপ উদ্ঘাটিত হ'তো না। একটি দিক মানবিক, সাধারণ মানুষের, বিশেষত যারা উত্তীয়ের প্রতি দরদী তাদের মনে হ'তেই পারে উত্তীয় তার তরুণ জীবন "নিষ্কারণে" দিলো। সখীরা জানে যে মধুর স্বপ্নাভ প্রত্যাশায় উত্তীয় বুক বেঁধেছিলো তা তো আশার ছলনামাত্র। জীবনকালে যে-সাধন-দুর্লভার হৃদয়ে স্থান হ'লো না, মৃত্যুর পরে (হোক্-না সে মহৎ মৃত্যু) তার হৃদয়ে স্থান হবে—উত্তীয় যদি তা-ই ভেবে থাকে তবে সে নিষ্কারণেই মৃত্যুবরণ করেছে। শ্যামার বুকে যা বাকী জীবন গেঁথে থাকবে তা উত্তীয়ের সুন্দর উদার প্রেম নয়, তার যন্ত্রণাদায়ক বিবেক-দংশক স্মৃতি, এবং সেইসঙ্গে নিজের প্রতি ধিক্কার। তাই সখীদের বিলাপ স্বাভাবিক :

মধুর দুর্লভ যৌবনধন ব্যর্থ করিলি
কেন অকালে
পুষ্পবিহীন গীতিহারা মরণমরুর পারে,
ওরে সখা।

এই গানের অব্যবহিত পরেই রাজপ্রহরী উত্তীয়কে বধ ক'রে বজ্রসেনকে কারামুক্ত করে। তখন সখীরা গেয়ে ওঠে সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরের গান; মনে হয় এ-সুর রবীন্দ্রনাথের আপন মনেরই সুর। সখীদের কণ্ঠে এ-ধরনের আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ব্যক্ত ক'রে নিশ্চয়ই তিনি এই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে সাধারণ মানুষের পক্ষেও সম্ভব অন্তত ক্ষণকালের জন্য এমন-এক নান্দনিক (মিস্টিক?) স্তরে ওঠা যেখান থেকে অতি মর্মন্তুদ মৃত্যুর কালো গহ্বরের ভিতর থেকেও এক অপরূপ আলো দেখা যায়। এই আলো রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনের প্রচণ্ডতম শোকের পরেও দেখেছিলেন, দেখে তাঁর "মনের মধ্যে একটা আকস্মিক আনন্দের হাওয়া বহিতে লাগিল।" সেই আলোরই গান শোনা যায় সখীদের কণ্ঠে:

কোন্ অপরূপ স্বর্গের আলো
দেখা দিল রে প্রলয়রাত্রি ভেদি
দুর্দিন-দুর্যোগে,
মরণমহিমা ভীষণের বাজালো বাঁশি।
অকরুণ নির্মম ভুবনে
দেখিনু একি সহসা—
কোন্ আপন-সমর্পণ মুখে নির্ভয় হাসি।

প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ এড়িয়ে গেছেন অন্তত 'নৈবেদ্য'-এর পর থেকে; প্রচলিত অর্থে মানবাত্মার অমরতা বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ ছিলেন না তিনি। তবু মৃত্যু সম্পর্কে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নান্দনিক দৃষ্টি তাঁর ছিলো ব'লে তাঁর হাতে বিয়োগান্ত নাটক ('প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'বিসর্জন', 'ডাকঘর' এবং সর্বোপরি 'শ্যামা') ট্র্যাজেডির খুব কাছ ঘেঁষেও ঠিক ট্র্যাজেডি হয়ে ওঠে না; এমন-এক দুঃখস্নাত বৈরাগ্য-স্নিগ্ধ মূর্তি ধারণ করে যাকে কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞার মধ্যে ফেলা যায় না।

'শ্যামা' নাটকের উপর ট্র্যাজেডির ছায়া পড়েছে গোড়া থেকেই, প্রথম দৃশ্যেই শোনা গেলো নির্দোষ নায়কের উদ্দেশ্যে কোটালের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা: "মশানে তোমার শূল হয়েছে পোঁতা।" শেষ দৃশ্যে দেখা যায় নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদ পূর্ণ এবং জীবন ছারখার হয়ে গেছে। উত্তীয়ের আত্ম-বলিদানের ফলে বজ্রসেন কারামুক্ত হয়, শ্যামা রাজভবনের সমাদরসম্মান ছেড়ে এসে সেই অখ্যাত অজ্ঞাত বিদেশীর পাশে দাঁড়িয়ে ভাবে অনেক দুঃখ-আঘাতের পর অবশেষে তাদের মিলন পরিপূর্ণ হয়েছে, বজ্রসেন ব'লে ওঠে "দুঃখ আমার আজি হল যে ধন্য", দু-জনে পূর্বজীবনের সমস্ত আবিলতা পিছনে ফেলে নৌকার পাল তুলে দিয়ে গান ধরে:

প্রেমের জোয়ারে ভাসাব দোঁহারে
বাঁধন খুলে দাও দাও, দাও—

ঠিক তখনই সখীরা বুঝতে পারে যে প্রেমের তরী অচিরে খান্‌-খান্‌ হয়ে যাবে ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যায় প'ড়ে। প্রেমিক-প্রেমিকার অপমৃত্যুর চেয়ে প্রেমের অপমৃত্যুর ট্র্যাজেডি তীব্রতর।

প্রেমের স্বাভাবিক মৃত্যুও কম ট্র্যাজিক নয়। তারই বিষাদঘন ধূসরতা দেখা যায় 'মানসী'র অনেক কবিতায়—"ভুল", "ভুলভাঙা", "বিচ্ছেদের শান্তি", "নারীর উক্তি", "পুরুষের উক্তি" ইত্যাদিতে। কিন্তু সবচেয়ে মর্মস্পর্শী কাব্যরূপ ধারণ করেছে প্রেমের স্বাভাবিক জরা ও মৃত্যুর বেদনা সেই মিতবাক চতুষ্পদীতে, যা গানের আকারেই আমাদের অনেক বেশি পরিচিত, অথচ সুরের ঐশ্বর্য লাভ করবার জন্য কবিতাকে কিছু দৈন্য স্বীকার করতে হয়েছিলো। সনেটের প্রথম চারটি অবিস্মরণীয় পঙ্‌ক্তি রূপান্তরিত গানের মধ্যেও আমরা ভুলতে পারি না:

তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলি।
সেই পুরাতন প্রেম যদি এক কালে
হয়ে আসে দূরস্মৃত কাহিনী কেবলি
ঢাকা পড়ে নব নব জীবনের জালে।

পুরাতন প্রেম নব প্রেমজালে ঢাকা প'ড়ে যায়—প্রেমের এই অপঘাত সাহিত্যে ও জীবনে আমাদের খুবই পরিচিত; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভাবিয়ে না-দিলে কি আমরা পুরানো প্রেমের নব-নব জীবনের জালে ঢাকা প'ড়ে যাওয়ার বেদনাটা এমন ক'রে বুঝতাম? মানুষের মৃত্যুর চেয়ে প্রেমের মৃত্যু রবীন্দ্রনাথকে দুঃখ দিয়েছে বেশি।

অদৃষ্টের ডোরে বাঁধা ঘটনার জাল ফেলে শ্যামার দুর্লভ, আক্ষরিক অর্থে অতি দুর্লভ প্রেমের নিশ্বাস রোধ করলো যে নির্মম ব্যাধ তার প্রতিকৃতি যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে সখীরা নবদম্পতির নৌকায় ভরপুর আনন্দের গান গেয়ে পাল তুলে দেওয়ার পূর্ব-মুহূর্তেই:

হায়, হায় রে, হায় পরবাসী,
হায় গৃহছাড়া উদাসী।
অন্ধ অদৃষ্টের আহ্বানে
কোথা অজানা অকূলে চলেছিল ভাসি।
শুনিতে কি পাস দূর আকাশে
কোন্‌ বাতাসে সর্বনাশার বাঁশি।

ওরে, নির্মম ব্যাধ যে গাঁথে
মরণের ফাঁসি।
রঙিন মেঘের তলে
গোপন অশ্রুজলে
বিধাতার দারুণ বিদ্রূপবজ্রে
সঞ্চিত নীরব অট্টহাসি।

বিধাতাকে নির্মম ব্যাধের আকৃতিতে দেখা, দৈববাণীর মধ্যে সঞ্চিত নীরব অট্টহাসি শোনা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অভূতপূর্ব, "they kill us for their sport"-এর চেয়েও জোরালো তার ব্যঞ্জনা। অথচ এই গানে বা তার নাটকীয় বিস্তারে নাটক শেষ হয় না। হ'লে হয়তো শেক্‌স্‌পীয়রীয় মহিমা লাভ করতো, কিন্তু রাবীন্দ্রিক সুষমা হারাতো। শেষ হয় যে-গানে তাতে সর্বংসহ ঈশ্বরের ক্ষমার কাছে বিবেকী মানুষের ক্ষমাহীনতা লজ্জিত।

উত্তীয় যদিও হাসিমুখে প্রাণ দিয়ে স্বর্গের আলো আনলো অবিচারে-অত্যাচারে অন্ধকার পৃথিবীতে, তবু ভোলা উচিত নয় যে উত্তীয়কে আদর্শ মানুষরূপে চিত্রিত করার কোনো অভিপ্রায় ছিলো না রবীন্দ্রনাথের; তাকে এঁকেছেন আদর্শ প্রেমিক ক'রে। মানসীর অর্থাৎ মনের মতো প্রেমাস্পদার সন্ধান করেছিলেন তিনি 'মানসী' নামক কাব্যগ্রন্থে। উত্তীয় হচ্ছে সেই মানসপ্রতিমার সুযোগ্য প্রেমিক—যার কোনো দাবি নেই, শুধু দেয়ই আছে। আদর্শ মানুষ হ'তে হ'লে একজনকে নয়, অনেকজনকে ভালোবাসতে হয় প্রাণ তুচ্ছ ক'রে। বুদ্ধের সর্বব্যাপী মৈত্রী ও করুণা, যীশুর love thy neighbour as thyself—এগুলিই আদর্শ মানুষের দীক্ষামন্ত্র। উত্তীয় সে-মন্ত্রে দীক্ষিত নয়। যে-মন্ত্র সে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছে তা-ও সুন্দর, মানব-জীবনে তার শক্তি ও মর্যাদা কম নয়, কিন্তু তা একেবারে ভিন্ন ক্যাটিগরির। সে-মন্ত্র প্রেমের মন্ত্র: সবার উপরে প্রেম সত্য।

শ্যামার প্রেম প্রেমের পরাকাষ্ঠা নয়, জলন্ত কাঠি—"যে জ্বলনে তুই মরিবি মরমে মরমে"। প্রেমের বেদীতে উত্তীয়ের আত্ম-বলিদানের কাছে শ্যামার আত্ম-নিবেদন ছোটো হয়ে গেছে, তার স্বার্থই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। অথচ সে-ও কিছু কম ত্যাগ স্বীকার করেনি সর্বাত্মক প্রেমের ডাকে। রূপে-গুণে অনন্যা এই প্রেমসাধিকা সমস্ত রাজপুরীর, সম্ভবত সমস্ত রাজ্যের স্তবস্তুতিপ্রীতি ত্যাগ করলো বিনা দ্বিধায়; ত্যাগ করলো রাজার রাজকীয় অনুগ্রহ ও অনুরাগ এবং সেইসঙ্গে তার আনুষঙ্গিক যাবতীয় ধনমান। আমরা ভুলে যাই যে শ্যামা ছিলো উঁচুদরের নৃত্যশিল্পী। চোখে পড়বার মতো সুন্দরী নর্তকী রাজার চোখে পড়তেই পারে, হারেমেও স্থান পেতে পারে। কিন্তু রাজনটী পদ পোয়েট লরিয়েটের সঙ্গে তুলনীয়; সর্বসাধারণ্যে বিঘোষিত রাষ্ট্রীয় সম্মান পেতে হ'লে অসাধারণ গুণ থাকা চাই। কোনো কৃতার্থ শিল্পীর পক্ষে এত বড়ো প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি এক মুহূর্তে ধূলি-পরিমাণ জ্ঞান ক'রে "তোমা সাথে এক স্রোতে ভাসিলাম আমি" ব'লে সত্যি-সত্যি ভেসে চ'লে যাওয়া ছোটোখাটো ত্যাগ নয়। প্রেমতপস্বিনী অতঃপর সব ছেড়ে নিজেকে নিবেদন করলো, "জীবনে মরণে প্রভু"র চরণে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে সে হ'তে চায় পতিপ্রাণা। পাপ তার অন্তরকে কলঙ্কিত করে না, ক'রে তোলে সমুদ্রের মতো গভীর।

এই ভাগ্যহতার অতি নিষ্ঠুরভাবে লাঞ্ছিত প্রেমের, সকল অর্থ খুঁজে পেয়ে

সকল অর্থ হারিয়ে-ফেলা জীবনের সম্মুখে আমরা স্তব্ধ হয়ে অশ্রু সংবরণ ক'রে দাঁড়াই, বিচারকের দণ্ড হাত থেকে খ'সে পড়ে। খ'সে পড়ে আরো এই কারণে যে যার চরণে সে সব-কিছু সমর্পণ করলো, ন্যায়-অন্যায় বিবেক পর্যন্ত জলাঞ্জলি দিলো, তারই শক্ত হাতে বিচারের দণ্ড বড়ো বেশি উদ্যত। নেপথ্যে কণ্ঠসংগীত শোনা যায়—নিঃসন্দেহে তাতে কবির কণ্ঠও মিলেছে, আমাদের কণ্ঠও মিলতে চায় :

সব কিছু কেন নিল না, নিল না,
নিল না ভালোবাসা—
ভালো আর মন্দেরে।
... ...
নদী নিয়ে আসে পঙ্কিল জলধারা
সাগর-হৃদয়ে গহনে হয় হারা,
ক্ষমার দীপ্তি দেয় স্বর্গের আলো
প্রেমের আনন্দেরে—
ভালো আর মন্দেরে।

আর-একটা কথা আমরা অনেকে ভুলে যাই—উত্তীয়ের প্রাণনাশের জন্য শ্যামা খুব বেশি দায়ী নয়। শেষ মুহূর্তে সে যখন ছুটে গিয়ে নগর-কোটালের কাছে স্বীকারোক্তি করলো যে এ-সব তারই ছলনা, উত্তীয় নির্দোষ, তখন কোটাল তাতে কর্ণপাতই করল না—বজ্রসেনকে ছেড়ে দিয়ে সে উত্তীয়কে আসামী ঠাউরেছে; তাকেও আবার ছেড়ে দিলে চলবে কেন, "চোর চাই, হোক না সে যে-কোনো লোক/নহিলে মোদের যাবে মান।" তবু বজ্রসেন তার কারামুক্তির উপায় জানবার জন্য অধীর হয়ে উঠলে, সব দায়িত্ব সব দোষ শ্যামা নিজের স্কন্ধেই টেনে নিলো, বললো—এ-কারাপ্রাচীরের কোনো শিলা তার হৃদয়ের চেয়ে কঠিন নয়। সমস্ত শুনে বজ্রসেন যখন নিষ্করুণ কণ্ঠে তাকে পাপিষ্ঠা, কলঙ্কিনী ব'লে ধিক্কার দিলো তখন শ্যামার মর্মাহত মিনতির প্রকাশ কথায় ও সুরে এই অতুলনীয় নাটকের বোধকরি সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ—যদিও কোনো শিল্পরচনার অঙ্গব্যবচ্ছেদ পাপ :

হে, ক্ষমা করো নাথ, ক্ষমা করো।
এ পাপের যে অভিসম্পাত
হোক বিধাতার হাতে নিদারুণতর।
তুমি ক্ষমা করো,
তুমি ক্ষমা করো, তুমি ক্ষমা করো।
... ...
তোমার কাছে দোষ করি নাই
দোষ করি নাই।
দোষী আমি বিধাতার পায়,
তিনি করিবেন রোষ—সহিব নীরবে।
তুমি যদি না করো দয়া—
সবে না, সবে না, সবে না।

বজ্রসেন কিন্তু ক্ষমা করতে পারলো না। একটু আগেই বেশ উদার কণ্ঠে বলেছিলো বটে যে, প্রেম সব পাপ ক্ষমা ক'রে প্রেমের ঋণ শোধ করে, "কালিমার পরে তার অমৃত সে বরষে"; কিন্তু সেটা তার অন্তরের কথা নয়। অথবা স্বভাবতই সে ভেবেছিলো যে শ্যামার পাপ যা-ই হোক্ তা ছোটোখাটো আকারেরই হবে, সে যে এত বড়ো পাপের পঙ্কে ডুবে আছে তা বজ্রসেন ভাবতেই পারেনি। যখন জানলো তখন ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলো। মুহূর্তকাল একটু করুণাই হ'লো পাপিষ্ঠার প্রতি, "কাঁদিতে হবে, জীবনে পাবি না শান্তি।" শ্যামাকে ধিক্কার দিতে গিয়ে আত্মধিক্কার জাগলো তার মনে—সে-ও তো মহাপাপভাগী, পাপমূল্যে কেনা তার জীবন। এবার ক্রোধে ভ'রে উঠলো তার মন। ক্ষমার এতটুকু জায়গা হ'লো না এই প্রেমিকের বিবেক-পীড়িত ন্যায়নীতিপূর্ণ হৃদয়ে! প্রেমের চরম শাস্তি দিতে সে উদ্যত হলো—শ্যামাকে পরিত্যাগ করলো। শ্যামা কিন্তু পিছনে-পিছনে চললো; সব-কিছু ছেড়ে এসেছে সে, বজ্রসেনকে ছাড়বে না। প্রেমিক-বিচারকের দণ্ড তখন আরো চরম উঠলো—সে-চরমদণ্ড আজকের দিনে অনেক সভ্য দেশে জঘন্যতম খুনীকেও দেওয়া হয় না। বজ্রসেন শ্যামাকে হত্যা করলো—যেমন ওথেলো ডেসডিমনাকে হত্যা করেছিলো তাকে পাপিষ্ঠা জেনে। শ্যামা মরেনি, কিন্তু বজ্রসেন তার বুকে মৃত্যু-আঘাতই হেনেছিলো; তার ভূলুণ্ঠিত দেহকে মৃত জেনেই সেখান থেকে সে প্রস্থান করে।

পাপিষ্ঠাকে কঠোরতম শাস্তি দিয়ে তার নিজের জীবনকে পাপ-ঋণ থেকে মুক্ত করবে—মুহূর্তের উত্তেজনায় হয়তো তা-ই ভেবেছিলো বজ্রসেন। কিন্তু প্রেমিকের অক্ষমার দ্বারা তো প্রিয়ার পাপক্ষয় হয় না, উভয়ের যন্ত্রণাই বাড়ে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলো বজ্রসেন পথে-পথে, মাঠে-মাঠে রোদ-বৃষ্টি-ঝড় মাথায় ক'রে। তার লেলিহান অন্তর্দাহের মধ্যে শান্তি কোথায় খুঁজে পাবে সে?

> এই দারুণ রৌদ্রে এই তপ্ত বালুকায়
> তুমি কি পথভ্রান্ত?
> দুই চক্ষুতে এ কী দাহ,
> জানি নে, জানি নে, কি যে চাহ—

গায় সখীরা। শ্যামার বিরহে (শোকেই বলা উচিত) নিষ্করুণ বিচারক আবার ব্যাকুল প্রেমিকে পরিণত হ'লো, তার উদ্বেল প্রেম বুকের পাঁজরে আছাড় খেয়ে পড়তে লাগলো উত্তাল সমুদ্রতরঙ্গের মতো। পরলোকের উদ্দেশ্যে সে চীৎকার ক'রে উঠলো:

> এসো, এসো, এসো প্রিয়ে
> মরণলোক হতে নতুন প্রাণ নিয়ে।

এ আর্ত চীৎকার আহত কিন্তু এখনো জীবিত শ্যামার কানে পৌঁছলো; নতুন নয়, পুরানো প্রাণ নিয়েই সে ফিরে এসে সামনে দাঁড়ালো। কিন্তু রক্তমাংসের শ্যামাকে

দেখে বজ্রসেনের মন আবার কঠিন হয়ে গেলো, প্রেমের স্থানে পাপবোধই জেগে উঠলো প্রখরতর হয়ে। শ্যামাকে সে আবার চ'লে যেতে আদেশ করলো।

কহিল ফিরায়ে মুখ, যাও যাও ফিরে,
মোরে ছেড়ে চলে যাও। নারী নতশিরে
ক্ষণতরে রহিল নীরবে। পরক্ষণে
ভূতলে রাখিয়া জানু যুবার চরণে
প্রণমিল, তারপর নামি নদীতীরে,
আঁধার বনের পথে চলি গেল ধীরে।

এইখানে কাহিনী-কাব্যের সমাপ্তি। নাটকে কিছুক্ষণ রঙ্গমঞ্চে গোরস্থানের নীরবতা বিরাজ করবে, তারপর গান শোনা যাবে—যে-গান একমাত্র শান্তিদেব ঘোষ-ই গাইতে পারেন, যে-গান শুনে আমরা বুঝতে পারি বজ্রসেনের উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ের গভীরে প্রেমিক সত্তা আর নৈতিক সত্তা পরস্পরকে অবিরাম আঘাতের পর আঘাত ক'রে তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিচ্ছে।

এই সমাপ্তি-সংগীতে বজ্রসেন আপন প্রেমের বলহীনতার জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছে। অথচ ঈশ্বরের আদেশ পালন করতে গিয়েই তার প্রেম দীনতা স্বীকার করলো। পাপকে প্রশ্রয় দিয়ে প্রেমকে সফল করা—সে তো অধর্ম, ঐশীবিধান তা হ'তেই পারে না। প্রেম তার দুর্বল ছিলো কিন্তু ধর্মাধর্ম জ্ঞান খুবই বলিষ্ঠ। ঘোরতর পাপের পঙ্কিল পথে প্রিয়া তার কাছে এসে আত্মসমর্পণ করেছে; গ্রহণ করলে সে-ও যে পাপী হবে। পাপিষ্ঠাকে সে ক্ষমা করতে পারলো না। তবু সে অন্তরের গভীরে উপলব্ধি করলো যে এই অভাগিনী পাপিষ্ঠাকে ঈশ্বর ক্ষমা করবেন, কিন্তু ক্ষমা করবেন না তার নীতিবিশুদ্ধ ক্ষমাহীনতা। ঈশ্বরের আদেশ কি তবে এই যে মানুষ তার ন্যায়নীতিবোধকে ক্ষুণ্ণ ক'রেও প্রেমের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবে? মানব-জীবনে প্রেমের মহৎ মূল্য অনস্বীকার্য; কিন্তু তার স্থান কি ন্যায়-নীতির ঊর্ধ্বে?

দুই

মূল্যের সঙ্গে মূল্যের সংঘাত (Conflict of values) যখন ঘটে তখন কোনো সহজ সর্বগ্রাহ্য সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না। ভালোর সঙ্গে-সঙ্গে প্রেমের (আকাঙ্ক্ষিতের) সংঘাতের চেয়ে এ-সংঘাত দারুণতর, মানুষের জীবনকে ছারখার ক'রে দেয়; অধিকাংশ ট্র্যাজেডির উৎস এইখানে। কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় বল্লীর প্রারম্ভে রয়েছে সেই বিখ্যাত শ্লোক: "শ্রেয় আর প্রেয় ভিন্ন, এ দুই লক্ষ্যবস্তু বিভিন্নভাবে মানুষকে বাঁধে। যারা শ্রেয়কে বরণ করে তাদের মঙ্গল হয়, আর যারা প্রেয়কে বরণ করে তারা মনুষ্যত্বের সত্য অর্থ থেকে পতিত হয়।" কিন্তু শ্রেয় বা নিঃশ্রেয়স্ (ultimate good) তো একমেবাদ্বিতীয়ম্ নয়, একাধিক।

প্রেম নিশ্চয়ই তার অন্যতম। প্রাচীনেরা তার আস্বাদ পেয়েছিলেন ব'লে তো মনে হয় না; তাঁরা নারী-পুরুষ সম্বন্ধে কামকেই বড়ো ক'রে দেখেছিলেন। এই সম্বন্ধের সে উন্নীত ভাবস্তরকে আমরা প্রেম বলি, তার কথা প্রাচীন সাহিত্যে খুব-একটা পাওয়া যায় কি? প্লেটো যদি-বা প্রেমের আলোচনা করেছেন তাঁর বিখ্যাত কথোপকথনে, প্রেমপাত্র করেছেন কমবয়সী প্রিয়দর্শন যুবককে, নারীকে রাখতে চেয়েছেন কামতৃপ্তি, গৃহকর্ম ও সেবার কাজে। সাফোর কবিতা উঁচুদরের প্রেমের কবিতা, তবু তাতে নারী-পুরুষের সম্পর্ক বিধৃত হয়নি; প্রেমিকা ও প্রেমাস্পদ দুই-ই নারী। 'মেঘদূত'-এর বিরহী যক্ষ কামার্ত, তার কল্পচিত্রগুলি কামুকের মানসজাত, প্রেমিকের নয়। তপোবনবাসিনী শকুন্তলাও দুষ্মন্তকে দেখে কামার্তা হয়েছিলো, প্রেমাকুলা নয়। বজ্রসেনকে দেখে শ্যামার মনে যে-ভাব জেগেছিলো ("কে ওই পুরুষ দেবকান্তি") তার সঙ্গে তুলনীয় নয় শকুন্তলার কম্পিত বক্ষের স্বেদবিন্দু-শোভিত মুখমণ্ডলের ব্যঞ্জনা—যদিও শ্যামা রাজনটী, কোনো মুনিঋষির সৎশিক্ষায় ও মহৎ দৃষ্টান্তে তার মন গ'ড়ে ওঠেনি। পরবর্তী অঙ্কে অবশ্য শকুন্তলার মনে শুদ্ধ পাতিব্রত্যের উন্মেষ দেখা যায়; কিন্তু প্রথম দর্শনে শ্যামা প্রেমে পড়েছিলো, শকুন্তলা কামবিদ্ধ হয়েছিলো।

প্রাচীন শাস্ত্রে যখন অর্থ, কাম, ধর্ম ও মোক্ষকে, চতুর্বিধ পুরুষার্থ বলা হয়েছিলো তখন ঠিক কী অর্থে বলা হয়েছিলো সেটা খুব স্পষ্ট নয় আমার কাছে। ধর্ম ও মোক্ষ যে-অর্থে পুরুষার্থ, অর্থ ও কাম তো ঠিক সেই অর্থে পুরুষার্থ হ'তে পারে না। বোধহয় সাইকোলজিক্যাল অর্থে তাঁরা ধনলাভ ও আসঙ্গসুখকে পুরুষার্থ বলেছিলেন। অর্থাৎ অত্যধিক সংখ্যক লোকের মনে এই লক্ষ্যগুলির আকর্ষণ দুর্নিবার; তারা প্রবলভাবে ধন এবং নারীসঙ্গ চায়। চাওয়া উচিত কিনা সে-প্রশ্ন আলাদা। পুরুষার্থের অন্য অর্থ এথিক্যাল: পুরুষার্থ হচ্ছে সেই লক্ষ্যবস্তু যা না-চাইলেও চাওয়া উচিত যার আকর্ষণ বাস্তবিক ক্ষেত্রে অনেকের মনে ক্ষীণ হ'লেও যা আমাদের সকলের জীবন-সাধনার সম্যক্ যোগ্য আদর্শ। পুরুষার্থের মধ্যে যখন অর্থ ও কামকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তখন এই দ্বিতীয় অর্থে 'পুরুষার্থ'-এর বদলে 'নিঃশ্রেয়স্' শব্দটা ব্যবহার করলে ভুল বোঝার সম্ভাবনা কম থাকে।

কেবল কামের তৃপ্তি নিঃশ্রেয়স্ ব'লে গণ্য হ'তে পারে না, কিন্তু প্রেমের সার্থকতা হ'তে পারে। মানব-জীবনের গভীরতম ও মহত্তম আনন্দের অন্যতম উৎস প্রেম। প্রেমকে কামগন্ধহীন হ'তে হবে এমন কোনো কথা নেই, কিন্তু কামনার চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম গভীর ও পরিব্যাপ্ত প্রেমানুভূতি। নগ্ন কামনা শ্রীহীন, কিন্তু প্রেমের মধ্যে যখন কামনা স্থান নেয় তখন তার রূপ আলাদা, প্রিয়ার দেহ তখন কোনো সুদক্ষ শিল্পীর হাতে-গড়া মূর্তির সুষমা লাভ করে। নিবিড় প্রেমের অঙ্গীভূত ইন্দ্রিয়সুখ অন্য-এক পর্যায়ে উঠে যায়, তার সঙ্গে শিল্পকর্ম-সঞ্জাত রসানন্দের তুলনা অসমীচীন নয়।

প্রেমের সঙ্গে সুনীতির (মরালিটির) যদি বিরোধ বাধে তবে কোন্‌টাকে ছেড়ে কোন্‌টাকে রাখবো আমরা? সুনীতিই কি নির্ব্যতিক্রমে বরেণ্য? মনে রাখা ভালো যে, সুনীতির কোনো বিধানই সবসময় অলঙ্ঘনীয় নয়। নরহত্যা পাপ, কিন্তু বিচারপতি যখন ফাঁসির হুকুম দেন, সেনাপতি যখন শহরের উপর বোমা ফেলতে আদেশ করেন তখন নরহত্যা, নিরস্ত্র নাগরিক-হত্যাও পাপ নয়। নিষ্ঠুরতা পাপ, কিন্তু মা যখন তার একমাত্র পুত্রকে জড়িয়ে ধ'রে বলে—তোকে আমি কিছুতেই শত্রুর কামানের মুখে যেতে দেবো না, তখন দেশের স্বাধীনতারক্ষায় নিবেদিত-প্রাণ পুত্র নিষ্ঠুরভাবে মায়ের হাত ছাড়িয়ে সীমান্তগামী ট্রেন ধরতে চ'লে যায় এবং আমাদের সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

এক হিসাবে অবশ্য সুনীতি মৌলিক, কারণ সুনীতির উপরই সমাজ দাঁড়িয়ে আছে। আর সমাজের ভিৎ যদি টলে তাহ'লে ব্যক্তিজীবনও বিপর্যস্ত হয়, সব সাধনাই পণ্ড হ'য়ে যায়। তবে কিনা সমাজরক্ষা করতে গিয়ে যদি ব্যক্তিকে এমন নিয়মনীতি বিধিনিষেধের জালে জড়িয়ে ফেলা হয় যে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই লোপ পায়, তাহ'লে সে-সমাজ নিয়েই বা আমরা করবো কী? ব্রাডলি বড়ো সুন্দর বলেছিলেন: "মানুষ মানুষই নয় যদি সে সামাজিক না-হয়, তবে সে পশুর চেয়ে খুব একটা উর্ধ্বে ওঠে না যদি সামাজিকের চেয়ে বেশি-কিছু না-হয়।" সুনীতির মূল্য সম্পূর্ণরূপে সামাজিক; তার একমাত্র লক্ষ্য সমাজের কল্যাণ। কল্যাণ বলতে ঠিক কী বোঝায় তা অবশ্য একটা জটিল প্রশ্ন। যা-ই বোঝাক্‌, সুনীতির লক্ষ্য সার্বিক কল্যাণ, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষের কল্যাণ নয়।

শিল্প ও জ্ঞানের মূল্য সামাজিক কি ব্যক্তিক বলা একটু শক্ত। এটা ঠিক যে জ্ঞানী (ফলিত বিজ্ঞানের কথা বলছি না) বা শিল্পীর সাধনা—তপস্যাই বলা উচিত—পরোপকারার্থে নয়, তিনি নিজের তৃষ্ণা মেটাবার জন্যই আলো বা রূপের সন্ধান করেন। কিন্তু যাতে তাঁর নিজের তৃষ্ণা মেটে তাতে অন্যেরও, সুধী ও রসিক-জনেরও, তৃষ্ণা মেটে। তাই তিনি প্রত্যক্ষত না-চাইলেও পরোক্ষত পরোপকারী, সুখস্বাচ্ছন্দ্য দিতে না-পারলেও গভীরতর আনন্দদানে সক্ষম। একজন প্রখ্যাত নীতিশাস্ত্রবিদ্‌ (নিকলাই হার্টমান) এদের চরিত্রে যে-সদ্‌গুণ দেখতে পেয়েছেন তাকে "প্রভাকর পুণ্য" ("radiant virtue") আখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ এঁরা লোকহিতৈষী না হ'য়েও লোকহিত সাধন করেন স্বভাবগুণে, প্রদীপ যেমন স্বগুণেই আলো বিকীরণ করে, মানুষকে পথ দেখায়। বরঞ্চ যিনি চতুর্থ পুরুষার্থ, অপবর্গ বা মোক্ষের সাধক, তিনি পর্বতগুহায় ধ্যানাসনে ব'সে কঠোর তপস্যার ফলে ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভ করলে কার কী এসে যায় তাতে। অবশ্য তিনি যদি মহাযান বোধিসত্ত্বের মতো পরিনির্বাণের দরজা থেকে ফিরে আসেন, তমসাচ্ছন্ন যারা তাদের সবাইকে তাঁর আবিষ্কৃত পথ দেখিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য, তবে অন্য কথা।

স্বীকার করতেই হবে যে প্রেমের মূল্য সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত। রবীন্দ্রনাথের মতো কবি-প্রেমিকের কথা আলাদা; তাঁরা সহৃদয় পাঠকের মনেও প্রেমের অনুভূতিকে গভীর এবং সূক্ষ্ম ক'রে তোলেন, এই ব্রহ্মসাক্ষাৎসহোদর আনন্দ বিষয়ে তাদের স্তিমিত মূল্যবোধকে জাগ্রত রাখেন। কিন্তু অ-কবি প্রেমিক যে চরম-মূল্যের সাধনা করছেন, তাতে তাঁর নিজের জীবনই ধন্য হবে, অন্যের হবে ব'লে তো মনে হয় না। তাই প্রেমিক তাঁর প্রেম-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবার জন্য যদি কোনো অসামাজিক অসৎ আচরণ ক'রে বসেন, তবে তাঁকে আমরা সহজে ক্ষমা করতে পারি না।

বরঞ্চ জ্ঞানী ও শিল্পীকে পারি, কারণ তিনি তাঁর জীবনদেবতাকে তুষ্ট করবার জন্য যদি একদিক দিয়ে সমাজের ক্ষতি করেনও, সঙ্গে-সঙ্গে অন্যদিক দিয়ে ক্ষতিপূরণ ক'রে দেন। তবু কোনো অভাবগ্রস্ত ভাস্কর যদি একটি বিধবা বৃদ্ধাকে গলা টিপে মেরে ফেলে তার গয়না-গাটি হস্তগত ক'রে সেই টাকা দিয়ে মহার্ঘ প্রস্তরখণ্ড কিনে এক অসাধারণ সুন্দর মূর্তি গড়েন, তাহ'লে আমাদের বিচার কী হবে? তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করলেও তাঁকে ক্ষমা করতে পারবো না বোধকরি। রবীন্দ্রনাথের শ্যামা তেমনি আমাদের গভীরভাবে ভাবিয়ে তোলে; নাট্যকারকেও ধাঁধায় ফেলেছিলো নিশ্চয়ই। পাপের পথে প্রেমের সাফল্য চেয়েছিলো এই দুর্ভাগ্যবতী সাধিকা। বিধাতার কথা বিধাতাই জানেন, কিন্তু আমরা কি তাকে ক্ষমা করতে পারি? বজ্রসেনের মতো আমরাও এই পাপিষ্ঠাকে ভালো না-বেসে পারি না, কিন্তু পাপের মার্জনা তাতে হয় না। হয় কি? বজ্রসেনের বিচারে শ্যামা পাপিষ্ঠা। বিচার শুনে শ্যামা কেঁদে বলে—আমি পাপ করেছি, কিন্তু তোমার কাছে আমি দোষী নই, দোষী আমি বিধাতার চরণে। কথাটা শোনায় বড়ো মধুর এবং করুণ, কিন্তু এইভাবে কি পাপের শ্রেণীভেদ করা যায়? মানুষকে খুন করানো যদি পাপ হয়, তবে বিধাতার চোখেই কেন হবে, মানুষমাত্রের চোখে তা পাপ; প্রেমিকও তো এতবড়ো জলজ্যান্ত সত্যের দিকে চোখ বন্ধ ক'রে থাকতে পারে না।

শ্যামার প্রাণাধিক এবং সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত বজ্রসেনকে "কঠিন শৃঙ্খলে" বেঁধে তার চোখের সামনে দিয়ে বধ করতে নিয়ে যাচ্ছে কোটাল। এই দৃশ্য দেখে সে প্রায় দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়, বিশেষ ক'রে উত্তীয়কে নয়, সহৃদয় বা মানব-দরদীমাত্রকে সম্বোধন ক'রে আর্তস্বরে ডেকে ওঠে—এই বিদেশীর প্রাণরক্ষা করতে পারে এমন বীর কি কেউ নেই কোথাও! তার ডাকে সাড়া দিলো কোনো বীরপুরুষ নয়, ভীরু বিনম্র নতচক্ষু উত্তীয়। এমন শক্তিমান সে নয় যে বলপ্রয়োগ ক'রে কোটালের হাত থেকে তার নিরপরাধ বন্দীকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসতে পারে। এমন কূটবুদ্ধিসম্পন্ন সে নয় যে কোটালকে বুদ্ধির প্যাঁচে ফেলে কার্যোদ্ধার করবে। বলে নয়, কৌশলে নয়, একমাত্র যে-উপায়ে প্রেয়সীর দয়িতকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনা তার পক্ষে সম্ভব—মিথ্যা স্বীকারোক্তি ক'রে চুরির অপবাদ নিজের

ঘাড়ে নিয়ে প্রবলের তলোয়ারের সামনে ঘাড় পেতে দিয়ে—তা-ও বীরোচিত, কিন্তু ভিন্ন অর্থে। একে ছল বলা যায়, কিন্তু এমন ছলনাকারীর কথা ভাবলে আমাদের মাথা নত হয় নীরব শ্রদ্ধায়। সেই ছলনাময় আত্মোৎসর্গের প্রস্তাব উত্তীয় করলো শ্যামার কাছে। শ্যামা সম্মত হ'লো; বিদায়মুহূর্তে তার হাত ধ'রে ঠেকাতে গিয়েও পারলো না। এ ভয়ংকর সম্মতি অপরাধ নিশ্চয়ই, নিন্দনীয় নিঃসন্দেহে। কিন্তু একেবারে অমার্জনীয় কি?

নাটকের শ্যামার পাপ অবশ্য জাতকের শ্যামার পাপের মতো জঘন্য নয় মোটেই। তবু রবীন্দ্রনাথ তাকে নিষ্পাপ ক'রে আঁকতে চাননি; চাইলে নাটক অর্থহীন হয়ে যেতো। তিনি শুধু দেখাতে চেয়েছেন শ্যামার পাপ যতো বড়োই হোক্, তার প্রেম আরো বড়ো। উপরন্তু যে-রবীন্দ্রনাথ কাব্যে আধ্যাত্মিকতার প্রতিভূ ব'লে পৃথিবীময় খ্যাত এবং যাঁর প্রতি হালের কোনো-কোনো বাঙালী সমালোচক সুনীতি-বায়ুগ্রস্ত, পিউরিটান ইত্যাদি ব'লে কটাক্ষ করেন সেই রবীন্দ্রনাথ আজ আটাত্তর বছর বয়সে আমাদের অবাক ক'রে দিচ্ছেন 'শ্যামা' গীতিনাট্যের শেষ গানে জানিয়ে দিয়ে যে এত বড়ো পাপও বিধাতার চোখে, অর্থাৎ শাশ্বত ন্যায়-নীতির চোখে, ক্ষমার্হ। এবং আমরা সবিস্ময়ে লক্ষ করি আমাদের শুদ্ধাত্মা কবি কতোখানি বুঝ, কতোখানি দরদ দিয়ে এই প্রেমার্তা "মৃত্যু-পিপাসিনী"র চরিত্র এঁকেছেন। ডস্টয়েভস্কীর উপন্যাস কি তিনি ভালোবাসতেন?

'শ্যামা' নাটকে মূল্যের সঙ্গে মূল্যের সংঘাতের কথা বলেছি। যাঁরা প্রেমকে জীবনের উচ্চতম মূল্যের মধ্যে গণ্য করেন, তাঁরাও হয়তো আপত্তি তুলবেন যে শ্যামার মনে যে-ভাব জেগেছিলো তা প্রেম নয়, মোহ (infatuation); কারণ প্রথম দর্শনে মানুষ রূপ ছাড়া আর কী দেখে, এবং রূপের প্রতি মোহ ছাড়া আর কী জন্মাতে পারে। আমি অবশ্য ইতিপূর্বে বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে, শ্যামা বজ্রসেনের শুধু রূপ দেখেনি, রূপের পর্দায় একটি অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ঝলক দেখেছিলো, এবং তার মনের গভীরে যে প্রবল আকর্ষণ জন্মেছিলো সেটা শুধু রূপের প্রতি জাগেনি, জেগেছিলো সমগ্র মানুষটার প্রতি।

ক্বচিৎ-কখনো এমন লোক আমাদের চোখে পড়ে যাকে দেখে চম্‌কে উঠে বলি, কী আশ্চর্য মুখশ্রী। এই আশ্চর্যানুভূতি কেবল মুখের রঙে রেখায় গড়নে জাগে না, জাগে চারিত্র্যের বা ব্যক্তিত্বের আভাসে-বিভাসে। অবশ্য ভুল করতেও পারি আমরা, পরে হয়তো শুধরে নিয়ে বলতে হয় প্রথম দর্শনে যা ভেবেছিলাম মেয়েটি (বা পুরুষটি) মোটেই সে-রকম নয়। শুধু প্রথম দর্শনে কেন, দু-চার বছর চিনবার পরেও কোনো-কোনো ক্ষেত্রে আমাদের বলতেই হয়—ভুল চিনেছিলাম, লোকটির হৃদয়-মনের অনেক-কিছুই ধরা দেয়নি এতদিনকার পরিচয়ে; আজ বুঝলাম এ তো আমার ভালোবাসার যোগ্য নয়। যা-ই হোক্, আমার বক্তব্য এই যে শ্যামা বজ্রসেনকে দেখে তেমনি চম্‌কে উঠেছিলো।

তবু যদি পাঠক বা দর্শকের ভুল হয়ে থাকে যে বজ্রসেনের প্রতি সত্যিকার প্রেম জাগেনি শ্যামার মনে, সে তার রূপ দেখেই মজেছিলো, তবে সে-ভুল ভেঙে যায় শ্যামাকে যখন বজ্রসেন চূড়ান্ত অপমান এবং নির্মমভাবে আঘাত ক'রে পরিত্যাগ করে। এর পর কোনোপ্রকার মোহই টিকতে পারে না; কিন্তু সত্যিকার প্রেম আরো সত্য, আরো গভীর হ'তে পারে। পরে একলা পথে উদ্‌ভ্রান্তের মতো হাঁটতে-হাঁটতে বজ্রসেন যখন তাকে ডাকে:

এসো এসো এসো প্রিয়ে
মরণলোক হতে নতুন প্রাণ নিয়ে,

তখন মান অপমান অভিমান অভিযোগ সব মুছে ফেলে ফিরে আসা শ্যামা সেই প্রেমিকের কাছে যে একটু আগে তাকে কলঙ্কিনী ব'লে ধিক্কার দিয়েছিলো, নিজের নীতিবিশুদ্ধতা রক্ষা করার জন্য তাকে মেরে ফেলতে পর্যন্ত চেয়েছিলো। ফিরে আসে মুখে কোনো নালিশ, চোখে কোনো কান্না নিয়ে নয়। "এসেছি প্রিয়তম, ক্ষম হে মোরে ক্ষম"—এ-ছাড়া আর কিছু চাইবার বা বলবার নেই তার। আবার সে কুড়ায় শুধু লাঞ্ছনাই এবং লাঞ্ছনাকারীর পদধূলি নিয়ে চ'লে যায় বনের অন্ধকারে, চিরকালের মতো। শেষ অঙ্কের শেষ গানের পর আমাদের মনে সন্দেহ থাকে না যে এই সর্বংসহা সর্বত্যাগিনী সর্বসুখবঞ্চিতা প্রেমিকার ঐকান্তিক প্রেম মূল্য হারানো দূরের কথা, শাশ্বতকালের রসিক হৃদয়ে অকুণ্ঠিত না-হোক্, বেদনার্ত স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ন্যায়নীতিতে সুদৃঢ়, বিবেক-দংশনে জর্জরিত বজ্রসেনের চরিত্রাঙ্কনে রবীন্দ্রনাথের মতো শুদ্ধচিত্ত কবির মনে সহানুভূতির অভাব থাকবার কথা নয়। আমরা নাট্যামোদীরা মানুষ হিসেবে বজ্রসেনকে শ্রদ্ধা করি, প্রেমিক হিসেবে নিন্দা করি; অথচ জানি মনুষ্যত্বের মূল্য রক্ষা করতে গিয়েই সে প্রেমের অমর্যাদা ঘটিয়েছিলো। "পাপীরে দিতে শাস্তি শুধু পাপেরে ডেকে এনেছি"—ঠিক বুঝে উঠতে পারি না এ কি তার তীব্র মানসিক যন্ত্রণারই প্রকাশ, নাকি তার স্থিরবুদ্ধি আত্মবিচার। সে কি সত্যিই ভাবছে পাপ এড়াতে গিয়ে সে পাপী হ'লো? শ্যামাকে ত্যাগ ক'রে বজ্রসেন অশেষ দুঃখ পেলো নিশ্চয়ই, কিন্তু তার বিবেক কি উপশমিত হয়েছিলো? তার নৈতিক দৃঢ়তা কি প্রেমের বলহীনতার কাছে লজ্জিত হয়েই থাকবে, চরিত্রবানের আত্মসন্তোষ প্রেমিকের হৃদয়যন্ত্রণাকে লাঘব করতে পারবে না? যে অন্তিম পরিস্থিতিতে প'ড়ে বজ্রসেন "এই দারুণ রৌদ্রে, এই তপ্ত বালুকায়" উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো, তার কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা চৌহদ্দির ভিতর থেকে বেরুবার কোনো সোজা রাস্তা বা সুড়ঙ্গ পথ বজ্রসেনের জানা নেই; আমাদেরও জানা নেই। এত বড়ো পাপকে সহজ মনে ক্ষমা করতে পারলেও তো সে নিজেকে পাপী ভাবতো, সে-ভাবনায় আমাদের মন সায় দিতো।

পাপিষ্ঠাকে মর্মান্তিক শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্তই বজ্রসেন গ্রহণ করলো; সে-

সিদ্ধান্তের ফলে দুটি জীবন ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেলো। এ দুর্লভ প্রেম মূল্য হারায়নি, কিন্তু সার্থকতা হারালো। সুনীতি কি রক্ষা পেলো? শ্যামার নৈতিক বলহীনতার গ্লানি মৃত্যুদিন পর্যন্ত তার মর্মপীড়ার কারণ হবে; প্রেমের বলহীনতা কি বজ্রসেনকে লজ্জা দেবে? শ্যামা প্রেমকে বলি দিয়ে ধর্মরক্ষা করতে পারতো, কিন্তু প্রেমও কি শ্যামার মতো জন্ম-রোম্যান্টিকের স্বভাবধর্ম নয়? বজ্রসেন প্রেমকে বলি দিয়েই তার নীতিধর্ম রক্ষা করলো। তবে সে নিজেকে পাপী জ্ঞান করছে কেন? অনেক প্রশ্নই ভাবিয়ে তোলে আমাদের রসাভিষিক্ত মনকে; নাট্যকারের মনে যদি-বা কোনো উত্তর জেগে থাকে এ-সব প্রশ্নের, সে-উত্তর তিনি স্পষ্ট ক'রে তোলেননি নাটকে। অবশ্য কাব্যে গোধূলির আলো-আঁধারিই মানায়, প্রখর দিবালোক নয়।

আমরা জানি বজ্রসেনের বুকে যে-শূলটি শেষ দিন অবধি বিঁধে থাকবে তা শ্যামার মতো প্রেমিকাকে পেয়ে হারানোর যন্ত্রণা শুধু নয়, শ্যামার মতো পাপীকে ক্ষমা করতে না-পারার সন্তাপও। ভিন্ন অর্থে দু-জনই পাপী। কিন্তু গান শেষ হয় কবি ও শ্রোতার একাত্ম এই তুলনামূলক ট্র্যাজিক উপলব্ধিতে যে পাপিষ্ঠা শ্যামাকে ভগবান তবু ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু ক্ষমাহীন চরিত্রবান বজ্রসেন ক্ষমার পাত্র নয়। তবে কি পুণ্যের চেয়ে প্রেম বড়ো? আধুনিক রবীন্দ্রনাথ কি তা-ই বলতে চেয়েছেন এই সাহসিক নাটকে? নাকি সমাপ্তি-সংগীত শুধু নাটকীয় প্রয়োজন-সাধন করছে, নাট্যকারের মন তাতে একটুও ধরা দেয়নি? হয়তো ধর্ম-দার্শনিক চারিত্র্যনীতিনিষ্ঠ সমাজ-চেতন রবীন্দ্রনাথের সায় ছিলো না প্রেমের এমন চূড়ান্ত জয়গানে। "এ দুর্লভ প্রেম মূল্য হারালো কলঙ্কে অসম্মানে"—সম্ভবত এটাই সেই রবীন্দ্রনাথের মনের কথা। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথের, আমাদের রবীন্দ্রনাথের, হৃদয় মিলেছে বজ্রসেনের হৃদয়ের সঙ্গে শেষ গানে। আমরা কেমন ক'রে ভুলবো যে রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের কাব্যের অনুরণন ট্র্যাজিক হ'লেও তাঁর সমগ্র কাব্যের মূল সুরটি রোম্যান্টিক। এবং রোম্যান্টিক কবির চোখে রোম্যান্টিক প্রেমের চেয়ে বড়ো সত্য আর-কিছু নেই। মনে হয় 'শ্যামা' রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে: শাশ্বত ধর্ম-ভাবনার সঙ্গে কবির সংরক্ত অনুভূতিকে মেলাতে পারেননি। এই ব্যঞ্জনা-দ্বৈধের ফলে নাটক কিন্তু খণ্ডিত হয়নি, নাটকীয় মূল্যে আরো সমৃদ্ধ হয়েছে।

এত সূক্ষ্ম, অনুভূতির গভীরতায় বিস্তারে ও বিবর্তনে এমন ঐশ্বর্যবান, ভালো-মন্দের বর্ণযোজনায় এবং টানাপোড়েনে এমন নিগূঢ় দুটি মানব চরিত্র (তিনটিই বলা উচিত, কারণ উত্তীয়ের সঙ্গে পরিচয় ক্ষণিক হ'লেও সেই ক্ষণকালের মধ্যে গভীর রেখাপাত ক'রে যায় সে আমাদের মানসপটে) মাত্র কয়েকটি গানে রবীন্দ্রনাথ কেমন ক'রে ফুটিয়ে তুললেন—ভাবতে গেলে বিস্ময়ে অভিভূত হ'তে হয়। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে কথা ও সুরের যুগ্মসৃষ্টি 'শ্যামা' রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ

সৃষ্টি। এই গীতিনাট্যের প্রথম কাব্যরূপ কাহিনীকাব্য "পরিশোধ"ও একটি অসাধারণ কবিতা। 'কল্পনা'-পূর্ববর্তী পর্বের রবীন্দ্র-কাব্যে তার তুলনা নেই।*

* 'শ্যামাকে নৃত্যনাট্য বলছি না শুধু এই কারণে যে কাব্যে ও সংগীতে রবীন্দ্রনাথের সৃজনী-প্রতিভা এবং আঙ্গিক-সিদ্ধি যেমন অনন্য'ছিলো, তার তুলনায় শতাংশের একাংশও নৃত্যকলাবিৎ ছিলেন না তিনি। 'শ্যামা'তে কথা ও সুরের মণিকাঞ্চন যোগ হয়েছে, কিন্তু নৃত্যকে মনে হয় অসম প্রতিদ্বন্দ্বী। রঙ্গমঞ্চে যতোবার 'শ্যামা' দেখেছি, আমার মনে হয়েছে নৃত্যের অংশটা বাদ দিলেই ভাল হ'তো। বিশেষত কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন শ্যামার গানগুলি তাঁর অপূর্ব কণ্ঠে অনবদ্য আঙ্গিকে গেয়ে যান তখন দুঃখের সঙ্গে ভাবি সেই গীত-মাধুরীকে নৃত্যরূপ দান করতে পারেন এমন নৃত্যশিল্পী কোথায়। যতোদিন-না রবীন্দ্র-কাব্যে সহৃদয়া অথচ নৃত্যকলায় পূর্ণসিদ্ধা কোনো শিল্পীর আবির্ভাব হচ্ছে এ-পার বা ও-পার বাংলায় ততোদিন নৃত্যনাট্য 'শ্যামা'র নৃত্য ভাগটা রসিকবৃন্দের কল্পনাতেই প্রতীক্ষমান থাকবে। বিশেষ ক'রে শ্যামার, কারণ শ্যামা যে রাজনটী; সাধারণ কোনো নৃত্যসাধিকা তার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন দেখলে না-ভেবে পারি না যে ভারসাম্য বা রসসাম্য রক্ষা পায়নি। তা ছাড়া 'শ্যামা'র মতো অতুলনীয় সৃষ্টির রূপায়ণে সামান্য ত্রুটি ঘটলেও মনে হয় যেন দেবমূর্তি অসম্মানিত হয়েছে।

প্রেমের দুই রূপ

চণ্ডালিনীর ঝি ও রাজেন্দ্রনন্দিনী

এক

চণ্ডালকন্যা প্রকৃতির রঙ কালো হ'লে কি হবে, দেখতে সে বড়ো সুন্দর। শুধু দেহের নয়, মনের গড়নও তার আর পাঁচজনের মতন নয়; সাধারণ মেয়ের পর্যায়ে তাকে কোনোমতেই ফেলা যায় না—যদিও সে কখনো চিত্রাঙ্গদার মতো গর্ব ক'রে বলেনি "নহি আমি সামান্যা রমণী।" যেমন প্রখর তার আত্মমর্যাদাবোধ তেমনি তীব্র তার স্পর্শকাতরতা। এক রাজপুত্র মৃগয়া করতে এসে তার রূপে মজলো, নিয়ে যেতে চাইলো তাকে রাজবাড়িতে। প্রকৃতি ঘৃণাভরে সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো। মা জিজ্ঞাসা করে: "কেন গেলি নে রাজার ঘরে? রূপ দেখে সে তো ভুলেছিল।" প্রকৃতি: "ভুলেছিল না তো কি। ভুলেই ছিল যে আমি মানুষ; চোখে ঠেকে পশুকেই, তাকেই চায় বাঁধতে সোনার শিকলে।" সমবয়সী উচ্চবর্ণের প্রতিবেশিনীরাই কি তাকে মানুষ ব'লে গণ্য করে? কথায়-কথায় নাক সিটকায়, দইওয়ালা কাঁকনওয়ালাকে সাবধান ক'রে দেয়—"ওকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না ছি। ও যে চণ্ডালিনীর ঝি। ফুল কিনতে গেলে ফুলওয়ালি পর্যন্ত তাকে ঘৃণা ক'রে চ'লে যায় অন্যদিকে।

যখন অবিচার অত্যাচার অবমাননা একটা সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন রাজার বিরুদ্ধে প্রজারা বিদ্রোহ করে, ধনিকতন্ত্র মালিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয় কলকারখানা ও খেতখামারের নিপীড়িত মজুররা। পদে-পদে বঞ্চিতা ও অপমানিতা এই ওজস্বিনী চণ্ডালিকা যে বিদ্রোহিনী হবে ঈশ্বরতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই:

যে আমারে পাঠাল এই অপমানে অন্ধকারে
পূজিব না, পূজিব না, পূজিব না সেই
দেবতারে, পূজিব না।
কেন দেব ফুল, কেন দেব ফুল,
কেন দেব ফুল; আমি তারে—
যে আমারে চিরজীবন রেখে দিল এই ধিক্‌কারে।

খুবই যুক্তিসংগত কথা, ন্যায়নীতিসম্মত কথা, এবং তেমনি সৎসাহসপূর্ণ বলিষ্ঠ তার প্রকাশ। কোনো সামাজিক বা রাষ্ট্রিক বিদ্রোহ যদি আমাদের সমর্থন লাভ ক'রে থাকে কোনোদিন, তবে তার চেয়ে কম সমর্থনযোগ্য নয় এই ধার্মিক বিদ্রোহ।

আমরা প্রাচীনকাল থেকে শুনে আসছি ঈশ্বরলাভ করতে হ'লে সাধকের অনেক গুণ থাকা দরকার, অনেক দুঃখবরণ, অনেক তপশ্চরণ করতে হবে তাকে। কঠোপনিষৎ বলেন : "যে পাপাচরণ হইতে নিবৃত্ত হয় নাই, ইন্দ্রিয়লোলুপতা হইতে বিরত হয় নাই, একাগ্রচিত্ত হয় নাই, কিংবা সমাধির ফললাভ বিষয়ে অস্থিরতা বর্জন করে নাই, সে এই আত্মাকে প্রজ্ঞান-সহায়ে লাভ করিতে পারে না" (১।২।২৮)। গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক এই অখ্যাত চণ্ডালকন্যাই কি প্রথম আমাদের মনে করিয়ে দিলো যে ব্যাপারটা একতরফা হ'লে চলবে না ; ঈশ্বরেরও কিছু সৎ এবং মহৎ গুণ থাকা অত্যাবশ্যক, আমাদের পূজা লাভ করতে হ'লে তাঁকেও সম্যক্‌রূপে পূজনীয় হ'তে হবে। রাজার বিধানে যদি অত্যাচার ঘটে তবে আমরা রাজানুগত হ'তে পারি না, ঈশ্বরের বিধানে যদি অন্যায় ঘটে তবে আমরা ঈশ্বরভক্ত হবো কেমন ক'রে ? বহুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ একটি গানের শেষে লিখেছিলেন :

জানি গো আজ হা হা রবে
তোমার পূজা সারা হবে
নিখিল-অশ্রু-সাগর কূলে।

কিন্তু পৃথিবীসুদ্ধ মানুষ যদি দুঃখে যন্ত্রণায় অবমাননায় চোখের জল ফেলতে থাকে তবে সে-হাহাকারের মধ্যে কি পূজা অন্তর থেকে স্বতঃই উৎসারিত হ'তে পারে ? আমাদের উপাস্য দেবতা কি শুধু শক্তিরই দেবতা, তিনি কি মঙ্গলের দেবতা নন ? যদি মঙ্গলের দেবতা হন তবে তাঁর মঙ্গলবিধানে এত ত্রুটি, এত পক্ষপাত কেন ? প্রশ্ন তুলেছে চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি ; 'চণ্ডালিকা'-রচয়িতার মনেও কি সেই প্রশ্ন জাগেনি তাঁর জীবনের শেষ দশকে যখন ঐ-নাটকটি লেখা হয় ?

প্রকৃতির দেবদ্রোহিতার উত্তরে দেবতা অথবা তাঁর অভিবক্তা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বলতে পারতেন, বলেছিলেন হয়তো—'তোর ধিক্কৃত অপমানিত জীবন অত্যন্ত ন্যায়-সংগত, অত্যাচারের কোনো প্রশ্ন নেই এতে । চণ্ডালী, তুই পূর্বজন্মে বহু গুরুতর পাপ করেছিলি, তারই শাস্তি তোর ইহজীবনের এই লাঞ্ছনা। শাস্তি সম্পূর্ণ হ'লে এবং চণ্ডালজন্মে তোর পুণ্যকর্ম যথোপযুক্ত হ'লে পরে তুই উচ্চবর্ণে জন্মলাভ করবি।' 'তৃষ্ণার্তকে জলদান, ক্ষুধার্তকে অন্নদান—এ তো নিঃসন্দেহে অতিশয় পুণ্যকর্ম, এ হেন পুণ্যের অধিকারিণী নই কেন আমি ?' 'শাস্ত্র-বিহিত কর্ম ক'রে পবিত্র বর্ণাশ্রমধর্ম রক্ষা কর, তাতেই তোর উদ্ধার। মেলা বকিস্ নে।' রবীন্দ্রনাথের এবং আমাদের সকলের শ্রদ্ধাভাজন তেজোবুদ্ধি চণ্ডালিকা এর কী প্রত্যুত্তর দিতো তা সহজেই অনুমান করা যায় : 'আমার পূর্বজন্ম ব'লে কিছু ছিলো, সে-জন্মে আমি অনেক পাপ করেছিলাম—এ-সব তোমাদের বানানো কথা, আমি তাতে ভুলবার পাত্রী নই। আমি বেশ বুঝতে পারছি ঐ আষাঢ়ে কৈফিয়ৎ তৈরি ক'রে তোমরা তোমাদের ইহজন্মের ঘোরতর অন্যায় অবিচারকে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করছো। আমি তার কিছুই মানি না। যে-ধর্ম অপমান করে সে-ধর্ম মিথ্যা।'

'আর যে-দেবতার রাজ্যে আমার নিষ্পাপ জীবন ("বিনা অপরাধে এ কী ঘোর অন্যায়") তোমাদের পাপের বোঝায় অহরহ পিষ্ট হচ্ছে তাঁকে সুদ্ধ মানি না।'

হিন্দু ধর্মের বিশাল স্রোতধারায় যে কতো মত কতো পথ এসে মিলেছে তার ইয়ত্তা নেই। ঈশ্বরবাদীও আছেন, ঈশ্বরে অবিশ্বাসীও আছেন তাতে, আছেন কর্মযোগী ও কর্মসন্ন্যাসী এবং তারই পাশে স্বর্গলাভের আশায় সকামকর্মী, আছেন সাকার দেবদেবীর পূজারী ও নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসক। এমন উদার পরমত-সহিষ্ণু ধর্মসমাজ আর নেই পৃথিবীতে। কিন্তু কী আশ্চর্য, এঁরা সবাই জন্মান্তর ও কর্মফল মানেন। মতবিশ্বাসের কথা যদি ভাবি তাহ'লে হিন্দুকে অহিন্দু থেকে তফাৎ করা যায় এই জন্মান্তরবাদ দিয়ে। ভুল বললাম, প্রাচীন বৌদ্ধরা ঈশ্বর মানতেন না, বেদ বেদান্ত মানতেন না, তবু তাঁরা কর্মফল মেনে নিয়েছিলেন। কিছু বৈশিষ্ট্য ছিলো তাঁদের কর্মবাদে, তবে ঠিক কোন্‌খানে এবং কতোটুকু তা আমার কাছে খুব স্পষ্ট নয়। একটি কথা অবশ্য স্পষ্ট। তাঁরা অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন, বললেন—পূর্বজন্মের কর্মফল মানুষকে ভোগ করতেই হবে, কিন্তু তার জন্যে সমাজে এই উচ্চ-নীচ, শোষক-শোষিত, অপমানকারী-অপমানিত ভেদব্যবস্থা রাখা সংগত নয়, মর্যাদায় এবং সুস্থ স্বাধীন জীবনযাপন করার অধিকারে সব মানুষ সমান, ব্রাহ্মণের সঙ্গে চণ্ডালের, সিংহাসনে সমাসীন রাজার সঙ্গে পথের ভিখারীর প্রভেদ নেই।

দেবদ্রোহিনীকে সেই কথাটা জানাবার জন্যে কি দেবতা পাঠিয়েছিলেন সৌম্য-কান্তি উন্নতদর্শন ("ভোর বেলাকার আলো দিয়ে তৈরি তাঁর রূপ") বৌদ্ধ ভিক্ষু আনন্দকে ? কুয়ো থেকে জল তুলছিলো প্রকৃতি, তার কাছে এসে দাঁড়ালেন পথ-ক্লান্ত তৃষ্ণার্ত এই দেবদূত বললেন : "জল দাও, আমায় জল দাও।" প্রকৃতির বুক ফেটে গেলো বলতে, তবু বলতেই হ'লো—"তোমায় দেব জল হেন পুণ্যের আমি নহি অধিকারিণী, আমি চণ্ডালের কন্যা।" তার উত্তরে আনন্দ শুনিয়ে দিলেন ভগবান তথাগতের মহান বাণী—"যে মানব আমি সেই মানব তুমি, কন্যা।" এর পরে জল দিতে আর কোনো সংকোচ রইলো না চণ্ডালিনীর মনে ; জল গ্রহণ ক'রে জলদাত্রীর কল্যাণ কামনা ক'রে চ'লে গেলেন ভিক্ষু। কয়েকটি মুহূর্তের ব্যাপার। কিন্তু দেহে-মনে শিক্ষায়-সাধনায় সম্পূর্ণ পৃথক দুই ব্যক্তির জীবনে বিপ্লব ঘটিয়ে দিলো "শুধু একটি গণ্ডুষ জল।" প্রকৃতির মনে হ'লো সে মুক্তি পেয়েছে, জন্ম-জন্মান্তরের কালিমা তার ধুয়ে গেছে। মা-র অবশ্য সে-সব কিছুই মনে হয়নি ; তিনি দেখেছেন অনেক, অনেক বেশিকাল যাবৎ খেয়েছেন সমাজের মার। পাকা সিনিকের মতো বললেন : "মনে রাখিস, প্রকৃতি, ওদের কথা কানেই শোনবার, কাজে খাটাবার নয়। অদৃষ্টদোষে যে-কুলে জন্মেছিস তার কাদার বেড়া ভাঙতে পারে এমন লোহার খোন্‌তাও নেই কোনোখানে।"

এ-পর্যন্ত নাটকের ভূমিকা মাত্র। এর পর থেকে আমরা ভুলে যাই হিন্দু

সমাজের অস্পৃশ্যতার কলুষ এবং গৌতম বুদ্ধের সে-কলুষমোচনের মহৎ প্রচেষ্টার কথা। ঝাপসা হয়ে আসে এ-সব নীতিকথা, ধর্মকথা। তার চেয়ে অনেক বড়ো হয়ে ওঠে প্রকৃতি ও আনন্দের মানসিক পট-পরিবর্তন এবং চারিত্রিক সংঘাতের ইতিবৃত্ত। অবশ্য আনন্দের মানসিক যন্ত্রণাবিদ্ধ সংগ্রাম এবং ক্রমিক পরাজয়ের চিত্রপরম্পরা কেবল প্রকৃতির মায়াদর্পণে (অর্থাৎ মনোদর্পণে) দেখি আমরা। এই নাটকীয় কৌশল অবলম্বন ক'রে নাটককে আরো নিবিড় করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'চণ্ডালিকা' ডাইড্যাকৃটিক্ নাটক নয়। নীতিশিক্ষা তার রসরূপের সম্পূর্ণ অঙ্গীভূত। এবং অত্যন্ত ক্ষুদ্রাঙ্গ।

প্রথম দর্শনে এই গৌরবর্ণ পীতবসন যুবকটির প্রতি যে বহুবর্ণ ভাবসমাবেশ হয়েছিলো প্রকৃতির মনে তার মধ্যে শারীরিক আকর্ষণও ছিলো, অবশ্য প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা এবং আত্মসম্মানের মধ্যে নবজীবন লাভ করার উল্লাসের পাশে। কিন্তু সেটা স্বল্পক্ষণের ব্যাপার। প্রখর রোদে কুয়োর ধারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'সে থাকতে দেখে মা অবাক হ'য়ে জানতে চাইলো : "পুরাণে শুনি নাকি তপ করেছেন উমা রোদের জ্বলনে—তোর কি হল তাই ?" "হ্যাঁ মা, আমি বসেছি তপের আসনে।" তপস্যাই বটে। উমা তপস্যা করেছিলেন শিবকে বররূপে লাভ করার জন্য। প্রকৃতিরও সেই তপস্যা, শিবতুল্য আনন্দকে সে চায় খুব কাছে···কয়েক মুহূর্তের জন্য নয়, বাকী জীবনের মতো। কিছুকাল পরে প্রকৃতি দেখতে পেলো অন্য ভিক্ষুগণকে সঙ্গে নিয়ে আনন্দ চলেছেন সবার আগে আগে। তার দিকে ফিরেও তাকালেন না। ক্ষোভে অভিমানে হতাশায় প্রকৃতির বুক পুড়ে গেলো :

হতভাগিনী, কে তোরে আনিল আলোতে
শুধু এক নিমেষের জন্যে।
থাকতে হবে তোরে মাটিতে
সবার পায়ের তলায়।

আনন্দ অবশ্য আগেই উপদেশ দিয়েছিলেন :

তিনি বলে গেলেন আমায়—
নিজের নিন্দা কোরো না,

তবে এ-উপদেশের মূল্য কতোটুকু। চণ্ডালিনীর ঝি অবশ্য সাহস ক'রে উচ্চবর্ণ ভিক্ষুর করপুটে জল ঢেলে দিলো ; কিন্তু ঐ পর্যন্ত। সে যখন গাঁয়ের উচ্চবর্ণ লোকেদের সামনে গিয়ে বুক ফুলিয়ে বলবে—আমি তোমাদের সবার সমান, "মানবের বংশ আমার, মানবের রক্ত আমার নাড়ীতে", তখন কি তাদের ধিক্কার আরো তীব্র, আরো নিষ্ঠুর হবে না ? আনন্দের উদার বাক্য ("যে মানব আমি সেই মানব তুমি, কন্যা") যদি শুধু ধর্মদেশনা নয়, তাঁর গভীরে অন্তরের ভাব প্রকাশ ক'রে থাকে, তবে তিনি ফিরে এসে বসুন তার পাশে, শুধু এক নিমেষের জন্য নয়, দিনের পর দিন সবাইকে জানান যে প্রকৃতিকে সকল লাঞ্ছনা থেকে উদ্ধার করেছেন :

"দেখুক সবাই আমার স্পর্ধা। গৌরব করে বলতে চাই, আমি তোমার সেবিকা; নইলে সংসারে সবারই পায়ের কাছে চিরদিন বাঁধা পড়ে থাকতে হবে দাসী হয়ে।" মায়ের বস্তুতান্ত্রিক এবং অত্যন্ত সমুচিত উপদেশ—"আকাশের চাঁদের পানে হাত বাড়াস নে"—ভাবে বিভোর কন্যার কানে পৌঁছলো না।

কিন্তু এহ বাহ্য, এ-সবই প্রকৃতির অন্তরের ক্যালিডস্কোপিক পরিবর্তনের দ্রুত-বিলীয়মান বর্ণসমাবেশ মাত্র। আসল কথা হচ্ছে যে এ-সবের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির মনে এক অভিনব অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতি জেগেছে যার রূপরেখা সে দেখতে পাচ্ছে না, যার তল সে খুঁজে পাচ্ছে না। প্রেম কাকে বলে সে জানতো না এতদিন, আজ একটি গণ্ডুষ জল দিতে গিয়ে সে ডুবে গেলো অকূল সমুদ্রে। "জল দাও" অতি সামান্য কথা, কিন্তু প্রকৃতির মর্মতলে পৌঁছে অসামান্য হ'লো তার মর্ম ও মূল্য, আদিগন্ত বিস্তৃত হ'লো তার অর্থ:

কালো মেঘ পানে চেয়ে
এল ধেয়ে
চাতক বিহ্বল—
বলে দাও জল, দাও জল।
ভূমিতলে হারা উৎসের ধারা
অন্ধকারে
কারাগারে।
কার সুগভীর বাণী
দিল আনি
কালো শিলাতল—
বলে দাও জল, দাও জল।

তার হর্ষবেদনায় কম্পিত বক্ষ থেকে, তার প্রতি রোমকূপ থেকে বেরিয়ে এলো গান:

না, না, ডাকব না, ডাকব না, অমন করে বাইরে থেকে,
পারি যদি অন্তরে তার ডাক পাঠাব আনব ডেকে।

মা-র সন্দেহ হ'লো কেউ বুঝি তার রূপসী কন্যাকে মন্ত্র করেছে, "বাছা মন্ত্র করেছে কে তোকে?" উত্তর দিতে গিয়ে প্রকৃতি কতকটা বুঝতে পারলো কী ঘটেছে তার হৃদয়ে, দেখতে পেলো যা কখনো সে দেখেনি, প্রেমের আলোয় উদ্‌ভাসিত তার মনের এতদিনকার ঘনান্ধকার কক্ষ। কোনো আবরণ না-রেখে, কোনোপ্রকার লজ্জা বা দ্বিধা বোধ না-ক'রে সে বলতে পারলো:

সে যে পথিক আমার,
হৃদয় পথের পথিক আমার।
হায় রে, আর সে তো এল না, এল না
এ পথে এল না:
আর সে যে চাইল না জল।

জল তো আর জল নয় তার চোখে, রূপান্তরিত হয়েছে এতদিনকার অবদমিত, অসংজ্ঞাত মনের গভীরে উত্তরোল প্রেমরসধারায়। আনন্দের সদুপদেশ নয়, সহৃদয় ব্যবহার নয়, নিজের অজান্তে যে অদম্য প্রেম ও প্রেম-পিপাসা তিনি জাগিয়ে দিয়ে গেলেন এই লোকসমাজে লাঞ্ছিতা তরুণীর হৃদয়ে, তাই তাকে তুলে দিলো সকল লাঞ্ছনার ঊর্ধ্বে, সদ্‌বংশজাত সাধারণ মানুষের শুধু সমস্তরে নয়, আরো উপরিতলে, বায়ু যেখানে নির্মল, দৃষ্টি যেখানে দূরপ্রসারিত। সেইখানে দাঁড়িয়ে সে অসংকোচে বলতে পারলো :

আমি ভয় করি নে, মা, ভয় করি নে
ভয় করি মা, পাছে সাহস যায় নেমে,
পাছে নিজের আমি মূল্য ভুলি।
এত বড়ো স্পর্ধা আমার, এ কি আশ্চর্য।

বলতে পারলো :

ভিক্ষুরে নিয়ে আয় অমানিতার পাশে,
সেই তারে দিবে সম্মান—
এত মান আর কেউ দিতে কি পারে।

অনেকপ্রকার মন্ত্র জানতো মা কিন্তু প্রেমের মন্ত্র সে শেখেনি কোনোদিন, তাই তার পক্ষে বোঝা সহজ নয় যে তার মেয়ে এখন আর সাধারণ মেয়ে নয়, অসাধারণ কিছু ঘ'টে গেছে তার দেহে মনে আত্মায়। "এত বড়ো স্পর্ধা" যে-প্রেম দিতে পারে সে-প্রেমের আয়তনও এমন মহাসাগরতুল্য যার তল নেই, তীর নেই। সেই প্রেমের মধ্যে প্রকৃতির জন্মান্তর ঘটেছে, এক নিমেষের জন্য একটি উচ্চবর্ণ আগন্তুকের তৃষ্ণা-মেটানো সম্মানলাভে নয়। স্বভাবতই মা মেয়েকে একাধিকবার বলতে বাধ্য হয়েছে "আমি যে তোর ভাষা বুঝি নে।" সাধারণ মেয়ের অগম্য এই মহান প্রেমানুভূতির প্রকাশ মহৎ ভাষাতেই সম্ভব। সে-ভাষা কবিতার ভাষা। গদ্য-ভাষিণী মা (অর্থাৎ গদ্য-ভাষার পরিধির মধ্যেই যার মনন ও বেদন সীমাবদ্ধ) কেমন ক'রে বুঝবে তার কন্যাকে; সে যে কবিতার ভাষায় কথা কইছে।

রবীন্দ্রনাথকে অনেকে জানেন ভক্ত কবি ব'লে, কেউ-কেউ বলেছেন প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ; কেউ-বা বলেছেন তিনি প্রধানত মানবিকতার কবি। আমি সাহস ক'রে বলতে চাই—মূলত ও সর্বোপরি প্রেমেরই কবি রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ঈশ্বর-প্রেমের পরতে-পরতে নারী-প্রেম রবীন্দ্র-কাব্যভাষার ক্রোশে দিয়ে বোনা। শতসহস্র উদাহরণের মধ্যে এখনই আমার মনে জাগছে :

মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েছ নীরব শয়ন-'পরে—
প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো।

তাঁর সেইসব প্রকৃতি-প্রেমের কবিতা ও গানই আমাদের স্মৃতিপটে অপরিমোচনীয় হয়ে থাকে যাতে প্রকৃতির ছবির রেখায় রঙে আর-একটি অস্ফুট ছবি ফুটে উঠতে

চায় কিন্তু ওঠে না—সে-ছবি প্রিয়ার কি ঈশ্বরের তা-ও আমরা বুঝতে পারি না। অনেক সময় :

সজল হাওয়ায় বারে বারে
সারা আকাশ ডাকে তারে।
বাদল দিনের দীর্ঘশ্বাসে জানায় আমায় ফিরবে না সে,
বুক ভরে সে নিয়ে গেল বিফল অভিসার।

প্রেমের অভূতপূর্ব ঐশ্বর্যমণ্ডিত ভাষা তৈরি করেছেন রবীন্দ্রনাথ, এবং সে-ভাষা আমাদের হৃদয়-পটে মুদ্রিত ক'রে গেছেন তাঁর ষাট বছরের বহু সাধনায় বহু বেদনায় রচিত কাব্য ও গানের নানা বর্ণের কালি দিয়ে। রবীন্দ্রনাথেরই কবিতাতে গানে নাট্যকাব্যে আমাদের প্রেমীসত্তা জন্মলাভ করেছে, যৌবনে পৌঁছেছে।

তবে কি রবীন্দ্র-পূর্ব যুগে কোনো বাঙালী প্রেমে পড়তো না? পড়তো, কিন্তু পড়তোই। প্রেম যে আমাদের জীবনকে কতো উপরে তুলতে পারে অর্থ ও কামের ক্লান্তিকর একঘেয়ে গ্লানিমা থেকে, বর্তমান যুগের (অর্থাৎ রেনেসাঁস-পরবর্তী যুগের) আবিষ্কৃত ও পরিশীলিত এই পরমাশ্চর্য অনুভূতিতে যে কতো বর্ণ কতো গন্ধ, কতো দেহলী, কতো অন্তঃপুর, কতো রবিকরোজ্জ্বল সোনালী-রুপালী শিখর কতো অন্ধকার ভূগর্ভস্থ গোপন কক্ষ, কতো সমুদ্র কতো আকাশ লুকানো রয়েছে তা কি আমরা আগে জানতাম? মহাজন-পদাবলীতে তার পূর্বাভাস পেয়েছিলাম, পূর্ণ স্বাদ পাইনি। শৃঙ্গার এবং ভক্তি দুটো রসই বড়ো সুন্দরভাবে ফুটিয়েছেন বৈষ্ণব কবিরা; কিন্তু দুটোর যোগফল নয় প্রেম। শরীরকে বাদ দিলে প্রেম স্বধর্মচ্যুত হবে; এই রক্ত-মাংসের পাত্রকে অনন্ত রহস্যে ভরপুর ক'রে তোলাই প্রেমের ধর্ম। সে-রহস্য তো শুধু পার্থিব নয়, এক অপার্থিব ইঙ্গিতও থাকে তাতে। সেই প্রেমের কবি রবীন্দ্রনাথ। জানি না অন্য কোনো ভাষায় প্রেমের এমন সূক্ষ্ম গভীর দিগন্তবিস্তৃত বিকাশ ঘটেছে কিনা; জানি না আর কোন্ দেশের মাটিতে প্রেম এসেছে এমন "মহা সমারোহে"।

সেই প্রেমের সিংহদ্বারে পৌঁছলো চণ্ডালকন্যা প্রকৃতি ধাপে-ধাপে কয়েকটি অনতিভিন্ন অনুভূতির সোপান বেয়ে। মায়ের বুঝতে দেরি হচ্ছে, দ্বিধা হচ্ছে দেখে এই কালো মেয়ে (নিশ্চয়ই তার "কালো হরিণচোখ"ও বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিলো) অলজ্জ অবিজড়িত অনাবিল কণ্ঠে জানিয়ে দিলো :

আমি চাই তাঁরে
আমারে দিলেন যিনি সেবিকার সম্মান,
ঝরে পড়া ধুৎরো ফুল
ধুলো হতে তুলে নিলেন যিনি দক্ষিণ করে।
ওগো প্রভু, ওগো প্রভু,
সেই ফুলে মালা গাঁথো,
পরো পরো আপন গলায়,
ব্যর্থ হতে তারে দিয়ো না, দিয়ো না।

নাট্যকার রূপকের ভাষায় আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে প্রকৃতি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে জানতে পেরেছিলো (যেমন সব মেয়েই জানতে পারে) তার বাঞ্ছিত প্রথম দর্শনেই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন—"কোনো কথা না বলে তবু কথা দিয়ে গিয়েছিলেন"। প্রকৃতির কাছে এ-ও অস্পষ্ট রইলো না যে এ-আকর্ষণ তার অনিন্দ্যসুন্দর শ্যামকান্তি দেহের ভাস্কর্যের প্রতি যতোটা, তার সিকি ভাগও নয় তার অনন্যসাধারণ মনের তেজস্বিতা ও মাধুর্যের প্রতি। তবে তা-ই হোক, আমার রূপের টানেই তিনি আসুন, না-এলে আমার নতুন জন্ম যে একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে। মাকে বললো: "তাই তো ডাকছি দিনরাত, শুনতে যদি না পান, ভয় নেই, দে তোর মন্তর প'ড়ে। সবই তাঁর সইবে।" এ-মন্ত্র "দেহের আকর্ষণীয় মন্ত্র", মনুষ্যজাতির আদিমতম মন্ত্র।

প্রকৃতি প্রাণপণে চাইতে লাগলো তার রূপের টান আরো মজবুৎ হোক্, কিছুতেই আনন্দ যেন এই মোহিনীমায়া কাটাতে না-পারেন। সে মনে-মনে জানে শুধু একবার ভিক্ষু যদি সন্ন্যাসব্রত ভঙ্গ ক'রে তার কাছে এসে বসেন তার আধো-আঁচলে তাহ'লে দেওয়া-নেওয়ার বিষমতা যাবে ঘুচে। মায়াবিনী তো শুধু মায়ার ফাঁদ পেতে রাখেনি, ফাঁদের তলায় ঢাকা আছে তার সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে-দেওয়া প্রেমের সাধনা, বেদনা ও ব্যাকুলতা।

আজ জেনেছি আমি নই-যে অভাগিনী
দেবই আমি, দেবই আমি, দেবই
উজাড় করে দেব আমারে।

প্রকৃতি যখন তার দেহের সঙ্গে তার কানায়-কানায় ভরা প্রেমিক হৃদয় তুলে ধরবে আনন্দের ওষ্ঠাধরে, তখন কি আনন্দের পক্ষে শুধু দেহ গ্রহণ ক'রেই ক্ষান্ত থাকা সম্ভব হবে? সব নেবেন তিনি, এবং সব না-দিয়ে পারবেন না। "আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসায় ভোলাব" গানটি 'চণ্ডালিকা'য় নেই, কিন্তু প্রকৃতির মুখে মানাতো ভালো। রূপের টানে একবার শুধু আসুন তিনি, তারপরে বাঁধবো তাঁকে ভালোবাসার বন্ধনেই; সে-বন্ধনে তাঁরও মুক্তি, আমারও।

'চণ্ডালিকা' নাটকে চণ্ডাল-কন্যার প্রেমের ক্রমবিকাশ ও স্তরে-স্তরে আরোহন দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। নাটকের শেষে প্রকৃতির প্রেমে মাটির গন্ধ যতোটা পাওয়া যায় তার চেয়ে আকাশের নীলিমা দেখা যায় বেশি। যত্রতত্র ব্যবহারের ফলে 'আধ্যাত্মিক' শব্দটার অর্থ এত তরল হয়ে গেছে যে আমার বলতে সংকোচ হচ্ছে প্রকৃতির প্রেম প্রাণিকতা থেকে অবশেষে উঠে গেলো আধ্যাত্মিকতার স্তরে। তুলনায় রাজেন্দ্রনন্দিনী চিত্রাঙ্গদার প্রেম প্রথম থেকে শেষ অবধি পার্থিব, প্রাণধর্মী। নাটকে আমরা দেখি সে-প্রেমের ক্রমবিবর্তন নয়, ক্রমউদ্‌ঘাটন। প্রারম্ভেই যে-প্রেম চিত্রাঙ্গদার মনের মধ্যে একপ্রকার পূর্ণতায় পৌঁছেছিলো। তাই নাটকের শেষে অর্জুনকে পতিরূপে লাভ ক'রে সার্থকতার তীর্থে পৌঁছলো। কেমন ক'রে, কী আশ্চর্য কৌশলে—তা নিয়েই নাটক। চিত্রাঙ্গদার চরিত্রমর্যাদা প্রকৃতির অপেক্ষা

অনুজ্জ্বল নয় কোনোমতেই, তবু ভিন্ন উপকরণে গড়া সে-মর্যাদা। এই দুই অখ্যাত অনার্য নারীর বহুস্তরবিন্যস্ত ব্যক্তিস্বরূপের পাশে তাদের খ্যাতিমান আর্যবল্লভদ্বয়ের সরল, সাদামাটা, অপেক্ষাকৃত অপরিণত চরিত্রের জ্যোতি নিষ্প্রভ হয়ে যাবারই কথা। নাটকদ্বয়ের সাফল্য এই যে এ লক্ষণীয় পরিণামটি আমাদের চোখের সামনে ঘটে অথচ আমরা লক্ষ করি না ; ভাবি (প্রায় ভেবে ফেলি), বৌদ্ধ ভিক্ষু আনন্দই উদ্ধার করেছেন কামার্ত চণ্ডাল-কন্যাকে, গাণ্ডীবধন্বা অর্জুনই বুঝি ধন্য করেছেন মণিপুরের রাজকন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ ক'রে।

দুই

রূপে নয়, গুণে এবং অবশ্য ভালোবাসায় ভোলাতে চেয়েছিলো চিত্রাঙ্গদাও তার মনোবাঞ্ছিত বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে—"এই পার্থ আজন্মের বিস্ময় আমার!" তরুণ বয়সে মণিপুর রাজ্যের নৃপতি-কন্যার মনে একটি "বাল্য দুরাশা" জাগরূক ছিলো "পার্থ-কীর্তি করিব নিষ্প্রভ আমি নিজ বাহুবলে।" কিন্তু মৃগয়ায় বেরিয়ে একদিন অকস্মাৎ ঐ শ্রুতকীর্তি বরেণ্য পুরুষের "সরল সুদীর্ঘ দেহ" এবং "আপনাতে আপনি অটল মূর্তি" দেখে এতদিনকার তারুণিক স্পর্ধা এক মুহূর্তে সম্পূর্ণ মুছে গেলো তার মন থেকে, জেগে উঠলো দুর্বার উদ্বেল প্রেম—"যে ভূমিতে আছেন দাঁড়িয়ে / সে ভূমির তৃণদল হইতাম যদি।" ব্যাকুল হয়ে উঠলো সে অর্জুনকে পাওয়ার জন্য, রণক্ষেত্রে নয়, হৃদয়ক্ষেত্রে তাঁকে জয় করবার জন্য। অর্জুন কিন্তু অবজ্ঞাসূচক স্মিতহাস্য ক'রে অন্যদিকে চ'লে গেলেন "বুঝি সে বালক মূর্তি হেরিয়া আমার।"

নিজের চারিত্র্যশক্তি, ধীশক্তি এবং অন্যান্য উচ্চপর্যায়ের গুণাবলির প্রতি চিত্রাঙ্গদার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিলো, আস্থা ছিলো, কিঞ্চিৎ গর্বও ছিলো :

সঙ্গীরূপে থাকিতাম সাথে,
রণক্ষেত্রে হতেম সারথি, মৃগয়াতে
রহিতাম অনুচর, শিবিরের দ্বারে
জাগিতাম রাত্রির প্রহরি, ভক্তরূপে
পূজিতাম, ভৃত্যরূপে করিতাম সেবা,
ক্ষত্রিয়ের মহাব্রত আর্ত-পরিত্রাণে
সখারূপে হইতাম সহায় তাঁহার।
একদিন কৌতূহলে দেখিতেন চাহি,
ভাবিতেন মনে মনে, "এ কোন্ বালক,
পূর্বজন্মের চিরদাস, এ জনমে
সঙ্গ লইয়াছে মোর সুকৃতির মতো।"
ক্রমে খুলিতাম তাঁর হৃদয়ের দ্বার,
চিরস্থান লভিতাম সেথা।

কিন্তু হায়, গুণের দ্বারা কারো হৃদয় জয় করতে বড়ো বেশি সময় লাগে, আর বনে-বনে ভ্রাম্যমাণ অর্জুন তো কয়দিন পরেই মণিপুর রাজ্য ছেড়ে চ'লে যাবেন অন্যত্র।

এরই মধ্যে জয়-পরাজয়ের পালাটা শেষ করতে হবে তাকে। অতএব অগত্যা সে তার অপরূপ দৈহিক সৌন্দর্য ও মাধুর্যের মায়াবন্ধনে অর্জুনকে বাঁধতে উদ্যত হ'লো। এ-কাজটা দ্রুতসাধ্য। কুরূপা মধ্যযৌবনা চিত্রাঙ্গদাকে সুরূপা সদ্যোদ্ভিন্নযৌবনা চিত্রাঙ্গদায় রূপান্তরিত করার ব্যাপারে মদন ও মদন-সখা বসন্তের ভূমিকা প্রতীকী। এই অলৌকিক কাণ্ডের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ শুধু এটুকুই বোঝাতে চেয়েছেন যে নারীর দেহলাবণ্য অত্যন্ত স্বল্পকালীন এবং বাহ্যিক ব্যাপার। ("এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহবিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে";) চারিত্র্যশক্তিতেই নারীর আসল রূপ ফোটে, তার "স্থায়ী পরিচয়", "জীবনের ধ্রুব সম্বল"।

সুতরাং চিত্রাঙ্গদা পুরুষালী মৃগয়া-সমুচিত কেজো কিন্তু শ্রীহীন বেশ ফেলে দিয়ে ধারণ করলো এমন মেয়েলী সুপরিমিত আবরণ ও আভরণ যাতে তার নারী-দেহের পূর্ণ যৌবনের সমূহ মোহিনী মায়া অর্জুনের "অটল মূর্তিতে" ফাটল ধরিয়ে দিতে পারে; উপরন্তু পুষ্করিণীর জলবিম্বে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিজের রূপ দেখার ছল ক'রে অদূরে দণ্ডায়মান অর্জুনকে দেখার সুযোগ দিলো তার দেহের "মর্ত্যে অতুল্য" ঐশ্বর্য। যাকে পুরুষ বেশে দেখে অর্জুন তাচ্ছিল্য ক'রে অন্যদিকে চ'লে গিয়েছিলেন তারই অপরূপ দেহলাবণ্যের মায়াজালে ধরা দিলেন এবার। চিত্রাঙ্গদার মর্মবেদনা এই যে অর্জুন বড়ো সহজেই ধরা দিলেন, "লহো মোর খ্যাতি, লহো মোর কীর্তি, লহো মোর পৌরুষগর্ব" বলতে-বলতে যেন ছুটে এসে লুটিয়ে পড়লেন তার পায়ের কাছে।

রূপের মদিরা পান ক'রে মাতাল অর্জুন দুই ব্যগ্র বাহু সম্প্রসারিত ক'রে ডেকে উঠলেন: "এসো এসো, যে হও সে হও।" তার সোজাসুজি অর্থ কি প্রায় এইরকম দাঁড়ায় না—তুমি রূপজীবিনী হও, জন্মহাবা হও কিংবা শত্রুপক্ষের ক্রূরবুদ্ধি গুপ্তচর—তাতে কিছু এসে যায় না, এই অপরূপ দেহ যার তাকেই আমার চাই। এর পরে

শুধু একা পূর্ণ তুমি
সর্ব তুমি
বিশ্ববিধাতার গর্ব তুমি
অক্ষয় ঐশ্বর্য তুমি
এক নারী সকল দৈন্যের তুমি মহা অবসান
সব সাধনার তুমি শেষ পরিণাম,

ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিগুলি একটু ফাঁকা শোনায় বৈ-কি। নারীর মধ্যে তার বহিরঙ্গের রূপচ্ছটা ছাড়া আর-কিছুই কি তখনো দেখতে শেখেননি অর্জুন? দৃষ্টিশক্তি যাঁর এতখানি শরীরান্ত তিনি তো অর্জুন নামের, পুরুষোত্তম উপাধির, যোগ্য নন। স্বভাবতই চিত্রাঙ্গদার মনে ধিক্কার জন্মালো: দ্বিবিধ ধিক্কার—বিশ্বজয়ী অর্জুনের প্রতি, এবং অর্জুন-বিজয়ী নিজের মায়াবী দেহের প্রতি।

যে-অর্জুন তার আবাল্য ভাবজগতের হিরো, সেই অর্জুনকে জয় করার আনন্দ মলিন হয়ে গেলো প্রথম মুহূর্তেই। অর্জুনকে সে চেয়েছিলো প্রেমিকরূপে, পেলো কামার্তরূপে।

কে আমি, কী আছে মোর, কী দেখেছ তুমি,
কী জান আমারে?

আমার দেহই কি সব, সর্বোত্তম সত্তা, সব গুণের সেরা গুণ? আমার মধ্যে আর-কিছু তুমি দেখতে পাওনি সে-দুঃখ বড়ো কম নয়; তার চেয়েও তীব্র জ্বালাময় আমার ব্যর্থতা এই যে আর-কিছু তুমি দেখতে চাওনি। "কোথায় গেলো প্রেমের মর্যাদা, কোথায় রইলো প'ড়ে নারীর সম্মান?" সব নারী এতে অসম্মানিত ও ক্ষুব্ধ বোধ করতো না, কিন্তু চিত্রাঙ্গদা করলো—নৃপতি-কন্যা ব'লে নয়, স্বভাব-প্রেমিকা ব'লে। সে-স্বভাব এতদিন চাপা পড়েছিলো তার স্থূল পুরুষ-বেশে, পৌরুষের কঠিন সাধনায়, রাজকুমারোচিত কর্মভারে। আজ যথাযোগ্য উদ্দীপকের আঘাত-মাত্রে সে-প্রেমীসত্তা উদ্দাম হয়ে উঠলো তার নারীবক্ষে। রাজকার্যে, মৃগয়ায় ও অন্যান্য পুরুষোচিত দুরূহ বিদ্যায় বিদুষী চিত্রাঙ্গদা অনঙ্গদেবের কাছে আক্ষেপ ক'রে বলেছিলো যে সে মনোহরণের বিদ্যা শেখেনি, তাই তার বাঞ্ছিত-সম্মিলন ব্যর্থ হ'লো। কামদেব ঠিকই উত্তর দিয়েছিলেন—এ-বিদ্যা কোনো নারীকে শিখতে হয় না, যৌবনই শিখিয়ে দেয় পূর্ণমাত্রায়। কিন্তু অন্য অর্ধোচ্চারিত আক্ষেপটি সত্য—অর্জুন প্রেমের পাঠে নিরক্ষর। বর্ণপরিচয় থেকে আরম্ভ ক'রে তাঁকে প্রেমের বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষিত ক'রে তোলার দায়িত্ব নিলো এই স্বভাবে ও সাধনায় অসাধারণ গুণান্বিতা রাজকুমারী—সম্পূর্ণ সজ্ঞানে না-হ'লেও একেবারে অজ্ঞাত-সারেও নয়।

কামের উদ্দীপনায় আত্মহারা অর্জুনকে অনর্জুন ব'লে ধিক্কার দিয়ে ফিরিয়ে তো দিলো চিত্রাঙ্গদা, কিন্তু সত্যিই কি তাঁকে ও-রকম-ক'রে ফেরানো যায়? হোক্ কাম, কিন্তু তা যে অর্জুনের কাম, কোনো সামান্য লোকের কাম নয়। আর যতোই অসামান্য হোক্ চিত্রাঙ্গদা তার বহুবিধ চিৎপ্রকর্ষে, তবু তো সে নারী, রক্তমাংসে গড়া তার দেহ, কামনায়-তৃষ্ণায় ভরা তার হৃদয়, তার প্রতি অঙ্গ।

হায়, হায়, সে কি ফিরাইতে পারি! সেই
থরথর ব্যাকুলতা বীরহৃদয়ের,
তৃষাত কম্পিত এক স্ফুলিঙ্গনিশ্বাসী
হোমাগ্নিশিখার মতো; সেই নয়নের
দৃষ্টি যেন অন্তরের বাহু হয়ে কেড়ে
নিতে আসিছে আমায়; উত্তপ্ত হৃদয়
ছুটিয়া আসিতে চাহে সর্বাঙ্গ টুটিয়া,
তাহার ক্রন্দনধ্বনি প্রতি অঙ্গে যেন
যায় শুনা। এ তৃষ্ণা কি ফিরাইতে পারি?

শত তিরস্কার শুনেও অর্জুনের পক্ষেই কি ফিরে না-আসা সম্ভব? রূপ-হুতাশনে যে দু-জনেই দগ্ধ হচ্ছে, দগ্ধ ক'রে মারছে পরস্পরকে। অর্জুন আবার ফিরে এলেন—লজ্জিত হয়ে নয়, নতমস্তকে নয়, আগুনের লেলিহান অভ্রভেদী শিখা হয়ে। আর চিত্রাঙ্গদা?

দাঁড়ানু উঠিয়া। মিথ্যা শরম সংকোচ
খসিয়া পড়িল শ্লথ বসনের মতো
পদতলে। শুনিলাম, "প্রিয়ে, প্রিয়তমে!"
গম্ভীর আহ্বানে, মোর এক দেহমাঝে
জন্ম জন্ম শতজন্ম উঠিল জাগিয়া।
কহিলাম, "লহ, লহ, যাহা কিছু আছে
সব লহ জীবনবল্লভ!" দুই বাহু
দিলাম বাড়ায়ে।—চন্দ্র অস্ত গেল বনে
অন্ধকারে কাঁপিল মেদিনী। স্বর্গমর্ত্য
দেশকাল দুঃখসুখ জীবনমরণ
অচেতন হয়ে গেল অসহ্য পুলকে।

এই অসহ্য পুলকের পর ভোরের প্রথম আলোয় দেখা গেলো শ্রান্ত কিন্তু সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত অর্জুন ঘুমিয়ে আছেন পুষ্পশয্যায়, "শ্রান্ত হাস্য লেগে আছে ওষ্ঠপ্রান্তে তাঁর···রজনীর আনন্দের শীর্ণ অবশেষ।" চিত্রাঙ্গদার মনে কিন্তু স্বর্গমর্ত্য কাঁপিয়ে-তোলা এই প্রচণ্ড অভিজ্ঞতার অবশেষ কোনো প্রশান্ত প্রসন্ন অনুভূতি নয়, বেদনা গ্লানিই। কেন এই অপ্রত্যাশিত দেশকালপাত্র-অসমুচিত তিক্ততার স্বাদ? অদ্ভুত কথা বলছে চিত্রাঙ্গদা:

বহুকাল সাধনায় এক দণ্ড শুধু
পাওয়া যায় প্রথম মিলন, সে-মিলন
কে লইল লুটি আমারে বঞ্চিত করি।
··· ··· ···
আজ প্রাতে উঠে, নৈরাশ্যধিক্কারবেগে
অন্তরে অন্তরে টুটিছে হৃদয়। মনে
পড়িতেছে একে একে রজনীর কথা।
বিদ্যুৎবেদনাসহ হতেছে চেতনা
অন্তরে বাহিরে মোর হয়েছে সতীন।

দেহ আর মনকে কি এতই বিচ্ছিন্ন করা যায় যে পরস্পর-সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ায় দুই সতিনের সম্পর্কের মতো তিক্ত ও ঈর্ষা-পীড়িত? এই অসম্ভব উপমা শুধু চিত্রাঙ্গদার মুখে নয়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মুখেও শুনে আমি বিস্ময় বোধ করি: "সেই সঙ্গে কেন জানি হঠাৎ আমার মনে হল সুন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হৃদয় ভুলিয়েছে তা হলে সে তার স্বরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে।

এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহবিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে।"

দেহকে এতখানি বাইরের জিনিস, ধার-করা জিনিস, ব্যক্তিসত্তায় তার অবদানকে—বিশেষত প্রেমের মতো অমূল্য অভিজ্ঞতায় তার অবদানকে—এত নগণ্য ও পরিহার্য রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই ভাবেননি। তাই চিত্রাঙ্গদা পড়তে-পড়তে (বা শুনতে-শুনতে) আমার মনে এই প্রসঙ্গে মৃদু অতৃপ্তি ও অস্বস্তি রেখায়িত হয়ে ওঠে তা তাঁর অন্য একাধিক শ্রেষ্ঠ কাব্যপাঠে সহজেই মুছে যায়। শ্যামার কাছে তার দেবকান্তি প্রেমাস্পদ দেহে আর মনে একাকার হয়ে গিয়েছিলো, যেমন হয়েছিলো চণ্ডালিকার কাছেও প্রেমের প্রথম পর্বে। কামনার সঙ্গে শ্রদ্ধা, রূপমুগ্ধতার সঙ্গে গুণমুগ্ধতা, শরীরের মূল্যবোধের সঙ্গে ব্যক্তিস্বরূপের মূল্যবোধ অবিশ্লেষ্য সাযুজ্য লাভ ক'রে যে অমূল্য রসানুভূতি দানা বাঁধে তা-ই প্রকৃত প্রেম, পরিপূর্ণ প্রেম। 'সানাই'-এর "পূর্ণ হয়েছে বিচ্ছেদ যবে" কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবক একবার পড়লে কেউ কখনো ভুলতে পারে না :

> এমনি রাত্রে কতবার, মোর বাহুতে মাথা,
> শুনেছিল সে-যে কবির ছন্দে কাজরি-গাথা,
> রিমি ঝিমি ঘন বর্ষণে বন রোমাঞ্চিত,
> দেহে আর মনে এক হয়ে গেছে যে-বাঞ্ছিত।
> এল সেই রাতি বহি শ্রাবণের সে-বৈভব—
> মন শুধু বলে, অসম্ভব এ অসম্ভব।

'চিত্রাঙ্গদা' নাটকে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন কথা বলতে চেয়েছেন ; বলতে চেয়েছেন —অন্তরের রূপই সত্য, মানুষের সত্য পরিচয় তাতেই ; বাহিরের রূপ মিথ্যা, কোনো-এক দেবতার ছলনা, বা প্রকৃতির জৈব উদ্দেশ্য সাধন করবার ছল। চিত্রাঙ্গদা তার দেবানুগ্রহে প্রাপ্ত রূপকে ব্যবহার করেছে অর্জুনকে দেহের দেহলি পার ক'রে অন্দরমহলের উপরতলায় পৌঁছিয়ে দেবার সোপান-রূপে। একবার পৌঁছতে পারলেই হ'লো, তারপরে সোপানটির আর কোনো প্রয়োজন থাকে না। মনে হয় রাষ্ট্রনীতিতে বিদগ্ধ এই রাজকুমারী বহু যত্নে রচিত একটি একসালা পরিকল্পনার খসড়া চোখের সামনে রেখে অর্জুনের সঙ্গে প্রেমলীলা শুরু করেছিলো ঐ বীরশ্রেষ্ঠের হাতে ধ'রে তাকে আত্মহারা কাম থেকে আত্মপ্রতিষ্ঠ শুভ্র সুন্দর প্রেমে ধীর পদক্ষেপে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সে-প্রেমের ফল হবে আদর্শ দাম্পত্য জীবন ; তারা পরস্পরকে নিয়ে আর ব্যাপৃত থাকবে না, সকল শুভকর্মে এমন-কি "দুরূহচিন্তাতে"ও হবে একান্ত সহধর্মী ও সহকর্মী।

প্ল্যানটা খুব জটিল বা সূক্ষ্ম নয়, তবে অর্জুনের পক্ষে তা-ই যথেষ্ট। তাঁর দেহ যেমন ঋজু, মনও তেমনি সরল। চিত্রাঙ্গদা মনস্থির করলো তার দেহলাবণ্যে অভিভূত অর্জুনকে সেই লাবণ্যসুধা এমন আকণ্ঠ পান করাবে দিনের পর দিন,

মাসের পর মাস যে বছর না-যেতেই ঐ কামমত্ত বীরপুরুষ হাঁফিয়ে উঠবেন, বলতে বাধ্য হবেন, আর না, ঢের হয়েছে, এবার অন্য-কিছু চাই, অন্য-কোনোখানে যেতে চাই। "কেন রে ক্লান্তি আসে আবেশভার বহিয়া"—নির্বোধ, বুঝতে পারছো না ক্লান্তি আনাটাই বুদ্ধিমতীর অভিপ্রেত ছিলো? "নারীর ললিত লোভন লীলায়" ক্লান্ত হবার আগেই অর্জুন ইচ্ছা প্রকাশ করলেন লোকালয়ে গিয়ে ঘর বাঁধবার; সামাজিক কাজকর্ম লোকহিত পূজাপার্বণ নিয়ে দিন কাটাবার কথা বললেন; রাত্রি থাক প্রেমের জন্য, কামের জন্য। চিত্রাঙ্গদা রাজী নয়। অর্জুন চাইলেন মৃগয়ায় গিয়ে তাঁর অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিতে। চিত্রাঙ্গদা রাজী নয়। একদল গ্রামবাসী পাশ দিয়ে ছুটে পালাচ্ছিলো দস্যুভয়ে। অর্জুনের ক্ষাত্রশক্তি তখনই উদ্যত হলো শত্রুনাশ ক'রে আর্তের পরিত্রাণের জন্য এগিয়ে যেতে। চিত্রাঙ্গদা রাজী নয়। তার একই ওজর: আমার বাহুপাশ থেকে যদি স্বল্পকালের জন্যও মুক্ত হয়ে অন্যত্র যেতে চাও, তবে আর ফিরে পাবে না আমাকে, আমার রূপযৌবন কারো জন্যে অপেক্ষা করতে পারে না—"এ বন্য হরিণী···চকিতে ছুটিয়া যায় কে জানে কখন স্বপনের মতো।" স্বভাবতই অর্জুনের বোধ হ'লো এবং ব্যথা হ'লো বোধ ক'রে যে "বহুদিন রয়েছে অলস হয়ে ক্ষত্রিয়ের বাহু।"

ক্লান্তি ও অস্থিরতা যখন চূড়ান্তে পৌঁছেছে তখন অর্জুন ব'সে-ব'সে ভাবতে লাগলেন—চিত্রাঙ্গদার কতোপ্রকার গুণের কতোরকমের প্রশস্তি তিনি পথিক বা পলাতকজনের কাছ থেকে শুনেছিলেন উদ্‌যাপিত বছরের কতো দিন। কামচর্চায় বিভোর অর্জুন তখন সে-সব কথা কানে শুনলেও মন দিয়ে শোনেননি। এখন বছর শেষে সেইসব কথা ভাবতে-ভাবতে অর্জুন যেন আর-এক চিত্রাঙ্গদার সন্ধান পেলেন। এতদিনে সর্বপ্রথম তাঁর মনে হ'লো যে-চিত্রাঙ্গদাকে শুধু চোখে দেখে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে তিনি ব'লে উঠেছিলেন "এক নারী সকল দৈন্যের তুমি মহা অবসান", সে-নারীর মন-মাতানো দেহের আড়ালে যে-মন লুকানো রয়েছে তার পরিচয় তো এখনো বলতে গেলে তিনি পানইনি; সেই অন্তঃপুরবাসিনী চিত্রাঙ্গদার হৃদয়-মনের ভাবনা-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, এষণা-উদ্দীপনা নিয়ে যে-ব্যক্তিসত্তা রচিত তার রূপরেখা এখনো অতিশয় ঝাপসা রয়েছে তাঁর মনশ্চক্ষে। একটি অপূর্ব উপমা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ অর্জুনের এই সময়কার ভাবনা প্রকাশ করেছেন:

যেন পান্থ আমি প্রবেশ করেছি গিয়া
কোন্ অপরূপ দেশে অর্ধরজনীতে।
নদীগিরিবনভূমি সুপ্তিনিমগন,
শুভ্রসৌধকিরীটিনী উদার নগরী
ছায়াসম অর্ধস্ফুট দেখা যায়, শুনা
যায় সাগরগর্জন; প্রভাত প্রকাশে
বিচিত্র বিস্ময়ে যেন ফুটিবে চৌদিক;

প্রতীক্ষা করিয়া আছি উৎসুক হৃদয়ে
তারি তরে।

এরপর নাটক দ্রুতগতিতে এগোয় সুখময় সমাপ্তির অভিমুখে। এতদিন যাকে শুধু চোখেই দেখেছিলেন অর্জুন, শুধু পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়েই যার সান্নিধ্য সম্ভোগ করেছিলেন, আজ সমূহ হৃদয়-মন দিয়ে উপলব্ধি করলেন যে সেই বরাঙ্গনার দেহই শুধু মর্ত্যে অতুল্য নয়, তার মন এবং চরিত্রও তেমনি বা ততোধিক সুন্দর। উপলব্ধির ফলে তাঁর হৃদয়ানুরাগ আরো গাঢ় হ'লো কিন্তু রঙ তার গেলো পাল্টে, কামের রক্তিম পটে ধীরে-ধীরে ফুটলো প্রেমের শ্বেতপদ্ম। অর্জুনের প্রেমিক দৃষ্টিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো চিত্রাঙ্গদার সমগ্র সত্তার রূপ। আগেই বলেছি চিত্রাঙ্গদার বহিঃরূপকে মিথ্যা এবং অন্তঃস্বরূপকে সত্য ব'লে রবীন্দ্রনাথ আমাকে ধাঁধায় ফেলেছেন। বলা বাহুল্য, 'সত্য'-'মিথ্যা' শব্দগুলি এখানে বৈজ্ঞানিক অর্থে প্রয়োগ করা হয়নি, প্রয়োগ করা হয়েছে মূল্যদ্বয়ের দুস্তর তারতম্যের বোঝাবার জন্য। কিন্তু যা ক্ষণিক বা স্বল্পকালীন তার মূল্য নগণ্য—এ-কথা মানতে আমার মন সরে না। রবীন্দ্রনাথও অনেক সময়ে মানেননি। বিশেষত শেষ পর্বে তিনি বার-বার এমন অমৃতভরা মুহূর্তের কথা বলেছেন যা আমাদের শুষ্ক শূন্য জীবনে পারিজাতগন্ধ বহন ক'রে নিয়ে আসে, দিনানুদৈনিক বৎসরানুবাৎসরিক নিরর্থকতাকে অর্থবান ক'রে তোলে। তাছাড়া, মননশক্তি ও চরিত্রশক্তি দিয়ে গড়া অন্তরের রূপও তো চিরস্থায়ী নয়। প্রৌঢ়ত্বের স্পর্শে যদি দেহের সৌন্দর্যে ক্ষয় ধরে, বার্ধক্যের স্পর্শে তেমনি মনের বা আত্মার সৌন্দর্যেও বিকারের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মরবার অনেক আগেই আমাদের দেহে এবং মনে মৃত্যুর কালিমা দিনে-দিনে প্রকট হ'তে থাকে। মৃত্যু নয়, জরা—দেহের এবং ফলত, অনিবার্যত, মনের জরা—মানব-জীবনের সবচেয়ে দুঃসহ অভিশাপ।

সে যা-ই হোক, অর্জুন চিত্রাঙ্গদার সম্পূর্ণ রূপ দেখে আবার নতুন ক'রে প্রেমে পড়লেন: তাঁর দেহ-মনের অবসাদ, বিষাদ, গ্লানি সম্পূর্ণ ঘুচে গেলো। এই পুনরুজ্জীবিত ও পূর্ণতর প্রেমে দেহের অনুপাত কতোখানি এবং মনের কতোখানি সে-বিচারে কাজ নেই। যবনিকাপাতের অব্যবহিত পূর্বে চিত্রাঙ্গদার সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত বাক্যচ্ছটা শুনে অর্জুন অভিভূত হয়েছিলেন কিন্তু ঠিক বুঝতে পারেননি তার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা। পাঠক-সমাজেও এটি স্ত্রী-স্বাধীনতার অব্যর্থ প্রকাশ ব'লে গৃহীত হয়েছে, অথচ দ্ব্যর্থতা ছিলো তাতে। সমগ্র নাটকটাই যে নারী-শ্রেষ্ঠতার মুক্তকণ্ঠ কিন্তু অব্যর্থ ঘোষণা।

হায় পার্থ, হায়, তুমি কি বুঝতে পারলে কার পাণিগ্রহণ ক'রে তুমি ধন্য হয়েছো? সে যে পূর্ণমানব (রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে যতোখানি পূর্ণ হওয়া সম্ভব), একাধারে পুরুষ এবং নারীর সমূহ শ্রেষ্ঠ গুণে বিভু—"স্নেহবলে তিনি মাতা, বাহুবলে তিনি রাজা"; শুধু বাহুবলে নয়, যাবতীয় রাজকার্যসংক্রান্ত বিদ্যাবলেও। অর্জুনের সঙ্গে বৎসরকালব্যাপী কাম ও প্রেমচর্চায় নিমগ্ন হবার পূর্বে:

স্থাপন করিয়া গেছে সতর্ক প্রহরী
দিকে দিকে, বিপদের যত পথ ছিল
বন্ধ করে দিয়ে গেছে বহু তর্ক করি।

তুমি তো কেবলই পুরুষোত্তম, অর্থাৎ পূর্ণমানবের আধখানা, তোমার মধ্যে নারীর শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর তো কিছুই নেই। যতোদিন তুমি মণিপুর রাজ্যে বাস করবে ততোদিন চিত্রাঙ্গদার পাশে তুমি নিষ্প্রভ হয়ে থাকবে না কি—পূর্ণচন্দ্রের পাশে অর্ধচন্দ্র? এমন অত্যন্ত শোভন মধুর কৌশলে এই মানবোত্তমা তোমার চরণে নিজেকে নিবেদন করলো যে তুমি টের পাওনি কে গ্রহীতা এবং কে গৃহীত, টের পাওনি যে তোমার চরিত্রশক্তিকে বেশ-খানিকটা সম্প্রসারিত ও সমুন্নত ক'রে, তোমার প্রখ্যাত বীর্যশৌর্যের মাটিতে এতাবৎকাল অনুদ্গত অধ্যাত্মবোধ (প্রেম-বোধ) বহু যত্নে অঙ্কুরিত এবং বেশ-খানিকটা পরিস্ফুট ক'রে তবে তোমাকে পতিরূপে গ্রহণ করলো চিত্রাঙ্গদা। শুধু তার চারুশীলিত হৃদয় নয়, তার অতি সূক্ষ্ম বহুদর্শী বুদ্ধি, তার মসৃণ কোমল কর্মকুশলতা কোথা পাবে তুমি? তুমি যে কেবলি পুরুষ!

তিন

চিত্রাঙ্গদা এবং প্রকৃতি ভিন্ন জাতের মানুষ, ভিন্ন তাদের সামাজিক পরিবেশ ও আশৈশব শিক্ষাদীক্ষা, ভিন্ন তাদের পরিণত ব্যক্তিস্বরূপের সংস্থাপনা। তবু দুই নাটকের গোড়াতে আমরা দুই নায়িকাকে যে-পরিস্থিতিতে দেখি তা কতকটা একইপ্রকারের। দু-জনের জীবন-পরিধির মধ্যে অকস্মাৎ পদার্পণ করলেন রূপে-গুণে দুই অসাধারণ পুরুষ; দুই নায়িকাই প্রথম দর্শনে তাঁদের প্রেমে পড়লো; প্রতিদানে দু-জনই পেলো প্রেম নয়, কাম। এই পর্যন্ত। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য তুলনা নয়; প্রতিতুলনা; এবং প্রতিতুলনা করবার মতো অনেককিছু আছে এই দুটি তুলনীয় নাটকে।

বীরশ্রেষ্ঠ তৃতীয় পাণ্ডবের খ্যাতি ভারতময় ছড়িয়ে পড়েছিলো, পূর্বপ্রান্তবর্তী ক্ষুদ্র রাজ্য মণিপুরের রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদার মনের গভীরে অর্জুনের সমুজ্জ্বল ভাবচিত্র অঙ্কিত ছিলো বালিকা বয়স থেকেই। অর্জুন ছিলেন তার জীবনের আদর্শ নায়ক, হৃদয়ের বরেণ্য পুরুষ। প্রকৃতি কি বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য আনন্দ ভিক্ষুর খ্যাতি আগেই শুনেছিলো? হয়তো শুনেছিলো। অন্তত জানতো তিনি শুধু উচ্চবর্ণের নয়, উচ্চস্তরের জ্ঞানী-গুণী মানুষ; তদুপরি তিনি রূপবান, এমন রূপ সে আগে কখনও দেখেনি। "এই পার্থ, আজন্মের বিস্ময় আমার"—না, এমনতরো অন্তরের ধন ছিলেন না আনন্দ, তবু প্রকৃতি একাধারে পুলকিত ও বিস্মিত হলো যখন আনন্দ খুব কাছে এসে দাঁড়ালেন তারই অশুচি কুয়োর ধারে। সে-বিস্ময়ের অবধি রইলো না যখন তিনি এই চণ্ডাল-কন্যার হাতে জল খেতে চাইলেন।

আনন্দিত বিস্ময় কেমন ক'রে বেদনার্ত প্রেমে পরিণত হ'লো, একটি গণ্ডুষ জল হয়ে গেলো হৃদয়ের অকূল সমুদ্র, তার কথা আগেই বলেছি।

নাটকে চিত্রাঙ্গদার রূপকে বলা হয়েছে দেব-দত্ত, পূজায় তুষ্ট হয়ে অল্পকালের জন্য অনঙ্গদেব ঐ বর দিয়েছিলেন তাপসিনীকে; ঋণ বললে আরো সঙ্গত হয়, কারণ এক বছর পরে প্রত্যর্পণের প্রতিশ্রুতি তার অঙ্গীভূত। অধমর্ণার মনে সন্দেহ ছিলো না যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সে তার দয়িতের কামকে প্রেমে পরিণত ক'রে তুলতে সক্ষম হবে, দেহলাবণ্যের কথাটা তখন আপনিই গৌণ এমন-কি বাহুল্য হয়ে উঠবে দু-জনের হার্দ্য সম্পর্কে। চণ্ডালিনীর রূপ কিন্তু প্রকাশ্যতই মা বসুন্ধরারই দান, এবং এ-ক্ষেত্রে তার মেয়াদ হ্রস্ব কি দীর্ঘ সে-প্রশ্ন তোলা হয়নি। বিশ্বজয়ী অর্জুন ছলনাময়ী নারীর রূপের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন ব'লে চিত্রাঙ্গদা প্রথম দফায় ধিক্কার দিয়েছিলো অর্জুনকে। কিন্তু সে-ধিক্কার সম্পূর্ণ আন্তরিক ছিলো না। অব্যবহিত পরেই কামের বন্যা দু-জনকেই ভাসিয়ে নিয়ে গেলো; তাদের মিলন হ'লো রূপসাগরে ডুব দিয়েই। কেমন ক'রে তারা অরূপরতন, প্রেমের রতনের সন্ধান পেলো, 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের মূল বিষয় তা-ই।

'চণ্ডালিকা' নাটকের মূল বিষয় বেশ-একটু ভিন্ন। প্রথম দর্শনে আনন্দ মুগ্ধ হয়েছিলেন বটে, তবে জলগ্রহণ ক'রেই প্রকৃতির রূপের মায়া কাটিয়ে আত্মসংবৃত ভিক্ষু রূপসীর দিকে দ্বিতীয়বার দৃকৃপাতমাত্র না-ক'রে চ'লে গেলেন। কিন্তু শেষ অবধি ফিরে আসতেই হ'লো তাঁকে। আর ফিরে আসা মানেই তাঁর আধ্যাত্মিক পতন। বুদ্ধদেবের এতদিনকার মহান শিক্ষা ও সাহচর্য থেকে যে-শক্তি পেয়েছিলেন তা ব্যর্থ হ'লো এই দুরূহ হার্দ্য পরীক্ষায়। অবশেষে আত্ম-জয়ের উপযুক্ত বল দিলো সেই অবলা যে তাঁকে রূপের যাদুতে পথভ্রষ্ট ও ভূলুণ্ঠিত করেছিলো। এ-ব্যাপারে চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে তার মিল দেখা যায়: দু-জনই উদ্ধার করলো তাদের দয়িতকে সেই কামের গ্রাস থেকে যেখানে রূপের মায়াজাল বিস্তার ক'রে তারাই টেনে এনেছিলো। কিন্তু অর্জুন উদ্ধার পেলেন প্রেমে, আনন্দ উদ্ধার পেলেন প্রেম-অপ্রেমের ঊর্ধ্বে নির্মল আত্মশুদ্ধিতে। 'চিত্রাঙ্গদা' মিলনান্ত নাটিকা; চণ্ডালিকা'কে ট্র্যাজেডির ভারতীয় সংস্করণ ভাবা যায় হয়তো। পরিসমাপ্তি তার চূড়ান্ত বিচ্ছেদে, কিন্তু চূড়ান্ত দুঃখে নয়। আনন্দ ফিরে গেলেন সেই ঊর্ধ্বলোকে যেখান থেকে তিনি নেমে এসেছিলেন; আত্মসমাহিত প্রকৃতি স্থির দাঁড়িয়ে রইলো তার কুটীর-প্রাঙ্গণে, কিন্তু মনে-মনে অনুসরণ করলো তাঁকে যাঁকে সে নিজেই উদ্ধার করেছিলো।

'চণ্ডালিকা' নাটকের প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রকৃতির দুঃখে ভরা; শেষ মুহূর্তে যখন সে দুঃখজয়ী তখনই দুঃখ তার সবচেয়ে মর্মান্তিক। বিষের জ্বালার চেয়ে "বিষকে দাহ দিয়ে" দহন ক'রে মারার যন্ত্রণা কম নয়; তবু পরিণাম তার মৃত্যু নয়, অমৃত। বুদ্ধদেবের মূল শিক্ষাকে দুঃখের কারণ আবিষ্কার ক'রে দুঃখকে

সমূলে বিনাশ করার শিক্ষা ভাবা ভুল ; দুঃখের মধ্যে থেকেই দুঃখের উপরে থাকার, জীবনের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে প্রশান্তি খুঁজে পাওয়ার শিক্ষাই তিনি দিয়ে গেছেন। দুঃখের পরিধি আর জীবনের পরিধি যে এক। প্রদীপকে যেমন ভোর হওয়া পর্যন্ত জ্বলতে হয়, মানব-জীবনের জ্বালাও তেমনি মৃত্যুর আগে শেষ হবার নয়—বলেছেন গালিব।

আমরা দেখি, প্রকৃতির মনের দর্পণেই দেখি, কী প্রাণান্তকর সংগ্রাম করছেন আনন্দ এই রূপসীর মায়াবন্ধন ছিন্ন ক'রে এতদিন যে-মুক্তির একনিষ্ঠ সাধনা তিনি ক'রে এসেছেন বুদ্ধের প্রিয় শিষ্যরূপে, সেই মুক্তলোকে ফিরে গিয়ে নিষ্কাম ধ্যানে ও কর্মে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'তে। "নিজেরে মারছেন বহ্নির বেত্র / শেল বিঁধছেন আপনার মর্মে"—কতো দূরে আমরা ফেলে এসেছি বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে যিনি এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁর ব্রহ্মচর্য-পালনের ব্রত, বুক ফুলিয়ে বলেছিলেন "পৌরুষের সে অধৈর্য / তাহারে গৌরব মানি আমি।" চিত্রাঙ্গদাও তাকে গৌরব ব'লে মেনে নিতে দ্বিধা বোধ করেনি যখন অর্জুন শুধু তার দেহের নয়, মনেরও প্রেমে পড়লেন। আনন্দের আত্ম-যুদ্ধ ("কী ভয়ংকর দুঃখের ঘূর্ণিঝঞ্ঝা") যোদ্ধার পক্ষে যেমন আগাগোড়া যন্ত্রণাদায়ক ও গ্লানিকর, মায়াদর্পণে দর্শিকা প্রকৃতির পক্ষেও তদ্রূপ—"আমি দেখব না তোর দর্পণ / বুক ফেটে যায়, যায় গো, বুক ফেটে যায়।" অথচ এই যুদ্ধে যদি আনন্দ পরাজিত হন, তবে সে তো প্রকৃতিরই পরম জয়, চরম লাভ। কিন্তু তা নয়। প্রেমের বাজিতে জয়ের আকাঙ্ক্ষা তার মনে জেগেছিলো স্বভাবতই ; তবে অন্য-একটি ভাব, একটি আশঙ্কা ক্রমশ প্রবলতর হয়ে উঠলো—"মহান বনস্পতি ধুলায় কি লুটোবে / ভাঙবে কি অভ্রভেদী তার গৌরব।" সন্ন্যাসী আনন্দের মনোভূমিতে যেমন বন্ধন ও মুক্তির শক্তিপরীক্ষা চলেছে, প্রেমিকা প্রকৃতির মনেও তেমনি প্রেমাস্পদকে পাওয়ার তীব্র ইচ্ছা এবং না-পাওয়ার শুভানুধ্যানের মধ্যে যেন সেই যুদ্ধের প্রতিবিম্ব দেখি আমরা। একবার সে ভাবে :

> বুকের জ্বালা দিয়ে আমি জ্বালিয়ে দিব দীপখানি—
> সে আসবে, ও সে আসবে।
> … … …
> দুঃখ দিয়ে মেটাব দুঃখ তোমার,
> স্নান করাব অতল জলে বিপুল বেদনার :

কিন্তু যখন দেখতে পায় যে তিনি সত্যি ফিরে আসছেন, একেবারে তার বাড়ির সামনে এসে পৌঁছেছেন, তখন শিউরে ওঠে সে—প্রত্যাসন্ন শুভলগ্নের তীব্র হর্ষে নয়, অশুভ পরিণামের বিপুল আশঙ্কায় : "মা ভয় হচ্ছে, তাঁর পথ আসছে শেষ হয়ে, তার পরে ? তার পরে কী ? শুধু এই আমি, আর কিছু না ! এতদিনের নিষ্ঠুর দুঃখ এতেই ভরবে ?" অত্যাশ্চর্য এই ভাবনা। প্রেম কতো গভীরে, কতো

দিগন্ত-ছোঁয়া, কতো গগনচুম্বী হ'লে যে-মিলন বুকের কাছে এসে পৌঁছেছে তাকে উপেক্ষা ক'রে চিরবিচ্ছেদকেই বুক পেতে গ্রহণ করার মতো এমন প্রেমাতীত ভাবনা জাগাতে পারে প্রেমিকার মনে—তা আমরা নাটকের অন্তিম দৃশ্যে স্তব্ধ বিস্ময়ে উপলব্ধি করি।

এমন ভাব চিত্রাঙ্গদার মনে জাগেনি, জাগতে পারতো না ; হয়তো সে রাজেন্দ্র-নন্দিনী ব'লে একদিক থেকে যেমন উঁচু পর্দায় বাঁধা তার মন, অন্যদিক থেকে তেমনি প্রাণ ও মনের সর্ববিধ উৎকর্ষসাধনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। উপনিষদ যাকে 'আনন্দ' বলেছেন, বুদ্ধদেব যার ইঙ্গিত করেছেন 'অমৃত' শব্দের দ্বারা, তার সন্ধান চিত্রাঙ্গদা পায়নি, তার স্বাদ সে জানে না। অর্জুনকে নিয়ে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা অন্যবিধ : অর্জুন যদি আমার রূপের টানে ফিরে আসেন, তার পরে কী, শুধু এই আমার সুন্দর শরীর ? "সে আমি যে আমি নই, হায় পার্থ !" আমার উজ্জ্বল মনের এবং বহুবিধ কর্মশক্তির রূপ দেখে যদি তুমি মুগ্ধ হও তবেই আমরা দু-জনে পৌঁছবো এক মহান সার্থকতার তীর্থে। সে যখন প্রজাদের বলেছিলো তোমাদের রাজকুমারী এক বৎসরের জন্য তীর্থযাত্রায় বেরুচ্ছেন, তখন সে খুব-একটা বানিয়ে বলেনি। প্রেমের চেয়ে বড়ো আর কী তীর্থ আছে মানব-জীবনে ? অন্তত চিত্রাঙ্গদার জীবনে এটাই সর্বোত্তম তীর্থ। চিত্রাঙ্গদাকে বলতে পারি পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের ভাবজগতের মানুষ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূল্য তার কাছে সর্বোচ্চ। রেনেসাঁসের অরুণোদয়ে সে রোম্যাণ্টিক প্রেমের উন্মেষ ঘটলো তাতে আত্মত্যাগের দাবি ছিলো, এমন-কি মৃত্যুবরণ পর্যন্ত সে-দাবি নিয়ে যেতে পারতো প্রেমিককে ; তবু তাতে ব্যক্তির সীমানা ছাড়িয়ে যাওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই ; বরঞ্চ পেত্রার্কা থেকে য়েটস্ পর্যন্ত দেখা যায় প্রায় সব কবি ও নাট্যকার এবং তাঁদের নায়ক-নায়িকারা রোম্যাণ্টিক প্রেমের মধ্যে ব্যক্তিত্বেরই সুন্দরতম স্ফুরণ সন্ধান করেছেন। রবীন্দ্র-নাথের মনেও এই ভাবধারা প্রবল। তবে তিনি একাধারে আধুনিক এবং প্রাচীন (যাঁরা উপনিষদের আলোয় রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন তাঁরা ভুল দেখেননি), রোম্যাণ্টিক এবং রোম্যাণ্টিকতা-উত্তীর্ণ। অল্পকালের ব্যবধানে রচিত তিনটি নৃত্য-গীতিনাট্যের মধ্যে তিনি 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'শ্যামা'তে দেখিয়েছেন রোম্যাণ্টিক প্রেমের পরাকাষ্ঠা, 'চণ্ডালিকা'য় তার স্বাতিক্রমণ।

রাজকন্যা পারেনি, কিন্তু চণ্ডাল-কন্যা পারলো নিজের অকূল-সমুদ্রতুল্য প্রেমকে উত্তরণ করতে, নিজের সমুজ্জ্বল প্রাণময় ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করতে। মনের এই শরীরাতিগ অহমোত্তীর্ণ বিশালতা "শুধু একটি গণ্ডুষ জল" ঘটিয়ে দেয়নি ; আগে থেকেই প্রেম-সাধিকার মন প্রস্তুত ছিলো, মহত্তর ভাব ধারণ করার মতো পাত্র তৈরি ছিলো তার অবচেতনে, আগেভাগেই নিজগুণেই সে হয়েছিলো দেবদ্রোহী এবং অবশ্যই সমাজদ্রোহী। তরুণ বয়স থেকে সে তপ করছিলো চিত্তের গহনে আনন্দের মতন কোনো জ্যোতিষ্মান পুরুষের জন্য। আনন্দের সঙ্গে ক্ষণিক

মিলনের বহু পূর্ব থেকেই "বিচ্ছেদ-দহন" তার মনে গোপন ছিলো, যদিও যাঁর বিচ্ছেদে সে ব্যাকুল তিনি তখন অপ্রকাশ ছিলেন। সে-ও শ্যামার মতো গাইতে পারতো যদিও তখন বাক্যহীন ছিলো তাঁর হৃদয় :

পিপাসিত জীবনের ক্ষুব্ধ আশা
আঁধারে আঁধারে খোঁজে ভাষা।

তাই তো আনন্দকে দেখে সে এই অদ্ভুত কথা বলতে পারলো—"বচনহারা আমাকে দিয়েছে বাক।" প্রকৃতির মনের গভীরতলের এই নিভৃত পিপাসা শ্যামার 'ক্ষুদ্র আশা'র চেয়ে গভীরতর ছিলো, ছিলো সুদূরতর ও মহত্তরের জন্য।

অনুমান করতে বাধা নেই যে বুদ্ধের শাস্ত্র-বর্জিত মানববাদী বৈপ্লবিক ধর্মের বাণী হাওয়ায়-হাওয়ায় ঈষৎ ক্ষীণ হয়ে পূর্বাহ্নেই প্রকৃতির কানে পৌঁছেছিলো; মা-ও শুনেছিলো সে-সব কথা, কিন্তু খুব-একটা গুরুত্ব আরোপ করতে পারেনি তাতে—"ওদের কথা কানেই শোনবার, কাজে খাটাবার নয়।" মেয়ে কিন্তু "মানুষের তৃষ্ণা-মেটানো সম্মান" পাওয়ার আগে থেকেই জানতো আনন্দ কিসের সাধক, কিসের প্রতীক। সেই প্রতীককেও ভালোবেসেছিলো, শুধু তাঁর দৈহিক বাস্তবিকতাকে নয়। সেইখানে বাধলো দ্বন্দ্ব, ঘটলো বিপদ, সর্বনাশও ঘটতে পারতো কিন্তু ঘটেনি, ঘটতে দেয়নি এই অশিক্ষিত অদীক্ষিত ছোটো জাতের মেয়ে।

প্রাণময়ী প্রেম দিয়ে সে আনন্দকে টেনে আনতে চেয়েছিলো তার পাশে, শয্যাসঙ্গীরূপে, স্বামীরূপে। অন্য-এক মহানুভব প্রেম দিয়ে সে আগেই আঁচ করতে পেরেছিলো, পরে চোখে দেখলো, যিনি এলেন তিনি তার ধ্যানের "সেই দীপ্ত উজ্জ্বল, সেই শুভ্র নির্মল, সেই সুদূর স্বর্গের আলো" নন। 'সুদূর' কথাটা লক্ষণীয়; যাকে নিয়ে আমাদের চিত্তের গহনে তপশ্চরণ, তিনি আধো আঁচলে এসে বসলে বা তাঁর জন্য রচিত শয্যায় বাহুতে মাথা রেখে শুয়ে পড়লে তপস্যা পূর্ণ হওয়ার বদলে তপস্যা ভঙ্গ হবে, ব্যর্থ হবে। ভোরবেলার আকাশের আলো দিয়ে তৈরি যাঁর রূপ তাঁর জন্য প্রেমিকার তপস্যা অনন্ত তপস্যা। সুদূরত্ব হ্রাস পেতে থাকবে কিন্তু কখনোই শূন্যে এসে ঠেকবে না। দূরের বন্ধুই সুরের দূতী পাঠাতে পারেন, কাছের—একেবারে দাম্পত্য অব্যবধানের—বন্ধু পারেন না। দাম্পত্যপ্রেমের বেসুর বাজবে মাঝে-মাঝে; মেনে নিতে হবে সেটা। এই তিক্ত-মধুর রসের স্বাদ আলাদা।

প্রকৃতির অনুপম রূপলাবণ্যের মন্ত্রবলের সঙ্গে প্রাণান্ত সংগ্রাম ক'রেও তাকে কাটাতে না-পেরে যখন আনন্দ তার প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালেন তখন সে মর্মে ম'রে গিয়ে দেখলো কী সর্বনাশ করেছে সে : "কী ম্লান, কী ক্লান্ত, আত্মপরাজয়ের কী বোঝা নিয়ে এলে আমার দ্বারে! মাথা হেঁট করে এলে।" দৈহিক কাম থেকে রোম্যান্টিক প্রেমে সমুত্তরণে কিন্তু আনন্দের উদ্ধার সম্ভব নয়, যেমন সম্ভব হয়েছিলো অর্জুনের ক্ষেত্রে। কাজেই সে-দিকে পা বাড়ালো না চণ্ডাল-কন্যা, যদিও তা-ই সে ভেবেছিলো গোড়ার দিকে। প্রেমে পরিপূর্ণ কিন্তু প্রেমেই পরিসমাপ্ত ছিলো

না এই তরুণীর সুপরিণত মন। অন্য পথে, আরো অনেক দুর্গম, দুর্জ্ঞেয়, দুর্বিষহ বেদনার পথে পা রাখলো সে। দেড় হাজার বছর পরে হাফিজ জানলেন এবং লিখলেন: "ইশ্‌ক্ আসান নমুদ্ আউ-ওয়াল্, ওয়ালে উফ্‌তাদ্ মুশ্‌কিল্‌হা" (প্রথম পদক্ষেপে প্রেম বড়ো সহজ ঠেকেছিলো, পরে কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে এলো পথ)।

আনন্দ "এতদিনের নিষ্ঠুর দুঃখে" যে-সাধনামার্গে অনেক দূর এগিয়েছিলেন তার মূল কথা হচ্ছে আত্মকেন্দ্রিক কামনা-বাসনার নিত্য-প্রজ্বলিত অগ্নি নির্বাপিত ক'রে সর্বমানুষ, এমন-কি সর্বজীবের প্রতি মৈত্রীভাবনার অনুশীলন। মৈত্রীভাবনার নির্যাসস্বরূপ যে-শ্লোকটি রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার উদ্ধৃত করেছেন তা বড়ো সুন্দর—"মা যেমন একটিমাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন, সমস্ত প্রাণীকে সেই প্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করিবে।" বুদ্ধের এই মহান শিক্ষার উজ্জ্বল প্রতীক আনন্দ—অন্তত প্রকৃতির চোখে। রোম্যান্টিক প্রেমে কি তাঁর উদ্ধার সম্ভব? প্রেম যতোই-না কেন মহাসাগরতুল্য বিশালতা লাভ করুক, তবু প্রেমের দৃষ্টি একটি ব্যক্তিবিশেষে সীমিত। আমরা ভাবতে পারি যে প্রেমিক প্রেমিকা দু-জনই নিজের-নিজের স্বতন্ত্র অহমতা হারিয়ে গ'ড়ে তুলেছে একটি যুগ্মসত্তা; এই যদি প্রেমের পরাকাষ্ঠা তবু মৈত্রীভাবনা ভিন্ন স্তরের ভাব। প্রেমিকযুগলের কাছে সমাজ-সংসার সব মিছে হয়ে যাবে, মিছে এ-জীবনের কলরব—এমন কোনো কথা নেই। বরঞ্চ তাতে ক'রেই প্রেমের আয়ু দ্রুত ক্ষয় হয়। উভয়ই নিজ-নিজ সর্ববিধ সামাজিক কর্তব্য যথোচিত পালন করুক, এটাই সুস্থ প্রেমের চাহিদা। তবু কর্তব্য কর্তব্যই। মা নিজেকে সব দিক দিয়ে বিলিয়ে দেয় যখন তখন তো সে তার একমাত্র পুত্রের প্রতি কর্তব্যপালনের কথা ভাবে না। এটা তার হৃদয়ের ধর্ম, ন্যায়ধর্ম নয়।

এই হৃদয়ধর্মের অনন্ত প্রসারই শিক্ষা দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দকে। এত বড়ো ধর্ম থেকে চ্যুত হয়ে আনন্দ এসেছেন প্রকৃতির কাছে যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত, আত্ম-পরাজয়ের গ্লানিতে পাংশুবর্ণ, এসেছেন মাথা হেঁট ক'রে। এ-দৃশ্য প্রকৃতি সইতে পারলো না। আনন্দের যন্ত্রণা ও গ্লানি ততোধিক যন্ত্রণাবিদ্ধ ও গ্লানিপূর্ণ করলো তাকে। নিদারুণ আঘাতে তার হৃদয়তন্ত্রের রাগরূপ পাল্‌টে গেলো এক মুহূর্তে; যুবতীর রোম্যান্টিক প্রেম নিজের সীমানা ছাড়িয়ে পরিণত হ'লো মৈত্রীভাবনায়। (সংস্কৃত জাতকে আমরা দেখি প্রকৃতি পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ক'রে ভিক্ষুণী হয়েছিলো। "পা দিয়ে মন্ত্রের উপকরণ ছড়িয়ে ফেলে দিল সে", হাত বাড়িয়ে আনন্দের হাত ধ'রে তুললো তাকে মাটি থেকে; যিনি ছিলেন সর্বতোভাবে পরাজিত তাঁর হেঁট মাথা তুলে ধ'রে বললো আশ্চর্য কথা—"জয় হোক, তোমার জয় হোক, তোমার জয় হোক।" বানানো কথা নয়, প্রবোধবাক্য নয়, এমন আন্তরিকতায় উদ্‌ভাসিত, বিশ্বাসের বলে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বললো যে তার কথাই সত্য

হয়ে উঠলো, আনন্দ ফিরে পেলেন তাঁর তেজোদৃপ্ত অথচ বিনয় মহদাশয়তা, তাঁর এতদিনকার শীলিত আত্মসমাহিতি। ফিরে গেলেন তাঁর স্বকীয় সাধনার পথে। যেতে-যেতে আবার পূর্বের মতো স্থির কণ্ঠে ব'লে গেলেন—"কল্যাণ হোক তব কল্যাণী।" কল্যাণী তার নারীসুলভ সহজ মহৎ বিনয়ে বললো বটে—"প্রভু এসেছ আমাকে উদ্ধার করতে, তাই এত দুঃখ পেলে"; কিন্তু কোনো শ্রোতা বা পাঠকের মনে সন্দেহ থাকে না প্রকৃতপ্রস্তাবে কে কাকে উদ্ধার করলো, কার দুঃখ তীব্রতর, শ্রেয়তর, শ্রদ্ধেয়তর।

প্রেমোত্তীর্ণ প্রেমিকা অশ্রু সংবরণ ক'রে স্থির নেত্রে তাকিয়ে রইলো তার হৃদয়-পথের পথিকের দিকে, দু-হাত দিয়ে বুক চেপে দেখলো তাঁর উল্টো পথে ফিরে যাওয়া, সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করলো তাঁর ফিরে-না-চাওয়া। মনে-মনে হয়তো বলেছিলো—"এ-ও কি রেখে গেলো।"*

* না, শেষ উদ্ধৃতিটি রবীন্দ্রনাথ থেকে নয়, অমিয় চক্রবর্তীর অত্যাশ্চর্য কবিতা "বিনিময়" থেকে।

এ-আলোচনা 'চণ্ডালিকা' গদ্যনাট্য ও গীতিনাট্য এবং 'চিত্রাঙ্গদা' পদ্যনাট্য ও গীতিনাট্য—উভয়ের উপর আশ্রিত। গোড়ার দিকে একক উল্টো কমার বেষ্টনীতে ন্যস্ত অল্প-কিছু সংলাপ কল্পিত, উদ্ধৃত নয়।

পান্থজনের সখা

১ তব চরণতলচুম্বিত পন্থবীণা

য়েট্‌স্ তাঁর আত্মজীবনীতে নিজেকে ধর্মপ্রাণ মানুষ ব'লে বলছেন : "আমার বাল্যকালের সরল ধর্মবিশ্বাস কেড়ে নিলেন হাক্‌স্‌লি এবং টিণ্ড্যাল। সেজন্য আমি তাঁদের ঘৃণার চোখে দেখতাম।" খ্রীষ্টান ধর্মের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হয়ে য়েট্‌স্ এক নতুন ধর্মের কাঠামো রচনা করতে উদ্যোগী হলেন আইরিশ পুরাণ ও কাব্যগাথা এবং লোকমুখে বংশ-পরম্পরায় আগত নানাপ্রকার আইরিশ রূপকথা-উপকথা থেকে উপাদান সংগ্রহ ক'রে ; "আমি রীতিমত একটি ডগ্‌মাও তৈরি ক'রে ফেলেছিলাম।" কিন্তু সত্যিকার ধর্মজিজ্ঞাসা বা ঈশ্বরানুসন্ধানে তাঁর মন ছিলো না (যেমন ছিলো রবীন্দ্রনাথের) ; য়েট্‌স্ শুধু খুঁজছিলেন তাঁর কাব্যের উপজীব্য এবং তাঁর কবিমানসের জন্য একটি শান্ত শোভন বাসভূমি নিজের দেশের মাটিতে অথচ নিজের কালের কোলাহল থেকে বেশ-খানিকটা দূরে। এলিয়টের মতো কোনো চার্চ-অনুশাসিত, শাস্ত্র-নির্ভর, বাঁধাধরা ধর্মবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের কোলে আশ্রয় নেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিলো ; তাঁর মনের গড়ন ছিলো অনেক বেশি পরীক্ষাপ্রবণ, মৌলিক, সূক্ষ্ম এবং সর্বদা সব বিষয়ে এমন-কি নিজের বিষয়েও ঈষৎ ব্যঙ্গরসিক।

য়েট্‌সের প্রথম পর্বের কবিতার অতি-রোম্যাণ্টিকতা কতোখানি স্বাভাবিক আর কতোখানি স্বরচিত তা নিয়ে তর্ক তোলা বৃথা। আধুনিক বিজ্ঞানকে তো তিনি ঘৃণা করতেনই, আধুনিক জগৎ ও আধুনিক জীবন থেকেও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, কারণ তার রূঢ়তা, তার ব্যতিব্যস্ততা, তার ছন্দোহীনতা য়েট্‌সের ছন্দোবিলাসী সৌম্যকান্তিপ্রিয় মনকে আঘাত করতো। ইবসেন-এর নাটকে তাঁর ঘোরতর অরুচি ছিলো, এবং হেতুটি অতিশয় য়েট্‌সীয়—"ঐ-সব নাটকের সংলাপ আধুনিক শিক্ষিত মানুষের মৌখিক ভাষার এত কাছাকাছি যে তাতে স্টাইলের কোনো অবকাশ নেই।" আধুনিককালের বেসুরো বেতালা আওয়াজ শুনে তাঁর মৃগতুল্য ভয়চকিত মন পালিয়ে গেলো প্রাচীন আইরিশ পুরাণে ও লোকগাথায়। কিন্তু সেখানে তো বেশিদিন থাকা সম্ভব নয় য়েট্‌সের মতো প্রতিভাসম্পন্ন চঞ্চলহৃদয় কবির পক্ষে।

সুদূরের তৃষ্ণা য়েট্‌সকে বাস্তব জগৎ থেকে আরো দূরে নিয়ে গেলো। নানাপ্রকার আজগুবি প্রেতলৌকিক এবং ঐন্দ্রজালিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি মশগুল হলেন ; উদ্দেশ্য ছিলো ব্লেকের মতো, সুয়েডেনবোর্গের মতো এক মিষ্টিক উপলব্ধিতে

পৌঁছনো যার আলো তাঁর বাকী জীবনকে উদ্‌ভাসিত ক'রে তুলবে! শেষ পর্যন্ত ভূত-প্রেতের সাহায্য ব্যতিরেকেই পৌঁছেছিলেন এমন এক উপলব্ধিতে যা কবির পক্ষে, তাঁর কবিতার পক্ষে, এবং আমাদের সকলের পক্ষে মূল্যবান। পৌঁছলেন ভিন্ন পথে, অতিশয় নিদারুণ পথে, দীর্ঘকালব্যাপী তীব্র যন্ত্রণার পথে।

নবযৌবনে য়েট্‌স্‌ এমন এক অথৈ প্রেমে পড়লেন যার ছাপ র'য়ে গেলো তাঁর সারাজীবনের কাব্যে ও কর্মে। পাত্রী আয়ারল্যাণ্ডের সেরা সুন্দরী, শুধু রূপে নয়, নানা গুণেও ঐশ্বর্যবতী, মড গন। গোড়ার দিকে মড তরুণ কবির প্রেমে সাড়া দিলেও বিবাহের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন। এই তেজস্বিনী নারী সমাজকর্মেও উদ্যোগী ছিলেন এবং আইরিশ বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত। স্বভাবতই তাঁর স্বয়ম্বর সভায় স্বপ্নালু কবির চেয়ে বরেণ্য হলেন বিপ্লবী বীর। য়েট্‌স্‌ তাঁর ব্যর্থকাম বেদনাকে অমর ক'রে দিয়ে গেছেন এমন কয়েকটি কবিতায় যা আমার মনে হয় লিরিক কবিতার পরাকাষ্ঠা। উদাহরণস্বরূপ এখানে "Broken Dreams"-এর শুধু প্রথম স্তবকটি উদ্ধৃত করি :

> There is grey in your hair.
> Young men no longer suddenly catch their breath
> When you are passing ;
> But may be some old gaffer mutters a blessing
> Because it was your prayer
> Recovered him upon the bed of death.
> For your sole sake—that all heart's ache have known,
> And given to others all heart's ache,
> From meagre girlhood's putting on
> Burdensome beauty—for your sole sake
> Heaven has put away the stroke of her doom,
> So great her portion in that peace you make
> By merely walking in a room.

মনে হয়—এ মনে হওয়ার কোনো বাস্তব ভিত্তি জানা নেই আমার, তবু মনে হয়—শেষ দুটি পঙ্‌ক্তির মৃদু অনুরণন শোনা যায় 'রোগশয্যায়'-এর শেষ কবিতার শেষের দিকে :

> দেখি, তুমি নতশিরে বুনিছ পশম
> বসি মোর পাশে
> সৃষ্টির অমোঘ শান্তি সমর্থন করি।

রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের কাব্যের সঙ্গে য়েট্‌সের যৌবনকালের কাব্যের সাদৃশ্য অধিক ব'লে অনেকের ধারণা। য়েট্‌স্‌ নিজে 'গীতাঞ্জলি'র কবি রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে তাঁর পক্ষে ক্ষতিকর জেনে তার থেকে সযত্নে বেশ খানিকটা দূরে স'রে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও শেষ পর্বের কাব্যে 'গীতাঞ্জলি' পর্বের কাব্য থেকে

দূরে স'রে এসেছিলেন। অথচ আশ্চর্য এই যে, দুই যুবক কবির মধ্যে যতোটা মিল সহজেই ধরা পড়ে, দুই বৃদ্ধ কবির মধ্যে আত্মীয়তা তার চেয়ে ঈষৎ প্রচ্ছন্ন হ'লেও ঘনিষ্ঠতর। অনাত্মীয়তাও কম নয় অবশ্য। এবং যতোদূর জানা যায় তাঁরা পরস্পরের সুপরিণত বয়সের গভীরতর ভাবনা-বেদনার দুঃসাহসিক কাব্যের সঙ্গে খুব-একটা পরিচিত ছিলেন না।

বস্তুতপক্ষে শুধু প্রেমের কবিতা নয়, য়েট্‌সের অধিকাংশ রসোত্তীর্ণ কবিতায় এক অপরূপ মাধুর্য সঞ্চার করেছে তাঁর জীবনের সবচেয়ে আনন্দঘন, সবচেয়ে হৃদয়-বিদারক এই মহৎ—সব অবিচক্ষণতা, খ্যাপামি ও ছেলেমানুষি নিয়েও মহৎ—প্রেমের অভিজ্ঞতা। অনিবার্যভাবে বাঙালী পাঠকের মনে জাগে আর-এক বহু-গুণান্বিতা রূপসী মহিলার কথা যাঁর কবি-সমাদৃত ডাক নাম ছিলো হেকেটি; ঠাকুরবাড়ির দেওয়া নামটিও কাব্য থেকেই সঙ্কলিত। একজনের প্রত্যাখ্যানের এবং অন্যজনের আত্মহত্যার আঘাত-হানা বিরাট বহু-আয়তন বেদনা এ-যুগের দুই শ্রেষ্ঠ কবির প্রতিভাকে কতো বিচিত্রভাবে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলো, কী প্রশান্ত সামুদ্রিক গভীরতা ও বিস্তার এনেছিলো তাঁদের কাব্যে, তার যথাযোগ্য আলোচনা হয়তো কোনো সাহিত্যবিদ্ সুসাহিত্যিক করবেন একদিন।

কতকটা মড গনের অনুপ্রেরণাতেই য়েট্‌স্ আইরিশ বিপ্লবের খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বিপ্লব অবশেষে সফল হ'লো, তবু যেন ব্যর্থ হ'লো কবির চোখে।

> We, who seven years ago
> Talked of honour and of truth,
> Shriek with pleasure if we show
> The weasel's twist, the weasel's tooth.

অন্তরের ও বাইরের ব্যর্থতা য়েট্‌সের অন্তিম দশকের মনে ও কাব্যে তিক্ত নৈরাশ্যের আমেজ ঘটিয়েছিলো। তার একটা পরিণাম এই যে, তিনি নিজের বার্ধক্য ও বার্ধক্য-জনিত শক্তিক্ষয়কে মেনে নিতে পারছিলেন না, মনে করতেন এটা বিধির স্থূল পরিহাস। সে-পরিহাসের সমুপযুক্ত উত্তর দেওয়ার মন্ত্র অবশ্য তাঁর জানা ছিলো:

> An aged man is but a paltry thing,
> A tattered coat upon a stick, unless
> Soul clap its hands and sing, and louder sing
> For every tatter in its mortal dress.

তবু যেন জানা ছিলো না। শরীর-পারের আধ্যাত্মিকতার জয়ধ্বনি করতে কোথায় যেন বাধছিলো তাঁর স্বভাবে; আত্মসচেতন হাস্যরসবোধেই সম্ভবত। সেই কথাটা তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন এমন ভাষায় ও ভঙ্গিতে যার পরোৎকর্ষ আমাকে অভিভূত করে।

All men live in suffering.
I know as few can know,
Whether they take the upper road
Or stay content on the low,
Rower bent in his row-boat
Or weaver bent at his loom,
Horseman erect upon horseback
Or child hid in the womb.
Daybreak and a candle end
That some stream or lightning
Form the old man in the skies
Can burn out that suffering
No right-taught man denies.
But a coarse old man am I,
I choose the second best.
I forget it all awhile
Upon a woman's breast.
Daybreak and a candle end.

নিজের সমাধিফলকের জন্য যে সংক্ষিপ্ত লেখ্য রচনা ক'রে গেলেন—

Cast a cold eye
On life, on death.
Horseman, pass by !

তার থেকেই বোঝা যায়, য়েট্‌স্‌ জীবন এবং জগৎকে ঠিক মেনে নিতে পারেননি, একপ্রকার স্টোইক্‌ নির্বেদে ভ'রে উঠেছিল তাঁর মন। কিন্তু শুধু নির্বেদে নয়। এমন কয়েকটি কবিতাও তিনি লিখে গেছেন যা আমাদের ভাবতে প্ররোচিত করে যে, তাঁর বেদনা ও সাধনার শেষ কথা ট্র্যাজিক আনন্দই, তিনিও রবীন্দ্রনাথের মতো যাওয়ার আগে অনুভব ক'রে গেলেন সমস্ত দুঃখ ও পাপের কালিমাকে ছাপিয়ে সমগ্র জগৎ-চরাচরে পরিব্যাপ্ত হয়ে "a terrible beauty is born"।

য়েট্‌সের মতো রবীন্দ্রনাথও যে-ধর্মসমাজ ও ধর্মবিশ্বাসের কোলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং লালিত হয়েছিলেন, তার চৌহদ্দী থেকে বেরিয়ে এলেন যৌবন শেষ না-হ'তেই। এ-ক্ষেত্রে কারণটা কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের অভিঘাত নয়, তাই বিজ্ঞানের প্রতি বৈরিভাব পোষণ করার কোনো অবকাশ ঘটেনি তাঁর মনোবিবর্তনে। বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ঘৃণা করা দূরে থাক্‌, সম্যক্‌ না-হ'লেও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার চোখেই দেখতেন তিনি। সে-শ্রদ্ধা বয়সের সঙ্গে গভীরতর হ'লো এবং উত্তীর্ণ-সত্তর রবীন্দ্র-মানসের অন্যতম প্রধান উপকরণ হ'য়ে দাঁড়ালো। খুব সম্ভব কেবল গ্যেটে ব্যতীত আর-কোনো মহৎ কবির বিশ্ব-নিরীক্ষায় বিজ্ঞান ও যুক্তির এমন প্রশস্ত আসন খুঁজে পাওয়া যাবে না। ১৩১৮ সালে প্রকাশিত

"ধর্মের নবযুগ" প্রবন্ধে লিখেছেন : "মানুষের জ্ঞান আজ যে-মুক্তির ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেইখানকার উপযোগী হৃদয়বোধকে এবং ধর্মকে না পাইলে তাহার জীবনসংগীতের সুর মিলিবে না এবং কেবলই তাল কাটিতে থাকিবে।" বর্তমান-কালের দু-একজন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের লেখায় এমন কথা পেয়েছি, অন্য-কোনো কবির লেখায় পাইনি। এই মুক্ত বুদ্ধি ও মুক্ত হৃদয় রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য।

আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের বিশ্ব-নিরীক্ষায় যে কী প্রকাণ্ড বিপ্লব ঘটিয়েছে সে-বিষয়ে দেশ-বিদেশের, বিশেষত এ-দেশের, সাহিত্যিক ও সাহিত্য-সমালোচকগণ যথেষ্ট সচেতন নন। এই বিপ্লবকারী বৈজ্ঞানিক চিন্তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রাণীবিজ্ঞানে ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ। ডারুইনিস্টরা দেখালেন যে, মানবাত্মা অকস্মাৎ স্বর্গধাম থেকে পতিত নয়, বানর-জাতীয় নিকৃষ্ট জীবের দেহমন থেকে ক্রমশ উত্থিত। অভ্যুত্থানের ইতিহাস বড়োই দীর্ঘ, কোটি বৎসরের মাপকাঠিতে পরিমেয়; এবং যেমন দীর্ঘ তেমনি হিংস্র, রক্তাক্ত। প্রাণীতে-প্রাণীতে খুনোখুনি তো চলেইছে, একতরফা খুনের পরিসংখ্যানও বিরাট। বাঘ ছাগল খায়, সোনালী ডানার চিল হাঁস-মুরগীর ছানা দেখতে পেলেই ছোঁ মেরে নিয়ে উড়ে যায়, অদৃশ্য অসংখ্য ব্যাকৃটিরিয়া মানুষকে খেয়ে শেষ করে। এই তো সে-দিন পর্যন্ত বসন্ত, ওলাউঠা, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের জীবাণুর কাছে মানুষ অসহায় ছিলো। শুধু তা-ই নয়। লক্ষ-লক্ষ জন্তু-জাতি প্রাণবিবর্তনধারায় ভূতলে বা সমুদ্রগর্ভে দেখা দিয়েছে এবং কিছুকাল ব্যর্থ সংগ্রামের পর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে; অথবা জীবাশ্মের কিছু ভগ্নাংশ রেখে গেছে বর্তমানকালের প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌দের কৌতূহল মেটাবার জন্য। টেনিসন-বর্ণিত "Nature red in tooth and claw"-র কথা ভাবেননি রবীন্দ্রনাথ যখন লিখে-ছিলেন : "এই তো তোমার প্রেম ওগো হৃদয়হরণ / এই যে পাতায় আলো নাচে সোনার বরন"। পরে ভাবতে হয়েছিলো তাঁকে।

দ্বিতীয়ত, মনের সঙ্গে দেহের, বিশেষত স্নায়ুতন্ত্রের সম্পর্ক যে এত ঘনিষ্ঠ, এতখানি পরস্পর-নির্ভরশীল, তা রবীন্দ্রনাথের জন্মের সময়ে জানা ছিলো না পশ্চিম য়োরোপেও। সত্তর বছর বয়সে যখন তিনি তাঁর কাব্যের শেষ পর্বে পৌঁছলেন তখন এ-বিষয়ে ভূরি-ভূরি তথ্য পুঞ্জীভূত হয়েছে, ধোপে টেকে এমন মতবাদ গঠিত হয়েছে; আরো সত্তর বছর পরে স্নায়ুবিজ্ঞান যে-বিপ্লব ঘটাবে আমাদের জ্ঞানে, কর্মে ও অনুভূতিতে তা অভাবনীয়। ইতিমধ্যে তার আভাস-ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি আমরা। ইংল্যাণ্ডের সেরা স্নায়ুবিশেষজ্ঞ রাসেল ব্রেন-এর লেখা থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করি :

> In this connection, behaviour disorders are of particular general interest, because it is often held that a sense of social and moral res-

ponsibility is a distinctly human characteristic. Attention was first directed to this aspect of brain damage by the disease known as encephalitis lethargia, which appeared in epidemic from during the decade following 1916, It was then noted that some children who had been attacked by this infection and as a result suffered from destruction of the basal parts of the brain, became delinquent. They were often aggressive, committed criminal offences, and proved quite unamenable to ordinary social and legal sanctions. Temporary outbursts of aggressive and sometimes violent behaviour are known to occur in patients with other lesions, particularly in the temporal and less often in the frontal lobes, and in some cases surgical removal of the lesion leads to cessation of the outbursts of violence."*

কিমাশ্চর্যম্ অতঃপরম্। অতঃপর মানুষের মরদেহের সঙ্গে একটি অমর আত্মা সংযুক্ত থাকে এবং দেহ ভস্মীভূত বা কবরস্থ হওয়ার পর সেই আত্মাটি পরলোকে অবস্থান ক'রে কিংবা ইহলোকেই পুনঃ-পুনঃ জন্ম-লাভ ক'রে পাপ-পুণ্যের মাত্রানুযায়ী শাস্তি-পুরস্কার ভোগ করে—প্রাচীন শাস্ত্রলব্ধ এই বিশ্বাসটাকে টিকিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো।

রামমোহন রায়ের ধারণা ছিলো যে সব ধর্মমতাবলম্বীরাই এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। এ-বিষয়ে কিন্তু তর্কের অবকাশ আছে। যে-বিশ্বাসটি সব ধর্মমতে বাস্তবিকই পাওয়া যায় তা আত্মার অমরতায় বিশ্বাস। এই বিশ্বাসকে বলা যেতে পারে ধর্মমতের (রিলিজনের) বিশেষ লক্ষণ। বিশেষ কিন্তু মৌলিক নয়। প্রচলিত সব ধর্মের মূল কথা হচ্ছে যে জগৎ শুধু নিয়মের রাজত্ব নয় (সেটা তো বিজ্ঞানের ধ্যেয়), জগৎ ন্যায়নীতির রাজত্বও বটে। অথচ শুধু ইহজীবনের খতিয়ান নিলে দেখা যায় অনেক নিষ্পাপ ও শুভকর্মী মানুষের জীবন দুঃখে ভরা, অনেক অত্যাচারী অনাচারী মানুষ সুখেই জীবন কাটায়। ন্যায়ের রাজত্বে (moral government-এ) আস্থা রাখতে হ'লে পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করা অনিবার্য হয়ে পড়ে। সেইকালে ঠিক-ঠিক হিসাব মিলে যায়—এ-কালের পাপ-পুণ্যের ফলের হিসাবে যতো গরমিলই থাক্-না কেন। আজ যদি বিজ্ঞানীরা বলতে শুরু করেন—মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার ক'রে বা অন্য ডাক্তারী উপায়ে মানব-দরদীকে মানব-দ্বেষী ও হিংস্র কিংবা তার বিপরীতটা, ঘটানো সম্ভব, তবে আমাদের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস প্রচণ্ড আঘাত পায়—কোপার্নিকাস, ডারুইন এবং ফ্রয়েডের কাছ থেকে যতোটা পেয়েছিলো তার চেয়ে বেশি বৈ কম নয়।

ম্যাক্সওয়েল-প্রণীত থার্মোডাইনামিক্সের দ্বিতীয় নীতির ভূমিকা আরো সাংঘাতিক।

* Russell Brain in *The Humanist Frame,* edited by Julian Huxley, London : George Allen & Unwin, 1961, p. 29.

তাকে অভিব্যক্তিবাদের উল্‌টো অর্থাৎ অবক্ষয়বাদও বলা যেতে পারে। ম্যাক্স-ওয়েলের অবক্ষয়বাদের পরিধি অবশ্য অনেক বেশি ব্যাপ্ত ও মৌলিক। প্রাকৃতিক জগতে বস্তু এবং শক্তির বিনাশ নেই, শুধু পরিবর্তন আছে। তবে লাভ-লোকসানের খতিয়ান নিলে দেখা যাবে পরিবর্তন এমনভাবে ঘটছে যে কেজো শক্তি ক্রমাগত খরচ হয়ে অকেজো শক্তির তহবিলে জমা হচ্ছে; সর্বমোট হিসাবে কোনো ভুল নেই। সিলিণ্ডারে বাষ্প চাপা থাকলে তা আমাদের পরিবহনের বা অন্যবিধ কাজে লাগে; বাতাসে ছড়িয়ে পড়লে তার দ্বারা কোনো কাজ হাসিল করা যায় না। এই ছড়িয়ে ফেলার দিকেই প্রকৃতির ঝোঁক। আর-একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝা যাক্ ব্যাপারটাকে। একটি বাক্সের একদিকে পঞ্চাশটি লাল গুলি এবং অন্যদিকে পঞ্চাশটি শাদা গুলি সাজিয়ে বাক্সটিকে ক্রমাগত নাড়া দিতে থাকলে গুলিগুলোর বিন্যাস অবিন্যাসে পরিণত হ'তে থাকবে, মোটের উপর বিশৃঙ্খলা বাড়তে থাকবে—সে-পর্যন্ত না সাদায়-লালে সব একাকার হয়ে যাচ্ছে। প্রাকৃত জগৎকে আমরা কস্‌মস্ বলি, কিন্তু তার গতি কেঅসের দিকেই। মাঝে-মধ্যে এখানে-ওখানে শৃঙ্খলা (order) বৃদ্ধি পেতে পারে কিন্তু জাগতিক বিশৃঙ্খলতার প্রবাহকে তা ঠেকাতে পারে না। ফলত এই বিশ্বব্যাপী অবক্ষয়ের পটভূমিকায় একটি ছোটো গ্রহপৃষ্ঠে যে প্রাণের (অপ্রাণ জগতে প্রাণীই সবচেয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যাপার, এবং এমিবার চেয়ে মানুষ লক্ষ গুণ বেশি জটিল হয়েও সেই পরিমাণে সুশৃঙ্খল) উদ্‌ভব তথা বিকাশ দেখে আমরা উল্লসিত, তা অত্যন্ত স্থানিক ও স্বল্পকালীন ব্যাপার। যেন এক বিরাট খরস্রোতা নদীর মাঝখান দিয়ে একটি ছোট্ট ডিঙি কোনো গতিকে উজান বেয়ে চলেছে, কিছুদূর এগিয়েই মাঝিদের দাঁড় টানবার শক্তি আর থাকবে না, নৌকো স্রোতোবেগে উল্‌টো দিকে ভেসে চলবে, অবশেষে সীমাহীন সমুদ্রগর্ভে কোথায় হারিয়ে যাবে তার কোনো চিহ্নও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আধুনিক বিজ্ঞান যে বিরাট বিপ্লব ঘটিয়েছে আমাদের চিন্তায়, অনুভূতিতে এবং সমগ্র জীবনে সে-বিষয়ে আই. এ. রিচার্ডস খুবই সচেতন ছিলেন। ফলত তিনি দুর্ভাবনায় পড়েছিলেন কবিতার ভবিষ্যৎ নিয়ে। তাঁর ধারণা যে আধুনিক বিজ্ঞানের নিরাসক্ত নিরপেক্ষ গবেষণালব্ধ এইসব যুগান্তকারী তত্ত্ব শিল্প-সাহিত্যের পক্ষে মারাত্মক। সাবেকী রিলিজন বা আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দিয়ে দেখা বিশ্বছবি—অবজ্ঞাভরে যার নাম দিয়েছেন তিনি magical view of the world—বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির ফলে সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে গেছে। অথচ তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় যে সেই বাতিল-করা দৃষ্টিভঙ্গী সাহিত্যরচনার পক্ষে যেমন অনুকূল ছিলো প্রকৃতি ও মানুষ বিষয়ে নববিজ্ঞান যে মোহমুক্ত দৃষ্টিদান করেছে তা তেমনি প্রতিকূল। তবে কি শিল্প-সাহিত্যের দিন ফুরিয়ে এসেছে, যেমন ফুরিয়ে এসেছে শাস্ত্রমানা ধর্মকর্মের দিন? জগৎকে আধ্যাত্মিকতার রঙে রাঙিয়ে না-দেখলে কি কবিরা আর কবিতা লিখতে পারবেন? দুশ্চিন্তা জাগে কাব্য-দার্শনিক কাব্য-প্রেমিক রিচার্ডস্-এর মনে।

কিন্তু রিচার্ডস্ কবিতাকে বাঁচিয়ে রাখবেন এই সহমরণের হাত থেকে। যদিও আধ্যাত্মিক বা ম্যাজিকাল বিশ্ব-নিরীক্ষায় বিশ্বাস রাখা আমাদের পক্ষে আর সম্ভব নয়, তবু, রিচার্ডস্ বলছেন, বিশ্বাস-বিশ্বাস খেলা করতে তো কোথাও আটকায় না। কবিতা লিখবার সময়ে এই খেলাচ্ছলে বিশ্বাস বা মেকি বিশ্বাসের সুযোগ গ্রহণ করবেন কবিরা, কিন্তু ভুলবেন না যে, এ-সব বাতিল করা বিশ্বাসের পুনরুদ্ধার নিতান্তই তাৎক্ষণিক, কেবলমাত্র আমাদের হৃদয়বোধগুলির (attitudes-এর) মধ্যে স্বস্তি, শান্তি ও সামঞ্জস্য আনবার জন্য। সেই ঘর-গড়া ক্ষণভঙ্গুর সামঞ্জস্য নাকি কবিতার পক্ষে অত্যাবশ্যক।

এই অবিশ্বাসী যুগে কাব্য-রচনার জন্য রিচার্ডস্ যে-ফর্মুলাটি উদ্ভাবন করেছেন তা আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকে। এ-যুগের মানুষের অশান্ত বিভ্রান্ত চিত্ত যদি কোনো ধর্মবিশ্বাস বা দার্শনিক নিরীক্ষার মধ্যে শান্তি লাভ করেও তবে তার জন্য সততার প্রয়োজন; আস্থা যদি খুব দৃঢ় না-ও হয় তবু মনোপ্রতিন্যাসটি সীরিয়স্ হওয়া দরকার। কেউ কেউ মনে করেন, কবির মন শিশুর মতো সরল থাকা ভালো। কিন্তু সেইসঙ্গে যদি তাঁর মনের আর-একটা দিক জীবনের বিচিত্র এবং নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতায় পোড় না-খেয়ে থাকে তবে কি তিনি উঁচুদরের কবি হ'তে পারবেন? তাঁর বিশ্বাসে যদি আন্তরিকতা না-থাকে, হৃদয়-মনের কমিট্‌মেণ্ট না-থাকে, তিনি যদি সত্যি-সত্যি কাব্য-রচনাকালে ছোটো ছেলের মতো ভাবেন—আমি রাজা, এ রানী, তুমি মন্ত্রী, আর এই মাটিতে পোঁতা কাঠিগুলি আমাদের সেনাবাহিনী, তবে তাঁর কাব্য-রচনাও ছেলে-খেলা হয়ে যাবে না কি—ছন্দ নিয়ে, মিল নিয়ে, ধ্বনিবিন্যাস নিয়ে, চিত্রকল্প-সংযোজনা নিয়ে এবং হৃদয়ভাব ও ধর্মবিশ্বাস নিয়ে খেলা?

কবিতায় অবশ্য কল্পনার স্থান খুবই প্রশস্ত, তবে সে-কল্পনা আপনাতে আপনি সমাপ্ত নয়। কল্পনার তুলি দিয়ে আঁকা চিত্রের সঙ্গে চিত্র যোগ ক'রে যে-চিত্রকল্প রচনা করেন কবি তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য অবশ্য কবির হৃদয়ভাব ও ভাবনারই প্রকাশ। কিন্তু সে-ভাব ও ভাবনা নিরালম্ব নয়। আলম্বন তার মানবিক, প্রাকৃতিক বা সর্বজাগতিক বিশ্ববোধ। অর্থাৎ যতো আভাসে-ইঙ্গিতে হোক্, যতো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে হোক্, শেষ পর্যন্ত কবি প্রকাশ করতে চান তাঁর বিশিষ্ট হৃদয় তথা সমগ্র ব্যক্তিস্বরূপ দিয়ে দেখা মানুষের রূপ, প্রকৃতির রূপ এবং মানুষ ও প্রকৃতিকে নিয়ে যে-ভূমা তারই রহস্যময় রূপরেখা। সে-রহস্য আমাদের মনের দরজায় সর্বদাই অত্যন্ত মৃদু করাঘাত করে কিন্তু দরজা খুললেই দেখা যায়—নেই, কোথাও কেউ নেই, কিছু নেই। যে-সব কবিতা, গান, নাটক ও উপন্যাস আমাদের জীবন-মরণের সঙ্গী হয়ে ওঠে তা রিচার্ডসের ফর্মুলা-অনুযায়ী রচিত নয়। তাতে এমন-কিছু থাকে যার স্পর্শে জগৎ ও জীবনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক, আমাদের ভাবনা ও বেদনা, আমাদের আশা-নৈরাশ্য অল্পবিস্তর রূপান্তরিত হয়ে ওঠে, সত্যতর হয়ে

ওঠে। সত্যের উপর বিজ্ঞানের একচেটিয়া দখলদারী আমি মানি না। সত্য বহুরূপী, জৈন দার্শনিকদের পরিভাষায় সত্য অনেকান্ত। সাংবাদিক সত্য, ঐতিহাসিক সত্য, বৈজ্ঞানিক সত্য, সত্যের এক-একটি অন্ত (aspect); সাহিত্য আর একটি অন্ত। অনেকান্ত মহাসত্যকে ধরবার জন্য, ধারণ করবার জন্য, আমাদের বহুভাষী হ'তে হয়। কবিতার সত্য সাংবাদিক, ঐতিহাসিক কিংবা বৈজ্ঞানিকের ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাই ব'লে তাকে মেকি সত্য বা সত্য নিয়ে খেলা বলার মতো একগুঁয়েমি যেন আমাদের না-হয়।

মেকি বিশ্বাসের (make believe-এর) উপর ভর ক'রে মহৎ কবিতা দাঁড়াতে পারে না এ-কথা রিচার্ডসের অজানা ছিলো না। বহুল দার্শনিক ও মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অবতারণার পর বিজ্ঞান-যুগের সংকট থেকে কবিতাকে উদ্ধার করবার জন্য একটি বিভ্রান্তিকর সূত্র রচনা করতে-করতে এক ফাঁকে উল্টো কথাটা ব'লেই ফেললেন আত্ম-খণ্ডনের চক্ষুলজ্জা ত্যাগ ক'রে, কারণ সেটাই কবিতা সম্বন্ধে খাঁটি কথা, শ্রদ্ধেয় কথা। ট্র্যাজেডিকে আমরা সবাই প্রায় একবাক্যে সাহিত্যের শীর্ষস্থানে বসাই, এবং কে না-জানে যে, ট্র্যাজিক উপলব্ধি সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে যিনি প্রচলিত অর্থে ভগবানে, সর্বশক্তিমান সর্বকল্যাণময় বিধাতার অমোঘ নৈতিক বিধানে, এবং প্রধানত নৈতিক বিধান রক্ষা করার জন্যই মানবাত্মার অমরতায়, পরকালে বা জন্মান্তরে, দৃঢ় বিশ্বাসী। অর্থাৎ ট্র্যাজেডির মধ্যে মন-জুড়ানো ধার্মিক মতবিশ্বাসের তথা সর্বপ্রকার ম্যাজিকাল ভিউ-এর শুধু যে স্থান নেই তা নয়, ট্র্যাজিক ভিউ আর ম্যাজিকাল ভিউ পরস্পর-বিরোধী। রিচার্ডস্ ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে যে খাঁটি কথাটা ব'লে ফেলেছেন ("Tragedy does not shy away from anything, it does not protect itself with any illusion, it stands uncomforted, unintimidated, alone and self-reliant."), তা অভিজ্ঞান-চিহ্নিত ট্র্যাজেডির পরিসরের মধ্যেই শুধু নয়, মহৎ সাহিত্যমাত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

য়েট্স্ এবং রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন মেজাজের কবি ব'লে পথ তাঁদের ভিন্ন হবারই কথা। তবু অনেক পথ হেঁটে, অনেক পুরানো পথ হারিয়ে, অনেক নতুন পথ আবিষ্কার ক'রে বা কেটে অবশেষে বার্ধক্যের প্রান্তে পৌঁছে তাঁরা পাশাপাশি দাঁড়ালেন রিচার্ডস্-বর্ণিত এই নির্ভীক, নির্জন, অপ্রবোধ ট্র্যাজিক চেতনায়। "Lapis Lazuli"-তে য়েট্স্ যে-আত্মশুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তাই অথবা তার খুব কাছাকাছি এক বিষণ্ণ আত্মস্থতা দেখি রবীন্দ্রনাথের বৃদ্ধ বয়সের কবিতায়। 'পরিশেষ' ও তৎপরবর্তী (কখনো-বা ঈষৎ পূর্ববর্তীও) কাব্যে লক্ষ করি সকল মোহাবরণ, সর্বপ্রকার ছলনাজাল তিনি একে-একে ছিন্ন ক'রে দিচ্ছেন, মনকে শক্ত ক'রে কঠিন সত্যকে চিনতে চাইছেন রক্তের অক্ষরে-অক্ষরে। উভয় বৃদ্ধ কবি সম্বন্ধে বলা যায় যা একজন বলেছেন উক্ত কাব্যের শেষ স্তবকে :

There, on the mountain and the sky,
On all the tragic scenes they stare,
One asks for mournful melodies;
Accomplished fingers begin to play.
Their eyes mid many wrinkles, their eyes,
Their ancient, glittering eyes, are gay.

য়েট্‌সের অন্তিম কাব্যেও প্রতিধ্বনিত রবীন্দ্রনাথের উক্তি :

মুক্তাকাশে দেখো চেয়ে প্রলয়ের আনন্দ স্বরূপ।
ওরে শোকাতুর, শেষে
শোকের বুদ্‌বুদ তোর অশোক-সমুদ্রে যাবে ভেসে।

কিন্তু সেটা পরে আলোচ্য। আপাতত ফেরা যাক্ আগের প্রসঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহার করলেন যে-সব কারণে তার মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান উল্লেখযোগ্য নয়। একটি প্রশ্ন প্রথমেই জাগে—তিনি কি আদৌ অনুগত ছিলেন? প্রশ্নটি অমূলক নয়। 'আত্মপরিচয়'-এর ১১৩ পৃষ্ঠায় পড়ি "জন্মকাল হতে আমার যে প্রাণরূপ রচিত হয়ে উঠেছে তার উপরে কোনো জীর্ণ যুগের শাস্ত্রীয় অবলেপন ঘটে নি।" ব্রাহ্মধর্ম অবশ্য জীর্ণ যুগের উত্তরাধিকারে পাওয়া ধর্ম নয়, তবু তার প্রতিষ্ঠা তো মূলত খ্রীষ্ট-পূর্ব যুগে রচিত উপনিষদ থেকে সংকলিত শাস্ত্রবচনের উপরেই। কথাটা আরো পরিষ্কার হয়ে যায় *The Religion of Man*-এ : "It was though an ideosyncracy of my temperament that I refused to accept any religious teaching merely because people in my surrounding believed it to be true."

আগেই বলেছি যে আধুনিককালের মুক্ত বুদ্ধির সঙ্গে ক্রমোন্নত ধর্মবোধের মিতালিতে রবীন্দ্রনাথ আস্থাবান ছিলেন, বুদ্ধি ও বুদ্ধি-প্রসূত জ্ঞানের একাধিপত্য না-মানলেও এমন কোনো ধর্মমত তাঁর পক্ষে শেষ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয় যা বুদ্ধিকে খর্ব বা খণ্ডিত করে। এইখানে য়েট্‌সের কবিদৃষ্টির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টির মৌলিক প্রভেদ।

অথচ রবীন্দ্রনাথের মনে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি উৎসাহ দেখে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সেই তেইশ-চব্বিশ বছরের যুবককে ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের মতো দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেছিলেন। যতোদূর জানা যায় ঐ-পদের যাবতীয় কর্তব্য তরুণ সম্পাদক নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছিলেন। এমনও হ'তে পারে যে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে নিজেকে নিবিড়ভাবে যুক্ত করতে পেরেছিলেন আবাল্য অভ্যাসবশেই, কিন্তু ক্রমশ বুঝতে পারলেন যে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে—ঈশ্বর-সাধনা এবং সর্বপ্রকার ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণের ক্ষেত্রে—পরাশ্রয়তা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। প্রতিভার একটি বড়ো অঙ্গ মৌলিকতা। "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শিল্পসাহিত্যে যেমন

ধর্মমতেও তেমনি, যা গোষ্ঠীগত তার মূল্য সামান্যই। প্রকৃতপক্ষে এটা পরস্পর-অনুকরণের সংক্রামকতা ছাড়া আর-কিছু নয়। আমি কেবল একটি মুখোশ প'রে সত্যের জীবন্ত স্বরূপ ঢেকে রেখেছিলাম—বহুদিন ধ'রে এই চেতনার সঙ্গে যুঝে অবশেষে আমার ধর্মসমাজের (church) সঙ্গে আমি সম্পর্ক ছিন্ন করলাম।"* মোটের উপর রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এলেন কারণ কোনো দলীয় মতবিশ্বাস বা ধর্মসামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে পুরোপুরি এবং আন্তরিক সংগতি রক্ষা ক'রে তাঁর স্বকীয় আত্মবিকাশ সম্ভব ছিলো না।

ধর্ম মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন না-ঘটিয়ে বিচ্ছেদ ঘটাচ্ছে দেখে ব্যথিত হয়েছিলেন রামমোহন রায়। এ-ব্যথা উত্তরাধিকারসূত্রে রবীন্দ্রনাথও পেয়েছিলেন। রামমোহনের মতো একাধারে কারয়িত্রী ও ভাবয়িত্রী প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তির পক্ষে এ-ব্যথা নীরবে বহন করা দুষ্কর ছিলো। কিন্তু তার প্রতিকারকল্পে এক নতুন সর্বজনীন ধর্মমত ও ধর্মানুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা তাঁর অভিপ্রেত ছিলো না। খ্রীষ্টান মুসলমান বৌদ্ধ জৈন পারসী সবাইকে দূরে রেখে কেবল হিন্দু একেশ্বরবাদীদের নিয়ে একটি স্বতন্ত্র ধর্মসমাজ গ'ড়ে তোলার কাজটি সম্পন্ন করলেন তাঁর শিষ্য দেবেন্দ্রনাথ। রামমোহন খুবই অবহিত ছিলেন কেমন ক'রে পূর্বতন মহাপুরুষেরা—গৌতম বুদ্ধ, যীশু খ্রীষ্ট, হজরৎ মুহম্মদ—সর্বজনীন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন এবং সেই ব্যর্থতার পরিণামস্বরূপ গ'ড়ে উঠলো কয়েকটি বিবদমান, কখনো-কখনো যুযুধান ধর্মসম্প্রদায়। কাজে-কাজেই রামমোহনের সর্বজনীন ধর্ম-ভাবনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হ'লো। তিনি তাঁর বিরাট প্রতিভা ও কর্মশক্তি নিয়ে বৈদিক, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয় ও ইসলামী ধর্মশাস্ত্রে (পরবর্তীকালের প্রক্ষিপ্তি, বিকার ও বিকৃত ব্যাখ্যা থেকে পরিশোধিত ধর্মশাস্ত্রে) এমন একটি অন্তর্বস্তুর অনুসন্ধানে উদ্যোগী হলেন যাকে সর্বধর্মের সারাৎসার বলা যায় এবং যা প্রকৃতই সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর মিলন ও প্রীতির সেতু রচনা করতে পারে। ভারত-পথিক-নির্দেশিত এ-পথ কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পথ নয়।

ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা, একাকীত্ব ও অনন্যতা তাঁর সমগ্র জীবন ও জীবনদর্শনের পটভূমিকায় মোটামুটিভাবে সত্য। কিন্তু মধ্যজীবনে—প্রায় এক দশক কাল—তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। ঐ-সময়ে 'নৈবেদ্য' রচিত হয় এবং ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপিত হয়। ব্রাহ্মসমাজ থেকে বেরিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথ সোজা গিয়ে ঢুকলেন না তাঁর গোপন বিজন হৃদয়কক্ষে, তখনি মশগুল হলেন না সেই মরমিয়া সাধনায় যাতে "তুমি একা আর আমি একা, কঠোর মিলন-মেলা।" প্রবেশ করলেন আরো বৃহত্তর ও প্রাচীনতর সমাজে, হিন্দু সমাজে। শতাব্দীর সন্ধিক্ষণ ও পরবর্তী কয়েকটি বছর ছিলো প্রখর দেশাত্মবোধ, স্বাজাত্যাভিমান এবং স্বদেশী আন্দোলনের

* Rabindranath Tagore, *The Religion af Man.*

যুগ। স্বদেশপ্রেম যতোই প্রবল হয়ে উঠলো রবীন্দ্রনাথের মনে, হিন্দু সমাজকে ততোই নিবিড়ভাবে তিনি স্ব-সমাজ ভাবতে লাগলেন। দুই ভাবের অভ্যুদয় এবং অবক্ষয় মোটামুটি যেন একই বক্ররেখার দ্বারা ছক-কাগজে অঙ্কিত। "সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি" অনুভূতিটি সুন্দর ও শুভ, তবে 'সকল দেশের সেরা আমার দেশ', ভাবখানিতে যে-অহংকার প্রকাশ পায় তা ব্যষ্টি এবং সমষ্টির মনকে খর্ব করে, যেমন খর্ব করে 'সকল সম্প্রদায়ের সেরা আমার সম্প্রদায়' ভাব। তাকেই বলে সাম্প্রদায়িকতা। দুটোরই উপরে উঠতে না-পারলে রবীন্দ্রনাথ কি রবীন্দ্রনাথ হতেন?

বছর কয়েকের জন্য কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বেশ-একটু সংকীর্ণ অর্থেই 'হিন্দু' হয়ে উঠেছিলেন। এই হিন্দুত্বের (নাকি আর্যত্বের?) সবচেয়ে উগ্র প্রকাশ বোধহয় ১৩০০ সালে লেখা প্রবন্ধ "হিন্দুর ঐক্য"। "...যাহাদের আমরা কিছুতেই খেদাইয়া রাখিতে পারি নাই, আমাদের বেড়া-দেওয়া উদ্যানের মধ্যে যে-সকল আগাছা আপনি আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে তাহারা ক্রমে অনবধান অথবা অভ্যাসের জড়ত্ব-বশত আমাদের সহিত এক হইয়া গিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহারা শরীরসংস্থানে, কী বুদ্ধিবৃত্তিতে আর্যদের স্বশ্রেণীর বা সমকক্ষ নহে। তাহারা সব বিষয়েই নিকৃষ্ট। এই কারণে তাহারা আর্য সভ্যতার বিকার উৎপাদন না করিয়া থাকিতে পারে না। তাহারা যেমন আর্যরক্তের বিশুদ্ধতা নষ্ট করিয়াছে, তেমনি আর্যধর্ম আর্যসমাজকেও বিকৃত করিয়া দিয়াছে।" স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এইসময়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববাসীর সঙ্গে মিলনের পথ তো খুঁজছেনই না, ভারতবাসীর মধ্যেও আর্য-অনার্য বিচ্ছেদের অনিষ্ট-কারিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন নন।

সকলের জানা আছে যে বোলপুরে যখন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বেশ কয়েক বছর পঙ্‌ক্তিভোজনের ব্যবস্থা ছিলো সেখানে, ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ ছেলেরা কখনো পাশাপাশি ব'সে খেতো না। অন্য একটি ব্যবস্থা আজকের নীতিবোধে ততোধিক বেদনাদায়ক ঠেকবে। ব্রাহ্মণ ছাত্ররা ব্রাহ্মণ শিক্ষকদেরই কেবল পদ-ধূলি নিতো, অব্রাহ্মণ শিক্ষকদের হাত তুলে নমস্কার করতো। ব্যবস্থাপক অবশ্য আশ্রম-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ক্যাথলিক ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। কিন্তু রবীন্দ্র-নাথের সম্মতি না-থাকলে তো এমন গুরুত্বপূর্ণ রীতি-নীতির প্রচলন সম্ভব ছিলো না সেই আশ্রমে যার 'গুরুদেব' পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ-অধিষ্ঠানও ব্রহ্ম-বান্ধবের কীর্তি। বলা বাহুল্য 'গুরুদেব' রবীন্দ্রনাথের সত্যিকার পরিচয় নয়। পরে একাধিকবার তাঁকে প্রতিবাদ করতে হয়েছে, বুঝিয়ে বলতে হয়েছে যে তাঁর সত্য পরিচয় তাঁর কবিতার মধ্যে পাওয়া যাবে; ধর্মশিক্ষা বা নীতিশিক্ষার মধ্যে নয়।

সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে যখন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-জীবনী'র দ্বিতীয় খণ্ডে পড়ি যে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের এই ভেদনীতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মত কী জিজ্ঞাসা করা হ'লে তিনি এক পত্রে জানালেন: "প্রণাম সম্বন্ধে আপনার মনে যে দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে তাহা

উড়াইয়া দিবার নহে। যাহা হিন্দুসমাজ-বিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া চলিবে না; সংহিতায় যেরূপ উপদেশ আছে ছাত্ররা তদনুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদিগকে পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম ও অন্যান্য অধ্যাপকদিগকে নমস্কার করিবে এই নিয়ম প্রচলিত করাই বিধেয়।"

জন্মসূত্রে ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের ঐ-সময়কার প্রখর হিন্দুত্বের ছায়া পড়েছে জন্মসূত্রে খ্রীষ্টান গোরার চরিত্রে। আশ্চর্য শিল্পনৈপুণ্যে আঁকা সেই চরিত্র। গোরার হাব-ভাব কথাবার্তায় হিন্দুত্বের বাড়াবাড়ি আমাদের যতোই অসহ্য লাগুক, আমরা তাকে শ্রদ্ধা না-ক'রে পারি না। দেশপ্রেমে এমন সমুজ্জ্বল, এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন উন্নতশির মানুষ জীবনে যেমন বিরল, উপন্যাসেও তেমনি; সে ব্রাহ্মণসন্তান নয়, নিহত আইরিশ দম্পতির শিশুসন্তান, ব্রাহ্মণ ঘরে আশ্রিত ও পালিত মাত্র—এই কথা মৃত্যুশয্যায় শায়িত তার পালক-পিতার মুখে শোনার প্রচণ্ড আঘাতে গোরার হিন্দুত্ব যখন ভেঙে খানখান হয়ে গেলো তখন বুঝতে পারি ভাঙবার জন্যই এই প্রাণোদ্দীপ্ত মূর্তিটি গড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর নিজের হিন্দুত্বের গণ্ডি ভাঙলো অবশ্য অন্তরেরই প্রসারে। শেষ অধ্যায়ে শুনি গোরার মুখে রবীন্দ্রনাথই যেন বলছেন তিনি ব্রাহ্ম হিন্দু সকল বদ্ধ জলাশয় থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন ভারত মহাসাগরের তীরে: 'আমি দিনরাত্রি যা হতে চাচ্ছিলুম কিন্তু হতে পারছিলুম না, আজ আমি তাই হয়েছি। আমি আজ ভারতবর্ষীয়...আপনি আমাকে সেই দেবতার মন্ত্র দিন যিনি হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম, সকলেরই; যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।" উপন্যাসের এবং উপন্যাসের নায়ক গোরার এইখানে সমাপ্তি। কিন্তু 'গোরা'র স্রষ্টার সন্ধান এগিয়ে চললো; আরো কয়েক বছর পরে দেখা যাবে তিনি সমস্ত পৃথিবীর সকল মানুষের দেবতার মন্দির-দ্বারে এসে পৌঁছেছেন। সেখানেও মানব-যাত্রার শেষ নেই। দেবতাও যে পান্থ। তাঁকে খোঁজা শেষ হবে কেমন ক'রে।

"ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা" শীর্ষক ভাষণে পড়ি: "বিশ্বমানবের উত্তরোত্তর সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে বর্তমান যুগে ভারতবর্ষের সাধনাই সকল সমস্যার, সকল জটিলতার সমাধান করে দেবে—এই একটা আশা ও আকাঙ্ক্ষা বিশ্বমানবের বিচিত্র কণ্ঠে আজ ফুটে উঠেছে।" রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিকে সহজ অর্থে ধরলে অতিশয়োক্তি কিংবা স্বদেশাভিমানের উগ্র প্রকাশ মনে হ'তে পারে। কিন্তু আসলে এমনতরো প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষা বিশ্বমানবের মনে না-জাগলেও রবীন্দ্রনাথের মনে জেগে-ছিলো। এত বড়ো অভিলাষকে বাস্তবায়িত করবার অপরিহার্য শর্তরূপে আর-একটি আকাঙ্ক্ষাও তাঁর মনে জাগলো। সেটি এই যে ভারতবর্ষের চিরাগত সাধনায় লব্ধ মূল আধ্যাত্মিক সত্যটিকে নতুন সাঁচে ঢালাই করতে হবে যাতে বিশ্বজনের কাছে তা সহজেই গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে।

১৩১৭ ও ১৩১৮ সালে যে দুটি প্রবন্ধ-সংকলন প্রকাশিত হয় ('সঞ্চয়' ও

'পরিচয়') তাতে রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তায় অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। তিনি এখন আর বৈদিক যুগের বিশুদ্ধ আর্যভাবের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে ভারতবর্ষের সকল সমস্যার সমাধান ব'লে মনে করছেন না—যেমন করেছিলেন "হিন্দুর ঐক্য" প্রবন্ধে। প্রথমত, শুধু ভারতবর্ষের কথা এখন ভাবছেন না তিনি, ভাবছেন সমগ্র পৃথিবীর সমস্যার কথা। দ্বিতীয়ত, ধর্মের সনাতনত্বের উপর আর জোর দিচ্ছেন না; জোর দিচ্ছেন ধর্ম-ভাবনা ও ধর্ম এষণার ক্রমবিবর্তনের উপর: "ধর্মমত জড়পদার্থ নহে, মানুষের বিদ্যা-বুদ্ধির অবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বিকাশ আছে।" তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত প্রবন্ধ "ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা"তে দেখিয়েছেন যে অন্তত খ্রীষ্ট-পূর্ব শতাব্দীগুলিতে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়েরা ভারতীয় ইতিহাসে দুই বিপরীত ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন; ক্ষত্রিয়েরা প্রবহমান কালের ও পরিবর্তমান সামাজিক অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে ধর্ম-সাধনায় ধর্ম-ভাবনায় ধর্মাচরণে নানারূপ মৌলিক পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করেছেন, মোটের উপর তাঁরা গঠন করেছিলেন দেশের প্রগতিশীল ও প্রসারণশীল শক্তি। পক্ষান্তরে, ব্রাহ্মণরা ছিলেন এস্ট্যাব্লিশমেন্টের ধারক ও বাহক, তাঁদের মনে সবসময় ভয় ছিলো পাছে রাজ-দার্শনিক ও রাজর্ষিরা এমন ভুঁইফোড় কিছু ক'রে বসেন যাতে প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিকের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়; তাই তাঁরা প্রাচীন মত ও পথের রক্ষক হয়ে দাঁড়ালেন, তাঁরা গঠন করলেন সমাজের রক্ষণশীল ও সংকোচনশীল শক্তি। আমাদের বুঝতে বিলম্ব হয় না যে রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক সহানুভূতি ও সমর্থন প্রগতিশীল ক্ষত্রিয় রাজাদের দিকেই। পরে খ্রীষ্ট-পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে, যখন ক্ষাত্রশক্তি নিরুদ্যম হয়ে গেলো রাজকার্যের ঊর্ধ্বস্থ সকল ক্ষেত্রে (কী কারণে, রবীন্দ্রনাথ তা বিশ্লেষণ ক'রে দেখাননি) এবং ব্রাহ্মণদের আধিপত্য একছত্র হ'লো, তখন ধর্মনীতি ও ধর্ম-সমাজের এই ব্রাহ্মণ প্রহরীরা সমাজকে অনম্য বিধানের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে এমন অনড় অসাড় মৃতবৎ ক'রে ফেললেন যে হিন্দু সমাজকে তথা সমগ্র দেশবাসীকে পুনরুজ্জীবনের জন্য অপেক্ষা করতে হ'লো ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব পর্যন্ত। ইসলামিক মরমিয়া সাধনার ও সামাজিক ভাবধারার অভিঘাতে হিন্দু সমাজ খানিকটা ন'ড়ে উঠেছিলো, তার ফলে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়াশীলতা দুই-ই দেখা দিলো। তবে সেটা স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়।

নবযুগের মন্ত্রদাতা রামমোহন কিন্তু ধর্ম-ভাবনায় কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তনের প্রবর্তক ছিলেন না। এক অর্থে অবশ্য ছিলেন। তখনকার দিনে এমন কথা বলা যে, সব ধর্ম মূলত এক, এবং ধর্মের কাজ সম্প্রদায় গঠন ক'রে মানুষে-মানুষে বিভেদ, বিবাদ ও সংঘর্ষের বিষাক্ত বাতাবরণ সৃষ্টি করা নয়, ধর্মের সার্থকতা সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সারা দুনিয়ার মানুষকে মানব-জীবনের সর্বোচ্চ স্তরে মেলানো—একটা বিপ্লব বটে। আমি অন্যদিক থেকে ভাবছি। রামমোহন উপলব্ধি করলেন সত্য-ধর্মের মূল কথা হচ্ছে বিশ্ব-স্রষ্টা ও বিশ্ব-বিধাতা এক পরম শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন

করা, এবং কর্মক্ষেত্রে স্বার্থত্যাগ ক'রে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষের উপকারের জন্য সচেষ্ট হওয়া। তাছাড়া তিনি ঘোষণা করলেন যে এটাই সব ঐতিহাসিক ধর্মের মূল কথা। ঘোষণা ক'রেই লক্ষ করলেন কোটি-কোটি খ্রীষ্টান তো এক নয়, তিন ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, এবং কোটি-কোটি হিন্দু বিষ্ণু শিব দুর্গা কালী ইত্যাদি বহু দেবতায় বিশ্বাস করেন, উপরন্তু তাঁদের মূর্তি গ'ড়ে সেইসব মূর্তিরই পূজা করেন। সুতরাং তিনি প্রাচীন আর্যশাস্ত্র অনুসন্ধান ক'রে প্রমাণ করতে ব্যস্ত হলেন যে প্রাচীনকালের মুনি-ঋষিরাও একেশ্বরবাদী ছিলেন; গ্রীক ও হিব্রু ভাষা শিখে তাঁর খ্রীষ্টান বন্ধু ও পাঠকদের জানালেন যে ঐ-সব ভাষায় লিখিত আদি খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে এক ঈশ্বরের সত্যই বিঘোষিত হয়েছিলো, তিন ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা পরবর্তী-কালের মতবিকার। চললো পণ্ডিত এবং পাদ্রীদের সঙ্গে বাদানুবাদ।

একটি বিতর্ক কিন্তু রামমোহন এড়িয়ে গেলেন। তিনি ভুলে গেলেন যে এ-দেশে গৌতম বুদ্ধ ঈশ্বরের প্রসঙ্গ বাদ দিয়েছিলেন তাঁর ধর্মশিক্ষা থেকে। স্বয়ং বুদ্ধকে ঈশ্বর-জ্ঞানে পূজা করা আরো পরের ব্যাপার, এবং এটাকেই এ-ক্ষেত্রে মতবিকার বলা যেতে পারে। সাংখ্যকাররাও ছিলেন অনীশ্বরবাদী। দ্বিতীয়ত, রামমোহন খোঁজ নিলেন না যে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট য়োরোপীয় চিন্তানায়ক ও দার্শনিকরা—হিউম্ ও ভলতের তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য—বিশ্ব-স্রষ্টা ও বিশ্ব-বিধাতা পরম শক্তিমান কল্যাণস্বরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেননি। সে-বিষয়ে আরো-একটু অবহিত থাকলে রামমোহনের ঈশ্বর-ভাবনা ভিন্ন রূপ ধারণ করতো যেমন করেছিলো রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে।

শাস্ত্র ঘেঁটে এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা এবং ভিন্ন শাস্ত্রাবলম্বীদের সঙ্গে তাই নিয়ে বাদানুবাদ করা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অসম্ভব ছিলো, তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর যুগ উভয়ই ছিলো প্রতিকূল। রবীন্দ্র-জীবনীকার বলছেন হিন্দুধর্মকে বিশ্ব-জনীন রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ তার যে-ব্যাখ্যা দিলেন "তাহা কি সনাতনী কি অর্বাচীন হিন্দু কেহই স্বীকার করিতে পারেন নাই।" পরে বিদেশে গিয়েও তিনি সে-ব্যাখ্যার কাঠামোয় রচিত অনেক সারগর্ভ অথচ সুললিত বাণী শোনালেন, কিন্তু একইভাবে নিরাশ হলেন। ঐ-সময়ে প্রবক্তা রবীন্দ্রনাথের কোল ঘেঁষে দেখা দিলেন মিষ্টিক রবীন্দ্রনাথ। এই রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ গদ্যে (নিবন্ধে বা ভাষণে) নগণ্য, কিন্তু পদ্যে ও গানে অতুলনীয়। মরমীয়া সাধনার কাব্যরূপ দেশ-বিদেশের অসংখ্য রসিকচিত্ত সানন্দে স্বীকার করলো, কিন্তু তার ধর্মরূপ ক'জনের কাছে পৌঁছলো? পৌঁছবার কথাও নয়। "এ যে আমার লজ্জাবতী লতা"রূপে যে অপূর্ব ঈশ্বরানুভূতি ধীরে-ধীরে মঞ্জরিত হয়ে উঠেছিলো, শীতের হাওয়া লেগে তার শুকিয়ে যাওয়ার কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি।

অবশেষে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-ভাবনা বহু নদনদী ঘুরে, বহু ঝড়ঝঞ্ঝা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়ে ঠেকলো সেই পশ্চিম তীরে যার নাম দিয়েছেন তিনি 'মানুষের ধর্ম', 'The

Religion of Man'। নামের নেতিবাচক অর্থটা লক্ষণীয়—মানুষের ধর্ম অর্থাৎ কিনা যা গোষ্ঠী সম্প্রদায়, জাতি বা দেশ-বিশেষের ধর্ম নয়। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের কোনো-কোনো শ্লোকের হিউম্যানিস্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন, বিশেষভাবে ঋণ স্বীকার করেছেন বাউল গীত-রচয়িতাদের কাছে। কিন্তু এ-ধর্ম-ভাবনা প্রধানত উনবিংশ শতাব্দীর পশ্চিম য়োরোপীয় নাস্তিক মনীষীদের অবদান। তাঁরা বললেন, পরম মূল্যের সন্ধান আমরা ইহলোক ও ইহজীবনের বাইরে করবো না, কারণ পরলোকে বা মানবোত্তীর্ণ কোনো আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাস করার মতো নির্ভরযোগ্য যুক্তি আমরা খুঁজে পাই না ; মানুষের মূল্যের প্রতিমানেই আর সব-কিছুর মূল্য পরিমেয়।

এই 'রিলিজন অফ ম্যান' পর্যায়ে এসে রবীন্দ্রনাথ অবতীর্ণ হলেন সেই তর্কে যা রামমোহন এড়িয়ে গিয়েছিলেন। মনে হয় নাস্তিকদেরই, বিশেষত পশ্চিমী নাস্তিক-দেরই, সম্বোধন ক'রে বলেছেন ; তোমরা যদি সৃষ্টির স্রষ্টা, জাগতিক ও নৈতিক বিধানের বিধাতা কোনো পরম সত্তা মেনে নিতে না-পারো তবে না-ই মানলে। তবু তো তোমরা মানো যে মানব-জীবন প্রাণধারণের গ্লানিকর চেষ্টায় বা শরীরসুখ, বিষয়সুখ, প্রতাপসুখ জাতীয় সব তুচ্ছ সুখের পিছনে ছোটাতে পরিসমাপ্ত নয়। মানো যে মানব-জীবন তার অর্থ খুঁজে পায় পূর্ণমানব হয়ে ওঠার অক্লান্ত অনির্বাণ সাধনায়। পূর্ণমানব বলতে কী বোঝায় সেটা অবশ্য আমাদের সকলের নিরবধি অন্বেষণের বিষয়। মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ কী তা নিয়ে যুগে-যুগে জাতিতে-জাতিতে এমন-কি ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে মতভেদ থাকতে পারে। আমার মনের গভীরে পূর্ণ-মানবের যে-ভাবচ্ছবি রয়েছে তাকেই আমি ভগবান বলি, তোমার মনের ভাব-চ্ছবিকে ভগবান বলতে তোমার কোথাও বাধবে কেন ? প্রশ্ন করতে পারো : এ কি কেবলই ছবি ? তা নয়। আমাদের জীব-ধর্ম আমাদের জন্য যে-কক্ষপথ নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছে তার বাইরে যখনই আমরা পা বাড়াই ("মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা") তখনই আমরা অনুভব করি পরম মানবিক সত্তা যেন আমাদের টানছে।

রবীন্দ্রনাথ যে-সব ধর্ম-ভাবনার ভিতর দিয়ে তাঁর সাধনার পথ কেটে এগিয়েছেন, তাতে ইতিপূর্বে কোথাও তিনি আধুনিক বিজ্ঞানের অভিঘাত খুব-একটা অনুভব করেননি। ব্রাহ্মধর্মে নয়, হিন্দুধর্মে নয়, "গীতাঞ্জলি'র প্রেমধর্মে নয় ; এই 'মানুষের ধর্ম' পর্বে এসেই বৈজ্ঞানিক চিন্তার সঙ্গে তাঁর ধর্মচিন্তার সংঘাত বাধলো। য়েট্সের বাল্যকালের খ্রীষ্টধর্ম কেড়ে নিয়েছিলেন তখনকার বৈজ্ঞানিকরা ; রবীন্দ্রনাথ তাঁর সত্তর বছর বয়সের হিউম্যানিস্ট ধর্মবিশ্বাস প্রায় হারাতে বসলেন নববিজ্ঞানীদের আঁকা বা উদ্ঘাটন-করা অমানুষী বিশ্বছবি দেখে। "অমানুষী" শব্দটা এখানে আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করছি—অর্থাৎ এমন ছবি যাতে মানুষের ও মানবিক মূল্যের কোনো বিশেষ মর্যাদা স্বীকৃত নয়, সুরক্ষিত তো নয়ই।

২ মনের মানুষের সন্ধানে

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

হিউম্যানিজম্‌-এর সংজ্ঞা হিসাবে কি এই ঘোষণাটি ব্যবহার করা যায়? কিন্তু যিনি ভগবানে বিশ্বাস করেন তিনি তো বলতে পারবেন না—ভগবানের উপরে মানুষ সত্য। উপনিষদকাররা উল্‌টো কথাই ঘোষণা করেছিলেন সকল মর্ত্যলোকবাসী এবং দিব্যধামবাসীগণকে সম্বোধন ক'রে—সবার উপরে ব্রহ্ম সত্য, সা কাষ্ঠা, সা পরাগতি। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রের মন এতে সায় দেবে। তাঁরা কি তবে কেউ হিউম্যানিস্ট ব'লে স্বীকৃতি লাভ করতে পারেন না?

রেনেসাঁস যুগে যখন হিউম্যানিস্ট ভাবধারা সবচেয়ে সোচ্চার হয়ে উঠলো তখনকার প্রথম হিউম্যানিস্ট পেত্রার্কা, এবং সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী হিউম্যানিস্ট এরাসমুস। এঁরা দু-জনেই ভগবানে বিশ্বাস করতেন। তাঁদের কাছে ভগবানও সত্য, মানুষও সত্য, কে বেশি সত্য সে-কথা ভাববার প্রয়োজন তাঁরা বোধ করেন-নি। মানুষের ব্যক্তিসত্তা এবং ঐহিক জীবনের সত্যমূল সকলের চোখে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তাঁরা, কারণ এই মহৎ সত্যটা চাপা পড়েছিলো মধ্যযুগের চার্চ-শাসিত অনুষ্ঠান-ভিত্তিক রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মের জগদ্দল পাথরের তলায়। গান্ধিজী প্রথম যৌবন থেকে মৃত্যুদিন পর্যন্ত মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে-ছিলেন, সে-উৎসর্গের তুলনা মেলা ভার। তিনি হিউম্যানিস্টদের মধ্যে সেরা হিউম্যানিস্ট ব'লে গণ্য হ'তে পারেন সংগতভাবেই। অথচ তিনি নিশ্চয়ই বলতে রাজী হতেন না যে, ভগবানের উপরে মানুষ সত্য। যা বলতেন তা অনুমান করা শক্ত নয়। ভগবান তো তোমার সেবার অপেক্ষা রাখেন না, তাঁর কী সেবা করবে তুমি? ঠাকুরের ভোগ রান্না ক'রে এবং ঐ-জাতীয় অন্যান্য ধর্মকর্ম ক'রে সময় নষ্ট কোরো না। চেয়ে দেখো চারিদিকে কতো অসংখ্য মানুষ কী অবর্ণনীয় দুঃখে-কষ্টে দিনাতিপাত করছে। এসো আমার সঙ্গে, তাদের সেবায় আমরা জীবনদান করি, ব্রতধারণ করি যে প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রত্যেকটি অশ্রুবিন্দু মুছাবো আমরা। মানুষই ভগবানের সর্বোত্তম সৃষ্টি, সর্বপ্রিয় সৃষ্টি। মানুষের সেবা করলেই ভগবানের সেবা করা হবে।

রেনেসাঁস হিউম্যানিস্টদের যে-অর্থে হিউম্যানিস্ট বলা হয় সে-অর্থে রবীন্দ্রনাথ

অবশ্য হিউম্যানিস্ট ছিলেন—'প্রভাত সঙ্গীত' থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত, এমন-কি 'গীতাঞ্জলি' পর্বে যখন তিনি মানুষ থেকে বেশ-খানিকটা দূরে স'রে গিয়ে নিজেকে ঈশ্বর-ভাবে বিভোর ক'রে তুলেছিলেন, তখনও। 'খেয়া'র "অনাবশ্যক" শীর্ষক অতি সুন্দর কবিতাটিতে তিনি গান্ধির পূর্বোক্ত কথাটাই বলেছেন কাব্যের তির্যক ভাষায়—তোমার প্রদীপ ঈশ্বরের পূজার জন্য নিয়ে যাচ্ছ বৃথাই, সেখানে তো চন্দ্র-সূর্য-তারকার লক্ষপ্রদীপ সর্বক্ষণই জ্বলছে; যে দুঃখী মানুষের ঘরে আলো জ্বলেনি তার ঘরের অন্ধকার তোমার প্রদীপের আলোয় দূর করো।

এই জীবনব্যাপী ব্যাপকতর অর্থবাহী হিউম্যানিজম্-এর পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের ধর্ম-অনুভূতি ও ধর্মচিন্তা একটি বিশেষ রূপ গ্রহণ করেছিলো 'মানুষের ধর্ম' ও *The Religion of Man* নামক বক্তৃতামালায়; সেটাই আমার আলোচ্য এখানে। এই বক্তৃতাগুলিতে এবং সমসাময়িক কোনো-কোনো কবিতাতে তিনি মানুষকেই ঈশ্বররূপে ধ্যান করতে চান; বলছেন—মানুষের বাইরে মানুষকে ছাড়িয়ে যদি ঈশ্বরের কথা ব'লে থাকেন কেউ, তবে আমার কাছে তার কোনো অর্থ নেই। এ কোন্ মানুষ? নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষ নয়, নিশ্চয়ই চোরজোচ্চোর খুনে নারীধর্ষণকারী অত্যাচারী মানুষ নয়। তাদেরকে পূজনীয় জ্ঞান করা দূরের কথা, যে-মহাপুরুষেরা ব'লে গেছেন এদেরও ক্ষমা করো ভালোবাসো, রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন ব্যর্থ নমস্কারে। পক্ষান্তরে, মহাপুরুষের পূজায় তাঁর মন ওঠেনি কোনোদিন; অবতারবাদে তাঁর সায় ছিলো না। গৌতম বুদ্ধ ও যীশু খ্রীষ্টকে তিনি শ্রেষ্ঠ মানুষ বলেছেন, দেবতা জ্ঞান করেননি কখনও। অথচ হিবার্ট লেকচারের আরম্ভে ঘোষণা করলেন—আবার বক্তৃতার বিষয় "Humanity of God"। কী অর্থে?

মানুষের সত্তায় দ্বৈধ আছে—বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। একদিকে সে প্রকৃতির সন্তান, প্রকৃতির কোলে জন্ম নেয়, লালিত-পালিত হয়, প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা চালিত; বস্তুতপক্ষে সে-নিয়মাবলি সরাসরি লঙ্ঘন করার ক্ষমতা তার নেই। জড়বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত যাবতীয় নিয়ম জীব-জগতেও খাটে; জীববিজ্ঞান ফিজিকো-কেমিক্যাল নিয়ম রদ করে না, তারই উপর নিজের ভিত্তিস্থাপনা করে। একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবের দেহ যে-কোনো জড়পিণ্ডের চেয়ে অনেক বেশি জটিল; তার গতিবিধির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও সেই পরিমাণে জটিলতর হবে। কিন্তু অসম্ভব নয়। কোনো বিজ্ঞানী সন্দেহ করেন না যে বাইঅলজি একদিন—অদূর ভবিষ্যতে একদিন—ফিজিক্স-কেমিস্ট্রির শাখা হয়ে দাঁড়াবে। তবু একটি বিড়াল ঘরে ঢুকলে সে কোন্‌দিক দিয়ে কোন্ চেয়ারে আসন গ্রহণ করবে সেটুকু বলার সাধ্য নেই কোনো জীববিজ্ঞানীর। ঘরের কোণে এক টুকরো মাছ প'ড়ে থাকলে বিড়ালটি যে সোজা ঐ-দিকে যাবে এ-কথা আমরা অবিজ্ঞানীরাও বলতে পারি। কিন্তু মাঝপথে যদি সে তার ছানার চীৎকার শুনতে পায় তবে কি থমকে দাঁড়াবে, ফিরে আসবে

ছানার কাছে, না কি সে-ডাক অগ্রাহ্য ক'রে মাছের দিকেই এগুবে—বলা কি সম্ভব হবে কোনোদিন ? বিজ্ঞানী অবশ্য আশা ছাড়বেন না ; বলবেন বিড়ালটির মস্তিষ্ক ও যাবতীয় স্নায়ুতন্ত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করার উপযুক্ত ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি যে-দিন আবিষ্কৃত হবে সেইদিন থেকে বিড়ালটির সম্ভাব্য গতিবিধির রেখাচিত্র আমরা মোটামুটি আঁচ ক'রে নিতে পারবো।

কিন্তু মানুষের বেলা কি তা কোনোদিন সম্ভব হবে ? কোনো দেহাত্মবাদী মনস্তাত্ত্বিক (অথবা দেহতাত্ত্বিক) কি একজন মহাকবির স্নায়ুতন্ত্র ও তাঁর পরিপার্শ্ব বিষয়ে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ ক'রে ভবিষ্যৎ-বাণী করতে পারবেন উক্ত কবির পরবর্তী কবিতা বা নাটক কী রূপ ধারণ করবে, কী ভাব ব্যক্ত করবে ? অবশ্য আমাদের মিটিয়রলজিস্টরা আবহাওয়ারই ঠিকমতো পূর্বাভাস দিতে পারেন না এখনও ; তবু আবহাওয়াতত্ত্বের প্রগতি থেকে অনুমান করা যায় যে বছর দশেকের মধ্যে নির্ভরযোগ্য ফোরকাস্ট আমরা পাবো। কিন্তু দশ হাজার বছর পরেও মানুষের আচার-আচরণের সঠিক পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হবে, এ-কল্পনা অলীক ঠেকে। মানুষের বেলা সব-কিছুর জটিলতা যে পর্বত-প্রমাণ, শুধু তা-ই নয় ; সে-বাধা দুর্লঙ্ঘ্য, কিন্তু অলঙ্ঘনীয়। একটা নীতিগত বাধাও আছে।

মানুষেব চালচলন প্রাকৃতিক কার্যকারণ-শৃঙ্খলার দ্বারা নিরূপিত, অন্তত তার বহির্ভূত নয়। বলা যেতে পারে তাকে যেন পিছন থেকে ঠেলে কোনো ভৌতিক বিজ্ঞানগম্য শক্তি চালনা করছে—মোটের উপর প্রাণধারণের দিকেই। অবশ্য মধ্যবয়স পার হয়ে গেলে এই শক্তির ধাক্কাই তাকে জরার খানায় ফেলবে এবং ক্রমশ বেশ দ্রুত গতিতে ঠেলে নিয়ে যাবে মৃত্যুগহ্বরে নিক্ষেপ করার জন্য। এই হ'লো মানুষের ভাগ্য, বিশ্বজাগতিক পটভূমিকায় মানবিক পরিস্থিতি। কিন্তু শুধু এটাই মানুষ সম্বন্ধে সব কথা নয়, শেষ কথা তো নয়ই। হ'লে মানুষে কুকুরে ভেদ থাকতো না। কুকুরের স্বভাবে দ্বৈধ নেই, যেমন আছে মানুষের স্বভাবে।

মানুষ সম্বন্ধে অন্য কথা এবং বড়ো কথা হচ্ছে এই যে তাকে সামনের দিক থেকেও সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকার আর-এর শক্তি টানছে। টানা-পোড়েন নয়, টানা এই ঠেলার লীলাক্ষেত্র হচ্ছে মানুষের দেহমনোভূমি। মাধ্যাকর্ষণ বা চুম্বকাকর্ষণের মতো অমোঘ নয় এ-টান ; তবু অবিসন্দিগ্ধ। ন্যূনাধিক আমরা সবাই এ-আকর্ষণ অনুভব করি, অল্পবিস্তর আমরা সবাই তাতে সাড়া দিই। কিন্তু কোনো জবরদস্তি, কোনো বাধ্যবাধকতা নেই এই অতিপ্রাকৃত বা আধ্যাত্মিক শক্তির আকর্ষণে। আমরা স্বেচ্ছায় তাকে বরণ করি, কিংবা স্বেচ্ছায় তাকে এড়িয়ে চলি। সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে যে-জন সে পশুতুল্য, অনেকখানি মেনে চলে যে-জন তাকে বলি মহা-পুরুষ ; সম্পূর্ণ মেনে চলতে পারে না কেউ, পারলে সে হ'তো অবতার বা সাক্ষাৎ ভগবান। খ্রীষ্টীয় এবং হিন্দু শাস্ত্রে অবতারবাদের স্থান আছে, রবীন্দ্র-শাস্ত্রে নেই।

কী এই শক্তি ? কেবলমাত্র প্রাণধারণ ও বংশবৃদ্ধিতে মানুষের তৃপ্তি নেই, সে

উঠবে আরো উপরে, হবে আরো বড়ো, আরো পূর্ণ। প্রকৃতি তাকে এই আরো বড়োর দিকে ঠেলে দিতে পারে না, কিংবা বড়োজোর হাজার-হাজার বংশপরম্পরায় যে-সব সূক্ষ্ম শারীরিক পরিবর্তন দৈবাৎ ঘ'টে যায় (chance mutation) এবং তারই ফলে যেটুকু বিবর্তন—মানসিক বিবর্তনও—সম্ভব যোগ্যতমের উদ্বর্তন নিয়মানুযায়ী, সেইটুকু উন্নতিসাধন করা প্রকৃতির কাজ। কিন্তু মানুষ যুগ-যুগ ধ'রে অপেক্ষা ক'রে থাকতে রাজী নয়। পরিপূর্ণতার, পরোৎকর্ষের বা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় পরম মানবের যে-আদর্শ সে হৃদয়ে ধারণ করে, সেই আদর্শের অনুপ্রেরণায় (তাড়নায় নয়) সে আরো দ্রুত এগিয়েছে, আরো অনেক দূর দ্রুততর গতিতে এগুবে। "এই যে অনিশ্চিতের মধ্যে, অনাগতের মধ্যে তার চিরনিশ্চিতের সন্ধান অক্লান্ত—তারই সংকটসংকুল পথে মানুষ বার বার বাধা পেয়ে ব্যর্থ হয়েও যাত্রা বন্ধ করতে পারলে না। এই অধ্যবসায়কে বলা যেতে পারত পাগলামি, কিন্তু মানুষ তাকেই বলেছে মহত্ত্ব। এই মহত্ত্বের আশ্রয় কোথায়। অলক্ষ্য একটি পরিপূর্ণতার দিকে মানুষের মনের আকর্ষণ দেখতে পাই; অন্ধকার ঘরের গাছে, তার শাখায় প্রশাখায় যেমন একটা স্বাভাবিক ব্যাকুলতা প্রাচীরের ওপারের আলোকের দিকে। আলোক যেমন সত্য, পূর্ণের আকর্ষণ নিয়ত যেখান থেকে প্রেরিত সেও যদি তেমনি সত্য না হত তাহলে জীবিকার প্রয়োজনের বাইরে আত্মার উৎকর্ষের জন্যে মানুষ যা কিছু চিন্তা করে, কর্ম করে, তার কোনো অর্থই থাকে না। এই সত্যকে ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করি আমাদের আদর্শে।"

দুটো প্রশ্ন ওঠে। এই 'সত্য' যাকে রবীন্দ্রনাথ চিরমানব, পূর্ণপুরুষ, মনুষ্যত্বের আদর্শ ইত্যাদি আখ্যা দিয়েছেন, কেমনতরো সত্য (real)? স্পষ্টতই তা চন্দ্র-সূর্যের মতো প্রত্যক্ষ বা ইলেকট্রন-প্রোটনের মতো বৈজ্ঞানিক প্রমাণে সিদ্ধ সত্য নয়। মানুষ না-থাকলেও চন্দ্র-সূর্য থাকতো, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারা নির্ধারিত হ'তো তাদের গতিপথ। কিন্তু মানুষ না-জন্মালেও মনুষ্যত্বের আদর্শ (পূর্ণপুরুষ) থাকতো বলার কোনো মানে হয় না। উপনিষদের ব্রহ্ম কিংবা খ্রীষ্টান কি মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের ঈশ্বর সৃষ্টি-সাপেক্ষ নন, জগৎ-সৃষ্টি না-হলেও তাঁর পূর্ণতার কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হ'তো না। প্রতিতুলনায় 'মানুষের ধর্ম'-এ রবীন্দ্রনাথ যে-ঈশ্বর-ভাবনায় উপনীত হয়েছেন সে-ঈশ্বর মানুষের হৃদয়েই আসীন। এই আসনটি রচিত না-হ'লে তাঁর সত্তা কোনো প্রমাণেই সিদ্ধ হয় না। মানুষের হৃদয়ে ভাবনায় ও কর্ম-উদ্যোগে তিনি যতোখানি অভিব্যক্ত ততখানিই সত্য, মানব-নিরপেক্ষ সত্য নন।

রবীন্দ্রনাথ আরো বলতে চান যে এই পরিপূর্ণতার বা পরোৎকর্ষের আদর্শ বিষয়ে মানুষের বোধ যুগে-যুগে বদলেছে, ক্রমশ উন্নততর হয়েছে। আর-সব বিষয়ে যেমন "পূজার বিষয় কল্পনায়"ও মানুষের ভ্রম ঘটেছে বার-বার, বার-বার তা সংশোধিত ও শুদ্ধ হয়েছে: "এই ভ্রমের বিচার মানুষেরই শ্রেয়োবুদ্ধি থেকেই, মানুষের দেবতার বিচার মানুষেরই পূর্ণতার আদর্শ থেকে।" তাই ব'লে যাঁকে

আমরা পুজো করবো, যাঁর ডাকে সাড়া দেবো তাঁকে আমরা খেয়ালখুশি মতো তৈরি করেছি—এমন কথা ভাবা যায় না; ভাবলে পূজা আর পূজা থাকে না, কর্মের উদ্দীপনাও নষ্ট হয়ে যায়। কোন্ দেবতাকে হবিঃ দান করবো—এ-প্রশ্ন বৈদিক যুগ থেকে অদ্যাবধি আমাদের সবাইকে ব্যাকুল করেছে, কিন্তু যে দেবতাকেই আমরা বরণ করি, পারি না ব'লেই করি। ব্লাউজের ডিজাইন বা মোটর গাড়ির রং পছন্দ করবার মতো সৌখীন ব্যাপার নয় ধর্মসাধনা, একটা বাধ্যকতা এবং বাধ্যকতাবোধ আছে তাতে।

বাধ্যকতা আছে বিচারে, কর্মে নয়। শ্রেয়ের পথ কোন দিকে নির্দিষ্ট জেনেও আমরা হেয় কর্ম করতে পারি, কিন্তু নারীধর্ষণ বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিককে হত্যা ক'রে নিজের পথ পরিষ্কার করাকে ইচ্ছামতো শ্রেয় জ্ঞান করতে পারি না। এককালে দেবতা ছিলেন পরম ভয়ের পাত্র; সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে তিনি হয়েছেন পরম শ্রদ্ধা ও প্রেমের পাত্র। রবীন্দ্রনাথ আরো তর্ক তুলেছেন যে বিজ্ঞানও তো যুগে-যুগে ভুল করে এবং ভুল শোধরায়, তাতে ক'রে বৈজ্ঞানিক সত্য তো মন-গড়া কাহিনী হয়ে যায় না। বিজ্ঞানের সত্য আর কর্মের সত্য ভিন্নপ্রকার, ভিন্ন তাদের উপলব্ধি ও সিদ্ধি। কিন্তু কোনোটাই খেয়ালের ব্যাপার নয়।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি হ'লো: "তারই সংকটসংকুল পথে মানুষ বার বার বাধা পেয়ে ব্যর্থ হয়েও যাত্রা বন্ধ করতে পারল না।" যে-মানুষ পরম মানুষের ডাক শুনেছে সে যাত্রা বন্ধ করতে পারবে না। বোঝা গেলো, এতটা আকর্ষণশক্তি পরম মানবের আছে।

শুধু এইটুকু জানি, তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর-পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপখানি।

কিন্তু বাধা ব্যর্থতা সংকট আসে কোথা থেকে? মানুষই কি মানবিক পরিপূর্ণতার পথের সন্ধান পেয়েও কোনো উল্টো বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হয়ে নিজের পূর্ণ বিকাশের পথকে নিজেই সংকটসংকুল ক'রে তুলেছে?

"মানুষের সত্তায় দ্বৈধ আছে", ঠিক কথা; কিন্তু এ দ্বৈধের উৎসমূল কোথায়? একদিকে সে পরম মানবিক সত্তা অর্থাৎ ঈশ্বরের দ্বারা আকৃষ্ট; অন্যদিকে সে পরম জাগতিকসত্তার নিয়মজালে বদ্ধ! এই নিয়মের আওতায় তার জন্ম ও বৃদ্ধি, তার যাবতীয় প্রবৃত্তির উদ্ভব ও পরিণতি। সে-প্রবৃত্তিকে আমরা বলি জৈব প্রবৃত্তি। প্রত্যেকটি জীবকে (মানব-নামধারী জীবকেও) তার জৈব প্রবৃত্তি শেখায় আপন একান্ত স্বাতন্ত্র্যকে, অহংকে, বাঁচিয়ে রাখতে এবং যে-কোনো মূল্যে বাড়িয়ে তুলতে, সব প্রতিবন্ধক সরিয়ে দিয়ে, সব প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি বা দলকে মাড়িয়ে দিয়ে। বলা যেতে পারে যে অহং-এর সঙ্গে পরমের দ্বন্দ্ব চলে প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে।

কিন্তু তাতে সব কথা বলা হয় না। কারণ এই অহং তো ভুঁইফোঁড় কিছু নয়, সমগ্র জাগতিক সত্তার মধ্যে সে গ্রথিত, সেইখান থেকে পায় তার সংকল্প, তার শক্তি। সৃষ্টির বিচারে শক্তির পরিমাপে এই পরম প্রতাপশালী জাগতিক সত্তাও ঈশ্বরের আর-এক রূপ অথবা ভিন্ন এক ঈশ্বর।

প্রাচীনকাল থেকে এই দুই ঈশ্বরকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। আমরা ঈশ্বরকে বলি সত্য শিব সুন্দর, অর্থাৎ সমস্ত চরম মূল্যের পরম আধার। তাই তিনি আমাদের প্রেম-ভক্তি কাড়েন, আমাদের সাধনাকে উদ্বুদ্ধ করেন, কর্মকে উদ্দীপ্ত করেন। আবার ঈশ্বরকে বলি সর্বশক্তিমান, সর্বঘটন-পটীয়ান, আদি স্রষ্টা এবং সর্বোচ্চ ও সর্বকালীন বিধাতা, রামমোহনের ভাষায় The Eternal Governor of the Universe। গোল বাধে সেইখানে। সর্বশক্তিমান বিধাতার সৃষ্টি বড়ো সুশৃঙ্খল, বড়ো সুনিয়ন্ত্রিত। বিজ্ঞান তার সাক্ষী; এবং সাক্ষ্য ক্রমশ জোরদার হচ্ছে, সুপ্রতিষ্ঠিত ও সর্বব্যাপী হচ্ছে। যাঁরা শক্তির পূজারী তাঁরা এই পরম শক্তিমানকে পূজা করবেনই। কিন্তু যাঁরা শ্রেয়কে, শ্রেয়োনীতিকেই পরম ব'লে জেনেছেন তাঁরা চারিদিকে তাকিয়ে বিহ্বল হয়ে যান—এত অন্যায়, এত নির্যাতন, এত ব্যর্থতা, এত অসহনীয় যন্ত্রণা কেন? একজনের পাপই যে আরেকজনের বুকে আঘাত হানে তা-ই নয়, প্রাকৃতিক বৈরিতার আয়তনও বিরাট। রোগ শোক জরা মৃত্যু তো আছেই, সার্থকতার তীরে পৌঁছে অনেকের ভরাডুবি হয়, যেমন হ'লো সেদিন আমাদের বন্ধু ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চানের। সবই নিয়মমতো ঘটে, কিন্তু সে-নিয়ম প্রাকৃতিক, শ্রেয়োনীতিক নয়। পরকাল, পুনর্জন্ম ইত্যাদি রোমান্‌স্ রচনা ক'রে মানবলোকে নৈতিক বিশৃঙ্খলার ব্যাখ্যা দেওয়া শুধু নিজেকে ভোলানো। রবীন্দ্রনাথ এ-সব ধর্মশাস্ত্রীয় প্রবোধবাক্যে কর্ণপাত করেননি। স্টপফর্ড ব্রুককে বলেছিলেন, "আমাদের বর্তমান জন্মের বাইরের অবস্থা সম্বন্ধে কোনো নির্দিষ্ট কল্পনা আমার মনে নাই, এবং সে সম্বন্ধে আমি চিন্তা করা আবশ্যক মনে করি না।" মানুষের দুঃসহ দুঃখের মতো এত বড়ো প্রকাণ্ড ব্যাপার তাঁর চিন্তাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ করেনি এমন কথা আমরা ভাবতে পারি না। কাজেই ভাবতে হয় যে তাঁর চিন্তা সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত ছিলো।

ধর্মতাত্ত্বিকদের মধ্যে কেউ-কেউ বলেন বিশ্বজাগতিক ভগবানের শক্তি সীমিত, সেই সীমিত শক্তি নিয়ে জড়ের বাধা কাটিয়ে মানুষের যতোটা ভালো করা সম্ভব ততোটা তিনি করেছেন। রবীন্দ্রনাথও তেমন কথা বলেছেন মাঝে-মধ্যে। "দেখছি এত স্খলন ঘটে, ছন্দ মেলে না, ওজনে ভুল হয়; বুঝতে পারি তিনি সর্বশক্তিমান নন, সেইজন্যে তাঁকে এত কাটাকুটি করতে হয়, সেই কাটাকুটির দুঃখ আমরা এড়াব কী করে।" বলা বাহুল্য যে, স্খলন ঘটে নৈতিক শৃঙ্খলায় (moral order-এ) প্রাকৃতিক শৃঙ্খলায় নয়। কিন্তু 'মানুষের ধর্ম' পুস্তকে তিনি আরো স্বচ্ছবাক্। স্পষ্ট জেনেছেন এবং জানাচ্ছেন যে অভাব শক্তির নয়, অভাব মঙ্গল-বিধানের এবং

মমতাবোধের ; যিনি জগৎ-স্রষ্টা এবং বিশ্ব-বিধাতা, মানুষের ভালোমন্দ সুখদুঃখ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। "পরম মানবিক সত্তাকে পেরিয়ে গিয়েও পরম জাগতিক সত্তা আছে। জাগতিক ভূমা আমাদের জ্ঞানের বিষয়, মানবিক ভূমা আমাদের সমগ্র দেহমনের ও চরিত্রের পরিতৃপ্তি ও পরিপূর্ণতার বিষয়।·· নৈর্ব্যক্তিক জাগতিক সত্তাকে প্রিয় বা কোনো-কিছু বলার অর্থ নেই। তিনি ভালোমন্দ সুন্দর-অসুন্দরের ভেদবর্জিত। তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ নিয়ে পাপ-পুণ্যের কথা উঠতে পারে না।" কিন্তু তাঁকে বাদ দিয়েই বা ওঠে কেমন ক'রে ? মানুষের হিংসা, স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত হিংস্রতা তো বিশ্বজাগতিক ব্যবস্থারই বিবর্তনধারার অনিবার্য পরিণাম।

শুভ এবং অশুভ বিপরীত শক্তির দেবতাদ্বয়ের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের কথা হচ্ছে না এখানে—যে-কথা বলা হয়েছিলো প্রাচীন পারসিক ধর্মশাস্ত্রে। খ্রীষ্টানেরা এবং মুসলমানেরা এক প্রচণ্ড শক্তিমান অমঙ্গল-বিলাসী শয়তানকে খাড়া করেন ভগবানের পাশাপাশি। শয়তানও ভগবানের সৃষ্টি, অথচ মানুষকে বিপথে নিয়ে গিয়ে ভগবানের উদ্দেশ্য পণ্ড ক'রে দেওয়াই তার কাজ। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য আধুনিক যুগের মানুষ, পৌরাণিক কাঠামোতে তাঁর ধর্মচিন্তা বিধৃত নয়। তিনি বলছেন কঠিন বাস্তবের সঙ্গে মহান আদর্শের দ্বন্দ্বের কথা। ঠিক এই কথাটা বলছেন না, তবু তাঁর বলা কথার ফাঁকে-ফাঁকে এসে পড়ে এই না-বলা কথা। পরম মানবিক সত্তাকে ছাড়িয়ে আছে যে বিশ্বজাগতিক সত্তা, তার কথা তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু এই দুই সত্তার মধ্যে কী সম্পর্ক সে প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন। "বিশ্বজাগতিক সত্তা" কি বিশ্বজগৎ থেকে স্বতন্ত্র কিছু ? অনেক প্রাচীনপন্থী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এই স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস করেন, জগৎকে ছাড়িয়েও জগদীশ্বরের নিরঞ্জন সত্তার স্থান আছে তাঁদের ভক্তহৃদয়ে। আমার কাছে এবং খুব সম্ভবত শেষ পর্বের রবীন্দ্রনাথের কাছে জগৎ-ব্যাপার ও জগদীশ্বরের পার্থক্য বাচনিক, বাচ্য একই।

বিশ্বদেবতা সৃষ্টি করেছেন মানুষকে, ভাষান্তরে বিশ্বজাগতিক বিবর্তনধারায় মানুষ জন্মলাভ করেছে। কী আশ্চর্য কৌশলে এ-সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে তা যাঁরা আধুনিক নৃতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব ও ভূতত্ত্বের স্বল্প চর্চাও করেছেন (রবীন্দ্রনাথ যেমন করেছিলেন) তাঁরা জানেন ; জেনে বিস্ময়ে, সম্ভ্রমে, রসানন্দে অভিভূত হয়ে ব'লে ওঠেন—এ কোন্ মহান গাণিতিক-শিল্পীর অপরূপ রচনা অনন্ত দেশ-কালের পট-ভূমিকায় ! প্রকৃতির নবতম সন্তান মানব-নামধারী বুদ্ধিযুক্ত প্রাণী স্বভাবতই বিশ্ব-প্রকৃতিকে জানতে বুঝতে চায়। তাতে ক্ষান্ত না-হয়ে পরম পিতাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তাঁর সৃষ্টিকর্মের মূল্য বিচার করে ; বলে, তোমাকে শ্রেয় বলা যায় না, তবে হেয় তুমি নও, তুমি নির্মম, তুমি উদাসীন, বিপরীত তুমি ললিতে-কঠোরে। তোমার রাজত্বে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায় এবং খিদে পেলেই বাঘ গোরুকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে খানিকটা খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি ক'রে বাকিটা শেয়াল-কুকুরের জন্য ফেলে দিয়ে চ'লে যায় ; তুমি কতো সহস্রপ্রকার কোটি-কোটি ব্যাকটিরিয়া সৃষ্টি

করেছো এবং ঐটুকু অদৃশ্য প্রাণীর দেহে উপজ্জা দিয়েছো যে মনুষ্যদেহই তাদের প্রকৃষ্ট খাদ্য ; ইত্যাদি।

তবু তুমি আমাদের পিতা। সুদীর্ঘ শৈশবকালে আমাদের অর্থাৎ মনুষ্যজাতির অস্তিত্ব রক্ষা করেছো তৎকালীন ভয়াবহ সব বিপদ-আপদ থেকে। ভূ-প্রকৃতির অবস্থা পরম্পরায় একটু এ-দিক ও-দিক হ'লেই তো আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম। তিন-চার শ' বছর আগে আমাদের বুদ্ধিকে সাবালক ক'রে তুলেছো বিজ্ঞানের উন্মেষ ঘটিয়ে। তারপর থেকে আমরা তোমার সামনে ভীতসন্ত্রস্ত হৃদয়ে করজোড়ে দাঁড়িয়ে নেই। তোমার বিধি-বিধান জেনে নিয়ে তোমারই উপর আংশিক রাজত্ব স্থাপন করতে শুরু করেছি। সবে শুরু। বন্যা-নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেছি, কিন্তু ভূমিকম্পের বেলা আমরা আজও অসহায়। রোগের জীবাণুতত্ত্ব আবিষ্কার করেছি, ইতিমধ্যে অনেকরকমের ভ্যাকৃসিন আর অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি ক'রে বসন্ত, কলেরা, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগকে কাবু ক'রে ফেলেছি : ক্যানসার এবং থ্রম্বোসিসকেও শীঘ্রই বশে আনবো। তবে যুদ্ধ, গণহত্যা, হিট্‌লর, স্তালিন, নিক্‌সন, ইয়াহিয়া প্রভৃতি জঘন্য সব ব্যাধির প্রকোপে আমাদের যন্ত্রণার শেষ নেই। তার ওষুধ তোমার কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। যেতে হবে অন্য দেবতার কাছে, যিনি শুভের দেবতা, সুন্দরের দেবতা। কারণ শুভবুদ্ধি ব্যাপকভাবে জাগ্রত না-হ'লে তো এইসব ব্যাধির প্রতিষেধক আর-কিছু নেই, তাঁর কাছেই প্রার্থনা করতে হবে—বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু। জ্ঞান, নীতিবোধ, সৌন্দর্যবোধ কিছুদূর পর্যন্ত এগোয় জৈবিক নিয়মে, তারপর হয়ে দাঁড়ায় জীবনরক্ষার দায় থেকে মুক্ত এক আধ্যাত্মিক সাধনা, সত্য শিব সুন্দরের আরাধনা। কোথায় বিভাজনী রেখা টানা যায়, অথবা আদৌ টানা যায় কিনা, বুঝতে পারি না।

মানবিক দেবতা অপেক্ষাকৃত নবীন। উপনিষদে এর আভাষ পাওয়া যায়, গৌতম বুদ্ধ এঁর কথা আরো বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন পরোক্ষে, প্রত্যক্ষত তিনি ঠাকুর-দেবতা মানতেন না। রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় শেষ পর্বে এমন কথা বলেন যেন বাউলদের 'মনের মানুষ' (রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায় তার অর্থ মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ) অথবা হিউম্যানিস্ট দার্শনিকদের ideal humanity-ই একমাত্র দেবতা, তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কোনোপ্রকার দেব-কল্পনা ভুয়ো : "আমাদের ধর্মশাস্ত্র (theology) পরমেশ্বরে যে গুণই আরোপ করুক্, প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি মনুষ্যত্বের অনন্ত আদর্শই, যাঁর দিকে সমগ্র মানবজাতি এগিয়ে চলেছে, যাঁর সঙ্গে তারা প্রেমের পথে মিলিত হতে চায় ; যাঁকে আদর্শ পিতা, বন্ধু ও প্রিয় বলে জানে।" এমন-কি এতদূর পর্যন্ত দাবি করেছেন যে মানুষ নিজের ধর্মসাধনার যে-নামই দিক, আমাদের পরিচিত সকল ধর্মের মূল কথা হচ্ছে এই আদর্শ মানব বা চিরমানবের সাধনা—প্রেমে, জ্ঞানে ও কর্মে। ভুলে গেছেন যে অধিকাংশ নিষ্ঠাবান

হিন্দু,ইহুদী; খ্রীষ্টান,মুসলমান তাঁদের উপাস্য দেবতাকে সর্বশক্তিমানরূপেও দেখেন; অথচ রবীন্দ্রনাথের পরম মানবিক সত্তায় সর্বশক্তিমত্তা খুঁজে পাওয়া যায় না; তিনি মানুষকে আকর্ষণ করতে পারেন, বিশ্বজগৎকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না।

সে যা-ই হোক্, রবীন্দ্রনাথের 'মনের মানুষ' বিষয়ে আরো কয়েকটি প্রশ্ন জাগে আমার মনে। সকলের মনের মানুষ কি একই বা একই প্রকার গুণসমুচ্চয়? মনে রাখা দরকার যে, 'মনের মানুষ' একটি মতবাদ বা মতবিশ্বাসের ব্যাপার নয়, যাঁকে আমি প্রেমে, জ্ঞানে, কর্মে সত্য ক'রে তুলতে প্রয়াসী আমার জীবনে, তিনিই আমার 'মনের মানুষ'। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই পরম মানবকে সত্য ক'রে তুলবার জন্য নিরন্তর সাধনা করেছিলেন; গান্ধি ও; আইনস্টাইনও। কিন্তু কতো বিচিত্র এই সাধনা-আরাধনার গতি ও গন্তব্য। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন আদর্শ শিল্পী হ'তে মূলত, গৌণত কিছু কর্মের দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। অসাধারণ সিদ্ধিলাভ করেছিলেন মহাশিল্পীরূপে; কর্মী বা জ্ঞানীরূপে তাঁর অবদান শ্রদ্ধেয় হ'লেও অল্পই। গান্ধিজী ভক্তিকাব্য ছাড়া অন্য কোনো সাহিত্যের বা শিল্পের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেননি; বলতেন, আমার জীবনই আমার কবিতা। সে-কবিতা পাঠ ক'রে আমরা মুগ্ধ হয়েছি, ধন্য হয়েছি। তবু বলবো পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ তাঁর মনের মধ্যে জাগরূক ছিলো না, ছিলো মহাকর্মী বা মহাদেবীর আদর্শ। আইনস্টাইন এ-যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী কিন্তু সমাজসেবীরূপে তাঁর সাধনা ও সিদ্ধি নগণ্য। অবশ্য জ্ঞানকর্ম ও শিল্প-রচনাও একপ্রকার সমাজসেবা, তবু সাধারণত সমাজসেবা বলতে আমরা আরো প্রত্যক্ষ সেবা বুঝি। গান্ধিজী নাকি একবার অধ্যাপক রামনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,আপনার গবেষণাগারে যেসব অতি-সূক্ষ্ম কাজ হচ্ছে তাতে কি আমাদের গরীবদের গ্রাসাচ্ছাদনের কিছু সুরাহা হবে। রামন উত্তর দিয়েছিলেন, ঠিক সেই লক্ষ্যটা সামনে রেখে তো আমরা বৈজ্ঞানিক গবেষণা করছি না। গান্ধিজী হতাশ কণ্ঠে বললেন, তবে সে-গবেষণার বিশেষ কোনো মূল্য নেই আমার কাছে।

'চিত্রা' কাব্যের জীবনদেবতার কথা মনে পড়ে। জীবনদেবতার কল্পনায় বহুত্ব ছিলো, প্রত্যেক মানুষের জীবনদেবতা স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত। সে কাব্যে ও তার ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ শুধু নিজের জীবনদেবতার কথাই বলেছিলেন; সর্বজনের জীবনদেবতার কথা ভাবেননি। জীবনদেবতা ও মানস-সুন্দরী (কাব্যলক্ষ্মী) খুব কাছাকাছি ধারণা, তবু পৃথক। রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা শুধু যে তাঁর কাব্য-রচনার পরম আদর্শ ও অনুপ্রেরণারূপে কল্পিত, তা নয়: "এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচন করিয়া চলিয়াছেন তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি জীবনদেবতা নাম দিয়াছি।" আরো স্পষ্ট ক'রে বলছেন, "চিত্রা কাব্যে আমি একদিন বলেছিলুম আমার অন্তর্যামী আমাকে দিয়ে যা বলাতে চান আমি তাই বলি, কথাটা এই রকম শুনতে হয়। কিন্তু চিত্রায় আমার যে উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে সেটি অন্য

শ্রেণীর। আমার একটি যুগ্মসত্তা আমি অনুভব করেছিলুম যেন যুগ্মনক্ষত্রের মতো, সে আমারই ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত, তারই আকর্ষণ প্রবল। তারই সংকল্প পূর্ণ হচ্ছে আমার মধ্য দিয়ে, আমার সুখে-দুঃখে আমার ভালোয় মন্দয়। এই সংকল্প-সাধনায় এক আমি যন্ত্র এবং দ্বিতীয় আমি যন্ত্রী হতে পারে, কিন্তু সংগীত যা উদ্ভূত হচ্ছে—যন্ত্রেরও স্বকীয় বিশিষ্টতা তার একটি প্রধান অঙ্গ। পদে পদে তার সঙ্গে রফা করে তবেই দুয়ের যোগে সৃষ্টি।"

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে জীবনদেবতা জগদীশ্বর নন, সর্বজনের দেবতাও নন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিজের 'যুগ্মসত্তা' ব'লে অভিহিত করেছেন, অর্থাৎ নিজের আদর্শ-স্বরূপ; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক ব্যক্তিটি যে-শক্তি যে-সম্ভাবনা যে-সুযোগ নিয়ে জন্মেছেন, সেগুলির সম্যক্ বিকাশ যদি ঘটে তবে তিনি যা হ'তে পারেন তাঁকেই বলছেন তাঁর জীবনদেবতা। পদে-পদে সন্দেহ করছেন, আশঙ্কা করছেন, জীবন-দেবতাকে বুঝি তিনি খুশি করতে পারেননি, তাঁর সূচিত পথে বেশি দূর এগুতে পারেননি।

জীবনদেবতার কল্পনায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্থান আছে, বেশ বড়োরকমের স্থান। এতই বড়ো যে দেবতাকে সুদ্ধ individualize করা হচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তির দেবতা স্বতন্ত্র, একান্ত তারই দেবতা, সর্বলোকের দেবতা নন। স্বকীয় জীবন-দেবতার প্রতি রবীন্দ্রনাথ গভীর অনুরাগ প্রকাশ করেছেন, অন্যদিক থেকেও ব্যতিহারী (reciprocal) তীব্রতা অনুভব করেছেন নিজের মনের গোপন কোণে; দাম্পত্য প্রেম ও মিলন রজনীর চিত্রকল্পকে ভিত্তি ক'রে রচনা করেছেন "জীবন-দেবতা" নামক কবিতাখানি।

দুঃখ সুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিত দ্রাক্ষা সম।

কিন্তু জীবনদেবতার প্রতি যে-ভাব ব্যক্ত হয়েছে এই কবিতায় এবং জীবনদেবতা বিষয়ে অন্যান্য কবিতায়, তাকে ঠিক মরমিয়া ভাবের কোঠায় ফেলা যায় না, ভক্তির এমন-কিছু আমেজ ঘটেনি এ-প্রেমে; এ যেন নারীপুরুষ-প্রেম এবং ভক্তভগবান-প্রেমের মধ্যবর্তী এক অভিনব অনুভূতির স্তর।

'গীতাঞ্জলী'তে রবীন্দ্রনাথ এ-স্তর পেরিয়ে পরিপূর্ণ ভক্তির স্তরে পৌঁছেছেন, যদিও অধিকাংশ গানে নারীপুরুষ-প্রেমের আধারেই ভক্তিরস ঢালা হয়েছে। 'গীতাঞ্জলি'র প্রথম গানেই অন্যবিধ অনুরাগের সুর লেগেছে, ইঙ্গিত তার স্পষ্ট; কবি যাঁর চরণ-ধুলার তলে মাথা নত করতে চান তাঁকে তাঁরই পরিপূর্ণীকৃত যুগ্মসত্তা বা তাঁর বিশিষ্ট ব্যক্তিস্বরূপের পরিপূর্ণতার আদর্শ ভাবা যায় না। রামমোহন রায় অথবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে একমেবাদ্বিতীয়ম্ আদি স্রষ্টা এবং সর্বলোকের বিধান-

কর্তা পরমেশ্বরের বন্দনা করতেন, 'গীতাঞ্জলি'তে তিনিই অবতীর্ণ। তৎসত্ত্বেও এই ত্রিভুবনেশ্বর, এই রাজাধিরাজ,এই সর্বমানবের জীবননাথের সঙ্গে 'গীতাঞ্জলি'র কবি নিজেকে বাঁধতে পেরেছেন, পূজা নয়, প্রেমের বন্ধনে। এ-প্রেম প্রেমাস্পদকে যতোই উঁচুতে তুলে ধরুক, ভাবনায় যতো খুশি বিস্তার বা গভীরতা সঞ্চার করুক তাতে ভুল করার এবং পরে ভুল ভাঙার কোনোই আশঙ্কা নেই, কারণ প্রেমের পাত্র তো রক্তমাংসের সামান্যা নারী নয় ; পাত্র স্বয়ং ভগবান সর্বগুণাধার, সর্ব-দোষমুক্ত, সর্বসীমারহিত, ইংরেজিতে, যাকে বলে Perfect Being। অথচ কবির কল্পনায় ইনি সামান্য এক প্রেমিক ভক্তকেও ভালোবাসেন, রাজার রাজা হয়েও তার কাছে ভিখারী সেজে আসেন, তার জন্য চোখের জল ফেলেন। তিনখানি গীতাখ্য-সংকলনে আমরা এই অভিনব আধ্যাত্মিক প্রেমের বা সংরাগরক্ত ভক্তির অতুলনীয় গীত-সুধারস পান করলাম।

ভুল ভাঙার কথাটি তুলেছি 'মানসী' কাব্যের রেশ টেনে। 'মানসী'র প্রথম দুটি কবিতার শিরোনাম "ভুল" এবং "ভুল ভাঙা"। নারীপুরুষের প্রেমের মধ্যে ভুল অনিবার্য। প্রেমের প্রথম উচ্ছ্বাসে প্রেমাস্পদ বাস্তবিক যা তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর এবং মহৎ ব'লে প্রতিভাত হয় প্রেমিকের চোখে। এটাকে মোহ বলা যেতে পারে, কিন্তু মোহ-ভঙ্গের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এর চেয়ে বড়ো সত্য কিছু নেই প্রেমিকার হৃদয়-মনে। "নারীর উক্তি" ও "পুরুষের উক্তি" সংলাপধর্মী কবিতাদ্বয়ে প্রেমের একটা শাশ্বত দিক বা দুর্বলতা উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। নারীর ব্যথিত প্রশ্ন :

> কেন আনো বসন্ত নিশীথে
> আঁখিভরা আবেশ বিহ্বল
> যদি বসন্তের শেষে শ্রান্তমনে ম্লান হেসে
> কাতরে খুঁজিতে হয় বিদায়ের ছল ?

পুরুষের উত্তর :

> প্রাণ দিয়ে দেবীপূজা
> চেয়ো না, চেয়ো না তবে আর।

খানিকটা ভুল উত্তর, কারণ নারী সত্যি-সত্যিই দেবী-পূজা চায়নি ; সে তার দোষ-গুণ নিয়ে যা আছে তাকে ঠিক তাই জেনেও প্রেমিক যেমন আপন সমস্ত হৃদয়ে তাকে স্থান দিক সারা জীবন ভ'রে—এই ছিলো তার একান্ত মনোবাঞ্ছা !

> এখন হয়েছে বহু কাজ
> সতত রয়েছ অন্য মনে।
> সর্বত্র ছিলাম আমি, এখন এসেছি নামি
> হৃদয়ের প্রান্তদেশে, ক্ষুদ্র গৃহকোণে।

কিন্তু বহু কাজ তো আসবেই মানুষের জীবনে। শুধু যে জীবিকা উপার্জনের জন্য তাকে দৈনিক আট-দশ ঘণ্টা সময় ও অনেকখানি মন দিতে হয় তা-ই নয়, আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্যও সাধনা করতে হয় তার চেয়েও অধিক পরিমাণ মনো-

নিবেশ সহকারে। কারো সমস্ত হৃদয় জুড়ে চিরজীবনের মতো আসন অধিকার করার দাবিটাই ভুল, প্রেমের প্রাথমিক ভুলে।

আসলে 'মানসী'র প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যে একটা অবাস্তবতার আমেজ রয়েছে। যুবক রবীন্দ্রনাথ হয়তো নিজেই বুঝতে পারেননি যে তাঁর হৃদয়ে এমন এক বিরাট অনুভূতি জেগেছিলো যার পরিতৃপ্তি ক্ষুদ্র মানবীর দ্বারা সম্ভবপর নয়। তিনি প্রেমাস্পদের মধ্যে খুঁজছিলেন এমন এক পরিপূর্ণতা, এমন অসীমতা যা মানবীর সীমানা ছাড়িয়ে যায় বহুদূরে।

বুঝতে পারেননি কেন বললাম, বুঝতে তো পেরেইছিলেন। এক পত্রে লিখছেন: "ভালো করে দেখতে গেলে 'মানসী'র ভালোবাসার অংশটুকু কাব্যকথা—বড়োরকমের লেখা মাত্র।" চিঠির এইটুকু পড়লে সন্দেহ হ'তে পারে যে রবীন্দ্রনাথও 'মানসী'র প্রেমের কবিতায় কোনো আধুনিক কবির মতো কবিতার আঙ্গিক নিয়ে, ভাষা নিয়ে বাক্‌-প্রতিমা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন, প্রেমানুভূতি যার অবলম্বন-মাত্র। তা কিন্তু নয়। একটা বড়োরকমের ভাব তাঁর মনের গভীরে দানা বেঁধেছে, প্রকাশের মাধ্যম খুঁজছে; তার চেয়েও আশ্চর্য কথা, খুঁজছে ভাবের উপযুক্ত পাত্র। সে-পাত্র ঈশ্বর ভিন্ন আর কী হ'তে পারে। আমি বলতে চাই রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরের সন্ধান পেয়ে তাঁর প্রেমে পড়েননি, প্রেমই তাঁকে ঈশ্বরের সন্ধান দিয়েছে। পিতৃদেব বা ব্রাহ্মসমাজ থেকে পাওয়া ঈশ্বরের কথা বলছি না এখানে, বলছি তাঁর আপন অন্তরের নিভৃত উপলব্ধির মধ্যে ব্যাকুল বেদনার মধ্যে আবিষ্কৃত ঈশ্বরের কথা। পূর্বোদ্ধৃত পত্রের পরবর্তী অংশে লিখছেন: "একেই বলো ভালোবাসা? আমার ভালোবাসার লোক কই? আমি ভালোবাসি অনেককে। কিন্তু 'মানসী'তে যাকে খাড়া করেছি সে মানসেই আছে, সে আর্টিস্টের হাতে রচিত ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা। ক্রমে সম্পূর্ণ হবে কি?" না হবে না; 'শেষ লেখা'র শেষ কবিতাতেও হয়নি।

'গীতাঞ্জলি'তে এসে রবীন্দ্রনাথ কি পেলেন সেই পরম সত্তাকে যিনি স্পিনোজার ভাষায় "the perfect object of a perfect love?" 'অনবদ্য প্রেম' কথাটা এখানে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ 'মানসী'তে রবীন্দ্রনাথ শুধু প্রেমপাত্রের অপূর্ণতার কথা ভেবে বিষণ্ণ বোধ করেননি, প্রেমের স্বাভাবিক অপূর্ণতার কথাও তাঁর মনে সমানে বিঁধেছে। নারীপ্রেমকে অপবিত্র করে প্রধানত কামনার অপ্রতিরোধ্য আমেজ—এটা রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন মত, আমার মত মোটেই তা নয়। তরুণ কবি কামকে প্রেমের রাহু জ্ঞান করেছিলেন, এমন রাহু যার গ্রাস থেকে প্রেমের কখনো মুক্তি নেই:

> বুকের ভিতর ছুরির মতন
> মনের মাঝারে বিষের মতন
> রোগের মতন শোকের মতন
> রব আমি অনিবার।

প্রেমের মায়াবী স্পর্শে রূপান্তরিত কাম প্রেমকে আরো নিবিড় ঐশ্বর্যবান ক'রে তুলতে পারে, প্রেমের রাহু না-হয়ে তার পরিপূর্ণতাও হ'তে পারে (অর্থাৎ রক্তমাংসের মানুষের হৃদয়বৃত্তির পক্ষে যতোটা পূর্ণতালাভ সম্ভব) এ-কথা রবীন্দ্রনাথ ভাবেননি, অন্তত যৌবন হারাবার আগে পর্যন্ত ভাবেননি। 'মানসী'র "নিস্ফল কামনা"তে বলছেন "ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব"; নারীদেহকে কিংবা তার সমগ্র ব্যক্তিস্বরূপকে একটি শতদল পদ্মের সঙ্গে তুলনা ক'রে লিখেছেন, "সুতীক্ষ্ণ বাসনার ছুরি দিয়ে / তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে।"

এখানে প্রেমের অন্য-একটি অপূর্ণতার কথা এসে পড়েছে যেটা আমার মতে আরো বাস্তবিক এবং বিনাশক অপূর্ণতা। তাকে প্রেমের possessive বা সর্বগ্রাসী ভাব বলা যেতে পারে। প্রেমিক প্রায়ই চায় প্রেমাস্পদকে আর-সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে, আর সব-কিছু থেকে সরিয়ে নিয়ে নিজের একান্ত এবং সম্পূর্ণ দখলে আনতে, তার ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব ক'রে তার ব্যক্তিস্বরূপের স্বকীয় স্ফুরণের ক্ষেত্রকে অগ্রাহ্য ক'রে শুধু নিজের দিকেই, নিজের উদ্দেশেই তাকে প্রস্ফুটিত করতে। মানতে চায় না যে

বিশ্বজগতের তরে, ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি।

স্বামী চায় স্ত্রীকে সম্পূর্ণ নিজের মনের মতোটি ক'রে গ'ড়ে নিতে; কখনো-কখনো বিপরীত চেষ্টাও দেখা যায়। দু-জনই যদি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়—হবে না-ই বা কেন—তা হ'লে ব্যক্তিত্বের সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং সংঘাতের আঘাতে-আঘাতে প্রেম ক্ষয় হ'তে থাকে।

কামনা এবং সর্বগ্রাসিতা—এই দুই রাহুর কবল থেকে ঈশ্বরপ্রেম মুক্ত। অনবদ্য প্রেমের অনবদ্য পাত্র ঈশ্বর। প্রেমের পথে পরিপূর্ণতা সন্ধানের এইখানেই পরিসমাপ্তি ঘটা উচিত ছিলো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এখানে পৌঁছেও থামতে পারেননি।

'গীতাঞ্জলি' পর্বে "মধুর তোমার শেষ যে না পাই" গোছের কাব্যানুভূতি সম্ভব হয়েছিলো, কারণ ঐ ক'টি বছর কবি রবীন্দ্রনাথ সত্যি-সত্যি চোখ মেলে জগতের দিকে তাকাননি। রূপসী প্রকৃতি অবশ্য ছিলো তাঁর কল্পনায় উজ্জ্বল, কিন্তু দুঃখ-ভারনত জীবনসংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত সাধারণ মানুষ ছিলো না। (মাত্র চার-পাঁচটি গানে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়।) কবি কি সুদর্শনার মতোই দীর্ঘকাল কাটালেন অন্ধকার ঘরের অদৃশ্য রাজাকে তাঁর স্বরূপে না-জেনে নিজেরই আবিষ্ট কল্পনার চোখে তাঁকে পরম মধুর সুন্দর ও শুভরূপে দেখে? "আলো কই। এ ঘরে কি এক দিনও আলো জ্বলবে না"—'গীতাঞ্জলি'র কবির মনেও কি এমন কোনো আক্ষেপ তীব্র বেদনার মতো বেজেছিলো, না কি তিনি বোধ করছিলেন চারিদিকই আলোয় আলোকময়—যদিও সে-আলো সত্যের এক পিঠেই পড়েছিলো, অন্য পিঠ ছিলো পক্ষপাতী প্রেমের ছায়ায় ঢাকা। হয়তো বুঝতে পারেননি যে

দিনের আলোয় সংসারের মাঝখানে তাঁর হৃদয়ের রাজাকে দেখলে তিনি সহ্য করতে পারবেন না। ঐ-সময়ের গীতিকবি গদ্য-নাট্যকার অপেক্ষা যেন একটু কাঁচা বয়সের, একটু নবযুবতী-স্বভাবের মানুষ ; শুধু বাঁশি শুনেই "মন প্রাণ যাহা ছিল" সব দিয়ে ফেলেছেন।

অবশেষে রাজপ্রাসাদের লেলিহান অগ্নিশিখার আলোয় অন্ধকার ঘরের রাজাকে দেখে ফেললেন একদিন। এক বীভৎস আগুন জ্ব'লে উঠেছিলো পশ্চিম মহাদেশ জুড়ে, তার ঝলসানো তাপে অল্পবিস্তর দগ্ধ হ'লো সারা দুনিয়ার মানুষ। তখন দুঃখের ও পাপের অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ দেখে শিউরে উঠলেন ভক্ত-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ। প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে প্রথম বুঝতে পারলেন যে-পরান-বঁধুর সঙ্গে "আমার হিয়ায় চলেছে রসের খেলা," জগৎ-সংসারে তাঁর আবির্ভাব কতো নিষ্ঠুর, কী ভয়ংকর! সইতে না-পেরে পালিয়ে গেলেন 'পলাতকা'য়, 'শিশু ভোলানাথ'-এ, 'পূরবী'-তে, 'মহুয়া'য় ; আবার মানুষের ছোটোখাটো তিক্ত-মধুর সুখদুঃখের ছবি আঁকলেন আরো পাকা হাতের সূক্ষ্মতর তুলিকায়। কিন্তু কোথায় পালাবেন তিনি? শুধু হৃদয়ের বাসর-শয়নে হৃদয়স্বামীকে পেয়ে তো তৃপ্ত হ'তে পারেন না রবীন্দ্রনাথ, তিনি যে কবি, যেমন রূপদক্ষ তেমনি সত্যদ্রষ্টা। জগৎ-সংসারের অভ্রভেদী নিষ্ঠুরতা ও ভয়ংকরতা ভেদ ক'রে তাঁকে খুঁজতে হবে ভগবানের স্বাক্ষর, শুধু রংরেজিনী প্রকৃতির রূপে নয়, অগুন্তি দুঃখী মানুষের বুকেও। সেই খোঁজার বেদনা আছে শেষ পর্বের কবিতায়, ভাবনা সংকলিত হয়েছে আলোচ্য দুটি বক্তৃতামালায়।

ভগবান যেন দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলেন। "মানুষের সত্তায় দ্বৈধ আছে"—এটা সেই মৌল সত্যের উল্টো পিঠ। এক পিঠে প্রেমের দেবতা, সত্য শিব সুন্দরের দেবতা—কিন্তু তিনি সর্বশক্তিমান নন, "একটা আন্তরিক আহ্বান, একটা নিগূঢ় নির্দেশ" মাত্র। মানুষকেই তার সীমিত শক্তি প্রয়োগ ক'রে সেই দৈবী আহ্বান জগৎময় বাস্তবায়িত ক'রে তুলতে হবে। প্রকৃতির বাঁধন কাটবে, সে কি এমনি শক্তিমান? অথচ প্রকৃতির দাস হয়েও তো মানুষ থাকতে পারে না। অন্যদিকে "বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে, গ্রহচন্দ্রতারকায়"। অপরিমিত শক্তির ছড়াছড়ি এখানে, অবিরত সৃষ্টির লীলাক্ষেত্র এই পরম জাগতিক সত্তা। কিন্তু তাঁকে ভালো কিংবা মন্দ, দয়ালু কিংবা নির্দয় কিছুই বলা যায় না।

পরম মানবিক সত্তা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলছেন: "হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর পীঠস্থান …এই মনের মানুষ, এই সর্বমানুষের জীবনদেবতার কথা বলতে চেষ্টা করেছি *Religion of Man* বক্তৃতাগুলিতে।" শেষের কথাটা ("সর্বমানুষের জীবনদেবতা") আমার কাছে খুব পরিষ্কার ঠেকছে না। আগেই বলেছি 'চিত্রা'র কবির মতে প্রত্যেক মানুষের জীবনদেবতা স্বতন্ত্র—তারই বিশিষ্ট ব্যক্তিসত্তার আধারে পরিপূর্ণতার যে-আদর্শ বিধৃত ও সক্রিয়। সর্বজনীন জীবনদেবতা কি তবে এইসব অসংখ্য ব্যক্তিগত জীবনদেবতার সংযোজনা কিংবা সমন্বয়? কখনো মনে হয় রবীন্দ্রনাথ

"পরম মানবিক সত্তা" বলতে বুঝেছিলেন এমন এক পরম পুরুষ যিনি একাধারে পরম ধ্যানী-জ্ঞানী, পরম প্রেমিক, পরম কল্যাণস্বরূপ। মনে রাখা দরকার যে ভগবান—যে-ভগবানের কথা উক্ত দুটি বক্তৃতামালায় বলা হয়েছে—কেবলমাত্র ভক্তের ভাব, দার্শনিকের তত্ত্ব বা কবির কল্পনা নন; তিনি খুবই গভীর অর্থে সত্য। তিনি সত্য কোটি-কোটি মানুষের ফলপ্রসূ প্রেরণার মধ্যে, তন্নিষ্ঠ সাধনার মধ্যে, উদ্দীপ্ত কর্মের মধ্যে। অথচ 'সর্বমানুষের জীবনদেবতা' বা সর্বপ্রকার মানবিক সৎগুণের পরাকাষ্ঠা তো সত্য নন কোনো সাধারণ মানুষের, এমন-কি কোনো অসাধারণ মহাপুরুষের সাধনায়। পনেরো-ষোলো বছর বয়সের অস্থিরমনা তরুণ-কিশোর এমন বিরাট সর্বময় আদর্শের কথা লালন করতেও পারে তার অনভিজ্ঞ চিত্তে; কিন্তু একটু মানসিক পরিণতি লাভ করলেই সে কিঞ্চিৎ হতাশার সঙ্গে উপলব্ধি করে যে একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন, গান্ধি ও লেনিন হওয়ার সাধনা হাস্যকর। মানবিক পরোৎকর্ষের আদর্শ বহুবিচিত্র, বহুধাবিভক্ত; সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে তাকে নিজের ব্যক্তিসত্তার এবং সামাজিক আবেষ্টনের পরিধিতে সীমিত পরোৎকর্ষের ভাবচিত্রটি বেছে নিতেই হবে। অর্থাৎ তাকে সর্বজনীন জীবন-দেবতার বায়বীয় স্তর থেকে নেমে আসতে হবে কঠিন মাটির উপর, তার একান্ত ব্যক্তিগত জীবনদেবতার প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে; তবেই তার বাস্তবনিষ্ঠ সাধনা অর্থবান হবে, সার্থকতার দিকে এগুতে পারবে।

নাকি রবীন্দ্রনাথ কঁৎ-এর সঙ্গে একমত হয়ে ভক্তি ও পূজার পাত্র ঠাউরেছিলেন সেই মহান সত্তাকে যাঁর বর্ণনায় বলেছেন: "সব মানুষকে নিয়ে, সব মানুষকে অতিক্রম করে, সীমাবদ্ধ কালকে পার হয়ে একা মানুষ বিরাজিত।" কঁৎ বলে-ছিলেন, "sum-total of all dead, living or future human beings"-এর কথা। অর্থাৎ শুধু অতীত ও বর্তমানকালের বাস্তব মনুষ্যগোষ্ঠী পূজনীয় নয় কঁৎ কিংবা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে। দেখা যাচ্ছে যে অজাত মানুষ, কোটি-কোটি বৎসর পরের পূর্ণতাপ্রাপ্ত মানুষ খুব বড়ো অংশ অধিকার ক'রে আছে রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম'-এ, কঁৎ-এর 'religion of humanity'-তে! কঁৎ বিজ্ঞানের উপর সরল অপরিমেয় বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, এবং বিজ্ঞান তখনো মনুষ্যজাতি ও সৌরজগৎ বিষয়ে হতাশার বাণী ঘোষণা করেনি। কঁৎ-এর ভাবনায় হিউম্যানিটির ঊর্ধ্বমুখী অনন্ত যাত্রার পথে কোনো বিঘ্ন ছিলো না; তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে বিজ্ঞানের অবাধ উন্নতির ফলে মানুষের শক্তি দেবতুল্য হবে, প্রকৃতি হবে তার দাসী। রবীন্দ্রনাথও অনুরূপ সরল আশাবাদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ১৯১৬-১৭ সালে; *Personality* শীর্ষক বক্তৃতা-সংগ্রহে বলেছেন: "The spiritual world which is being built of men's life and that of God, will pass its infancy of helpless falls and bruises, and one day will stand firm in its vigour of youth glad in its own beauty and, freedom of movement."

দীর্ঘ-দীর্ঘ কাল অতিবাহিত হ'লে পর এমন এক যুগ আসবে এই পৃথিবীরই বক্ষের উপর যখন সব ভুল ভ্রান্তি মূঢ়তা ইতরতা ও হিংস্রতা ধুয়ে মুছে যাবে, সব মানুষের বুদ্ধি আলোকোজ্জ্বল, হৃদয় পবিত্র, এবং কর্ম নিষ্কলুষ হবে—এমন আশা করা যায়, করাই ভালো। "শিশুতীর্থ"-এর শেষ ক'টি পঙ্‌ক্তিতে এই নবজাতক হিউম্যানিটির জয়গান করা হয়েছে। শুধু একজন যীশু খ্রীষ্ট বা একজন গৌতম বুদ্ধ নয়, ঘরে-ঘরে তাঁদের মতো মানুষ জন্মাবে। কিন্তু সে তো লক্ষ বা কোটি বছর পরের কথা। মানবযাত্রী সেই শিশুতীর্থের দিকে এগিয়ে চলেছে (চলেছে তো ?) এবং ক্রমশই বুঝতে পারছে বড়োই দীর্ঘ কঠিন এ-পথ, ক্ষুরের তীক্ষ্ণীকৃত অগ্রভাগের চেয়েও দুরত্যয়।

ইতিমধ্যে বিজ্ঞান সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছে। আমাদের এই বেহিসাবী খরচে-স্বভাব মার্তণ্ডদেব অপরিমেয় শক্তিকণা নিরন্তর চারিদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নষ্ট করছেন, তার অব্যর্থ পরিণামস্বরূপ এমন একদিন আসবেই যখন সূর্য এতটা নিরুত্তাপ হয়ে যাবে যে পৃথিবীতে কোনো প্রাণীর, অন্তত উন্নত স্তরের কোনো প্রাণীর পক্ষে প্রাণধারণ অসম্ভব হয়ে উঠবে। তার অবশ্য দেরি আছে, তবু খাঁড়াটি ঝুলছে মনুষ্যজাতির ঘাড়ের উপর, অপ্রতিরোধ্য গতিতে নেমে আসছে খুব ধীরে-ধীরে। তাছাড়া নাক্ষত্রিক অ্যাক্সিডেন্ট তো আছেই। নানা আভ্যন্তরীণ শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতে কোনো-কোনো তারকা ফেটে দুখানা কি দশখানা হয়ে গেছে। সূর্যেরও সেই দশা হ'তে পারে। তখন মা বসুন্ধরাও সন্তানপালনের যোগ্যতা হারাবেন : উপবৃত্ত-বর্ত্ম ধূমকেতুর গতিবিধির হিসাব আমরা রাখি, কিন্তু প্যারা-বোলিক বর্ত্মে ধাবমান কোন্ রহস্যাবৃত কমেট কখন যে সৌরমণ্ডলে প্রবেশ করে বা করবে, তা জ্যোতির্বিজ্ঞানীর গণনার বাইরে। পৃথিবীর খুব কাছে এসে পড়লে ধাক্কা লাগা সম্ভব। তার আগেই আমরা সার্থকতার তীরে পৌঁছে যাবো কি ? যদি-বা যাই, সে ভঙ্গুর সার্থকতার মূল্য কতোটুকু ?

সর্বমানবিক ধ্বংসের জন্য যে শুধু গ্রহনক্ষত্রই দায়ী হবে এমন কোনো কথা নেই। আমাদের তিন ক্ষমতামদমত্ত সুপার পাওয়ারের হাতে যে-পরিমাণ পার-মাণবিক শক্তি তুলে দিয়েছে বিজ্ঞান, তার শতাংশের একাংশ শুভবুদ্ধি দেয়নি। প্রত্যেকের চেষ্টা অপর দুই মহাসুরের মধ্যে কেমন ক'রে যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়া যায়। বাধলে কিন্তু তিন মহাশক্তিই তাতে জড়িয়ে পড়বে। দিনকতক বেপরোয়া হাই-ড্রোজেন বোমা ছোঁড়াছুঁড়ি চললে কোনো মানুষই বেঁচে থাকবে না এ-পৃথিবীতে ; দুর্ভাগ্যক্রমে যারা বেঁচেও থাকবে তারা ইতর প্রাণীতে পরিণত হবে জেনেটিক মিউটেশানের ফলে।

পরম মানবিক সত্তার আহ্বান পৌঁছেছে মানুষের কানে, মানবযাত্রী চলেছে দলে-দলে তারই উদ্দেশে। কিন্তু পথের বাঁকে-বাঁকে বিঘ্ন পর্বত-প্রমাণ। সে-বিঘ্ন সরাবার সাধ্য নেই পূর্ণপুরুষের বা মনের মানুষের। তিনি শক্তির দেবতা নন।

শক্তির দেবতা যিনি, সেই পরম জাগতিক সত্তা (যাঁকে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বদেবতা, God of cosmic forces-ও বলেছেন) তিনি শুভাশুভ-বোধরহিত। দুই দেবতার প্রকৃতি এতই ভিন্ন যে কেমন ক'রে তাঁদের মধ্যে পূর্ণ সহযোগ ঘটবে তা আমরা বুঝতে পারি না। পূর্ণ সহযোগ মানেই এখানে ঐক্য। শক্তির দেবতা এবং শুভের দেবতা এক না-হ'লে আমাদের ভক্তি কোথাও দানা বাঁধতে পারে না, অর্থাৎ ভগবান কথাটা তার সম্যক্ অর্থ হারায়। যে-দেবতার "রথ ধাবমান, কিন্তু এখনো এসে পৌঁছননি", এবং পৌঁছনো নির্ভর করছে অন্য দেবতার মর্জির উপর (কোনো মর্জি কি আছে তাঁর ? তিনি উদাসীন, নির্মম), তাঁকে ভগবান বলি কেমন ক'রে। পক্ষান্তরে, যে-দেবতার অনন্ত সৃষ্টিক্ষেত্রে মঙ্গল-অমঙ্গল বিষয়ে কোনো অঙ্গীকার নেই, যাঁর বিধানে নিষ্পাপ শিশু রোগ-যন্ত্রণায় ছটফট করে এবং ঘোরতর পাপী সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে দিনযাপন করে, তাঁকেই বা আমরা ভগবান বলবো কোন্ মুখে !

অথচ দুই দেবতা এক হ'লে সৃষ্টি এমন বিকলাঙ্গ, মানুষ, অধিকাংশ মানুষ, এমন জড়-বুদ্ধিসম্পন্ন, এমন সংকীর্ণ স্বার্থান্বেষী এবং ফলত আত্মহননকারী হ'লো কেমন ক'রে ? চারিদিকে দুঃখ ও পাপের বিরাট স্বরূপ দেখে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' পর্বের ঈশ্বর-ভাবনায় চিড় ধরলো (যে, ঈশ্বর একাধারে পরম শক্তি ও পরম প্রেম, যাঁর অসীমে কিছুই হারায় না, যিনি দুঃখ দিয়ে দুঃখী সন্তানকে কোলে টেনে নেন) ; 'মানুষের ধর্ম' ও *The Religion of Man*-এ এমন ঈশ্বরের সন্ধান করলেন যিনি জগৎ-জোড়া দুঃখ ও পাপের জন্য দায়ী নন। যাঁর সন্ধান পেলেন তিনি একটি "নিগূঢ় নির্দেশ" মাত্র। সে-নির্দেশ মেনে মানুষকে চলতে হবে আপন শক্তির উপরই ভর ক'রে। এই ক্ষীণ শক্তির সঙ্গে মাঝে-মাঝে বিরোধ বাধে বিরাট জাগতিক শক্তির। 'মনের মানুষ'-এর সন্ধান তো পাওয়া গেলো, কিন্তু তিনি এ সব সংকট-মুহূর্তে অসহায়। সংকটাপন্ন মানুষ হৃদয়ের মধ্যে একদিকে শুভ ও সুন্দরের টান অনুভব করে, কিন্তু অন্যদিক থেকে প্রবলতর ঠেলা পেয়ে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে মাটিতে। তার অসহায় পতন এবং গুরুতর আঘাতের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, কিন্তু ভরসা দিতে পারছেন না যে এ-সবের অবসান হবেই একদিন। আর যদি-বা হয়, তবে এত লক্ষ বছর ধ'রে যে অগুনতি মানুষ শুধু প্রাণধারণের উদয়াস্ত খাটুনির মধ্যে, সেই খাটুনির তিক্ত গ্লানির মধ্যে, অত্যাচারীর নিপীড়ন ও অসম্মানের মধ্যে, প্লেগ কলেরা কর্কট বসন্ত রোগে ভুগে-ভুগে মৃত্যুমুখে পতিত হ'লো তাদের অর্থহীন ব্যর্থ জীবনকে কি আমরা স্রেফ খরচের খাতায় লিখে রাখবো, দূর ভবিষ্যতে যে শুভ সুন্দর সার্থক মনুষ্যগোষ্ঠী জন্মলাভ করবে তাদেরই প্রস্তুতিপর্বে এরা কি কেবল বলিদান, আর কোনোই মূল্য নেই তাদের জন্ম-মৃত্যুর ? স্বভাবতই 'গীতাঞ্জলি'র রাজার রাজা-র চেয়ে 'মানুষের ধর্ম'-এর মনের মানুষ আরো ক্ষণস্থায়ী হলেন রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর-ভাবনায়। কেউ একেবারে মুছে গেলেন না তাঁর মানস-পট থেকে, কিন্তু চিত্রটি বছরে-বছরে ঝাপ্সা হয়ে এলো।

আবার ঘনায় অন্ধকার। নিদারুণ পথ আরো কোথায় নিয়ে যাবে আমার পথিক কবিকে, তাঁর "হালভাঙা পালছেঁড়া ব্যথা চলেছে কোন্ নিরুদ্দেশে?" পথের শেষ কোথায় নাই-বা জানলাম, কিন্তু সে-পথে মানবযাত্রীদল চলেছে চরম সার্থকতার তীর্থের দিকে না অন্তিম ব্যর্থতার গহ্বরের মুখে—এ-বিষয়ে ভরসা দেবে কে? রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আশা ছাড়েননি, মানুষে বিশ্বাস হারান-নি। কিন্তু "হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার"—এমন চরম শুভসংকল্প-ময় ও অনন্ত শক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়েছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ। সেইখানে রয়েছে তাঁর শেষ কাব্য-দশকের ট্র্যাজিক-চেতনার উৎস। আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান কবি হলেন পৃথিবীর মহত্তম লিরিক কবি। "সমুখে শান্তি পারাবার" না "সম্মুখে ঘন আঁধার"—জেনে গেলেন কি সাধক রবীন্দ্রনাথ? প্রশ্নটি আমাকে ব্যাকুল করে; তিনি যে আমার মতন শত-শত পান্থজনের সখা। রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব আমি কখনোই বলতে পারিনি, পারবোও না; কিন্তু মনের গভীরে, কখনো-বা অবচেতনে, সর্বদাই একটি সুর বাজে—"চিরসখা, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না"।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যকথা অধিকাংশই উদ্ধৃত 'মানুষের ধর্ম' থেকে, দু-এক জায়গায় *The Religion of Man* এবং প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-জীবনী' প্রথম খণ্ড থেকে।

শেষ পর্বে যে নতুন ভাব ও অনুভবের পরিচয় পাই আমরা, ট্র্যাজিক চেতনা যার প্রধান বৈশিষ্ট্য, তার প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে 'পরিশেষ' থেকে; রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সত্তর ছুঁয়েছে। কিন্তু তার পূর্বাভাস 'পূরবী'তেও দেখতে পাওয়া যায়, এমন-কি 'শিশু ভোলানাথ'-এও। শেষোক্ত কাব্যের সূচনাতেই নাম-কবিতাটি প'ড়ে আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই, কারণ বইখানি মোটের উপর শিশুপাঠ্য না-হোক্‌, বালক-ভোগ্য ক'রেই রচিত। ছোটো ছেলেরা নিজেদের দামী খেলনা নিজেরাই ভাঙে, ভাঙা টুকরোগুলি এদিকে-সেদিকে ছুঁড়ে ফেলে নিতান্ত খেলাচ্ছলেই। তাদের অবশ্য জানবার কথা নয় কোন্‌ খেলনার দাম কতো। বিশ্বদেবতাও কি তা-ই করছেন তাঁর সবচেয়ে সুন্দর খেলনা মানুষকে নিয়ে, তিনিও কি বোঝেন না এই খেলনার মূল্য মর্যাদা?

আপন বিভব
আপনি করিস নষ্ট হেলাভরে,
প্রলয়ের ঘূর্ণ চক্র'পরে
চূর্ণ খেলেনার ধূলি উড়ে দিকে দিকে।
... ...
অকিঞ্চন, তোর কাছে কিছুরই তো কোনো
মূল্য নাই।

কবিতাটি এমন সহজ হাল্‌কা চালে লেখা যেন এ নিয়ে ভাবনা বা প্রশ্ন করার কিছু নেই, এই তো স্বাভাবিক। ছেলেরা পুরানো খেলনা ভাঙে, আবার নতুন খেলনা পায়; বেশ তো মজা। বিশ্বদেবতাও কি তাঁর খেলার পুতুলগুলিকে, অগণিত নরনারী বালক-বালিকা এবং কোলের শিশুগুলিকে অথবা সমস্ত জগৎ সংসারটাকেই ধ্বংস-ভ্রংশ করছেন মজা দেখবার জন্য, হয়তো-বা আবার নতুন ক'রে নতুন এক জগৎ সৃষ্টি করবার সুখটি ভোগ করবার জন্য:

আপন সৃষ্টিকে
ধ্বংস হতে ধ্বংস মাঝে মুক্তি দিয়ে অনর্গল,
খেলারে করিস রক্ষা ছিন্ন করি খেলেনা-শৃঙ্খল।

এই নিষ্ঠুর ভয়ংকর খেলার কথা শেক্‌স্‌পীয়রও বলেছিলেন তাঁর সবচেয়ে মর্মন্তুদ ট্র্যাজেডিতে—"they kill us for their sport"। কথাটা হয়তো ইস্পাত-কঠিন সত্যই; তবু মনে প্রশ্ন জাগে 'শিশু ভোলানাথ'-এর মতন একটি ফুটফুটে

কবিতা-সংকলনের সূচনাতেই এমন বিপরীত ভাবের কবিতা কেন যোগ করলেন রবীন্দ্রনাথ? নিষ্পাপ অসহায় শিশুদের কথা ভাবতে গেলেই কেন তাঁর মনে আসে মৃত্যুর কথা, ধ্বংসের কথা? আরো অনেক বৎসর পূর্বের লেখা 'শিশু' কাব্যের সূচনাতেও তিনি সম্ভবত শিশুদের পিতামাতাকেই মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন:

ঝঞ্ঝা ফিরে গগনতলে
তরণী ডুবে সুদূর জলে
মরণ-দূত উড়িয়া চলে,
ছেলেরা করে খেলা।

'পূরবী'তে এসে দেখি তাঁর শিশু ভোলানাথকে রবীন্দ্রনাথ ভুলতে পারছেন না। গভীর রাত্রে কবির শয্যা কেঁপে উঠছে "হরিণের থরথর হৃদ্‌পিণ্ড যেমন", কোন্ সে ভয়ংকরের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন তিনি অন্ধকার ঘরে; না, ঘরে নয়, আঁধারে প্রচ্ছন্ন ঘন বনে:

পদধ্বনি, কার পদধ্বনি
অজানার যাত্রী কে গো,
ভয়ে কেঁপে উঠিল ধরণী।
এই কি নির্মম সেই যে আপন চরণের তলে
পদে পদে চিরদিন
উদাসীন
পিছনের পথ মুছে চলে?
এ কি সেই নিত্যশিশু, কিছু নাহি চাহে—
নিজের খেলেনা-চূর্ণ
ভাসাইছে অসম্পূর্ণ
খেলার প্রবাহে?

'পূরবী'র এই কবিতাটিতে আড়াগোড়া রয়েছে ধ্রুপদী গাম্ভীর্য, 'শিশু ভোলানাথ'-এর টপ্পা-ঠুংরীর লঘুতা নেই কোথাও। মনে করা যেতে পারে যে পুরানো পথ ছেড়ে নতুন অজানা পথের ডাক শুনতে পাচ্ছেন কবি, নিজেকে বোঝাচ্ছেন যে এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই; কবির জগতের সঙ্গে সঙ্গে কবির ভাব এবং ভাবের সঙ্গে প্রকাশভঙ্গি, সব-কিছু "তিলে তিলে নূতন হোয়", নতুন হওয়াটাই জাগতিক নিয়ম। শিল্পীর পক্ষে এ-নিয়মটা আরো বেশি সত্য। তাঁকে তো বারে-বারে রপ্ত ভঙ্গি, অভ্যস্ত ভাবের জড়িমা কাটিয়ে উঠে নতুনের দিকে পা বাড়াতেই হবে। এ-গতি সব সময় অগ্রগতি না-ও হ'তে পাবে; তবু তাঁর তো ব'সে থাকার জো নেই। কিন্তু কোনো কবি বা চিত্রকরকে যদি বলা হয় নূতনত্ব-সন্ধানের প্রাক্-শর্ত হচ্ছে তাঁর যাবতীয় পুরানো রচনা টুকৃরো-টুকৃরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে আক্ষরিক অর্থে একেবারে বিলুপ্ত ক'রে দেওয়া, তবে কি তিনি এমন নির্মম নির্বিচার ধ্বংসের পথে নবসৃষ্টির আহ্বান শুনে খুশি হবেন, উৎসাহ বোধ করবেন? অথচ বিশ্বকবি কি তা-ই

করছেন না — বিশেষত মানব-জীবন নামক তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট রচনাটিকে নিয়ে ? এত যত্নের সাথে এত হেলা-ফেলা কি শিল্পী-সুলভ না বালকোচিত ?

প্রশ্নটা আরো বিষাদগম্ভীর হয়ে ওঠে "কঙ্কাল" শীর্ষক কবিতাটিতে। উত্তর আছে শেষে, কিন্তু প্রশ্নের তীব্র আওয়াজের পাশে উত্তরের ক্ষীণ কণ্ঠ প্রায় শোনাই যায় না। পথের একপাশে ঘাসের উপর প'ড়ে-থাকা কোনো পশুর কয়েকটি 'পাণ্ডু অস্থিরাশি' দেখে যদি কেউ ভাবেন যে মানুষের শেষও সেইমতো "কালের নীরস অট্টহাসি"তে, তবে তিনি ভুল করবেন। আসলে এটা ঘোষণা নয়, প্রশ্ন — পাণ্ডু অস্থিরাশিতেই কি মানুষের পরিসমাপ্তি ? শেষ দুটি পঙ্‌ক্তিতে তার উত্তর রয়েছে অবশ্য :

নহি আমি বিধির বৃহৎ পরিহাস,
অসীম ঐশ্বর্য দিয়ে রচিত মহৎ সর্বনাশ।

খুব জোরালো উত্তর। আমার কিন্তু সন্দেহ হয় একটু যেন অতিরিক্ত মাত্রায় জোরালো। বিশ্বাসে যথেষ্ট জোর থাকলে গলা এতটা তুলবার কোনো দরকার হ'তো না। একটা পীড়াদায়ক প্রচ্ছন্ন সংশয় কবির মন থেকে পাঠকের মনে সংক্রামিত হয় — মানুষও কি তবে শেষ পর্যন্ত বিধির বৃহৎ পরিহাসই ? শুনেছি, আমি যখন খুব ছোটো ছিলাম তখন নিষ্ঠুর-রসিক গুরুজনেরা মাঝে-মধ্যে ভয় দেখাতেন — ঐ-আমগাছের মগডালে পেত্নী ব'সে আছে, তার এত বড়ো-বড়ো লাল চোখ, ইত্যাদি। আমি অনাবশ্যক উঁচু গলায় বারকয়েক ঘোষণা করতাম — হাম নহীঁ ডরতে, হাম নহীঁ ডরতে — বলতে-বলতেই কেঁদে ফেলতাম।

মানুষের আত্মা অমর, শারীরিক মৃত্যুতে তার ক্ষয় নেই — ধর্ম-শাস্ত্রের এই চলিত উত্তর দিচ্ছেন না রবীন্দ্রনাথ। মানুষ বিধির বৃহৎ পরিহাস নয় কেন বোঝাতে গিয়ে যে-কথাগুলি বলছেন তা বেশ-একটু অন্যধরনের, রাবীন্দ্রিক এবং কাব্যিক :

ভেবেছি জেনেছি যাহা
বলেছি শুনেছি যাহা কানে
সহসা গেঁথেছি যাহা গানে
ধরে নি তা মরণের বেড়াঘেরা প্রাণে
... ...
আমার মনের নৃত্য কতবার জীবন-মৃত্যুরে
লঙ্ঘিয়া চলিয়া গেছে চিরসুন্দরের সুরপুরে।

এ-সবই সত্য, তবু তাতে এইটুকুই প্রতিপন্ন হয় যে মানুষের সত্তা অসীম ঐশ্বর্য দিয়ে গড়া। প্রশ্ন থেকেই যায় — তবু কি মৃত্যুতে তার মহৎ সর্বনাশ ঘটে না ? সর্বনাশকে মহৎ জেনে আমরা একপ্রকার ট্র্যাজিক আনন্দ পেতে পারি, যেমন পাই ওথেলো কিংবা কর্ডেলিয়ার সর্বনাশে। কিন্তু সর্বনাশ ঘটবে না এমন ভরসা পাবো কোথা থেকে ? মৃত্যুকে আদর ক'রে 'শ্যামসমান' বললেও মৃত্যুতে মৃতের যাবতীয় অমূল্য চিন্তাশক্তি রসবোধ কর্মপ্রেরণা — এক কথায় তার অদ্বিতীয় ('ইউনিক') ব্যক্তি-সত্তার অবসান ঘটে।

রবীন্দ্রনাথ কি তবে ইঙ্গিত করেছেন যে এই জীবনের পরিধির মধ্যেই এমন কয়েকটি অমূল্য মুহূর্ত আসে—জ্ঞানে, শিল্পে, প্রেমে—যখন আমরা কালের সীমা ছাড়িয়ে যাই ; কাজেই শরীরের সঙ্গে-সঙ্গে মনের (বা আত্মার) অবসান ঘটলেও ঐ-ক'টি কালাতীত মুহূর্তে আমরা অমৃতের স্বাদ পাই, যদিচ প্রচলিত আক্ষরিক অর্থে মানুষ অমর নয়। মৃত্যু যাঁর ছায়া, অমৃতও যাঁর ছায়া—সেই মহান দেবতার কথা হয়তো স্মরণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু অমৃতের সঙ্গে অমরতার ভেদ ঘুচিয়ে ফেলেননি। এই ভাবধারা ক্রমশ স্থিতিলাভ করবে পরবর্তী কাব্য-রচনায়।

'পূরবী' থেকে এগোবার আগে আর-একবার পিছন ফিরে তাকানো যাক্ রবীন্দ্র-কাব্য বিবর্তনের স্বরূপটি বোঝবার জন্যে। নানাপ্রকারের দ্বন্দ্ব ও ভাবদ্বৈধ রবীন্দ্রনাথের কাব্যচেতনাকে বার-বার আলোড়িত করেছে। শেষ পর্বের কবিতায় সেটা সবচেয়ে সুস্পষ্ট এবং মর্মস্পর্শী, কিন্তু 'গীতাঞ্জলি'র অব্যবহিত পূর্বে রচিত 'খেয়া'তে তার প্রকাশ বড়ো সুন্দর, বড়ো মধুর। বইখানির নামকরণে আমাদের ধারণা হ'তে পারে যে পাল তুলে নৌকা চলেছে এ-পার থেকে ও-পার পানে, কবি পাড়ি দিয়েছেন এক কাব্যকূল থেকে অন্য কাব্যকূলে। কিন্তু 'খেয়া'র বেশিরভাগ কবিতাই ও-পারে যাবো কি যাবো না সেই দোটানা ভাবের কবিতা। 'নৈবেদ্য' সাজিয়ে দিয়েছিলেন যে-দেবতার চরণে তাঁকে তিনি পেয়েছিলেন পূজ্যপাদ পিতৃদেবের কাছ থেকে। সে-পাওয়া রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সত্য হয়নি ; বাইরে থেকে কোনো পাওয়াই সত্য হ'তে পারে না এত বড়ো স্বকীয় ও সৃষ্টিশীল প্রতিভার ক্ষেত্রে। তাঁর পক্ষে হওয়াটাই সত্য ; ততোটুকুই তিনি বাইরে থেকে নিতে পারেন যতোটুকু তিনি সম্পূর্ণ আত্মসাৎ ক'রে নিজের বিকাশের উপকরণরূপে ব্যবহার করতে পারেন। একটি গোলাপ ফুল সূর্যরশ্মি থেকে, হাওয়া থেকে, মাটি থেকে অনেক-কিছু আহরণ করে, কিন্তু ফুলের মধ্যে সেই উপাদানগুলিকে সনাক্ত করার উপায় থাকে না। রবীন্দ্রনাথের মতো কবি-সাধকের অন্তরের তৃষ্ণা মেটাতে পারবে যে-জল তা তাঁর বুকের পাঁজর ছিন্ন ক'রে বুকের ভিতর থেকেই উৎসারিত হবে একদিন। তাই 'নৈবেদ্য'-এর সমাপ্তি অনাবৃষ্টিতে, খরায় শুকনো ফেটে-ফেটে যাওয়া মাটির উপর দাঁড়িয়ে কবি প্রার্থনা করছেন ইন্দ্রদেবের কাছে :

দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি, অতি দীর্ঘকাল,
হে ইন্দ্র, হৃদয়ে মম। দিক্‌চক্রবাল,
ভয়ংকর শূন্য হেরি, নাই কোনোখানে
সরস সজল রেখা—কেহ নাহি আনে
নববারিবর্ষণের শ্যামল সংবাদ।

'খেয়া'র প্রথম কবিতাতেই পাই নববারিবর্ষণের শ্যামল সংবাদ ; রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছেন যে সরস সজল সবুজ কাননভূমিতে গিয়ে তাঁর বুক-ভরা তৃষ্ণা মিটবে তা নদীর ও-পারে, খেয়া পার হ'তে তবে তাঁকে। আশা নিয়ে, খানিকটা

আশঙ্কা নিয়ে, একপ্রকার বিষণ্ণ ব্যাকুলতা নিয়ে ব'সে আছেন নদীর পাড়ে এসে খেয়া-ঘাটের খুব কাছটাতে। তবু মনস্থির করতে পারছেন না।

ওরে আয়,
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিনশেষের শেষ খেয়ায়।

কে আর নিয়ে যাবে; তীরের মায়া, এ-পারের চেনা গ্রামের, চেনা মানুষের, চেনা জগতের মায়া ত্যাগ ক'রে সাহসে বুক বেঁধে নিজেই তাঁকে উঠে বসতে হবে যে-কোনো একটি খেয়া-নৌকায়, পাড়ি জমাতে হবে অজানা কূলের দিকে। কী আছে ও-পারে গোধূলির আবছায়ায় ঠিক দেখা যাচ্ছে না, তবু সেই ছায়াচ্ছন্ন কূলকে মনে হয় 'সোনার কূল', শোনা যায় কি না-যায় এমনি অত্যন্ত ক্ষীণ অশ্রুতপূর্ব কোনো গানের স্বরও ভেসে আসছে যেন। গানের সুরে কেউ কি ডাকছে ও-পার থেকে? সেই ডাক শুনে বা শুনতে পেয়েছেন মনে ক'রে আমাদের সাধক কবি, রোম্যান্টিক কবি, বেরিয়ে পড়েছেন ঘর ছেড়ে। কিন্তু ঘাটে এসে দোটানায় পড়েছেন—অচেনার জন্য মন উৎসুক, অথচ চেনার টানে পা সরছে না নৌকার দিকে। "ঘরেও নহে, পারেও নহে, যে জন আছে মাঝখানে", তার দুঃখ কে বুঝবে? এই হ্যামলেটীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের আকুলতা, অস্থিরতা, বেদনা ও বিষাদ বইখানিকে আশ্চর্য কাব্যোৎকর্ষ দান করেছে।

না, রবীন্দ্রনাথ ও-পারে যাবেন না—"আমার নাই বা হল পারে যাওয়া"। এ-পারেই কতো বিচিত্র কাজে ও অকাজে জীবন সার্থক হ'তে পারে না কি তাঁর? মানুষকে, চেনা এবং অচেনা মানুষকে, ভালোবাসতে জানে যে-জন তার সব তৃষ্ণা কি মিটবে না এ-পারেই? ঈশ্বরকে না-পেলেও, না-চাইলেও তার জীবন শূন্য থাকবে না এতটুকুও।

হাতের কাছে, কোলের কাছে
যা আছে সেই অনেক আছে,
আমার সারা দিনের এই কি রে কাজ
ওপার পানে কেঁদে চাওয়া।

কিন্তু দ্বিচারী কবির মন যে মানে না, তাঁকে কাঁদতেই হয়, চাইতেই হয় ও-পার পানে। তিনি যে "পথিক পরান" নিয়ে জন্মেছেন, তাঁর কানে যে "চরণতল-চুম্বিত পন্থবীণা" করুণ সুরে সদাই বাজছে। উপরের গানে নিজেকে বুঝিয়ে ভুলিয়ে শান্ত ক'রে আবার অস্থির হয়ে উঠলেন পরবর্তী একটি কবিতায়; কবিতাটি বড়ো হৃদয়গ্রাহী, নামই "পথিক"। এই দরিদ্রা ধরণী এবং তার অসহায় মানব-সন্তানেরা মিনতি করেছে:

পথিক ওগো পথিক, যাবে তুমি?
এখন যে গভীর ঘোর নিশা!

নদীর পারে তমালবনভূমি
গহন ঘন অন্ধকারে মিশা।
... ...
এ মেলা যদি না লাগে তব ভালো
শান্তি যদি না মানে তব প্রাণ,
সভার তবে নিবায়ে দিব আলো,
বাঁশির তবে থামায়ে দিব তান।
স্তব্ধ মোরা আঁধারে রব বসি
ঝিল্লিরব উঠিবে জেগে বনে,
কৃষ্ণরাতে প্রাচীন ক্ষীণ শশী
চক্ষে তব চাহিবে বাতায়নে।
পথপাগল পথিক, রাখো কথা,
নিশীথে তব কেন এ অধীরতা!

আচ্ছা, আমাদের দ্বৈতবাদী দ্বিচারী কবির পক্ষে কি সম্ভব নয় এ-পারকে ভালোবেসে এ-পারেই থাকা, আবার ও-পারের জন্য ব্যাকুল হয়ে ও-পারেও যাওয়া? কবিও তো স্কাইলার্ক-ধর্মী; ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের স্কাইলার্কের পক্ষে যা সম্ভব হয়েছিলো, তাঁর পক্ষেই বা তা সম্ভব হবে না কেন? এই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থীয় ভাবনা থেকে রচিত হ'লো "নীড় ও আকাশ" কবিতাখানি। কিন্তু কবির ভালোবাসা ও আনন্দ মাটি এবং আকাশে সমমাত্রায় বণ্টিত হয়নি; শেষের স্তবকে নীড়ের প্রতি পক্ষপাত স্পষ্ট হয়ে উঠলো:

তবু নীড়েই ফিরে আসি
এমনি কাঁদি এমনি হাসি,
তবু এই ভালোবাসি
আলোছায়ার বিচিত্র গান।

এ ব্যর্থ প্রয়াস ছেড়ে রবীন্দ্রনাথ দিনান্তবেলায় ভাবতে লাগলেন—ও-পারে তাঁকে যেতেই হবে, এ-পারের আলোছায়ার বিচিত্র গান তো অনেক গেয়েছেন, আর কতো? "এ-পারে কৃষি হল সারা / যাব ও-পারের ঘাটে।" গানটি সম্ভবত জীবনান্তের গান, কিন্তু আপাতত আমি তাকে লোকান্তর অর্থে, জগৎ ছেড়ে জগদীশ-অভিমুখে যাত্রা করার অর্থেই গ্রহণ করছি। তবু দেখি তাঁর দ্বিধা ঘুচতে চায় না, তাঁরই প্রিয় ফুল ভীরু মাধবীর মতন "আসিবে কি, ফিরিবে কি" করছেন। 'খেয়া'র শেষ কবিতায়ও তিনি প্রথম কবিতার মতোই বিষণ্ণ, ব্যাকুল, কিন্তু ইচ্ছাশক্তি-রহিত। পাড়ি দেওয়া দূরে থাক্, আমাদের বড়ো আদরের কবি আদুরে ছেলের মতোই ঘাট ছেড়ে ঘরেই ফিরে এসেছেন। ঘরের দাওয়ায় ব'সেও কিন্তু নদীর ও-পারে দিনশেষের আবছা আলোয় অদৃশ্যপ্রায় তটরেখার দিকেই চেয়ে আছেন, তখনো ভাবছেন:

ভাঙিলে হাট দলে দলে
সবাই যাবে ঘাটে চলে
আমি তখন মনে করি
আমিও যাই ধেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে।

মনে করতে-করতে তাঁর আরো দু-এক বছর কেটে যাবে।

'খেয়া' বইখানি ছাড়বার আগে আমি তার একটি অত্যাশ্চর্য কবিতার কথা বলতে চাই যার তুলনা নেই কোথাও, রবীন্দ্র-কাব্যের বিপুল অমূল্য রত্নভাণ্ডারেও আছে কিনা সন্দেহ। কবিতাটি দুইভাগে বিভক্ত—"শুভক্ষণ" এবং "ত্যাগ"। সকলের জানা আছে এ-কবিতা :

ওগো মা
রাজার দুলাল যাবে আজি মোর
ঘরের সমুদ্রপথে।

ঘরে আসার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, যুবরাজ বিশ্বলোকের বিশ্বকাজে সর্বদা ব্যাপৃত, এই অখ্যাত গ্রামের একটি অতি সাধারণ মেয়ের মনের কথা তিনি ভাববেন কেন, জানবেনই-বা কেমন ক'রে। মেয়েটির সীমিত একঘেয়ে জীবনে কিন্তু এটাই মাহেন্দ্রক্ষণ, সে যে জানালায় দাঁড়িয়ে রাজার দুলালকে শুধু একবার এক ঝলক দেখতে পাবে। না, না, রাজা তার দিকে দৃক্‌পাত করবেন না, করতেই পারেন না। তবু তাকে এমন সাজে সাজতে হবে, এমন ছাঁদে খোঁপা বাঁধতে হবে যাতে এই পরমক্ষণের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না-হয়।

শুভক্ষণ এলো, রাজার রথ সম্মুখের পথ দিয়ে দ্রুত চ'লে গেলো, প্রভাতের আলোয় তার স্বর্ণশিখর ঝলমল ক'রে উঠলো। সেই মুহূর্তে মেয়েটি তার গলার হার ছিঁড়ে হারের মধ্যমণিটি ফেলে দিয়েছিলো পথের মাঝখানে রথের সামনে। রথ থামিয়ে রাজকুমার ঐ-মণিটি কুড়িয়ে আনবেন, হাতে নিয়ে প্রসন্ন মুখ তুলে এক পলকের জন্যও তাকাবেন তাঁর ভক্ত-প্রেমিকার অশ্রুছলছল চোখের পানে—এমন অসম্ভব আশাও জেগেছিলো অবোধ বালিকার মনে। ঈশ্বরের কাছে আমাদের সব প্রার্থনা, সব আশাই তো অসম্ভবের; অসম্ভব তার পূর্তি; আমরা সবাই সেখানে অবোধ বালক-বালিকা। মণি তো হৃদয়েরই প্রতীক এ-কবিতায়; হার-ছেঁড়া মণি তো নয়, বুক-ছেঁড়া প্রেম। এই প্রেমাঞ্জলি কেমন ক'রে গ্রহণ করলেন রাজাধিরাজ? তাঁর স্বর্ণরথের চাকার তলায় মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে ধুলায় মিশিয়ে দিয়ে। আর সবই বুঝতে পেরেছে এই অবুঝ রাজ-প্রেমিকা, শুধু বুঝতে পারে না :

মা গো, কী হল তোমার, অবাক নয়নে
চাহিস কিসের তরে,

মা কি সমস্ত হৃদয় দিয়ে একদিনও ভালোবাসেনি তার হৃদয়ের রাজাকে?

এমন উদাসীন, নির্মম, নিষ্ঠুর, রাজার দুলাল 'গীতাঞ্জলি'র রাজার রাজা নন, যিনি সিংহাসন থেকে নেমে আসেন, থেমে দাঁড়ান সামান্যতম মানুষের দরজার সামনে, গুণহীনের গানখানি যাঁর প্রেমে বাজে। তবে এই সম্পূর্ণ নির্মম দেবতাই অধিকতর সত্য দেবতা। তাঁর সাক্ষাৎ পাবো আমরা শেষ পর্বে; ভক্তিপর্বে তিনি প্রক্ষিপ্ত। জানি না কেমন ক'রে তাঁর পূর্বাভাস এখানে এসে প'ড়ে 'খেয়া'র এই কবিতাটিকে দেশকালাতীত মহিমা দান করেছে। অন্ধকার ঘরের ভয়ংকর নিষ্ঠুর রাজাকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি ভক্তিপর্বে রচিত 'রাজা' নাটকে, 'ডাকঘর'-এও তাঁর ইঙ্গিত রয়েছে। তবু গীতাখ্য তিনখানি বইতে ('গীতাঞ্জলি', 'গীতালি', 'গীতিমাল্য') তাঁর দেখা মেলে না।

'গীতাঞ্জলি'তে দেখি রবীন্দ্রনাথ সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ত্যাগ ক'রে খেয়া পার হয়ে পৌঁছেছেন সেই ঘোমটা-পরা ছায়ায় ঢাকা তীরে যার সোনালী তটরেখার দিকে তিনি বেশ-কিছুকাল ধ'রে তাকিয়ে ছিলেন দোদুল্যমান চিত্তে। তাঁর নিজেরই মনের কুয়াশায় ঢাকা ছিল এ-দেশ। খেয়া নৌকা থেকে নেমে দেখেন ছায়ার ঘোমটা স'রে গেছে, চারিদিক আলোয় আলোকময়, সবই সুন্দর, সবই মধুর, সবই আনন্দে ভরপুর। এমন ক'রে তো কখনো ভালোবাসেননি তিনি, এমন ভালো-বাসার লোক তো খুঁজে পাননি আগে।

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোক-ভূলোক
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।

প্রেমের শত দুঃখের কথা তিনি শতবার গেয়েছেন, এই প্রথম দুঃখ তাঁর অসীম পাথার পার হয়ে এসে মিলিয়ে গেলো আকাশ থেকে আকাশে ধ্বনিত আনন্দের কলগানে; এই প্রথম তিনি বুঝতে পারলেন অশ্রুজলে ধোয়া নির্মল আনন্দ কাকে বলে। দুঃখ যে নেই তা নয়, কিন্তু দুঃখ এ-পারের আনন্দকে মলিন করা দূরে থাক্, আরো উজ্জ্বল ক'রে তোলে। দুঃখও যে এত ভালো লাগবে তা কি তিনি আগে জানতেন :

চারিদিকে সুধাভরা
ব্যাকুল শ্যামল ধরা
কাঁদায় রে অনুরাগে।
দেখা নাই পাই
ব্যথা পাই
সেও মনে ভালো লাগে।

দেখা না-পাওয়া কি কাঁদাতে পারে না, এমন কান্না কাঁদাতে পারে না যার কোনো সান্ত্বনা নেই কোথাও? পারে হয়তো, কিন্তু 'গীতাঞ্জলি'র কবিকে নয়। বিরহিনী যেমন গভীর রাতে একলা পথে ঝড়ের হাওয়ায় নিবে-যাওয়া প্রদীপ হাতে চলেছেন অভিসারে, ও-দিক থেকে তাঁর প্রিয়তম তেমনি আসছেন দৃঢ় পদক্ষেপে,

পদধ্বনি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে ; রাজার রাজাকে ঠেকাতে পারে এত বড়ো শক্তি কার ?

আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে,
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায়
রাখবে কোথায় ঢেকে।

চন্দ্রসূর্য তো আর ত্রিভুবনেশ্বরকে ঢেকে রাখতে পারে না, মানুষই পারে। কিন্তু সেইসব আলোহারা অসহায় সামান্য মানুষ কিংবা আলো-হরণকারী দানবিক শক্তিমত্ত মানুষের কথাকে রবীন্দ্রনাথ মনের মধ্যে স্থান দিচ্ছেন না এখন। মোটের উপর 'গীতাঞ্জলি' পর্বের মূল সুরটি হচ্ছে "তোমার প্রেমে আঘাত আছে নাইকো অবহেলা", আর শেষ পর্বের মূল সুর "উদাসীন জগতের ভীষণ স্তব্ধতা"।

'গীতালি'র বড়ো সুন্দর একটি গানের ব্যঞ্জনা আমার মনে জেগে ওঠে ঐ-সময়কার সব মধুর রসকে ছাপিয়ে। এ-গানটি "শুভক্ষণ"-"ত্যাগ"-এর মতো রচিত নয়, তবু কোনো অশুভ লগ্নের দূরাগত গম্ভীর নিনাদে যেন পশ্চাৎপটখানি কেঁপে-কেঁপে উঠছে ভয়ে অথবা বেদনায় :

সরিয়ে দিয়ে আমার ঘুমের
পর্দাখানি
ডেকে গেল নিশীথরাতে
কে না জানি—

কে, কে সে ? প্রকৃতি ?

কোন্ গগনের দিশাহারা
তন্দ্রাবিহীন একটি তারা—

প্রকৃতিই বোধহয়। না কিন্তু :

কোন্ রজনীর দুঃস্বপনের
আর্তবাণী,—

আর্তবাণী কি রজনীর হ'তে পারে, রজনী কি দুঃস্বপ্ন দেখতে পারে ? ঘরের অন্ধকারে দুঃস্বপ্ন-পীড়িত মানুষই কঁকিয়ে উঠেছে, বনের অন্ধকারে দিশাহারা ঠোকর-খাওয়া মানুষের বুক থেকেই আসচে এ আর্ত কান্না।

আঁধার রাতে ভয় এসেছে
কোন্ সে নীড়ে।

কোনো দরিদ্র দম্পতি কি গভীর রাতে তাঁদের একমাত্র শিশুসন্তানের চিকিৎসা-বিহীন রোগশয্যার পাশে ব'সে আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে শিউরে উঠেছেন ?

বোঝাই তরী ডুবল কোথায়
পাষাণ-তীরে ;

কতো লক্ষ মানুষের বোঝাই তরী নিত্যই ডুবছে তীরের কাছে এসে পাষাণে ঠেকে। হ্যাঁ, লক্ষ-লক্ষ মানুষের কথাই ভাবছেন রবীন্দ্রনাথ ঐ-সময়কার এই ব্যতিক্রমী গানে :

এই ধরণীর বক্ষ টুটে
এ কী রোদন এল ছুটে
... ...
ডেকে গেল নিশীথরাতে
কে না জানি।

নীড়-ভাঙা তরী-ডোবা সব ভাগ্যহত মানুষের ভয়ার্ত চীৎকারে তিনি কার ডাক শুনতে পাচ্ছেন—ঈশ্বরের, না অনীশ্বরের? তবে কি এই আশ্চর্য সুন্দর কিন্তু অপ্রত্যাশিত কঠোর গানে 'গীতাঞ্জলি'র কবি শেষ ক'রে দিচ্ছেন ঈশ্বরপ্রেমের অধরা মাধুরীকে ছন্দে বাঁধবার পালা? এখনই কি গলা সাধবেন রৌদ্রী রাগিণীর প্রথম আলাপে? না তার দেরি আছে।

শান্তিনিকেতন মন্দিরে প্রদত্ত ভাষণগুলি এবং ঐ-সময়কার কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়ে 'শান্তিনিকেতন' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। বইখানিকে 'গীতাঞ্জলি' পর্বের মোটের উপর শান্ত সমাহিত ভক্তি-রসাত্মক গান ও কবিতার ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা মনে করা যেতে পারে। "কর্মযোগ" প্রবন্ধে লিখছেন : "ইতিহাসের সুদূরপ্রসারিত ক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের প্রশস্ত রাজপথে মানবাত্মা চলেছে মেঘমন্দ্রগর্জনে আপনার কর্মের বিজয়রথে, চলেছে বিশ্বের মধ্যে আপনার অধিকার বিস্তীর্ণ করতে।···তুমি কি অসাড় হয়ে চোখ বুজে বলতে চাও মানবাত্মার এই বিজয়রথের কোনো সারথি নেই।" শেষ পর্বে দেখা যায় বিজয়রথের রথী হয়েছে বিক্ষতচরণ পদাতিক, রাজপথ নিশ্চিহ্ন-প্রায়, সারথি গরঠিকানা। সারথির ঠিকানা যাঁর জানা আছে, এমন-কি সারথি কোনো অজ্ঞাত লোক থেকে মানবাত্মার রথ পরিচালনা করছেন এ হেন প্রত্যয় স্থির আছে যাঁর মনে, তিনি কি লিখতে পারেন :

ধর্মরাজ দিল যবে ধ্বংসের আদেশ
আপন হত্যার ভার আপনিই নিল মানুষেরা।
ভেবেছি পীড়িত মনে, পথভ্রষ্ট পথিক গ্রহেব
অকস্মাৎ অপঘাতে একটি বিপুল চিতানলে
আগুন জ্বলে না কেন মহা এক সহমরণের।
তার পরে ভাবি মনে,
দুঃখে দুঃখে পাপ যদি নাহি পায় ক্ষয়
প্রলয়ের ভস্মক্ষেত্রে বীজ তার রবে সুপ্ত হয়ে,
নূতন সৃষ্টির বক্ষে
কণ্টকিয়া উঠিবে আবার। (৩৮, 'রোগশয্যায়')

সৃষ্টিকর্তার প্রতি অভিমান—যে অভিমান তাঁকে অবিশ্বাসের প্রান্তভূমিতে নিয়ে গেছে—এবং সৃষ্টির প্রতি, বিশেষত মানবিক জগতের প্রতি হতাশাজনিত বিক্ষোভ শেষ পর্বের একাধিক কবিতায় আবেগপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। আর-একটি উদাহরণ দিই।

দেবতা যেথা পাতিবে আসনখানি
যদি তার ঠাঁই কোনোখানে নাই,
তবে, হে বজ্রপাণি,
এ ইতিহাসের শেষ অধ্যায়তলে
রুদ্রের বাণী দিক দাঁড়ি টানি
প্রলয়ের রোষানলে। ("পক্ষিমানব", 'নবজাতক')

শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথের মতন কবির মনের গভীরে হতাশা ও নৈরাশ্য কতোখানি তীব্র হ'লে তিনি মনুষ্যজাতির এবং মাতা বসুন্ধরার সমূহ প্রলয় কামনা করতে পারেন তা ভাবতে গেলে আমার মতন অভক্ত পাঠকের মনেও ব্যথা লাগে। আরো ব্যথা লাগে যখন দেখি তিনি আঘাতের পর আঘাতে প্রায় ভেঙে-পড়া বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কী ব্যাকুল চেষ্টাই ক'রে যাচ্ছেন কবিতার পর কবিতায়। তার শেষ নিদর্শন বোধকরি মৃত্যুর ঠিক দু-মাস আগে লেখা 'শেষ লেখা'র ২-সংখ্যক কবিতা :

মৃত্যু দেখা দেয় এসে একান্তই অপরিবর্তনে,
এ বিশ্বে তাই সে সত্য নহে,
এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।

এখানে যুক্তি এবং ভক্তি দুই-ই নিস্তেজ, করুণ ; "নিশ্চিত মনে জানি" অনিশ্চিত মনের আকুলতাই প্রকাশ করছে, নিশ্চিত জ্ঞান নয়। অন্তিম পর্বের একাধিক কাব্য-সংকলনে দেখি হতাশার অন্ধকারের কবিতার পাশেই রয়েছে ম্রিয়মাণ অথচ জিজীবিষু আশার ক্ষীণ কম্পমান দীপশিখা। রবীন্দ্রনাথ যদি সত্যিই শুনে থাকেন "মানুষ-জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি", তবে কেমন ক'রে ভাবতে পারলেন এটা "প্রহসন"; কেমন ক'রে বলতে পারলেন "এ প্রহসনের মধ্য অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের"? দুঃসহ নিষ্ঠুর বাস্তবকে "দুষ্ট স্বপন" ব'লে কি নিজেকে ভোলাতে চাইছেন আজও আটাত্তর বৎসর বয়সে লেখা "জন্মদিন" শীর্ষক কবিতাটিতে? কয়েকটি দুষ্ট স্বপনের (বা নাৎসি শক্তির) লোপ হ'তে আমরা দেখেছি অবশ্য ; সেইসঙ্গে দেখেছি কিছু সুষ্ঠু স্বপনের (যথা মার্কস্‌-কল্পিত সর্বপ্রকার শোষণমুক্ত স্বাধীন সমাজের) উবে যাওয়াও। ঐ-কবিতার শেষের দিকে সবিস্ময়ে পড়ি :

মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে-অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব,

কবিতায় বর্ণিত এমন নিদারুণ পরিস্থিতির সম্মুখীন যিনি, তাঁর মুখে বা মনে কি কোনোপ্রকারের হাসি ফুটতে পারে? "ধিক্কার হেনে যাব" বললে হয়তো আরো সহজ শোনাতো। হয়তো তা-ই বলতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। "হাসি দিয়ে মারি যারে" তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করি ; অথচ পৃথিবীময় দুঃখ ও পাপের যে অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ রবীন্দ্রনাথকে শেষ বয়সে গভীরভাবে বিচলিত করেছিলো তাকে আর যা-ই ভাবি তুচ্ছ এবং উপহাসযোগ্য ভাবা যায় না। 'নবজাতক'-এর "জয়ধ্বনি" শীর্ষক কবিতাটিতে যখন বললেন :

অপূর্ণ শক্তির এই বিকৃতির লক্ষণ
দেখিয়াছি চারিদিকে সারাক্ষণ,

চিরন্তন মানবের মহিমারে তবু
উপহাস করি নাই কভু—

তখন অনেক বড়ো কথা বললেন তিনি। কিন্তু চিরন্তন মানবের মহিমা তো এখনো আদর্শরূপেই রয়েছে আমাদের সামনে, বাস্তবরূপ ধারণ করেনি। ইতিমধ্যে এবং এখনো "নাগিনীরা ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস"। বিষাক্ত বায়ু সহ্য করতে না-পেরে কি মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ (চিরমানব) মারা যাবে, নাকি বলিষ্ঠ শুভবুদ্ধির সাহায্যে নাগিনীদের বধ ক'রে বাতাবরণ শুদ্ধ ক'রে মানুষ যাত্রা করবে "বহ্নিশয্যা মাড়াইয়া দলে দলে / দুঃখের সীমান্ত খুঁজিবারে" ? নিশ্চিত ক'রে কে দেবে তার উত্তর।

অমঙ্গলবোধে এমন যন্ত্রণাদগ্ধ কবির মনে শান্তি থাকতে পারে কি ? "শান্তিরে ঝড় যখন হানে / শান্তি তবু চায় সে প্রাণে"—এর চেয়ে আরো নিষ্ঠুর, আরো ধ্বংস-বিলাসী ঝড় নষ্ট করেছে ভগ্নস্বাস্থ্য জরাক্লিষ্ট কবির শান্তি। বলা প্রয়োজন যে ঐ-সময়ে রবীন্দ্রনাথকে নিজের দৈহিক ব্যাধি ও জরার চেয়ে অনেক বেশি বিচলিত ক'রে তুলেছিলো আধুনিক সভ্যতার ব্যাধি ও জরা। তাই এমন আকুলতা, এমন নিরাশ্রয়তা, এমন একাকীত্ব। একটি প্রিয়মুখ শয্যার পাশে দেখতে না-পেলে সন্ত্রস্ত হৃদয়ে বোধ করেন "পৃথিবী পায়ের নীচে চুপি-চুপি করিছে মন্ত্রণা / সরে যাবে বলে"; উৎকণ্ঠায় দুই বাহু তুলে "শূন্য আকাশেরে" ধরতে চান। 'শূন্য' বিশেষণটা লক্ষণীয় ; নিশ্চয়ই তার মানে মেঘশূন্য বা তারকাশূন্য নয় ; দেবতাশূন্য অর্থ করলেই অর্থসঙ্গতি রক্ষা হয়। সন্ত্রাস অবশ্য কেটে যায়, শান্তি ফিরে আসে। কিন্তু আশ্চর্য সে-শান্তি ; যেন আতঙ্ক আর হতাশার উপাদান দিয়েই গড়া।

চমকিয়া স্বপ্ন যায় ভেঙে :
দেখি, তুমি নতশিরে বুনিছ পশম
বসি মোর পাশে
সৃষ্টির অমোঘ শান্তি সমর্থন করি।

প্রবন্ধের গোড়ার দিকে এই পঙ্‌ক্তিগুলির সঙ্গে য়েট্‌সের কয়েকটি পঙ্‌ক্তির তুলনা করেছিলাম, এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি প্রতিতুলনার দিকে। রবীন্দ্রনাথের এই ক্ষুদ্র কবিতাটির ব্যঞ্জনা বিরাট। জাগতিক শান্তি ও মঙ্গল পশম-বোনা দুটি ক্ষীণ অসহায় ক্ষণভঙ্গুর বাহুস্তম্ভের উপর ভর ক'রে আছে, এর চেয়ে দৃঢ়তর স্থায়ীতর কোনো ভিত্তি কি নেই তার ? 'অমোঘ' শব্দটি মনে হয় কোনো পূর্ব পর্ব থেকে ছিটকে এসে পড়েছে, রবাহূত অতিথির জন্য আসন পাতা নেই এখানে।

আগেই বলেছি শেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথের প্রধান ভাব ট্র্যাজিক চেতনা। অল্প-সংখ্যক কবিতায় ব্যক্ত হ'লেও প্রধান, 'পরিশেষ' থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত কাব্য-গুলির উপর চোখ বুলিয়ে গেলে এই ভাবটাই সবচেয়ে গভীর রেখাপাত করে আমাদের মনে, অন্তত আমার মনে। তার অত্যুৎকৃষ্ট প্রকাশ 'সেঁজুতি'র "তীর্থ-

যাত্রিণী" কবিতাটি। এক বৃদ্ধা, হাতে নামজপ-ঝুলি আর পাশে পুঁটুলি নিয়ে "জীবনের পথে শেষ আধক্রোশটুকু" পার হবার জন্য সারাদিন ধ'রে ব'সে আছে মফস্বলের কোনো ছোটো ইস্টেশনে তীর্থগামী ট্রেন ধরবে ব'লে। এই অখ্যাত গ্রামের অজ্ঞাত মেয়ে একদিন যৌবনের পাত্র ভ'রে পেয়েছিলো কিছু, দিয়েছিলো কিছু "মধু মদিরায় রসে বেদনার নেশা"। কিন্তু সে-পাত্র এখন শূন্য, সে-কাহিনী আজ দুরস্মৃত। তবু কোনো পূর্ণকুম্ভের দুর্মর আশায় ভোরবেলা থেকে সে ব'সে আছে অন্য-এক বহু-দূরের জন্য।

পরিত্যক্ত একা বসি ভাবিতেছে, পাবে বুঝি দূরে
সংসারের গ্লানি ফেলে স্বর্গঘেঁষা দুর্মূল্য কিছুরে।
হায়, সেই কিছু
যাবে ওর আগে আগে প্রেতসম, ও চলিবে পিছু
ক্ষীণালোকে : প্রতিদিন ধরি-ধরি করি তারে
অবশেষে মিলাবে আঁধারে।

'দূর' শব্দটি রবীন্দ্রনাথের (এবং প্রায় সব রোম্যান্টিক কবির) বড়ো প্রিয়, এই সে-দিন পর্যন্ত কতো রঙিন স্বপ্ন, কতো রক্তিম ভাবাবেগ জাগিয়ে তাঁর 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে 'মহুয়া' পর্যন্ত কাব্যে মাধুরী এনেছে, গানকে অধরা করেছে। "আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী", "দূরে কোথায় দূরে-দূরে / আমার মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে", "দূরদেশী সেই রাখালছেলে", "দূরের বন্ধু সুরের দূতীরে" আরো কতো। কখনো-বা ক্লান্তি এসেছে দেহে, প্রশ্ন ও আশঙ্কা জেগেছে মনে, যেমন 'সোনার তরী'র শ্রেষ্ঠ কবিতায় : "আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে / হে সুন্দরী ?" "আশার স্বপন" যদি না-ও ফলে সেই দূর দেশে, তবু "স্নিগ্ধ মরণ আছে কি হোথায় ?" যে-দেশে রয়েছি আমরা সে-দেশের মরণ অবশ্য কুৎসিত যন্ত্রণাময়, তবে দূর পারে যেখানে নিয়ে যাচ্ছে সোনার তরী বেয়ে তাঁর মানস-সুন্দরী, সেখানে মরণ নিশ্চয়ই সুন্দর, স্নিগ্ধ ("স্নিগ্ধ মরণ" কি কীট্‌স্‌-এর "easeful death"-এর ভাষান্তর ?) কিন্তু চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে ব্যবধান বড়ো বেশি রেখেছেন ভগবান; যিনি চেয়েছিলেন "To cease upon the midnight with no pain", তাঁকে বৎসরাধিক কাল কঠোর যন্ত্রণা পেতে হয়েছিলো, রবীন্দ্রনাথও শেষ দু-তিন বছর রোগযন্ত্রণায় ভুগেছিলেন। তবু যন্ত্রণা সহ্য করার মধ্যে একটা মহিমা থাকে, যদি যন্ত্রণা নিরর্থক না-হয়, কোনো সার্থকতার তীর্থে পৌঁছবার পাথেয় হিসাবে গণ্য হ'তে পারে। কিন্তু পরিত্যক্তা তীর্থযাত্রিণীর মৃত্যু ঘটবে কেবল রিক্ততার মধ্যে শূন্যের পিছনে ছুটতে-ছুটতে; তার অবসন্ন জীবনের ক্ষীণালোক ক্ষীণতর হবে, "অবশেষে মিলাবে আঁধারে"।

রবীন্দ্রনাথ কি বলতে চাইছেন : মানুষের সাধারণ, সব মানুষের, তীর্থযাত্রা গোড়া থেকেই ব্যর্থতার অভিশাপ বহন ক'রে চলেছে, তার সব অন্বেষণই মরীচিকা-

অন্বেষণ ? "স্বর্গঘেঁষা দুর্মূল্য কিছু" কোথাও নেই, তার উপচ্ছায়া শুধু দেখা যায় সামনে, অথচ বেশ খানিকটা দূরে। এ-দূরত্ব কখনোই হ্রাস পাবে না, আমরা যতো এগিয়ে যাই-না কেন, প্রেতচ্ছায়াটি স'রে যাবে ততো দূরেই।

হমকো মালুম হৈ জিন্নৎ কী হকীকৎ লেকিন
দিলকে বহ্‌লানেকো গালিব য়হ খয়াল আচ্ছা হৈ।

(স্বর্গের সত্য-মিথ্যা আমার বেশ জানা আছে তবে
মনকে ভোলাবার জন্য, গালিব, কল্পনাটা মন্দ নয়।)

অথবা সার্ত্র্‌-এর ভাষায় বলতে পারি—man is a useless passion। শুধু দুঃসাধ্য নয়, অসাধ্যের পিছনে ছুটে-ছুটে আয়ুক্ষয় করবে—এই তো মানব-জন্ম। সব পথ এসে মিলে গেছে সেই পথে যার কোনো শেষ নেই, উদ্দেশ্য নেই; তাই তো "হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া ব্যথা চলেছে নিরুদ্দেশে"।

তীর্থযাত্রিণীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় ইস্টেশনে, ইস্টেশনেই সে ব'সে আছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা ক'রে। জানে না কখন আসবে ট্রেন, তবু ভাবে আসবে নিশ্চয়ই এক সময়ে; আর ভাবে:

ভোর হতে ধৈর্য ধরি বসি ইস্টেশনে
অস্পষ্ট ভাবনা আসে মনে,
আর কোনো ইস্টেশনে আছে যেন আর কোনো ঠাঁই,
যেথা সব ব্যর্থতাই
আপনার
হারানো অর্ঘ্যেরে-ফিরে পায়,

কিন্তু সে-ইস্টেশনে পৌঁছানো তীর্থযাত্রিণীর ভাগ্যে নেই, তার বহু পূর্বেই বৃদ্ধার অবশিষ্ট সব ধ্যান জ্ঞান জীবন "মিলাবে আঁধারে"।

কবি কি পৌঁছতে পেরেছিলেন সেই ইস্টেশনে ? সম্ভবত। বছর খানেক পরে লেখা 'নবজাতক'-এর একটি কবিতার শিরোনাম "ইস্টেশন"। প্রথম পঙ্‌ক্তিতেই শুনি—"সকাল বিকাল ইস্টেশনে আসি"। এত ঘন-ঘন ? ইস্টেশন কি এত কাছে, পথ কি এত সুগম ? হয়তো উক্তিতে লেগেছে কাব্যের রঙ, সংক্ষেপে যাকে আমরা অতিরঞ্জন বলি। তবু বিশ্বাস করা শক্ত নয় যে মাঝে-মাঝে কবি সেই মায়াবী ইস্টেশনের সন্ধান পান যার সান্নিধ্যে তাঁর হৃদয়-মন এক স্তর থেকে আর-এক স্তরে উঠে যায়। যাত্রীদের ব্যস্তসমস্ত হয়ে ট্রেনে ওঠা-নামার বর্ণনায় ট্র্যাজেডির আভাস রয়েছে সর্বত্রই, বিশেষত উপান্ত স্তবকে:

'গেল গেল' বলে যারা
ফুকরে কেঁদে ওঠে
ক্ষণেক পরে কান্না-সমেত
তারাই পিছে ছোটে।

বর্ণনার শেষে অন্তিম স্তবকে কবিতাটি হয়ে ওঠে চিন্তাগর্ভ, বহন করে, কবির ভাষায়, কিছু "মননজাত অভিজ্ঞতা"।

চিত্রকরের বিশ্বভুবনখানি—
এই কথাটাই নিলেম মনে মানি।
কর্মকারের নয় এ গড়া পেটা—
আঁকড়ে ধরার জিনিস এ নয়,
দেখার জিনিস এটা।

আমরা তো এতদিন জানতাম যে গড়া-পেটাই চলেছে বিশ্বভুবনময়, বিশেষত আমাদের এই "মহাবীর্যবতী" পৃথিবীতে। চারিদিকে একবার চাইলে দেখতে পাবো কতো দুঃখ, কতো ব্যর্থতা, কতো নির্যাতন, কতো কলুষিত মনন ও আচরণ ; দেখবো পাপী অনেক ক্ষেত্রে সুখেই দিন কাটাচ্ছে, আর পুণ্যাত্মাদের মধ্যে অনেকের দুঃখ-যন্ত্রণার শেষ নেই। এত দুঃখের কারণ কী ? ১৩১৪ সালে লেখা "দুঃখ" শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিশদ ক'রে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে সৃষ্টিকর্তা তো একটি ফুৎকারে জগৎ সৃষ্টি ক'রে হাত গুটিয়ে ব'সে নেই। অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত সৃষ্টি-কর্ম চলছে, চলবে। এইখানে সাধারণ শিল্পীর সঙ্গে তাঁর তফাৎ। দুঃখের মূল কারণ এই যে সৃষ্টি অপূর্ণ, আজ পর্যন্ত খুবই অপূর্ণ, নানা দোষ ক্রটি বিচ্যুতি রয়েছে ভুবনজোড়া। কিন্তু জাগতিক অবিরাম পরিবর্তনের একটা ডিরেক্‌শন আছে, একটা উদ্দেশ্য আছে। কালস্রোতে ভেসে উঠছে কতো নক্ষত্রলোক, কতো সৌর-মণ্ডল, কতো পৃথিবী। সবই চলেছে অপূর্ণ থেকে পূর্ণের দিকে। অবাধ নয়, তবু অমোঘ সে-গতি। "অপূর্ণের মধ্য দিয়া নহিলে পূর্ণের প্রকাশ হইবে কেমন করিয়া ?" উপরন্তু সৃষ্টি "কার্যকারণে আবদ্ধ"। কোথাও প্রবল বন্যায় নগর গ্রাম ক্ষেত খামার সব জলে ডুবে যাচ্ছে, হাজার-হাজার লোক মরছে, লক্ষ-লক্ষ লোকের সর্বনাশ হচ্ছে ; এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে করুণাময় ভগবান তক্ষুনি বন্যার জল সরিয়ে দিয়ে সব আগের মতো বা আরো ভালো ক'রে দেবেন—সেটি হবার জো নেই। প্রকৃতি সর্বদা ও সর্বত্র নিয়মমতো চলে, নিয়মমতো বাঁচায় ও মারে। প্রাকৃতিক বিধানে ব্যাঘাত ও ব্যতিক্রম ঘটানো বিধাতার স্বভাব নয়। মানুষ যতো দুঃখই পাক, তার কোনো দৈবী তাৎক্ষণিক প্রতিকার নেই। শেষ অবধি প্রতিকার আছে অবশ্য, কিন্তু আমাদের ধৈর্য ধ'রে প্রতীক্ষা করতে হবে তার জন্য। মানুষের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি এবং শুভবুদ্ধিই প্রতিকারের ব্যবস্থা করবে, তবে এ দুই বুদ্ধির উন্মেষ বড়োই মন্থর। তবু নিজের উপর এবং ভগবানের উপর ভরসা হারালে চলবে না।

রবীন্দ্রনাথের মনে সে-সময়ে এবং তার পরে আরো দুই দশক সন্দেহ ছিলো না যে সৃষ্টি চলেছে মন্থর কিন্তু দুর্নিবার গতিতে অপূর্ণ থেকে পূর্ণের দিকে ; এই বিশ্বাসকে ভগবৎ-বিশ্বাস বললে কিছু ভুল বলা হয় না। মোদ্দা কথা এই যে সৃষ্টিময় গড়া-পেটা চলছে ইম্‌পর্ফেক্টকে পর্ফেক্ট করার জন্য। সেই গড়া-পেটার হাতুড়ি

যখন আমাদের গায়ের উপর পড়ে, তখন আমাদের বুক থেকে হাহাকার রব ওঠে। উঠুক। এইভাবে তো সৃষ্টি সম্পূর্ণ হবে, জগৎ ঈশাবাস্যম্ হবে, মর্তে প্রতিষ্ঠিত হবে স্বর্গরাজ্য। নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে।

এই অনাদ্যন্ত সৃষ্টির প্রতি, তার ঈশ্বর-নির্দিষ্ট অমোঘ প্রগতির প্রতি, আস্থা হারিয়ে আজ বলেছেন – না, ঈশ্বর কর্মকারের মতো গ'ড়ে-পিটে জড় থেকে জীব, জীব থেকে মানুষ, মানুষ থেকে মহামানব তৈরি করছেন না। তৈরি হচ্ছে কিছু, কিন্তু তার পিছনে কোনো ঐক্যবদ্ধ একনিষ্ঠ সংকল্প নেই। পরম চিত্রকর মনের খেয়ালে, মনের আনন্দে ছবির পর ছবি এঁকে যাচ্ছেন, একদিকে মুছে ফেলছেন, অন্যদিকে নতুন রঙ লাগাচ্ছেন, অরূপকে রূপ দিচ্ছেন, বিরূপকে যে সর্বদা বর্জন করেছেন তা নয়। কবির চোখে আমরা দেখি "রূপ-বিরূপের নৃত্য একসঙ্গে নিত্যকাল চলে"; দেখি কোথাও কোনো দায়িত্ব নেই, কোনো অঙ্গীকার নেই, দেশকালব্যাপী কোনো মহাপরিকল্পনা নেই; আছে শুধু খেয়াল, শুধু খুশি। পরম শিল্পীর মনে কোনো মমতা পর্যন্ত নেই নিজের সৃষ্টির প্রতি; তাঁর দক্ষিণ হাতের কাজ শেষ হ'তে-না-হ'তেই বাঁ হাত মুহূর্তমাত্র দ্বিধা না-ক'রে সেটা মুছে ফেলে:

> এক তুলি ছবিখানা এঁকে দেয়,
> আর তুলি কালি তাহে মেখে দেয়।

শেষ পর্বে সোজাসুজি ভগবানকে সম্বোধন ক'রে লেখা কবিতার সংখ্যা খুবই কম। সেই অত্যল্প সংখ্যক কবিতার মধ্যে একটি হচ্ছে 'বীথিকা'র "নমস্কার":

> প্রভু, সৃষ্টিতে তব আনন্দ আছে
> মমত্ব নাই তবু
> ভাঙায় গড়ায় সমান তোমার লীলা।
>
> … … …
>
> দুঃখ লজ্জা ভয়
> ব্যাপিয়া চলেছে উগ্র যাতনা
> মানববিশ্বময়,
> সেই বেদনায় লভিছে জন্ম
> বীরের বিপুল জয়।

বীরের বীরত্ব দেখে জয়ধ্বনি অবশ্যই করবো আমরা, কিন্তু যে বিপুলসংখ্যক মানুষ উগ্র যাতনায় হাহাকার করছে, তাদের যাতনা কি তাতে উপশমিত হবে? আর কি কোনো সান্ত্বনা নেই তাদের জন্য? 'নবজাতক'-এরই অন্য একটি কবিতা "রোম্যান্টিক"-এ বলেছেন:

> যেথা ওই বাস্তব জগৎ…
> দৈন্য সেথা, ব্যাধি সেথা, সেথায় কুশ্রীতা,
> সেথায় রমণী দস্যুভীতা—
> সেথায় উত্তরী ফেলি পরি বর্ম;
> সেথায় নির্মম কর্ম।

কিন্তু নির্মম কর্মের অধিকারী কর্মপ্রিয় রবীন্দ্রনাথ হ'তে পারলেন না, অনধিকারের বেদনাই ব্যক্ত ক'রে গেলেন কয়েকটি সুন্দর কবিতায়।

সে যা-ই হোক্, রবীন্দ্রনাথ শেষ অবধি (গোড়া থেকেই সে-চেষ্টা ছিলো) সান্ত্বনা খুঁজে পেলেন—সান্ত্বনা নয়, সুখদুঃখ-বর্জিত নির্লিপ্ত প্রশান্তি—বিশ্ব-চিত্রকরের চিত্র দেখে, বলতে পারলেন: "ভালো লেগেছে, ভালোবেসেছি।" বৈদিক ঋষিদের ভাষায় বললেন: ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি। ভূমাতেই সুখ, ব্যক্তিতে সুখ নেই। নিজের ব্যক্তিসীমা ছাড়িয়ে উঠতে হবে, অপরকেও দেখতে হবে তার বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিরূপে নয়, ভূমার অঙ্গরূপে। ঋষিদের কথা জানি না, কিন্তু মানতে বাধা নেই যে এমন সীমাহীন দেশকালে সম্প্রসারিত দৃষ্টি ও তজ্জনিত প্রশান্তি—যাকে নান্দনিক দৃষ্টি ও আনন্দ বলা যায়—মহাকবির আয়ত্তগম্য হ'তে পারে। কেপলর-নিউটনের সময় থেকে বৈজ্ঞানিকরা ব'লে এসেছেন জাগতিক পরোৎকর্ষের কথা, পিথাগোরাসের music of the spheres এখনো তাঁরা শোনেন কান পেতে, বরঞ্চ সে-সংগীত আজ বেটোফেন-সিম্ফনির ধ্বনি-ঐশ্বর্য লাভ করেছে। সম্প্রতিকালের এক শীর্ষস্থানীয় পদার্থবিজ্ঞানী ওয়াইৎসেকর বলেন—বিশ্বব্যাপারের অশেষ জটিলতা এমন সরল কয়েকটি নিয়মের সূত্রে গ্রথিত যে ভাবতে গেলে বিস্ময়ে অবাক হ'তে হয়: "Such a world possesses the greatest intellectual beauty." কবিরা যখন জগৎকে সুন্দর বলেন তখন 'সুন্দর' শব্দটা স্বভাবতই আরো বিস্তার লাভ করে, বুদ্ধির সঙ্গে হৃদয়ের ও ইন্দ্রিয়েরও সন্তোষ প্রকাশ করে।

আকাশে-আকাশে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত রাগিণীর অশ্রুত মাধুরী পিথাগোরাস একাই ভোগ করেননি, আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষি-কবিরাও ব'লে গেছেন মহাবিশ্বের গগন-পটে লেখা কাব্যের কথা, বলেছেন—"দেবস্য পশ্য কাব্যম্"। রবীন্দ্রনাথের মতন কবি যে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনে অনুভব করবেন না এই বিশ্বজোড়া কবিতার ছন্দ, তা আমরা ভাবতেই পারি না। বিশ্ব-জগতে সুন্দরের প্রকাশ কখনো সংগীত হয়ে কবির কর্ণে ও মর্মে বাজে, কখনো-বা চিত্রধর্ম ধারণ ক'রে তাঁর নয়ন-মনকে উদ্ভাসিত করে:

ঐ তো আকাশে দেখি স্তরে স্তরে পাপড়ি মেলিয়া
জ্যোতির্ময় বিরাট গোলাপ

'বিরাট গোলাপ'-এর চেয়ে আরো লাগসই, আরো সার্থক উপমা পাই 'নবজাতক'-এ, "জয়ধ্বনি" কবিতাটিতে:

প্রত্যক্ষ দেখেছি যথা
দৃষ্টির সম্মুখে হিমাদ্রিরাজের সমগ্রতা,
গুহাগহ্বরের বক্র ভাঙাচোরা রেখাগুলো তারে
পারে নি বিদ্রূপ করিবারে।

হয়তো এরই কৈফিয়ৎস্বরূপ ১৩৪৭ সালে একটি প্রবন্ধে লিখলেন: "বস্তু যা পেয়েছি

তার চেয়ে রস পেয়েছি অনেক বেশি। আজ বুঝতে পারি এইজন্যই আমার আসা। আমি সাধু নই, সাধক নই, বিশ্বরচনার অমৃত-স্বাদের আমি যাচনদার। বারবার বলতে এসেছি—ভালো লাগল আমার। জগতে কাজ করবার লোকের ডাক পড়ে, চেয়ে দেখার লোকেরও আহ্বান আছে। আমার মধ্যে এই চেয়ে দেখার ঔৎসুক্যকে নিত্য পূর্ণ করবার আবেগ আমি অনুভব করি।"

সেই আহ্বান অনুভব করেছিলেন তাঁর সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ উর্দু কবি ইকবালও। একটি সুন্দর গজলের প্রথম দুটি পঙ্‌ক্তি এই :

গুলজারে হস্ত্‌ ও বুদ ন তু বেগানাওয়ার দেখ্‌
দেখনে কী চীজ হৈ ইঁসে তু বারবার দেখ্‌।

(আছে এবং ছিল-র বাগানকে উদাসীন চোখে দেখো না ;
দেখবার জিনিস এটা, বারবার চেয়ে দেখো।)

একই আহ্বান অনুভব করেছিলেন জর্মান ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি গ্যেটেও ;

To see I was born,
To look is my call
To the tower sworn,
I delight in all.
... ...
You blessed eyes
What you saw everywhere,
It be as it may,
It was, oh, so fair!

(Walter Kauffman's translation from *Fasut*)

ঐ উপান্ত পঙ্‌ক্তিতে (It be as it may) উহ্য রয়েছে যাবতীয় মানবিক যন্ত্রণা অক্ষমতা ও ব্যর্থতাবোধ।

গ্যেটে-বর্ণিত মীনারচূড়া থেকে যখন রবীন্দ্রনাথ নেমে আসেন—নামতেই হয় তাঁকে—"জন্মমৃত্যুর সংকীর্ণ সংগমস্থলে" ভাসমান ব্যক্তিজগতে, তখন দেখেন "সেখানে নিবিড় নিগূঢ় কালিমা অপেক্ষা করছে মৃত্যুর হাতের মার্জনা।" অথচ প্রত্যেকটি ব্যক্তির স্বতন্ত্র ব্যক্তিস্বরূপের মূল্য অন্তত কবির চোখে অন্য যে-কোনো মূল্য অপেক্ষা হেয় হ'তেই পারে না। নগণ্যতম মানুষও বিপুল (অসীম বললেও ভুল বলা হয় না) সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে ; অনেক-কিছু করবে সে, হবে সে, দেবে সে—কী তা সে নিজেই ঠিক জানে না, শুধু একটা অবিরাম অজর দুরন্ত তাগিদ অনুভব করে নিজের মনের গভীরতলে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

অথচ সেই অপার সম্ভাবনার কতো ভগ্নাংশই বাস্তবায়িত হয় তার অক্ষম সাধনায় এবং অবন্ধু প্রাকৃতিক ও মানবিক পরিবেশে। যাঁরা দেহে-মনে সক্ষম, ভাগ্য-

দেবতার বরপুত্র, লোকচক্ষে কীর্তিমান, তাঁরাও কি বার্ধক্যে পৌঁছে ভাবতে পেরেছেন আমার যা হবার তা হয়েছি, যা করবার তা করেছি, এবার যেন সবক'টি পাপড়ি মেলে-ধরা ফুলের মতো ঝ'রে যাই। গালিব একটি অবিস্মরণীয় বয়েতে ব'লে গেলেন :

বস্ হুজুমে না-উমীদী খাকমেঁ মিল জায়েগী
য়হ্ জো এক লজ্জৎ হমারী স'য়ী-এ বেহাসিল মেঁ হৈ।

(হতাশার ভিড় আর যেন না-বাড়ে, ছাই হয়ে যাবে
যে-স্বাদুতা আমার বিফল প্রয়াসে এখনো রয়েছে।)

গান্ধিজী নিহত হলেন উনআশী বছর বয়সে ; কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড়ো একটি কাজ—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ ও হরিজনদের নিয়ে পরস্পর প্রীতিপূর্ণ এক জাতি গঠন করবার কাজ—তখন সবে শুরু হয়েছিলো। অন্য বড়ো কাজ দেশের প্রত্যেকটি বঞ্চিত নরনারীর চোখের জল মুছে ফেলা—তখনো শুরুই হয়নি। রবীন্দ্রনাথ কি "আশি বছরের আয়ুঃক্ষেত্রে" পদার্পণ ক'রে ভাবতে পেরেছিলেন তাঁর বিকাশ, তাঁর প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়েছে ? রোগশয্যায় তিনি দেখতে পেরেছিলেন আকাশময় এক বিরাট গোলাপ ; নিজের মনের ভিতরের কুঁড়িটিকে কি গোলাপ হয়ে ফুটে উঠতে দেখে গেলেন ? তবে কি লিখতে পারতেন :

আছে আর নাই মিলে অসম্পূর্ণ তব সত্তাখানি
আপন গদগদ বাণী
পারে না করিতে ব্যক্ত, অশক্তির নিষ্ঠুর বিদ্রোহে
বাধা পায় প্রকাশ-আগ্রহে
মাঝখানে থেমে যায় মৃত্যুর শাসনে।
তোমার যে-সম্ভাষণে
জানাইতে চেয়েছিলে নিখিলের নিজ পরিচয়
হঠাৎ কি তাহার বিলয়,
কোথাও কি নাই তার শেষ সার্থকতা।
তবে কেন পঙ্গু সৃষ্টি, খণ্ডিত এ অস্তিত্বের ব্যথা।
অপূর্ণতা আপনার বেদনায়
পূর্ণের আশ্বাস যদি নাহি পায়,
তবে রাত্রিদিন হেন
আপনার সাথে তার এত দ্বন্দ্ব কেন।
ক্ষুদ্র বীজ মৃত্তিকার সাথে যুঝি
অঙ্কুরি উঠিতে চাহে আলোকের মাঝে মুক্তি খুঁজি।
সে মুক্তি না যদি সত্য হয়
অন্ধ মূক দুঃখে তার হবে কি অনন্ত পরাজয়।
("অপূর্ণ", 'পরিশেষ')

কবিতার শেষ প্রশ্নটি একটু যেন আলংকারিক, প্রশ্নের ভঙ্গিমায় উহ্য রয়েছে ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারিত একটি আশানুরূপ উত্তর—মৃত্তিকার সঙ্গে যুঝে আমার অন্তরের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠবে একদিন, অন্ধ মূক দুঃখে তার অনন্ত পরাজয় হবে না। এই আশা বছরে-বছরে ক্ষীণ হ'তে লাগলো। 'পরিশেষ'-এ এর অব্যবহিত পরবর্তী কবিতা "আমি"তে নিজেকে বোঝাচ্ছেন : এই খণ্ড-খণ্ড কোটি-কোটি আমি তো স্বতন্ত্ররূপে সত্য নয়, "ভূত ভবিষ্যৎ লয়ে যে বিরাট অখণ্ড বিরাজে / সে মানব মাঝে"ই সত্য, আর সে অখণ্ড মানবসত্তার তো ক্ষয় নেই, মৃত্যু নেই। আপাতত আধুনিক বিজ্ঞানের বিরুদ্ধ সাক্ষ্য অগ্রাহ্য ক'রে আমরা ধ'রেই নিচ্ছি কঁৎ-এর মতন সে মানবসত্তা অমর এবং অনন্ত উন্নতির পথে চলেছে। কিন্তু ব্যক্তির সত্যতা, ব্যক্তির পূর্ণতা নিজ ব্যক্তিত্বের সীমানাকে সম্পূর্ণ বিলোপ ক'রে দিয়ে অনন্ত মানবসত্তায় এক হয়ে যাওয়াতেই—এ-কথা খুশি মনে নিঃশেষে মেনে নেওয়া কি শারীরিক ও মানসিক অনন্ত তৃষ্ণায় ভরপুর মানুষের পক্ষে সম্ভব? সর্বমানুষের প্রতি মৈত্রীভাবনা এবং সাধ্যমতো হিতৈষণাকে প্রত্যেক ব্যক্তির পুরুষার্থ ভাবাই সঙ্গত। কিন্তু সবাইকে ভালোবাসতে শেখা মানে সকলের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলা নয়, স্বার্থত্যাগ মানে আত্ম-বিলোপ নয়। মুনি-ঋষিরা সাধু-সন্ন্যাসীরা যতোই কেন বলুন-না ব্যক্তির সঙ্গে ভূমার সম্পর্ক বিন্দুর সঙ্গে সিন্ধু-বৎ, কবি তো সে-কথা সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারেন না। ব্যক্তিস্বরূপ বলতে যা বোঝায় তা সত্য এবং অমূল্য ; বিন্দুর কোনো স্বরূপ নেই, গুণগত স্বাতন্ত্র্য নেই।

চার বছর পরে লেখা 'শেষ-সপ্তক'-এর একাধিক কবিতায় প্রত্যাশার রেশটুকু আর পাওয়া যায় না, "অপূর্ণ" কবিতাটির ক্ষীণাশা এখন নৈরাশ্যে নিমজ্জিতপ্রায়, প্রশ্ন রূপান্তরিত হয়েছে একটি চ্যালেঞ্জে। রবীন্দ্রনাথ যেন আহতস্পর্ধাপূর্বক বিহ্বল কিন্তু অবিজড়িত কণ্ঠে জানতে চাইছেন—ভগবান, তোমার সৃষ্টিতে এমন নিষ্ফলতা, নিষ্ফলতার এমন যন্ত্রণা কি সম্ভব?

> এই অপরিণত অপ্রকাশিত আমি—
> এ কার জন্যে, এ কিসের জন্যে।
> যা নিয়ে এল কত সূচনা, কত ব্যঞ্জনা,
> বহু বেদনায় বাঁধা হতে চলল যার ভাষা,
> পৌঁছল না যা বাণীতে,
> তার ধ্বংস হবে অকস্মাৎ নিরর্থকতার অতলে—
> সইবে না সৃষ্টির এই ছেলেমানুষি।

সৃষ্টির ছেলেমানুষি মানে তো স্রষ্টারই ছেলেমানুষি। মর্ত্যের মানুষকে তো সইতেই হবে এ-ছেলেমানুষি ; কে বলতে পারে স্বর্গের দেবতার কী সইবে আর কী সইবে না। তিনি কি সেই আদিকালের শিশু ভোলানাথ নন? মানুষের ভাগ্য নিয়ে পুতুল খেলা বা ছিনিমিনি খেলা যদি তাঁর ভালো লাগে, তবে তাঁর কাছ থেকে জবাবদিহি কে তলব করবে? অথচ কোনো এক অভাবনীয় দুঃসাহসে ভর ক'রে

কৈফিয়ৎ আমরা চেয়ে বসি ; রবীন্দ্রনাথ নিজে বার-বার প্রশ্ন করেছেন—'কিন্তু কেন'। সবচেয়ে মর্মান্তিক কথা এই যে কৈফিয়ৎ না-পেলে আমাদের বিশ্বাসে ভক্তিতে চিড় ধরে। চিড় ধরেছিলো রবীন্দ্রনাথের মনেও।

আরো কয়েক বছর পরের বই 'নবজাতক'-এর "প্রশ্ন" কবিতাটিতে তিনি আকাশের দিকে চেয়ে দেখেছেন সেখানে বহ্নিবাষ্প চতুর্দিকে ধাবমান, "কেন্দ্রে তার তারাপুঞ্জ মহাকাল-চক্রপথে ঘুরে"। তার উপরে কিছু নেই। তবে নিম্নে রয়েছে মানুষের দেহ এবং মন। এই অত্যাশ্চর্য যুগ্মসত্তা যেন কোনো দৃশ্যাতীত জ্যোতি, কতোটুকুই-বা জানি তার।

এ অজ্ঞেয় সৃষ্টি 'আমি' অজ্ঞেয় অদৃশ্যে যাবে নামি।
অসীম রহস্য নিয়ে মুহূর্তের নিরর্থকতায়
লুপ্ত হবে নানারঙা জলবিম্বপ্রায়,
অসমাপ্ত রেখে যাবে তার শেষ কথা
আত্মার বারতা।

আগের বিনম্র বিষণ্ণ প্রশ্ন এখন "সুতীব্র আর্তস্বর"-এ পরিণত হয়েছে, যার কোনো উত্তর নেই চারিদিককার ভীষণ স্তব্ধতায়। 'নবজাতক'-এর আধুনিক বিজ্ঞান-সচেতন কবিতাগুলিতেই সবচেয়ে প্রকট হয়েছে অন্তিম পর্বের ট্র্যাজিক সুর।

তবু আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ শেষ অবধি এই বিশ্বাসটিকে বহু কষ্টে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন যে, নানা স্খলন পতন বিভ্রান্তি এমন-কি মাঝে-মাঝে পশ্চাৎ-গতি সত্ত্বেও বিরাট মানবসত্তা চলেছে কোনো-এক পরিপূর্ণ সার্থকতার তীর্থের অভিমুখে—যার কল্পচিত্র আমাদের মানস-পটে এখনো অস্পষ্ট তবু তার আকর্ষণী শক্তি কম নয়। সে-যাত্রাকে সফল ক'রে তুলবার জন্য প্রাকৃত জগতের প্রয়োজনীয় আনুকূল্য থেকে মোটের উপর আমরা বঞ্চিত হইনি এ-যাবৎ। তবে ভাবীকালে তা ক্রমশঃ প্রত্যাহৃত হবে ব'লে আধুনিক বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করেছেন। সে-বিষয়ে উত্তীর্ণ-সত্তর রবীন্দ্রনাথ অবগত হয়েও যেন কিঞ্চিৎ সন্দিহান। ফলত ক্লান্ত হ'লেও তাঁর কল্পনা ও এষণা পাখা বন্ধ করেনি, যদিও:

বিশ্বজগৎ নিশ্বাস বায়ু সম্বরি
স্তব্ধ আসনে প্রহর গণিছে বিরলে।

ওয়াইৎসেকর প্রশ্ন তুলেছেন যে অতি-অতি দূর দেশ-কালে কী হয়েছিলো, হচ্ছে বা হবে সে-বিষয়ে নিশ্চিত ক'রে কিছু ঘোষণা করা বিজ্ঞানের পক্ষে অনধিকার চর্চা। হাজার কোটি বৎসর পূর্বের বা পরের প্রাকৃতিক অবস্থা ঠিক বিজ্ঞানগম্য নয়। এ-সব বৈজ্ঞানিক বিতর্ক উঠেছে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে। তাই তার দ্বারা রবীন্দ্রনাথের কল্পনা উৎসাহিত হয়েছিলো বলা যায় না। নিজের অন্তরের তাগিদেই এবং বিজ্ঞানের প্রতি কবির পক্ষে অপ্রত্যাশিত মাত্রায় শ্রদ্ধাবান হয়েও তিনি বিশ্ব-জগতের প্রলয়-যাত্রার কথাটা সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারেননি। রোগশয্যায় শুয়ে "অসুস্থ দেহের মাঝে ক্লিষ্ট রচনার যে প্রয়াস" তা-ই দেখছেন অনাদি আকাশে, দেখছেন:

আদি মহার্ণব-গর্ভ হতে
অকস্মাৎ ফুলে ফুলে উঠিতেছে
প্রকাণ্ড স্বপ্নের পিণ্ড,
বিকলাঙ্গ, অসম্পূর্ণ।

তবু রোগশয্যার যন্ত্রণার মধ্যেই ভাবছেন এমন একদিন আসবে যে-দিন :

মৃত্তিকার দিবে আসি মন্ত্র পড়ি,
ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিবে বিধাতার
অন্তর্গূঢ় সংকল্পের ধারা।

অনাদিকাল থেকে অদ্যাবধি যার প্রকাশ ক্লিষ্ট, ব্যাহত, বিকলাঙ্গ, তা মন্ত্রবলে একদিন উদ্‌ঘাটন করবে পরম সুন্দর ও শুভের সংকল্প—একটু অসঙ্গতি আছে এ-ভাবনায়। তবু রবীন্দ্রনাথ ভাবছেন তা-ই, না-ভাবলে তাঁর চোখে সমস্ত বিশ্ব-জগৎ অন্ধকার হয়ে যাবে ব'লেই হয়তো ভাবছেন ; যুক্তি যেখানে পরাভূত সেখানে হৃদয় পরাভব মানছে না। তবে যে-বিশ্বাস না-থাকলে আমরা বাঁচতে পারি না (শুধু পশুধর্ম নয়, মনুষ্যধর্ম রক্ষা ক'রে বাঁচতে পারি না) তা কেবল বাসনার অভিক্ষেপ—এ-কথা শ্রদ্ধেয় নয়। বৈজ্ঞানিক সত্যের বিচার হয় পরীক্ষাগারে এবং শেষ পর্যন্ত প্রযুক্তি-বিদ্যার সাফল্যে অর্থাৎ প্রকৃতির উপর ক্ষমতা-বিস্তারে। সে-সত্যকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না, তার বিরুদ্ধাচরণ করতে গেলে জড়প্রকৃতির মার খেতে হবে। কিন্তু বিজ্ঞান যেখানে নীরব বা স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে অমিতভাষী, সেখানেও বিজ্ঞানের তাঁবেদারী করতেই হবে এমন দাসখৎ অন্তত কবি লিখতে বাধ্য নন। শত কোটি বৎসর পরে কী হবে আর কী হবে না তার আনুমানিক হিসাব মেলাতে গিয়ে আমরা আজকের জীবনের আধ্যাত্মিক তহবিল শূন্য ক'রে দিতে রাজী নই।

মানবসত্তার (হিউম্যানিটির) অন্তিম বিনাশ আর রাম শ্যাম যদুর মৃত্যু একই পর্যায়ের সত্য নয়। প্রথমটি অতি সূক্ষ্ম গণনার ব্যাপার, অধুনা যার ফলাফল কিঞ্চিৎ বিতর্কিত। দ্বিতীয়টি আমাদের চোখের সামনে দিবারাত্রি ঘটছে। যাঁরা বলেন জড়দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হ'লেও প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-সংবলিত (তা না-হ'লে কর্মফলের কথা ওঠে কেমন ক'রে ?) বিদেহী আত্মা অবিনশ্বর, তাঁরা কি জানেন না অথবা ধামাচাপা দিয়ে রাখছেন সেই ভূরি-ভূরি প্রমাণ যা আধুনিক শরীর-বিজ্ঞান এবং মনস্তত্ত্ব সংগ্রহ করেছে দেহ-মনের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও পরস্পর-নির্ভরতা বিষয়ে ?* উঁকি-ঝুঁকি মারলেও রবীন্দ্রনাথের মনে এ-ধারণা কখনো বাসা

* মন দেহেরই ব্যাপারমাত্র—জড়বাদীদের এ-মত আমি সমর্থন করতে পারি না। আমি শুধু বলতে চাই যে দেহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন মন ধারণা করা যায় না, বিরুদ্ধ সাক্ষ্যের পরিমাণ বড়ো বেশি। যদি কেউ বলেন : মন না-হয় দেহের সঙ্গে বিলীন হয়ে গেলোই, আত্মা তো অমর হ'তে পারে, তা হ'লে উত্তরে বলবো : আত্মাকে মন থেকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। মনেরই কোনো-কোনো সমুন্নীত বৃত্তিকে আমরা আধ্যাত্মিক ব'লে থাকি। যদি-বা মনের অতীত আত্মা ব'লে কোনো রহস্যময় সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করি, তবু প্রশ্ন ওঠে—একজনের আত্মার সঙ্গে আর-একজনের আত্মার ভেদ থাকবে কোথায় ? ভেদ তো দেহে এবং মনেই।

বাঁধতে পারেনি যে মানুষের জাতিসত্তার মতন তার ব্যক্তিসত্তাও অজর, অমর, এবং অনন্তকালের পথে—জন্ম-পরম্পরায় বা লোকান্তরবাসী বিদেহী আত্মারূপে—চলেছে পরিপূর্ণতার দিকে আপন ব্যক্তিস্বরূপের মূল রক্ষা ক'রে। ব্যক্তিমানুষ "ধ্বংস হবে অকস্মাৎ নিরর্থকতার তলে"—এ-ভাবনা তাঁর কবি-হৃদয়কে যতোই ব্যথা দিক, তাকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় তিনি খুঁজে পাননি। জাজ্বল্যমান সত্যকে তো আর স্বপ্নের রঙিন বালাপোষ দিয়ে ঢাকা যায় না, সে-স্বপ্ন শাস্ত্র বা জনমত-সংবলিত হ'লেও না। পক্ষান্তরে জীবাত্মাকে মায়ার সৃষ্টি ব'লে বরখাস্ত ক'রে দেওয়ার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন ও সাহিত্য এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ।

হৃদয়ের যুক্তি তাঁকে মহামানবের চিরন্তনতার আশ্বাস দিয়েছে, সেই চিরমানবের অনন্ত যাত্রার মধ্যে নিজের স্বল্পায়ু আমি-কে অর্থবান ক'রে তুলবার কথা বার-বার বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। তবু মন মানে না। ব্যক্তিসত্তার অমোঘ ক্ষণিকতা, নিজের জরায় তার গ্লানিকর সাক্ষ্য এবং প্রিয়জনের মৃত্যুতে তার ভয়াবহ ঘোষণা—এ যে ব্যক্তি-জীবনের নিদারুণতম সত্য। "কেন হারাবার লাগি এতখানি পাওয়া"—প্রশ্নটি স্তব্ধ হবে না কোনোদিন কোনো বুকে।

তবে কি ব্যক্তির জন্য কোনোই সান্ত্বনা নেই? রবীন্দ্রনাথ stoic resignation-এর কথা বলছেন না, বলছেন না imperturbability বা নির্বেদের কথা। ক্বচিৎ-কখনো বলেছেনও যখন, ভাব ভঙ্গি ও ভাষা তখন এমন হাল্‌কা যে মনে হয় সমস্ত ব্যাপারটা দৈবী বা কস্‌মিক রসিকতা:

বিধাতা আপন ক্ষতি করে যদি ধার্য
নিজেরই তবিল-ভাঙা হয় তার কার্য,
নিমেষেই নিঃশেষ করি ভরা পাত্র
বেদনা না যদি তার লাগে কিছুমাত্র,
আমারি কী লোকসান যদি হই শূন্য—
শেষ ক্ষয় হলে কারে কে করিবে ক্ষুণ্ণ।

("মংপু পাহাড়ে", 'নবজাতক')

কিন্তু ব্যক্তি-জীবনের ট্র্যাজিক পরিণামকে এমন ফুরফুরে স্তোকবাক্যে উড়িয়ে দেওয়া যায় না; সে-চেষ্টা সফল হয়নি 'ক্ষণিকা'র "বোঝাপড়া" কবিতাটিতেও, যদিও তখন অনুত্তীর্ণ যৌবন রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিলো "তেমন করে হাত বাড়ালে / সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি"।

সমস্ত দৈবী ও প্রাকৃতিক প্রতিকূল শক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ বলছেন অন্য-একটি কথা, যে-কথা রবীন্দ্রনাথের মতো কবিই বলতে পারতেন, কোনো স্টোয়িক দার্শনিক বা বৈদান্তিক ঋষি নয়; বলছেন এমন ভাষায় ও ভঙ্গিতে যাতে কবির অন্তরের সত্য স্বকীয় মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত, সমুজ্জ্বল। আমাদের সন্দেহ থাকে না যে এই সত্যকে খণ্ডাতে পারে এমন কোনো শক্তি ইহলোকে বা পরলোকে

নেই। ব্যক্তি মানবসত্তার শেষ সম্বল এই পরম মূল্যবান কথাটা আমি নিজের ভাষায় লিখতে পারতাম, তবে তাতে কথার সার থাকলেও সুর যেতো হারিয়ে। অথচ সুরটাই এখানে অনেকখানি, কারণ মর্ম-গ্রহণের চেয়ে বড়ো কথা এখানে মর্মে গ্রহণ। অনেক কবিতার অনেক জায়গায় সংক্ষেপে বা স্বল্পবিস্তারে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এ-কথা, তবে যে-কবিতায় আদ্যোপান্ত এই একটি কথাই বলা হয়েছে, তা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হ'লেও প্রায় সমস্তটা উদ্ধৃত করতে চাই। অন্যান্য গদ্যকবিতার মতো বিস্তৃত হ'লেও কবিতাটি সুন্দর, এবং হৃদয়ের সুষ্ঠু যুক্তিতে সপ্রমাণিত।

কালো অন্ধকারের তলায়
পাখির শেষ গান গিয়েছে ডুবে।
বাতাস থমথমে,
গাছের পাতা নড়ে না,
স্বচ্ছ রাত্রের তারাগুলি
যেন নেমে আসছে
পুরাতন মহানিম গাছের
ঝিল্লিঝংকৃত স্তব্ধ রহস্যের কাছাকাছি।

এমন সময়ে হঠাৎ আবেগে
আমার হাত ধরলে চেপে
বললে, "তোমাকে ভুলব না কোনোদিনই।"
দীপহীন বাতায়নে
আমার মূর্তি ছিল অস্পষ্ট,
সেই ছায়ার আবরণে
তোমার অন্তরতম আবেদনের
সংকোচ গিয়েছিল কেটে।
সেই মুহূর্তে তোমার প্রেমের অমরাবতী
ব্যাপ্ত হল অনন্ত স্মৃতির ভূমিকায়।
সেই মুহূর্তের আনন্দ বেদনা
বেজে উঠল কালের বীণায়,
প্রসারিত হল আগামী জন্মজন্মান্তরে।
সেই মুহূর্তে আমার আমি,
তোমার নিবিড় অনুভবের মধ্যে
পেল নিঃসীমতা।
... ...
এই নিমেষটুকুর বাইরে আর যা-কিছু
সে গৌণ।
এর বাইরে আছে মরণ,
একদিন রূপের আলো-জ্বালা রঙ্গমঞ্চ থেকে
সরে যাব নেপথ্যে।

প্রত্যক্ষ সুখ-দুঃখের জগতে
মূর্তিমান অসংখ্যতার কাছে
আমার স্মরণচ্ছায়া মানবে পরাভব
তোমার দ্বারের কাছে আছে যে কৃষ্ণচূড়া
যার তলায় দু'বেলা জল দাও আপন হাতে
সেও প্রধান হয়ে উঠে
তার ডাল-পালার বাইরে
সরিয়ে রাখবে আমাকে
বিশ্বের বিরাট অগোচরে।
তা হোক
এও গৌণ।

("চোদ্দো", 'শেষ সপ্তক')

অনুরূপ ভাব প্রকাশ করেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর প্রথম পর্বের শ্রেষ্ঠ কবিতা "শাশ্বতী"তে, আরো সংক্ষেপে ঘন-সন্নিবদ্ধ চারটি পঙ্‌ক্তিতে :

একটি কথার দ্বিধা-থরথর চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী,
একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে
থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি।

মনে প'ড়ে যায় 'চৈতালী'র সনেট "প্রথম চুম্বন"। এখানে শুধু প্রথম এবং শেষ পঙ্‌ক্তিদ্বয় উদ্ধৃত করছি :

স্তব্ধ হল দশ দিক নত করি আঁখি
বন্ধ করে দিল গান যত ছিল পাখি।

অনন্ত নক্ষত্রলোক উঠিল শিহরি,
আমাদের চক্ষে এলো অশ্রুজল ভরি।

এলিয়ট্ লিখেছেন :

I will show you fear in a handful of dust.

লিখতে পারতেন কিন্তু লেখেননি (পাছে তাঁকে কেউ রোম্যান্টিক ব'লে বসে) :

'I will show you eternity in a kiss :

প্রেমকে এই মহোচ্চ স্তরে, যেখানে তার প্রত্যেকটি প্রকাশে প্রচ্ছন্ন থাকে স্বর্গের মূল্য, বেশিদিন রাখা সম্ভব নয়, মর্ত্যের সব জিনিসের মতো প্রেমও ক্ষয়িষ্ণু, মরণশীল। পরবর্তী সনেট "শেষ চুম্বন"-এ বড়ো সুন্দর ক'রে এই কথাটা বলা হয়েছে : তবু যখন পূর্ণ বৈভবে ও মহিমায় তার প্রকাশ ঘটে (যতো স্বল্পদিনের জন্যে হোক্ সে-প্রকাশ) তখন আমাদের তুচ্ছ, একঘেয়ে, গ্লানিকর, মৃত্যুর দিকে ধাবমান জীবন ধন্য হয়ে যায় চিরকালের মতো।

শুধু প্রেমের দীপ্তিতেই যে ক্ষণকাল অসীমকালের ও অনন্ত লোকের মর্যাদা লাভ করে তা নয়, মহৎ শিল্প-সাহিত্যের রসাস্বাদনেও তা ঘটতে পারে, ঘটতে পারে দুর্লভ বন্ধুত্বডোরে বাঁধা দুই বন্ধুর বহুকাল পরে দূর দেশে হঠাৎ দেখায়, হিমালয় বা সমুদ্রের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারে, জ্ঞানান্বেষীর পক্ষে কোনো-কোনো দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের এমন আলোকসম্পাতে যাতে সমস্ত বিশ্ব চরাচরকে সম্বোধন ক'রে মন ব'লে ওঠে : "বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে"।

ঘুরে-ফিরে আবার আমরা পৌঁছলাম সেই পরম বিস্ময়ে যা একমাত্র মানুষের পক্ষেই বোধ করা সম্ভব, অথচ যার উপলব্ধি মানুষকে নিয়ে যায় তার জীবন-সীমার বাইরে। এ তো অসীমের মধ্যে নিজেকে হারানো নয়, অসীমকেই কোনো-এক চূড়ান্ত মুহূর্তের অণুতম পরিধির মধ্যে ধ'রে আনা। অমৃত-ভরা মুহূর্তগুলি অমৃত পায় কোথা থেকে? নারীপ্রেম, মানবপ্রেম, বন্ধুত্ব, শিল্পসম্ভোগ—যে-কোনো অমূল্য অভিজ্ঞতাই আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়। মনে হয় যেন পর্দার পর পর্দা স'রে যাচ্ছে, দিগন্তের পর দিগন্ত পেরিয়ে যাচ্ছি আমরা। সাহিত্য চিত্রাদি শিল্প-সামগ্রী বিষয়ে এ-কথা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানী-গুণীরা বহুবার বলেছেন। প্রেমের বেলাও যে এই নিঃসীমতা কম সত্য নয় তা বোধহয় শুধু কবিরাই বলেছেন প্রেমিকদের কানে-কানে। জ্ঞানে শিল্প-সাহিত্যে কিংবা লোকহিতৈষণায় জীবনের অর্থ খুঁজে পাওয়া সব মানুষের সহজাত বা পরিশীলিত শক্তিতে কুলিয়ে না-ও উঠতে পারে; কিন্তু প্রেম সামান্যতম মানুষের, হরিপদ কেরানীরও, হৃদয়কে অসামান্য মূল্যের আধার ক'রে তোলে কিছুকালের জন্য।

> শুধু ধূলি, শুধু ছাই মূল্য যার কিছু নাই,
> মূল্য তারে করো সমর্পণ
> স্পর্শে তব, পরশ রতন।

এ-অভিজ্ঞতা ঈশ্বর-প্রেমের বেলা যেমন নারীপ্রেমের বেলায়ও তেমনি সত্য। এবং অন্তত এই একটি সাধনমার্গে অধিকারীভেদের প্রশ্ন একেবারেই গৌণ।